কাজী নজরুল ইসলাম



ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সকল কবি-সাহিত্যিক তাদের লেখনির মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের তরুণ-যুবকদের চেতনার কারফিউ-তন্দ্রা ভেঙ্গে দিয়ে দেশপ্রেমের মন্ত্রে জাগরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের কাছে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র আর কবি-সাহিত্যিকদের ছিল কলম এবং মুকুন্দদাসের ছিল কণ্ঠ। কলমাস্ত্র ও কণ্ঠ দিয়ে নির্মাণ হতো চেতনা। চেতনা সৃষ্টি করতো বিপ্লবীদের সাহস ও দৃঢ়তা। যার কারণে ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

'আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
.....
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!'

'গাজনের বাজনা বাজা, কে মালি কে সে রাজা
কে দেয় সাজা, মুক্ত স্বাধীন স্বত্ব কেড়ে
হা.. হা.. হা.. পায় যে হাসি ভগবান পরবে ফাঁসি...'

কাজী নজরুল ইসলাম। আমাদের কবি। মানুষের কবি। চারণ কবি। জাতীয় কবি। বিদ্রোহী কবি। বিপ্লবী কবি। শোষিত মানুষের কবি। শুধু কবি নন, তিনি সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যেও অন্যতম। গীতিকার, সুরকার, গায়ক, নাট্যকারও তিনি। অন্যদিকে অস্ত্র হাতে সাহসী সৈনিকের দায়িত্বও পালন করেছেন। শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকে ব্যয় করেছেন। স্বাধীনতা-সাম্যের জন্য তিনি বজ্র-ইস্পাত কঠিন কবিতা রচনা করেছেন। অন্যদিকে সময় পেলেই প্রকৃতির প্রেমে ডুবে যেতেন তিনি। লিখতেন মা-মাটি-প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রকৃতি নারী নিয়ে।

'তুমি আমায় ভালোবাস তাই আমি কবি
আমার এরূপ- সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।'

নজরুল ছিলেন মানবতাবাদী কবি। তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন সর্বত্র। লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, মানুষ হিসেবে বিচার করেছেন সকলকে। বিশ্ব সভ্যতায় সকলের সম অবদান। তাই তিনি বলেছেন..

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

মানুষ আর মানবতা বিষয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। 'মানুষ' কবিতায় তিনি রচনা করেন মানুষের সাম্যের পথ। যে পথ শোষণ-বৈষম্যে অবসান ঘটিয়ে সাম্য ভালবাসার সমাজ ও পৃথিবী নির্মাণ করবে। পৃথিবীর সভ্যতার মূলে মানুষেরই অবদান। সভ্যতা নির্মাণে আর কারো কোনো অবদান নেই। তাই তিনি 'মানুষ' কবিতায় বলেছেন..

'গাহি সাম্যের গান..
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাহি, নহে কিছু মহীয়ান!'

মুক্তসমাজ মুক্তসংস্কৃতি মুক্তচিন্তা নির্মাণের কবি ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও ছোট-বড় এসকল কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাকে কখনও আমল দেননি। গোঁড়ামি-ধর্মান্ধতা ও কথিত কাল্পনিক কোনো দেব-দেবী-ঈশ্বরে আস্থা রাখেননি। বরং এসব গোঁড়ামির মূলে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন বারংবার। মানুষকে সব ধরণের চেতনার দীনতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করার জন্য শক্ত হাতে লিখেছেন অবিরাম। তিনি বলেছেন..

'পুঁজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।
মূর্খরা সব শোন, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন!'

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। চুরুলিয়া জামুরিয়া থানায় অবস্থিত। দাদা কাজী আমিনউল্লাহ। বাবা কাজী ফকির আহমদ, মা জাহেদা খাতুন। নজরুল ইসলামের বাবা ছিলেন স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম। তারা ছিলেন ছয় ভাই এবং এক বোন।

কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া। তিনি বাল্য বয়সে স্থানীয় মক্তবে 'মসজিদ পরিচালিত মুসলিমদের ধর্মীয় স্কুলে' পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯০৮ সালে তার বাবা মারা যায়। তখন তার বয়স মাত্র নয় বছর। পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে তার শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হয়। মাত্র দশ বছর বয়সে তাকে নেমে যেতে হয় রুটি-রুজির সন্ধ্যানে। এ সময় তিনি মক্তবে ছাত্র পড়ানো শুরু করেন। একই সাথে হাজী পালোয়ানের কবরের সেবক এবং মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসাবে যুক্ত থাকেন। এভাবে তিনি ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়ের সাথে পরিচিত হন। মক্তব, মসজিদ ও মাজারের কাজে তিনি বেশি দিন ছিলেন না। শুরু হল ভবঘুরে ও বাউণ্ডুলে জীবন। বাল্য বয়সেই তিনি লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। একটি লেটো দলে যোগ দেন। তার চাচা কাজী ফজলে করিম চুরুলিয়া অঞ্চলের লেটো দলের ওস্তাদ ছিলেন। আরবি, ফারসি ও উর্দূ ভাষায় তার দখল ছিল। ফজলে করিম মিশ্র ভাষায় গান রচনা করতেন। ধারণা করা হয় ফজলে করিমের প্রভাবেই নজরুল লেটো দলে যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া ওই অঞ্চলের জনপ্রিয় লেটো কবি শেখ চকোর এবং কবিয়াল বাসুদেবের লেটো ও কবিগানের আসরে নজরুল নিয়মিত অংশ নিতেন। লেটো দলেই তার সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। এই দলের সাথে তিনি বিভিন্ন স্থানে যেতেন। তাদের

সাথে অভিনয় শিখতেন। তাদের নাটকের জন্য গান ও কবিতা লিখতেন। এসময়ে তিনি বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন শুরু করেন। একইসাথে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নও চলতে থাকে। নাট্যদলের জন্য বেশকিছু লোকসঙ্গীত রচনা করেন তিনি। ... চাষার সঙ, শকুনীবধ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, দাতাকর্ণ, আকবর বাদশাহ, কবি কালিদাস, বিদ্যাভূতুম, রাজপুত্রের গান, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ এবং মেঘনাদ বধ।

১৯১০ সালে নজরুল লেটো দল ছেড়ে ছাত্র জীবনে ফিরে আসেন। তিনি প্রথমে রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। আর্থিক সমস্যার কারণে বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেন নি। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর তাকে আবার রুটি-রুজির সন্ধানে বের হতে হয়। প্রথমে যোগ দেন বাসুদেবের কবি দলে। এরপর একজন খ্রিস্টান রেলওয়ে গার্ডের খানসামা এবং সবশেষে আসানসোলের চা-রুটির দোকানে রুটি বানানোর কাজ নেন। জীবনযুদ্ধে কষ্টের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। এই দোকানে কাজ করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লাহ'র সাথে তার পরিচয় হয়।

দোকানে একা একা বসে নজরুল যেসব কবিতা ও ছড়া রচনা করতেন তা দেখে রফিজউল্লাহ তার প্রতিভার প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হন। তিনিই নজরুলকে ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। ১৯১৫ সালে তিনি আবার রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ফিরে যান এবং সেখানে অষ্টম শ্রেণি থেকে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত নজরুল এখানেই পড়াশুনা করেন। ওই বছরের শেষদিকে মাধ্যমিক প্রিটেস্ট পরীক্ষা না দিয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এই স্কুলে পড়াশুনার সময় নজরুল স্কুলের চারজন শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। এরা হলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবী চেতনা বিশিষ্ট নিবারণচন্দ্র ঘটক, ফারসি সাহিত্যের হাফিজ নুরুন্নবী এবং সাহিত্য চর্চার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯১৭ সালের শেষদিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রথমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত প্রদেশের নওশেরায় যান। প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন ১৯১৭ সালের শেষভাগ থেকে ১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিক থেকে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত পদ মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন। উক্ত রেজিমেন্টের পাঞ্জাবী মৌলবির কাছে তিনি ফারসি ভাষা শিখেন। এছাড়া সহ-সৈনিকদের সাথে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রাখেন। আর গদ্য-পদ্যের চর্চাও চলতে থাকে একই সাথে সমভাবে।

করাচি সেনানিবাসে বসে নজরুল যে রচনাগুলো সম্পন্ন করেন তার মধ্যে রয়েছে, বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী (প্রথম গদ্য রচনা), মুক্তি (প্রথম প্রকাশিত কবিতা); গল্প: হেনা, ব্যথার দান, মেহের নেগার, ঘুমের ঘোরে, কবিতা সমাধি ইত্যাদি। করাচি সেনানিবাসে থাকা সত্ত্বেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী, মর্ম্মবাণী, সবুজপত্র, সওগাত এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। এই সময় তার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ফারসি কবি হাফিজের কিছু বই ছিল। মূলত নজরুলের সাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি করাচি সেনানিবাসে। সৈনিক থাকা অবস্থায় তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। এ সময় নজরুলের বাহিনীর ইরাক যাবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় আর যাননি। ১৯২০ সালে যুদ্ধ শেষ হলে ৪৯

বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয়। এরপর তিনি সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

যুদ্ধ শেষে নজরুল ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। তার সাথে থাকতেন ওই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফ্ফর আহ্মদ। এখানে তার সাহিত্য-সাংবাদিকতা জীবনের মূল কাজগুলো শুরু হয়। প্রথম দিকে মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস বাঁধন হারা এবং কবিতা বোধন, শাত-ইল-আরব, বাদল প্রাতের শরাব, আগমনী, খেয়া-পারের তরণী, কোরবানি, মহররম, ফাতেহা-ই ইয়াজদহম। এই লেখাগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় তার খেয়া-পারের তরণী এবং বাদল প্রাতের শরাব কবিতা দুটির প্রশংসা করে একটি সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেন। এ থেকেই দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সাথে নজরুল নজরে আসতে শুরু করেন। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে কাজী মোতাহার হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আফজালুল হক প্রমুখের সাথে পরিচয় হয়। তৎকালীন কলকাতার দুটি জনপ্রিয় সাহিত্যিক আসর গজেনদার আড্ডা এবং ভারতীয় আড্ডায় অংশগ্রহণের সুবাদে পরিচিত হন অতুলপ্রসাদ সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশির ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মেলন্দু লাহিড়ী, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ প্রমুখের সাথে।

১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে যেয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে নজরুলের বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

১৯২০ সালের ১২ জুলাই নবযুগ নামক একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেরেবাংলা এ. কে ফজলুল হক। এই পত্রিকার মাধ্যমেই নজরুল নিয়মিত সাংবাদিকতা শুরু করেন। ওই বছরই এই পত্রিকায় 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন যার জন্য পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং নজরুলের উপর পুলিশের নজরদারী শুরু হয়।

সওগাত পত্রিকার ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় তার প্রথম গান প্রকাশিত হয়। গানটি ছিল: 'বাজাও প্রভু বাজাও ঘন'। ১৯২১ সালের এপ্রিল-জুন মাসের দিকে নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে গ্রন্থ প্রকাশক আলী আকবর খানের সাথে পরিচিত হন। তার সাথেই তিনি প্রথম কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। আর এখানেই পরিচয় হয় প্রমীলা দেবীর সাথে। যার সাথে তার প্রথমে পরিণয় ও পরে বিয়ে হয়েছিল।

১৯২১ সালের ২১ নভেম্বর ছিল সমগ্র ভারতব্যাপী হরতাল। এতে নজরুল অসহযোগ মিছিলের সাথে শহর প্রদক্ষিণ করেন আর গান করেন, 'ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ফিরে চাও ওগো পুরবাসী'। নজরুলের এ সময়কার কবিতা, গান ও প্রবন্ধের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এর উদাহরণ বিদ্রোহী কবিতাটি। ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট নজরুল ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ করে। এটি সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হতো। ১৯২০-এর দশকে

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন এক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরপর স্বরাজ গঠনে যে সশস্ত্র বিপ্লববাদের আবির্ভাব ঘটে তাতে ধূমকেতু পত্রিকার বিশেষ অবদান ছিল। এই পত্রিকাকে আশীর্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু।

আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন। পত্রিকার প্রথম পাতার শীর্ষে এই বাণী লিখা থাকতো। পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের কবিতা আনন্দময়ীর আগমনে প্রকাশিত হয়। এই রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় ৮ নভেম্বর পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। একই বছরের ২৩ নভেম্বর তার যুগবাণী প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। একই দিনে তাকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাকে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি নজরুল বিচারাধীন বন্দী হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক জবানবন্দী প্রদান করেন। ১৬ জানুয়ারি বিচারে তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯২৪ সাল থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত তিনি লেখালেখি জগতে ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের পাশে থেকে কবিতা দিয়ে, গান দিয়ে, ধারালো লেখনি দিয়ে তাদেরকে উজ্জীবিত করতেন। এছাড়াও তিনি অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। একবার মুজফ্ফর আহ্মদ তাকে পার্টির মেম্বারশীপ দিতে চাইলে তিনি জানান, পার্টি সদস্যরা নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে যেভাবে কাজ করেন সেভাবে তিনি যুক্ত থাকতে পারবেন না কিন্তু তিনি যখনই সময় পাবেন তখনই পার্টির কাজ করবেন। কারণ তিনি ছিলেন বিদ্রোহী-বিপ্লবী বেশে বাউণ্ডুলে স্বভাবের স্ফুলিঙ্গ।

নবযুগে সাংবাদিকতার পাশাপাশি নজরুল বেতারে কাজ করছিলেন। এমন সময়ই অর্থাৎ ১৯৪২ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তার অসুস্থতা সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে। এরপর তাকে মূলত হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু এতে তার অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। সেই সময় তাকে ইউরোপে পাঠানো সম্ভব হলে নিউরোসার্জারি করে ভাল করা যেত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে তিনি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তারা নিভৃতে ছিলেন। ১৯৫২ সালে কবি ও কবিপত্নীকে রাঁচির এক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এরপর ১৯৫৩ সালের মে মাসে নজরুল ও প্রমীলা দেবীকে চিকিৎসার জন্য লন্ডন পাঠানো হয়। মে ১০ তারিখে লন্ডনের উদ্দেশ্যে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন ছাড়েন। লন্ডন পৌছানোর পর বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তার রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। বলেছিলেন 'ইনভল্যুশনাল সাইকোসিস' রোগে ভুগছেন।

১৯৫৩ সালের ৯ ডিসেম্বর কবিকে পরীক্ষা করানো হয়। এর ফলাফল থেকে ড. হফ বলেন যে, কবি নিশ্চিতভাবে পিক্স ডিজিজ নামক একটি নিউরণ ঘটিত সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগে আক্রান্তদের মস্তিস্কের ফ্রন্টাল ও পার্শ্বীয় লোব সংকুচিত হয়ে যায়। অনেক দিন পর নজরুলকে নিয়ে তার সঙ্গীরা ভারতে ফিরে আসেন।

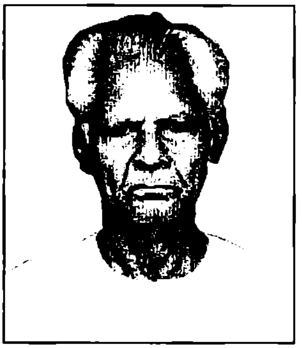
১৯৭২ সালের ২৪ মে তারিখে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবি নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান

এক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কবির বাকি জীবন বাংলাদেশেই কাটে। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে। ওই বছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। ১৯৭৪ সালে কবির সবচেয়ে ছোট ছেলে এবং বিখ্যাত গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ মারা যায়। ১৯৭৬ সালের ২৭ আগস্ট তিনি মারা যান।

'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত
মম অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!
আমি জানি জানি ওই স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ওই চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুঁটি বিধাতার বুকে হাতুড়ি,
আমি জানি জানি ওই ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তা'ও!
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তা'ও!
তোর নিযুত নরকে ফুঁ'দিয়ে নিবাই, মৃত্যুর মুখে থুথু দি,
আর যে যত রাগে তারে তত কাল-আগুনে কাতুকুতু দি'
– নজরুল ইসলাম

লেখক: শেখ রফিক

জগদীশ আইচ সরকার



চন্দ্রদ্বীপ। বরিশালের পূর্বনাম। এটি ছিল তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। অগ্নিযুগের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামে বরিশালের অবদান নানাদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম। বরিশালের বানরীপাড়া ছিল সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের তীর্থস্থান। বানরীপাড়ার পরে স্বরূপকাঠীর নাম উল্লেখযোগ্য। মূলত বরিশাল সদর ও বানরীপাড়ার পর স্বরূপকাঠীতেই বিপ্লবীদের তৃতীয় ঘাটি গড়ে ওঠে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে স্বরূপকাঠীই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। যার নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী কমিউনিস্টরা। তাদের মধ্যে কমরেড জগদীশ আইচ সরকারের নাম সর্বজন স্বীকৃত।

স্বরূপকাঠীর বুক চিরে বয়ে গেছে বিখ্যাত সন্ধ্যা নদী। নদীর দুই কূল ঘেঁষে রয়েছে অসংখ্য গ্রাম। কামারকাঠী তার মধ্যে একটি। স্বরূপকাঠী থানা সদর থেকে এক কি. মি. দক্ষিণে এর অবস্থান। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামের বহু নেতা-কর্মী ও সংগঠকের জন্ম এ কামারকাঠীতে। এ গ্রাম স্বরূপকাঠী থানার দেশপ্রেমিকদের তীর্থস্থান।

কমরেড জগদীশ আইচ সরকারের জন্ম ১৯২০ সালের ১ জানুয়ারি। পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠী থানার জলাবাড়ি ইউনিয়নের কামারকাঠী গ্রামে। বাবা ধনন্তরী আইচ সরকার। মা কুসুমকুমারী আইচ সরকার। বাবা ধনন্তরী আইচ সরকার ছিলেন একজন নাম করা কবিরাজ। আদর্শ ও সততা ছিল তার জীবন-দর্শন। জমিজমা ভালই ছিল। যে কারণে কবিরাজ মশাই টাকা ছাড়াই মানুষকে চিকিৎসা ও সেবা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মা কুসুমকুমারী আইচ সরকার ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী। তিনি ছিলেন পরোপকারী। দেশপ্রেমিক মানুষকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। নানাভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করতেন। অসহায় মানুষকে তিনি সব সময় সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেন। ধনন্তরী আইচ সরকার ও কুসুমকুমারী আইচ সরকার পরিবারে ৬ টি সন্তানের জন্ম হয়। চার ছেলে ও দুই মেয়ে। ৬ ভাইবোনের মধ্যে জগদীশ আইচ সরকার তৃতীয়। বোনেরা তার ছোট।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর পাঠশালা ও প্রাইমারি স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে নবকুমার ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। ওই স্কুলে সশস্ত্র বিপ্লববাদী যুগান্তর দলের আঞ্চলিক নেতা ডা. রাধিকা মোহন কর শিক্ষকতা করতেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবী সূর্যসেনের অন্যতম সহযোদ্ধা। এই শিক্ষকের সাথে জগদীশ আইচ সরকারের ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জগদীশ

আইচ ধীরে ধীরে এই বিপ্লবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন। ক্লাসে তিনি প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি খেলাধুলায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। স্কুলের স্পোর্টসে তিনি প্রায়ই প্রথম পুরস্কার অর্জন করতেন। এছাড়া তিনি গান, কবিতা আবৃত্তি ও অভিনয়েও ছিলেন পটু। সহপাঠীদের নিয়ে নানারকম গল্প, উপন্যাস ও কবিতা আবৃত্তির আড্ডা জমাতেন। স্কুলের সকল ছাত্র তাকে পছন্দ করতো।

ব্রিটিশ সরকার ১৯৩০ সালে ডা. রাধিকা মোহনকে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগ দেখিয়ে গ্রেফতার করে বক্সার বন্দী শিবিরে আটক রাখে। ১৯৩৩ সালে ডা. রাধিকা মোহন তার মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৭ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি পেলে তিনি প্রচুর মার্কসবাদী বই নিয়ে বাড়িতে আসেন। 'বই পড়, শরীর গঠন কর' এই শপথ ও গান নিয়ে পাঠাগার, ব্যায়ামাগার স্থাপন করলেন ডা. বাবু।

১৯৩৪ সালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে এলাকার ছাত্র-যুবদের সংগঠিত করে রাত জেগে বই পড়া শুরু করলেন। এই সকল বই পড়ে ছাত্র-যুবকরা কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। এতে যুক্ত হলেন জগদীশ আইচ সরকার। তখন তিনি নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। এ সময় তিনি নিজ স্কুলে ছাত্র ফেডারেশন গড়ে তোলেন। নিজে দায়িত্ব নিলেন সাংগঠনিক সম্পাদকের। সংগঠনের কাজের সূত্র ধরে ডা. বাবুসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টির কাজে। এ সময় তিনি সমগ্র স্বরূপকাঠিতে ছাত্র ফেডারেশন গড়ে তোলেন।

১৯৩৮ সালে প্রখ্যাত ছাত্র নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও মনিকুন্তলা সেন ছাত্র ফেডারেশনের কাজে বানারীপাড়ায় আসেন। তাদের সাথে আলোচনা করে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩৯ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাসের স্বীকৃতি লাভ করেন। ম্যাট্রিক পাস করার পর বাগেরহাট পিসি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে প্রায় এক বছর ছাত্র ফেডারেশনের সাথে কাজ করেন। নানা প্রতিকুল পরিবেশের কারণে তিনি পিসি কলেজ থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। ১৯৪০ সালে চাখার কলেজে পুনরায় ভর্তি হন। এ সময় ডা. রাধিকা বাবুর পরামর্শে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে গোপনে গোপনে কাজ করতে শুরু করেন। কারণ ওই সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে আই. এ পরীক্ষা বাদ দিয়ে পার্টির কাজে চলে যান।

শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পার্টির দায়িত্ব বেড়ে গেল বহুগুণে। দেশে তখন চলছে ভারত ছাড় আন্দোলন। একদিকে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অন্যদিকে পার্টি গড়ার কাজ। সবই করতে হচ্ছে কমরেডদের। সংগ্রামী সৈনিক জগদীশের কাজের অন্ত নেই। ছাত্র-যুব ও পার্টির কাজে ব্যস্ত সব সময়। এ সময় তিনি জনযুদ্ধ পত্রিকাও বিলি করতেন।

১৯৪২ সাল। বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, চলছে যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে এই যুদ্ধের কারণে। এ সময় তিনি পার্টির সদস্য পদ পান। ওই বছর কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস ও বরিশাল জেলা পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি কংগ্রেস ও জেলা পার্টির সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৩ সাল, বাংলা ১৩৫০ সন। এই সনটি ইতিহাসে মন্বান্তরের সন হিসেবে পরিচিত। এই সময় ইংরেজ শাসকদের অবহেলার কারণে সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। গ্রাম-বাংলার আনাহারী মানুষ খাবারের জন্য ছুটছে কলকাতার দিকে। ওলিতে-গলিতে,

রাজপথে-ফুটপথে অগণিত মানুষ ক্ষুধার তাড়নায়-যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কাক ও কুকুরের সঙ্গে বুভুক্ষু মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খুঁজে ফিরছে ডাস্টবিনে-নর্দমায়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশব্যাপী লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

কামারকাঠীতে ডা. রাধিকা বাবুর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা লঙ্গরখানা খোলা হয়। জগদীশ আইচের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে শত শত ছাত্র-যুবক এই লঙ্গরখানায় অনাহারী মানুষের সাহায্যার্থে কাজ করে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধে পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠী থানা সফল হয়।

এ সময় কমরেড জগদীশ আইচকে গ্রেফতার করা হয়। জেলখানায় বসেও জগদীশ আইচ কারাবন্দীদের নিয়ে গ্রুপ করে মার্কসবাদী পড়াশুনাসহ গণসঙ্গীতের আসর জমাতেন। তিনি ভাল গান করতেন। জোর গলায় গাইতেন– চল চল চল/ দুর্গম গিরি কান্তার মরু/মুক্তির মন্দির সোপান তলে/কেউ বা সাদা কেউ বা কালা/এখনো খোলেনি আঁখি যার/ প্রভৃতি। দীর্ঘ কারা জীবন শেষে ১৯৪৯ সালে মুক্তি পান। ইতোমধ্যে ভারত স্বাধীন হয়। জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান।

১৯৫০ সালে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধালো। দাঙ্গা বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুললো কমিউনিস্ট পার্টি। এ সময় বরিশালের প্রায় সকল কমিউনিস্ট নেতাকে সরকার গ্রেফতার করে। মুকুল সেন ও জগদীশ আইচকে গ্রেফতার করতে সরকার ব্যর্থ হয়। জগদীশ আইচ আত্মগোপন অবস্থায় কলকাতায় চলে যান। ১৯৫২ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দেশে এসে যুক্ত হন ভাষা আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনের পর বাটনাতলা বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। জাতি গড়ার কাজে যুক্ত হন। ওই বছর পিরোজপুর জেলার মধ্যে বাটনাতলা বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী পাশ করে। এই স্কুলের ছাত্ররা শুধু শিক্ষায় নয়, সকল বিষয়ে পারদর্শী ছিল। তিনি কেবল ছাত্রদের শিক্ষক ছিলেন না বরং শিক্ষকেরও শিক্ষক ছিলেন। এরপর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বার্থে মালীখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গণকপাড়া, পাংগাসিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। জীবনের সর্বশেষ ইন্দুরহাট কলেজিয়েট একাডেমীতে শিক্ষকতা করেন। স্বরূপকাঠী থানার সকল মানুষ তাকে স্যার বলে ডাকতেন। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় জগদীশ স্যার।

১৯৫৩ সালে তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে পার্টি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে শত শত ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীকে নিয়ে কাজ করেন। এরপর তিনি যুক্ত হন শিক্ষক আন্দোলনের সাথে। দীর্ঘ দিন যুক্ত থাকেন এই আন্দোলনে। এছাড়াও যুক্ত ছিলেন এলাকার সকল সামাজিক আন্দোলনে। ১৯৫৬-৬৯'র গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত তিনি বৃহত্তর বরিশালে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মেহনতি মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অবশ্য এ কাজে তাকে মুকুল সেন, খোকা রায়, নলিনী দাস, নূরুল ইসলাম মুন্সিসহ আরো অনেকে সহয়তা করেন। আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন ওই অঞ্চলের আতঙ্ক। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে তিনি বরিশালের ছাত্রদেরকে সংগঠিত করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে তিনি বরিশালের ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। ৭০'এ স্বরূপকাঠীর ব্যাসকাঠীর কৃষক সম্মেলনের সকল

আয়োজন তিনি করেন। এই সম্মেলনে প্রখ্যাত কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ, হাতেম আলী খাঁ ও মহিউদ্দিন আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জগদীশ আইচের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল জেলার অন্যতম সংগঠক তিনি। তরুণ ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক ও কৃষকদের রিক্রুট, ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর যোদ্ধাদের অন্যতম পরিচালক ও সংগঠক ছিলেন তিনি।

৭৩'র নির্বাচনে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন। ৭৪'র দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় আসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। ৭৫'র বাকশালে যোগদানের বিরোধীতা করেন। ১৫ আগস্টের পর রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য পার্টির সিদ্ধান্তে আত্মগোপনে যান। আত্মগোপনে থেকে তিনি খেলাঘর, ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, ক্ষেতমজুর সমিতি ও উদীচীসহ আরো অনেক গণসংগঠনের কাজে যুক্ত থেকে ওই সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। ৮২'র মার্শাল ল' জারির প্রতিবাদের জন্য জনমত গঠন করেন। ৮৬'র ও ৯১'র নির্বাচনে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেন। ৮৭'র কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৯০'র গণআন্দোলনে তার ভূমিকা অনন্য। ৯২'-এ পার্টি ভাঙ্গনের সময় তিনি জোর প্রতিবাদ করেন এবং পরবর্তীতে পার্টি পুনর্গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তিনি ৯৫'র কংগ্রেসে ডেলিগেট নির্বাচিত হন। ৯৯'-এ তিনি পার্টির ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে সম্মাননা পান।

জগদীশ আইচের সকল কাজে যারা প্রেরণা যুগিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হল তার সহধর্মীনি শেফালি প্রভা আইচ। তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। স্বরূপকাঠী অঞ্চলের নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনন্য। একজন আদর্শ মা হিসেবে সন্তানদের আদর্শ রাজনীতির সঙ্গে তিনিই যুক্ত করে দেন। পার্টি কমরেডদেরকে নিজের সন্তান,, ভাই-বোনের মতো মনে করে তাদের প্রতি সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতেন। এজন্য কমরেডরা নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে বিভিন্ন বিপদে-আপদে তার বাড়ি বেছে নিতেন। তাদের সংসারে দুটি সন্তানের জন্ম হয়। গৌতম আইচ সরকার ও খনা চন্দ।

বিপ্লবী জগদীশ আইচ সরকার ২০০১ সালের ১৯ জানুয়ারি মারা যান।

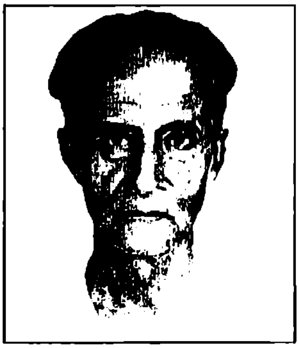
লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. কমরেড জগদীশ আইচ সরকারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণিকা ১৯ জানুয়ারি ২০০২, প্রকাশক: কমরেড জগদীশ আইচ সরকার স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

২. কমরেড জগদীশ আইচ সরকারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণিকা ১৯ জানুয়ারি ২০০৪, প্রকাশক: কমরেড জগদীশ আইচ সরকার স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

অমূল্যনাথ লাহিড়ী



পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য যে সমস্ত বিপ্লবী জীবনবাজী রেখে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, তাদের মধ্যে কমরেড অমূল্যনাথ লাহিড়ী অন্যতম। ভারতমাতাকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রথম জেলে যান। তিনি ৮৮ বছর বেঁচে ছিলেন। এই ৮৮ বছর জীবনের মধ্যে ব্রিটিশ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে ৩০ বছর জেলে কাটিয়েছেন।

অমূল্যনাথ লাহিড়ীর জন্ম ১৮৯৮ সালের ২১ আগস্ট। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাহপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর গ্রামে। বাবা দ্বারকনাথ লাহিড়ী, মা সারদা লাহিড়ী। অমূল্যনাথ লাহিড়ীরা দুই ভাই। ছোট ভাইয়ের নাম অনাথ লাহিড়ী। পিতা দ্বারকনাথ লাহিড়ী ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ সার্ভিস বিভাগের একজন অফিসার ছিলেন। এই চাকরিসূত্রে তিনি কলকাতার বেলেঘাটায় বসবাস শুরু করেন। এখানেই অমূল্যনাথ লাহিড়ীর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। মা সারদা লাহিড়ী অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লববাদী দল অনুশীলনের সদস্য ছিলেন।

তিনি অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের নানা কাজে সহযোগিতা করতেন। অমূল্যনাথ লাহিড়ী শিশুকাল থেকে মায়ের সংস্পর্শে থাকার কারণে তিনিও অনুশীলন দলের কর্মীতে পরিণত হন। সেই কিশোর বয়সেই তিনি অনুশীলন দলের সংবাদ এবং অস্ত্রবাহক হিসেবে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিচরণ করতেন। পুলিশ অফিসারের সন্তান, সুদর্শন এবং স্মার্ট হওয়ার কারণে ইংরেজ ঘাটিগুলোতে অবাধে প্রবেশ করতে পারতেন।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি ১৯১২ সালে প্রথম জেলে যান। তিনি ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। কর্মচাঞ্চল্য ও প্রচারবিমুখ সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। অল্পভাষী অথচ দারুণ দৃঢ়চেতা স্বভাবের এই মানুষটি জমিদারের সন্তান হয়েও কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের আপন জন ছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সালের তেভাগা আন্দোলনে নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কৃষকদের দাবি আদায়ে সংগ্রাম চালান। এ আন্দোলনের কারণে তিনি কৃষকদেরকে তার পরিবারে দুধ সরবরাহ করতে নিষেধ করে দেন। জমিদার বাড়ির শিশুদের দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জমিদারের সাথে কৃষকদের দশ আনা ছয় আনা চুক্তি হয়। সেই সময়ে লাহিড়ী মোহনপুর গ্রামে ১৮ জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল। ১৮ জনের মধ্যে ৮ জন নারী ছিলেন। এরা সবাই ছিল কৃষকের মেয়ে-বৌ।

কমরেড অমূল্যনাথ লাহিড়ী ১৯৫৭ সালের পর স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত পাবনা জেলার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি কৃষক সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে কৃষকদের সংগঠিত করেন। ১৯৬৪ সালে তার নেতৃত্বে মোহনপুরে বিশাল কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক কৃষকের এ সমাবেশে মাওলানা ভাসানী ও ন্যাপ নেতা ইসহাক অংশগ্রহণ করেন। এই সমাবেশে মুসলিমলীগ পুলিশের সহায়তা নিয়ে হামলা চালায়। কমরেড লাহিড়ীর নেতৃত্বে কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হামলা প্রতিহত করে অস্ত্রধারী পুলিশকে আটক করে। এই সমাবেশে অমূল্যনাথ লাহিড়ী ন্যাপ নেতাদের উপস্থিতিতে বলেছিলেন– বাঙালি পাকিস্তানে থাকবে না, বাঙালি স্বাধীন হয়ে যাবে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। এই বয়সে তিনি পায়ে হেঁটে সিরাজগঞ্জ থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত পার্টি নেতাকর্মীদের যুদ্ধের কাজে সংগঠিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য পশ্চিম বঙ্গের করিমপুরে তিনি ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। পার্টির নেতা কর্মীদের প্রতি তিনি ছিলেন অসাধারণ দরদী। প্রত্যেক কর্মীর যাবতীয় খোঁজখবর রাখতেন এবং তার সুখে দুঃখে সাথে থাকতেন। কোনো কর্মী অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করে তুলতেন। সবার সাথে তার পরমাত্মীয়ের সম্পর্ক ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি তার ছিল প্রচণ্ড সামরিক জ্ঞান। এই জ্ঞান তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন। কিভাবে পশ্চাৎপসারণ করে পুনরায় আক্রমন চালাতে হবে সে সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শ দিতেন। মুক্তিযোদ্ধারাও তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি অমূল্যনাথ লাহিড়ীর সাথে আলোচনায় বসে। এই আলোচনায় বলা হয় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি একসাথে স্বাধীনতা যুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি বৃহত্তর পাবনাঞ্চলে সিপিবি'র সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কমরেড অমূল্যনাথ লাহিড়ী ১৯৮৬ সালের ২৪ আগস্ট মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

২. সাপ্তাহিক একতা– ২২ আগস্ট ১৯৯২।

হেনা দাস



জয়তু বিপ্লবী হেনা'দি। লাল সালাম হেনা'দি। হেনা দাস। একটি নাম। একজন মানুষের নাম। আর মানুষ কখনো মরে না। মানুষ মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে। চিরদিন বেঁচে থাকে। যেমন বেঁচে আছেন সক্রেটিস, হ্যানিমান, লালন, কার্লমার্কস, লেনিন, মাও সে তুং, পাবলো নেরুদা, চে গুয়েভারা, আলেন্দ্রে, হো চি মিন, কিম ইল সুন, হুমায়ুন আজাদসহ লক্ষ মানুষ। তেমনি হেনা দাসও বেঁচে থাকবেন। থাকবেন আমাদের আদর্শ-চেতনায়। মানুষ মানুষের মধ্যেই বসবাস করে। মানুষ ছাড়া মানুষের আর যাওয়ার তো কোনো জায়গা নেই।

শুধু হেনা দাস বললে নামটি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। এই নামটির পূর্বে বিপ্লবী শব্দটি একান্তভাবে অপরিহার্য। তাতে বুর্জোয়া থেকে শুরু করে সুবিধাবাদী, অসুবিধাবাদী ও নানান রঙের বামপন্থীরা কোনো আপত্তি তুলবেন না, একথা আমি জানি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, যে মানুষের মধ্যে হেনা দাসরা বেঁচে থাকবেন, সেই মানুষ কি আমরা হতে পেরেছি বা হওয়ার চেষ্টা করছি?

মানুষ বা বিপ্লবী কখনো মরে না। তার যৌক্তিক কারণ হল-মানুষ বেঁচে থাকে তার কৃতকর্ম ও সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে। কোনো সৃষ্টি ধ্বংস হয় না। সৃষ্টি যুক্ত হয় নতুন সৃষ্টির সাথে। এভাবে সকল সৃষ্টি সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। যার কারণে সভ্যতার চাকা সবসময় সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অনেকে মানুষ আর বিপ্লবী এই শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য টানেন। কেউ কেউ এই শব্দ দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিষয় বলেন। আবার কেউ কেউ সমার্থক বলেও মত দেন। তবে সরদার ফজলুল করিমের মতে, 'একজন মানুষ সবসময়ই কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী'। কারণ কমিউনিস্ট বা বিপ্লবী সেই হতে পারে, যে মানুষ হয়ে উঠে বা মানুষ হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকে। সে মানুষ কখনো কোনো অসঙ্গতি, অসাম্য, শোষণ-বৈষম্য মেনে নিতে পারে না। সে প্রতিনিয়ত লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের সমাজ, মানুষের পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করে যায়।'

হেনা দাস যে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন, তারা কোথায়? অনেকে আমাকে হতাশাবাদী বলার সিদ্ধান্ত হয়তো নিয়ে ফেলেছেন। বলুন, আপত্তি নেই। কারণ অমানুষতো আর বলেন নি? আমার ভয় এখানেই। কেননা আমি মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি এবং চেষ্টাও করছিনা। তারপরও আপনারা আমাকে মানুষ বলছেন। লোভ, ভোগ, লাভ ও প্রকাশইজম আমার

অস্থি-মজ্জায়। আমার মধ্যে আমি (মানুষ) নেই। শুধু আছে ভোগ আর সুবিধাবাদ। ব্যাখ্যা দেবেন হয়তো এর উর্ধ্বে কেউ নয়। একথা আমি মানি না। কেননা হেনা দি-এর উর্ধ্বে ছিলেন। কারণ তিনি মানুষ ছিলেন। সরদার ফজলুল করিম, কমরেড জসীম উদ্দিন মণ্ডলসহ অনেক মানুষ এখনো বেঁচে আছেন। মানুষ হয়ে বেঁচে আছেন। বেঁচে থাকবেন মানুষের মাঝে চিরদিন। সাম্য ভালবাসার পৃথিবী গড়ার জন্য, মানুষের পৃথিবী গড়ার জন্য।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম লড়াকু বিপ্লবী, শিক্ষক ও নারী আন্দোলনের নেতা এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন হেনা দাস। ৮৫ বছর জীবনের ৭২ বছরই হল সংগ্রামময় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

কমরেড হেনা দাস ১৯২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সিলেট শহরের পুরান লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সতীশচন্দ্র দত্ত। তিনি একজন স্বনামধন্য আইনজীবী ছিলেন। মা মনোরমা দত্ত। তিনি ছিলেন চুনারুঘাট থানার নরপতি গ্রামের জমিদার জগৎচন্দ্র বিশ্বাসের বড় মেয়ে। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে হেনা দাস ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ।

মাত্র সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত হন। হেনা দাস শিশু শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সিলেট সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৪২ সালে সিলেট মহিলা কলেজ থেকে আই. এ পরীক্ষায় ১ম বিভাগ অর্জন করেন। ১৯৪৭ সালে সিলেট মহিলা কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন। ১৯৬০ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে বি. এড পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে এম. এ পাশ করেন।

১৯৪৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে সম্মেলনে যোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ছাত্র ফেডারেশন থেকে শুরু করে সুরমা উপত্যকা গার্লস স্টুডেন্ট কমিটি, সুরমা উপত্যকা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, সিলেট জেলা গণনাট্য সংঘ, লেখক ও শিল্পী সংঘ, শিক্ষক সমিতি এবং মহিলা পরিষদে কাজ করেছেন তিনি।

১৯৪৮ সালে আত্মগোপন থাকা অবস্থায় তিনি বিয়ে করেন কমিউনিস্ট কৃষকনেতা রোহিণী দাসকে। ১৯৪৮-৫৯ সালের 'নানকার বিদ্রোহে' কমরেড হেনা দাস নানকার নারীদের সংগঠিত করেন। চা-বাগানের কুলি মেয়েদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সংগঠিত করেন ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ওই সময় তিনি সিলেটের ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ভাষার দাবিতে ছাত্রদের মিছিল-মিটিং ও লিফলেট বিলিতেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে এই আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন। ১৯৫৮-এ হেনা দাস ঢাকায় এসে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং বহু শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতের শরণার্থী শিবিরে গিয়ে ত্রাণ কাজ চালান।

১৯৭৮ থেকে টানা ১৪ বছর তিনি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে নেতৃত্ব দেন। তিনি ছিলেন ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সদস্য। ১৯৭০ সালে মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর তিনি পরিষদের নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নেন। স্বাধীনতার পর এ সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। কবি সুফিয়া কামাল মারা যাওয়ার পর ২০০০ সালে তিনি এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে ১৯৮৯ সালে তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

বিভিন্ন সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করার জন্য তাকে সরকারের রক্তচক্ষুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। ১৯৭৯ সালে শিক্ষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তাকে কারাবরণে যেতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টি করার জন্য তাকে বার বার যেতে হয়েছে আত্মগোপনে। আত্মগোপনকালেও তিনি পার্টি গড়ে তোলার কাজ করতেন। নারীপুরুষ নির্বিশেষে গণমানুষের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে আমৃত্যু ভূমিকা রেখেছেন কমরেড হেনা দাস। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন– এমন অনেক সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন এই লড়াকু নেত্রী।

ভাষা আন্দোলনেও তার ভূমিকা ছিল অগ্রণী। তিনি ছিলেন মহিলা পরিষদের সভানেত্রী। নারী ও শিক্ষক আন্দোলনের তার ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি দেশের সকল মানুষের কথা ভাবতেন। লিখতেন শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি বিষয়ে। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের কথা বলতেন।

তিনি ২০০৯ সালের ২০ জুলাই মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

২. সাপ্তাহিক একতা– ১৮ জুলাই ২০১০।

অমল সেন



বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাবেক সভাপতি আজীবন বিপ্লবী কমরেড অমল সেনের জন্ম ১৯১২ সালে। অধুনা নড়াইল জেলার আফরা গ্রামে। জন্মলগ্ন থেকেই তিনি প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার মধ্যে বেড়ে ওঠেন। পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর পাঠশালা ও প্রাইমারি। প্রাথমিক পাঠ শেষে দৌলতপুরের একটি হাইস্কুলে ভর্তি হন।

যখন তিনি নবম শ্রেণির ছাত্র, তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী দল 'অনুশীলন' এর সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৯৩৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খুলনার দৌলতপুর কলেজে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্সে ভর্তি হন। এই কলেজে পড়াশুনাকালীন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে একনিষ্ঠ কর্মীতে পরিণত হন।

উল্লেখ্য, তদানিন্তন খুলনা-যশোরকে নিয়ে গড়ে ওঠা পার্টির জেলা কমিটি ১৯৩৩ সালের শেষ ভাগে নড়াইলের এগারখান অঞ্চলে তাকে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করে। পার্টির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি এগারখানের রসিক ঘোষের বাড়িতে ওঠেন। ওই অঞ্চলেই ছিল তাদের পারিবারিক জমিদারী। জমিদারের সন্তান হয়েও তিনি নির্যাতিত-নিপীড়িত কৃষকদের সংগঠিত করে জমিদারী শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলেন। তার এ সংগ্রামমুখী জীবন ও নিঃস্বার্থপর ভাবমানস পার্টি নেতাদের নজর কাড়ে। এক বছরের মাথায় ১৯৩৪ সালে তিনি পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। ওই সময় এগারখানসহ নড়াইলের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন গড়ার গুরু দায়িত্ব তাকে প্রদান করা হয়। হাটতোলা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়ান। এর পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমিতি গঠন করেন। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৭ সালে তাকে যশোর-খুলনা আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্ভূক্ত করে।

১৯৪২ সালে খুলনা-বরিশাল-যশোর অঞ্চলকে নিয়ে যে গেরিলা টিম গঠন করা হয় কমরেড অমল সেন সে টিমেরও সদস্য হন। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়, নড়াইলে সে আন্দোলনের প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন কমরেড অমল সেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পার্টির যশোর জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই সময় তিনি কমরেড রনদিভের বাম হঠকারী লাইন প্রয়োগের প্রাক্কালে গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। যদিও তিনি প্রথম থেকেই কমরেড রনদীভের বাম হঠকারী

লাইনের বিরোধীতা করে আসছিলেন, কিন্তু ইস্পাত কঠিন দৃঢ় কমিউনিস্ট শৃংখলা মেনে চলা কমরেড অমল সেন পার্টি লাইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কখনও অদৃঢ় ছিলেন না। অবশেষে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি মুক্তি পান।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর তিনি পুণরায় গ্রেফতার হন এবং ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কারামুক্ত হন। মুক্তি পাওয়ার পরপরই তিনি পার্টির যশোর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নড়াইল অঞ্চলের দায়িত্ব নেন। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার তাকে বেশি দিন বাইরে থাকতে দেয়নি। তিনি আবারও কারারুদ্ধ হন ও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পান। কমরেড অমল সেন ছিলেন শোষক-নির্যাতকদের কাছে মুর্তিমান বিপ্লবী। তাই ১৯৭০ সালে আবারও তাকে কারান্তরালে যেতে হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর হামলার পরপরই বীর জনতা জেল ভেঙ্গে তাকে মুক্ত করে। ১৯৭১ সালের জুন মাসে তিনি ভারতে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলাদেশ-ভারতে যখন শ্রেণী শত্রু খতমের উন্মাদনা চলছে, তখনও তিনি সেই কালস্রোতে ভেসে যাননি। গণলাইনে কাজ করার গণবিপ্লবী পতাকা তিনি তুলে ধরেন।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তিনটি পার্টি কেন্দ্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, সে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড অমল সেন। ১৯৮৮ সালে ৬টি পার্টি কেন্দ্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদেও কমরেড সেন নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, সাম্যবাদী দল ও ওয়ার্কার্স পার্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি হন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের পার্টি কংগ্রেসেও তিনি পুণরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। তার জীবিতাবস্থায় সর্বশেষ ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। বার্ধক্যজনিত কারণে তারই প্রস্তাবক্রমে তাকে পলিটব্যুরোর সদস্য করা হয়নি।

নব্বই বছর বয়সে কমরেড অমল সেন ২০০৩ সালের ১৭ জানুয়ারি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

২. সাপ্তাহিক নতুন কথা– ১৫ জানুয়ারি ২০০৪, ১৭ জানুয়ারি ২০০৫।

সুনীল রায়



যখন ভারতমাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য এ উপমহাদেশের মানুষ সোচ্চার তখন সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা প্রতিরোধ গড়ে ছিল সারা ভারতব্যাপী। চলছিল দেশকে স্বাধীন করার সব রকম প্রস্তুতি। ঠিক তখন সুনীল রায় জন্মেছিলেন, ১৯২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের শ্যামনগর গ্রামে। বেঁচে ছিলেন প্রায় ৮১ বছর। তিনি ২০০১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মারা যান। ৮১ বছর জীবনের প্রায় ৭০ বছর কেটেছে তার আন্দোলন-সংগ্রামে, কখনো জেলে বা আত্মগোপনে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ৮০'র দশকে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে পার্টি ভাঙ্গনের সময়ে তিনি বিলোপবাদীদের হাত থেকে পার্টিকে বাঁচাতে মতাদর্শিক সংগ্রাম চালান।

জন্মটাই তার আন্দোলন-সংগ্রামের উজ্জ্বলতম সময়ে। তখন ভারতমাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য এ উপমহাদেশের মানুষ স্বোচ্চার। শসস্ত্র বিপ্লববাদীরা প্রতিরোধ গড়ে ছিল সারা ভারতব্যাপী। চলছিল দেশকে স্বাধীন করার সব রকম প্রস্তুতি। ৯ বছরের শিশু সুনীল রায় যোগ দিলেন লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। যখন তিনি অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন তখন পারিবারিক অনটনের কারণে তাকে চাকুরি নিতে হয় নারায়নগঞ্জের চিত্তরঞ্জন কটন মিলে। মাত্র ১০ টাকা বেতন দিয়ে ঘোচাতে হয় সংসারের অভাব-অনটন। ১৯৩৮ সালে নিজ কর্মস্থলে শ্রমিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুরু হয় রাজনীতি পাঠ। যুক্ত হন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে।

লড়াই-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বুঝতে চেষ্টা করেন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শনকে। ১৯৩৬-৩৯ সাল তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে তিনি স্বদেশি আন্দোলন থেকে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। চিত্তরঞ্জন কটন মিলে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৪২ সালে শ্রমিকদের দাবি নিয়ে এক সমাবেশ তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ থেকে তাকে গ্রেফতার করে ৪ বছর জেলে আটক রাখা হয়। জেলের মধ্যে তাকে স্বাভাবিকভাবে রাখা হয়নি, নানারকম অত্যাচার করা হয়েছে। কারণ একটাই তিনি কমিউনিস্ট।

১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। ১৯৪৭ সালে তাকে এবং শ্রমিক নেতা আফসারকে মিল কর্তৃপক্ষ চাকুরিচ্যুত করে। এ কারণে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দীর্ঘ ৩ মাস মিল বন্ধ করে রাখে। এ সময় এই ঘটনার প্রতিবাদে শুধু ওই মিল নয়, ঢাকার অধিকাংশ মিলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। এক পর্যায়ে ধর্মঘট ভাঙতে পুলিশ-সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর গুলিতে ৮ জন শ্রমিক মারা যায়, আহত হয় ৮০ জনেরও বেশি।

১৯৪৯ সালে নানা পরিস্থিতির কারণে কমিউনিস্টরা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। কমরেড সুনীল রায় শ্রমিক নেতা গোলজারকে নিয়ে আত্মগোপনে যান। গোলজারকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গ্রেফতার হন তিনি। মুক্তি পেলেন ১৯৫০ সালে। কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার অভিযোগে ওই বছর মার্চে আবারো গ্রেফতার হন তিনি। ছাড়া পেলেন ১৯৫৩ সালে। এরপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। কিন্তু পার্টির নির্দেশে তাকে আন্তরিকতার সাথে চলে যেতে হয় আদমজী জুট মিলে। উদ্দেশ্য একটাই শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা, সংগঠিত করা। এ সময় তিনি আদমজীতে দুর্বার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

একই সময় তিনি ঢাকার বিভিন্ন মিলে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। পোস্তাগোলা ১ নম্বর ঢাকেশ্বরী কটন মিল প্রাঙ্গণে সুনীল রায়ের নেতৃত্ব একটি বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বক্তব্য রেখেছিলেন। এরপর বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সমাবেশে সুনীল রায়কে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয় লাভ করার পর সবখানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে তিনি এই দাঙ্গা নিরসনে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। একই সময়ে পাকিস্তান পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। সুনিল রায় বাধ্য হয়ে আত্মগোপনে যায়।

১৯৬০ সালে আবার গ্রেফতার হন তিনি। এবার মুক্তি পেলেন ১৯৬৪ সালে। মুক্তি পাওয়ার পর সূত্রাপুরে বসবাস শুরু করেন। সূত্রাপুরে সে সময়ে জ্ঞান চক্রবর্তী, জিতেন ঘোষ, হাতেম আলীসহ অনেক পোড়-খাওয়া কমিউনিস্ট বসবাস করতেন। সরকারি নজরদারী এড়িয়ে সকল কমিউনিস্টকে খুব সাবধানে চলতে হতো। ১৯৬৯ সালে আবার সবার মতো তাকে আত্মগোপনে যেতে হয়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ৮০'র দশকে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালে পার্টি ভাঙ্গনের সময়ে তিনি বিলোপবাদীদের হাত থেকে পার্টিকে বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯৮ সালের শেষের দিকে তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তিনি আর কোনো দিন সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। বর্ণাঢ্য এক রাজনৈতিক জীবন শেষে ২০০১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।

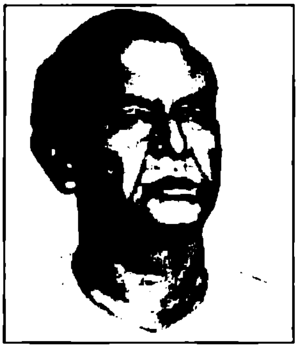
লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. সাপ্তাহিক একতা– ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯।

২. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

সতীন সেন



অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম বিপ্লবী সতীন সেন। দেশমাতৃকা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিবেদিত প্রাণ এই বিপ্লবীর ৬১ বছরের জীবনে ২৬ বছরই কেটেছে কারাগারে; বাতুলা প্রান্ত থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ১৮টি কারাগারে। কারা সংগ্রামে তার অনশনে কেটেছে ৩২২ দিন। এর ভেতর ১৫৩ দিন বরিশাল জেলে টানা অনশন করেছিলেন তিনি।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় সতীন্দ্রনাথের জীবন-কথার মুখবন্ধে লিখেছেন 'মুক্তি-সংগ্রামের বীরযোদ্ধা অসামান্য দেশপ্রেমিক সতীন সেনের জীবনী কোনো পরিচয়েরই অপেক্ষা রাখে না। কোনো ভূমিকা ইহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কারণ সতীন সেনের জীবন তাহার নিজেরই তপস্যার আলোকে উদ্ভাসিত। ত্যাগ ও সংগ্রামকুশলতার জন্য কীর্তিত। নানা কর্মের ক্ষেত্রে নানা সময়ে দেশমাতৃকার এই সুসন্তানকে দেখিয়াছি, দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই।'

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায় ১৮৯৪ সালের ২৫ এপ্রিল ঠাকুরদার বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন বিপ্লবী সতীন সেন। তার ঠাকুরদার নাম রাম সেবক সেন। বাবার নাম নবীন্দ্র চন্দ্র সেন। সতীন সেনের পিতা নবীন চন্দ্র সেন ছিলেন পটুয়াখালী মহকুমার খ্যাতনামা মোক্তার। জন্মের এগারো মাস পর মায়ের সঙ্গে পটুয়াখালী আসেন সতীন সেন। এর কিছুদিন পর তার মায়ের মৃত্যু ঘটে।

সতীন সেনের বাল্যকাল ও কৈশোর অতিবাহিত হয় পটুয়াখালীতে। সতীন সেনের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সুধীর দাশগুপ্ত। এই দুইজনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পটুয়াখালীতে একটি ছাত্রসংঘ। চরিত্র গঠন, আধ্যাত্মিক অনুশীলন, আসন, প্রাণায়াম, গীতাপাঠ, ব্যায়ামচর্চা, বিলাসিতা বর্জন, অনর্থক হাস্যকৌতুক বা আচরণে তরলতা পরিহার করে ব্রহ্মচারীর জীবন পালন ছিল তাঁদের আদর্শ।

১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন সরকারি আদেশে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯০৭ সালে তেমনি পটুয়াখালীতে আয়োজিত জেলা সম্মেলন সরকারি আদেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই সম্মেলনের জন্য সংগৃহীত টিন, কাঠ বাজেয়াপ্ত করে তাই দিয়ে তৈরি হয়েছিল সরকারি কর্মচারীদের ক্লাবঘর। সতীন-সুধীরের দল সরকারের এই অন্যায় আদেশ ও জননায়কদের এই অপমান নিঃশব্দে হজম করতে না পেরে তারা একরাত্রে ওই ক্লাবঘরটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। সতীন সেনের বয়স তখন ১৩ বছর মাত্র। সেই সময়ই তারা রক্ত দিয়ে হলেও দেশকে পরাধীনতা নাগপাশ থেকে মুক্তির শপথ নিয়েছিলেন।

যখন বাংলার প্রতিটি অঞ্চলের গুপ্ত সমিতি ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের প্রয়াস চালান তখন সুধীর দাশগুপ্ত ও সতীন সেনও তাতে যুক্ত হন। এসময় তারা হীরালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

সতীন সেনের অদম্য সংকল্প ও সুধীর দাশগুপ্তের বুদ্ধিকৌশল যুক্ত হয়ে পটুয়াখালীর গুপ্ত সমিতি সফলতা লাভ করে। বিদ্যালয়ের অধ্যয়নে উভয়েই ছিলেন যত্নশীল। যথাসময়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে ১৯১১ সালে উভয়েই বরিশালে আসেন। তখন স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ছিলেন বরিশালের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। যাঁরা তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেননি, তারাও তাঁকে মনে মনে গুরুস্থানীয় নেতা বলে গ্রহণ করেছিলেন; এবং তাঁদের প্রতিও স্বামীজির আদেশ ছিল অলঙ্ঘ্য। সুধীর ও সতীন স্বামীজির এই আদর্শ গ্রহণ করলেন।

'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
একা আমি বসে রবো মুক্তি সমাধিতে?'

সতীন সেন আমরণ এই মুক্তির সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি হাজারিবাগ সেন্ট কলাম্বাস কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এই কলেজের ইংরেজি আচার-আচরণ তার ভাল লাগতো না। নগ্নপদ ধুতিবস্ত্রপরিহিত এই তরুণ স্ব-পাকে ভোজন, গীতাপাঠ এবং একান্তে স্বাধীনতালাভের জন্য সবসময় বিপ্লববাদের অনুশীলনে মগ্ন থাকতেন। এখানে বসেই তিনি তার বৈপ্লবিক সাধনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

কলেজে বোটানি পাঠের সুযোগ নেই, এই অজুহাতে হাজারিবাগ সেন্ট কলাম্বাস কলেজ ছেড়ে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। এখানে তিনি ভর্তি হলেন রিপন কলেজে। এখানে তিনি নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে যে বিপ্লবী দলটি পরিচালিত হয়, সেই দলে পুরোদমে বিপ্লবী কাজে যুক্ত হলেন। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য, সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের সংগ্রহের কাজে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন সতীন সেন।

১৯১৫ সালে নদীয়া জেলার শিবপুরে ডাকাতি কাজ শেষ করে নৌকায় চড়ে ফিরে আসার পথে সাধারণ লোকেরা নদীর দুই পাড়ে হই-চই করে বিপ্লবীদের অনুগমন করতে লাগল। তখন তারা বাধ্য হয়ে নৌকা ছেড়ে হাঁটাপথে রওনা দিল। পুলিশ বারবার এসে তাদের আক্রমণ করেছে। তখন দুই পক্ষে গোলাগুলি চলেছে। সমস্ত দিন ধরে চলল লড়াই। রাতের অন্ধকারে তারা ভাগ ভাগ হয়ে আত্মগোপন করে রেলে বা অন্য উপায়ে কলকাতা আসার চেষ্টা করল। পুলিশ নানা জায়গায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করল। নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে কয়েকজন দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পৌঁছল বারাসতের কাছে। নরেন ঘোষ চৌধুরী ও সুধীর দাশগুপ্ত চলে গেলেন কলকাতায়। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য যারা ছিল তারা ধরা পড়ে গেল। সতীন সেন, বিজয় মিত্র ও রাধিকা গাঙ্গুলি গ্রেপ্তার হলেন বারাসতে। নরেনবাবু পরে কলকাতায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

ওই সময়ে কৃষ্ণনগরে ডাকাতি ও নরহত্যার মামলা শুরু হল। সতীন সেন, বিজয় মিত্র ও রাধিকা গাঙ্গুলির পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত হলেন প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এস. কে সেন এবং নরেনবাবু ও অন্যান্যদের জন্য নিযুক্ত হলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার নিশীনাথ সেন। বিচারে সতীন সেন, বিজয় মিত্র ও রাধিকা গাঙ্গুলি মুক্ত হলেন। ডাকাতির সঙ্গে কিংবা বারাসতের

জঙ্গলে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ প্রমাণিত হয়নি। মামলা থেকে মুক্তি পেলেন।

এরপর নদীয়া জেলার শিবপুরে, সেখানকার জমিদার ও পুলিশের সঙ্গে সতীন সেন ও তার অনুসারীদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৯১৬ সালে প্রথমবারের মতো কারাবরণ করেন সতীন সেন। সেবার তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এক বছর তাকে অন্তরীণ করা হল খুলনা জেলার কালীগঞ্জে। এখানে তিনি অসুস্থ হলে তাঁকে পাঠানো হল বহরমপুর জেলে এবং সেখান থেকেই মালদহ জেলার বাসনগোলা থানায়। পরবর্তী সময় তিনি বাংলার ৮টি– কারাগারে এবং বহরপুর ও জলপাইগুড়ি কারাগারে বন্দী জীবন-যাপন করেন ৪ বছর।

অন্তরীণ থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সতীন সেন মুক্তিলাভ করেন ১৯১৯ সালের শেষ দিকে। কিছুদিন পরই শুরু হয় অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন। সতীন সেন ঝাঁপিয়ে পড়েন সেই আন্দোলনে। এ আন্দোলনকে সফল করার জন্যে সতীন সেন কয়েক হাজার যুবক নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন। প্রথমে কলকাতা, পরে মাদারীপুর ও বরিশালে কিছুদিন কাজ করার পর সতীন সেন পটুয়াখালীতে আসেন। মহকুমার আন্দোলন পরিচালনায় নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। দুর্বার গণআন্দোলনে আন্দোলিত করে তোলেন সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল। এ অপরাধে ১৯২২ সালে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারের পর সতীন সেনকে স্থানান্তর করা হয় বরিশাল কারাগারে। কারাগারে প্রবেশ করেই তিনি রাজবন্দীদের প্রতি জেলরক্ষী বাহিনীর দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে শুরু করেন তুমুল আন্দোলন। তাঁকে রাখা হয় নির্জন সেলে। এ জেলে থাকা অবস্থায় তিনি ৬৩ দিন অনশন করে বন্দীদের সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য করেন।

পরবর্তী সময়ে বরিশাল কারাগার থেকে সতীন সেনকে একে একে স্থানান্তর করা হয় অলীপুর সেন্ট্রাল জেল, বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল এবং হুগলি জেলে। হুগলি জেলে গিয়ে সে সময় আন্দোলনরত কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার শুরু করেন অনশন। এর কিছুদিন পরই তার জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

বিপ্লবী সতীন সেনের অন্যান্য প্রধান আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে ১৯২৬ সালে লাউকাঠী, বারুরিয়া, কনকদিয়া ও চাঁদসী ইউনিয়ন আন্দোলন। সতীন সেন যে কত বড় মাপের নেতা ছিলেন তা সে সময়কার ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। ওই বছর সতীন সেন সরকারি দুর্নীতি ও ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদে পটুয়াখালির লাউকাঠী ইউনিয়নে হাজার হাজার মানুষকে সংঘবদ্ধ করে যে বিরাট গণসংগ্রাম সৃষ্টি করেছিলেন তা দেখে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ইএন কান্তি বলেছিলেন 'দুর্ভাগ্য যে, সতীন বাবু; আপনি পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার দেশের লোক হলে আপনার স্থান হতো প্রধান সেনাপতির আসনে।'

১৯২৭ সালে বরিশালের বিপ্লবী দলগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। যুগান্তর দলও দুইভাগে বিভক্ত হয়। যুগান্তর ও তরুণসংঘ। যুগান্তরের নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত ও অরুণ গুহ। অন্যদিকে তরুণ সংঘের নেতা ছিলেন সতীন সেন। তিনি তরুণ সংঘ নেতা হলেও যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সাথে যোগাযোগ রেখে চলতেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, লক্ষ্য যেখানে এক, সেখানে দলীয় কোন্দলে শত্রুপক্ষেরই লাভ হবে।

১৯২৮-১৯২৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্স ও সিটি কলেজ ছাত্র আন্দোলন, ১৯৪১ সালে বরিশাল জেলায় যুদ্ধ কর বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪২ সালে ভারতছাড় নামে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ সে সময় বাংলার সব আন্দোলন পরিচালনার ভার সতীন সেনের ওপর ন্যস্ত হয়। এ সংগ্রামে অবধারিত ফল হিসেবে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন।

১৯৩০ সালে সতীন সেনের প্রতি সরকার কর্তৃক বরিশাল প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল প্রাদেশিক আইন সভায়। উত্তরে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব ডব্লিউডি প্রেনটিংস মন্তব্য করেছিলেন 'সতীন সেন ব্রিটিশ শাসনের একটি বিপদস্বরূপ। তার ওপর যে আইন জারি করা হয়েছে সেটা যুক্তিযুক্ত।' ওই বছর দার্জিলিং কারাগারে একজন খ্রিস্টান বৃদ্ধা সতীন সেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে উপহার দিলেন নিজের হাতে তৈরি অসংখ্য ক্রুশ আঁকা একটি কাপড়। সতীন সেন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এতো ক্রুশ কেনো'? উত্তরে বৃদ্ধা বলেছিলেন 'যেহেতু তোমার জীবনটাই যে 'ক্রুশময়'।'

বঞ্চিত সাধারণ মানুষের সেবা আর মাতৃভূমির জন্যে ক্রুশ বিদ্ধ যিশু খ্রিস্টের মতোই বিপ্লবী সতীন সেন তিল তিল করেছেন উৎসর্গ করেছেন নিজের সমগ্র জীবনটি।

১৯৩৬ সালে বাইরের সঙ্গে সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে সতীন সেনকে অম্বলা জেলে রাখা হয়েছিল। ফলে দিল্লির কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আইন সভার সদস্যরা সতীন সেনের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

১৯৪২ সালে বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য, লড়াই-সংগ্রামকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অমিয় দাশগুপ্ত, অরুণ রায় চৌধুরী, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, আবুল কালাম সামছুদ্দিন, মোজাম্মেল হক, শাহ-আলম চৌধুরী, এবিএম জাহিদ, মজিবুর রহমান চৌধুরী, সুধীর সেন, দেবেন ঘোষ, আজিজ তালুকদার, মোশারফ হোসেন, মনা ঘোষ, মুকুল সেন, হিরালাল দাশগুপ্ত, অমৃতলাল দে, আজিজুল হক শাজাহান, বেলায়েত হোসেন, কাজী মহিউদ্দিন, সরদার ফজলুল করিম, স্বদেশ বোস, হীরালাল মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন সুতার, নুরুল ইসলাম খান, আরজ আলী, নুরুল ইসলাম উকিল, হেলাল মুন্সী, সুনীল গুপ্ত, নুরুল ইসলাম মুন্সী, মনোরমা বসু মাসিমা, রানী রায়, মোশারফ হোসেন, আব্দুল করিম, আব্দুল মোতালেব, সিদ্দিক হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, নিরোদ নাগ, জগদীশ আইচ সরকার, আব্দুস সাত্তার, আইয়ুব আলী মাস্টার, ধীরেন ভট্টাচার্য, নিখিল সেন, নলিনী দাস, মোহাম্মদ এমাদুল্লাহ, আবদুশ শহীদ, আজাদ সুলতান, ও সতীন সেন প্রমুখ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

১৯৪৬ সালে কলকাতার একটি বিশেষ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী সতীন সেনকে দেখিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'এরই মাঝে আছে আগামী দিনের বাংলার নেতৃত্বভার।' ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিদায় নিল ব্রিটিশরা। জন্ম হল ভারত-পাকিস্তানের। সতীন সেনের রাজনীতির মূল ক্ষেত্র ভারত হলেও তিনি পূর্ববঙ্গেই থেকে গেলেন।

এ সময় বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক ঘটনা প্রবাহ তাঁকে শংকিত করে তুলেছিল। এসব ঘটনার পিছনে পাকিস্তানি শাসকদের শঠতার মুখোশ খুলে দেন সতীন সেন। ফলে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে দুবার গ্রেপ্তার হন তিনি। এ সময় তিনি প্রায় ১ বছর কারাভোগ করেন। এরই মধ্যে তিনি নির্বাচিত হন বিধান সভার সদস্য।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। বিধান সভার আসন ছেড়ে ছুটে এলেন সতীন সেন। সেই রক্ত রেখায় তিনি হয়তো দেখতে পেয়েছিলেন তার প্রতিক্ষীত অভিযানের আলোকবর্তিকা। গ্রেপ্তার করা হল সতীন সেনকে। মুক্তি পেলেন ১৯৫৩ সালে। বগুড়া কারাগার থেকে যখন মুক্তি দেয়া হয় তখন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ হাজার-হাজার মানুষ তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে সতীন সেনের বিরাট অবদান ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেয়। এর পরদিনই সতীন সেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় রংপুর জেলে। সেখানে পুলিশের নির্যাতনে একজন সাধারণ কয়েদির মৃত্যু হলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন সতীন সেন। ফলে তার ওপরও চলে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন। চিকিৎসার অভাবে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয় পাবনা জেলে। পাবনায় কিছুদিন রেখে নেয়া হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। সতীন সেনের অবস্থা যখন মুমূর্ষু তখন পুলিশি পাহারায় হাসপাতালে নেয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ১৯৫৫ সালের ২৫ মার্চ রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যেখানে বসে সতীন সেন বাংলার চির বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বহু আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তার সেই প্রিয় স্বরাজ প্রাঙ্গণে (বর্তমানে পটুয়াখালি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

লেখক: শেখ রফিক

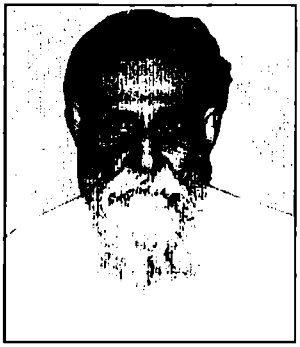
তথ্যসূত্র:

১. ইতিহাসের পাতা থেকে (প্রথম খণ্ড)– আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক: মিত্রম, ৩৭, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা, প্রকাশকাল জানুয়ারি-২০০৮।

২. অবসরডটনেট।

৩. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা– হেমচন্দ্র কানুনগো, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল জুন ১৯২৮।

রণেশ দাশগুপ্ত



সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মার্কসবাদী রাজনীতিক রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১২ সালের ১৫ জানুয়ারি। মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ের গাউরদিয়া গ্রামে। বাবা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত। তিনি খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন। তার কাকা নিবারণ দাশগুপ্ত ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও শিক্ষক। আরেক কাকা ছিলেন গান্ধীবাদী স্বদেশি আন্দোলনের কর্মী। পারিবারিক রাজনৈতিক ধারার জন্য রণেশ দাশগুপ্ত ছোটবেলা থেকেই দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের বীজ অন্তরে বুনেছিলেন। যার ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এভাবেই রণেশ দাশগুপ্ত এক সময় হয়ে ওঠেন তুখোড় মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মী।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর পাঠশালা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছোটবেলায় পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা, বইপড়া ও লেখালেখি করে সময় কাটাতেন। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ করে রাঁচির (বিহার) বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯২৯ সালে মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর ভর্তি হন বাঁকুড়ার মহাবিদ্যালয়ে। এখানে পড়াশুনাকালে তিনি সশস্ত্র বিপ্লববাদী দল অনুশীলনের সঙ্গে পরিচিত হন। ধীরে ধীরে তিনি এই দলের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

সশস্ত্র বিপ্লববাদী দল অনুশীলনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে বাঁকুড়া মহাবিদ্যালয় থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়।

কিছুদিন পর তিনি অনুশীলন দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতায় এসে 'সিটি কলেজ'-এ ভর্তি হন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশের উৎপাতের কারণে লেখাপড়ায় একের পর এক বিঘ্ন ঘটতে থাকে। পুনরায় তিনি দলের কথা মতো বরিশালে এসে ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ সময় তিনি তার মাতুল সত্যানন্দ দাশের বাড়িতে থাকতেন। সত্যানন্দ দাশ ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশের পিতা। এখানেও বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি বিপ্লববাদী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৯৩৪ সালে তার পিতা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত অবসর গ্রহণ করলে তারা সপরিবারে মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ের গাউরদিয়া গ্রামে পৈতৃক বাড়িতে সবাই বসবাস করতে শুরু করেন। ২ বছর পর ওই গ্রাম পদ্মায় বিলীন হয়ে যায়। তখন তারা সবাই ঢাকা শহরে চলে আসেন। বাবা

অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত ওই সময় বার্ধক্যের কারণে উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। সেই সময় রণেশ দাশগুপ্ত সংসার চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। চাকুরি নেন সংবাদপত্রে। শুরু হয় সাংবাদিকতা জীবন।

ততকালীন সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা 'সোনার বাংলা'য় সাংবাদিক জীবনের সূচনা ঘটে। আর এখান থেকেই মূলত তার লেখক জীবনের শুরু। সেকালের ঢাকা সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখের বন্ধুত্ব লাভ করেন। এদের সঙ্গে নানা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে থাকেন। একই সময়ে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সাথে যুক্ত হন।

১৯৪৩ সাল, বাংলা ১৩৫০। সময়টি ইতিহাসে মন্বান্তরের হিসেবে পরিচিত। ইংরেজ শাসকদের অবহেলার কারণে সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিলে রণেশ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী মোকাবেলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রাজনৈতিক কারণে তাকে পাকিস্তান পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি বিনা বিচারে কারারুদ্ধ থাকেন। গোটা পাকিস্তানি আমলে তাকে বহুবার কারাগারে যেতে হয়েছে। কারণ একটাই, তিনি কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়গুলোতে জেলে বসেও তিনি তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পাঠচক্র করতেন। জেল খানায় বসে মুনীর চৌধুরীকে 'কবর' নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং নাটকটি সম্পূর্ণতা পায় সকল বন্দীর সহায়তায় কারাগারে মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে।

কারামুক্তির পর ১৯৫৫ সালে তিনি 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় সাংবাদিকতার চাকুরি গ্রহণ করেন। এ পত্রিকাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রগতির মুখপত্র হিসেবে গড়ে তুলতে তার অবদানই ছিল মুখ্য। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' প্রবন্ধ গ্রন্থটি সকলের কাছে সমাদৃত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালনের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে। মুক্তি পান ১৯৬২-তে। আবার কারারুদ্ধ হন ১৯৬৫ সালে। এবার মুক্তি পান ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর। কারাগার থেকে বেরিয়ে বিপ্লবী কথাশিল্পী সত্যেন সেন, শহীদুল্লাহ কায়সারসহ একঝাঁক সংস্কৃতি সচেতন তরুণ মিলে গঠন করেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এই সংগঠক ১৯৭১ সালে তরুণ ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক ও কৃষকদের রিক্রুট, ট্রেনিম্বর দেয়াসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংবাদ কর্মীকে ভারতে নিয়ে আশ্রয় শিবিরের সংবাদ বিশ্বগণমাধ্যমে প্রচারে ভূমিকা রাখেন। তিনি ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর যোদ্ধাদের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১ নভেম্বর কলকাতার একটি সভায় যোগ দিতে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সেখানে থেকে যেতে বাধ্য হন। তারপর বাংলাদেশ নানা বিপর্যয় ও উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। তিনি আর ফিরে আসেননি, স্বেচ্ছা নির্বাসিতের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি, উর্দুসহ কয়েকটি ভাষার পণ্ডিত

ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে তার প্রকাশিত গ্রন্থের মননশীল প্রবন্ধ ও অনুবাদের ভেতর থেকে।

'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (বঙ্গাব্দ ১৩৬৬), 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৩), 'ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম' (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে), 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা' (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের) ও 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ'। অনুবাদঃ ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ)। সম্পাদনাঃ জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র।

রণেশ দাশগুপ্ত ১৯৯৭ সালের ৪ নভেম্বর কলকাতার পিজি হাসপাতালে মারা যান। অকৃতদার ছিলেন তিনি। নিরভিমান ও ঋষিতুল্য উদার স্বভাবের এই মানুষটির মরদেহ সবার ইচ্ছায় ও ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ স্বদেশে ফিরিয়ে এনে পরিপূর্ণ মর্যাদায় পোস্তগোলা শ্মশানভূমিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. রণেশ দাশগুপ্ত স্মারক গ্রন্থ– সম্পাদনাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রকাশক: আগামী প্রকাশনী, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০২, ঢাকা।

২. রণেশ দাশগুপ্ত– সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রকাশক: মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, কথা প্রকাশ, প্রকাশকালঃ একুশে বইমেলা ২০১২।

৩. অনুপ্রাণন রণেশ দাশগুপ্ত– রতন সিদ্দিকী, দৈনিক প্রথম আলো, ০৪-১১-২০১১।

সত্যেন সেন



'সত্যেন সেনের সাহিত্যকর্ম সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি মহৎ নিদর্শন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যের অনন্য পথিকৃৎ। মানুষের জীবন ও ইতিহাসকে যে রচনাকার সামগ্রীকভাবে অবলোকন করতে সক্ষম না হন, যিনি মানব সমাজটাকে তার বর্তমানের সকল বৈষম্য দূর করে সঙ্গতিপূর্ণ এক মানব সমাজ সৃষ্টিতে নিজেকে উৎসর্গ না করেন এবং যিনি দূরগামী সেই লক্ষ্যকে নিত্য মুহূর্তের কর্ম ও আচরণের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারেন, তার পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অনুপ্রেরণাদায়ক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কারণ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যিক ও তার সৃষ্টি অবিচ্ছেদ্য। উভয়কে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যিক। সত্যেন সেনের জীবন ও সাহিত্য সাধনা এই সত্যেরি সাক্ষ্য বহন করে। তার সাহিত্য বাংলাদেশের সচেতন সাহিত্য এবং সমাজকর্মীদের জন্য সত্যেন সেনের সাহিত্য নিত্যমুহূর্তের পথ প্রদর্শক এবং অনুপ্রেরণার উৎস স্বরূপ' –সরদার ফজলুল করিম।

বিপ্লবী কথাশিল্পী সত্যেন সেনের সৃষ্টি ও দর্শন বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন মাত্রা। তার সৃষ্টিকর্ম মূলত সংগ্রামী ও শোষিত মানুষকে কেন্দ্র করে। তার সাহিত্যকর্মের মৌলিক দর্শন হল শোষণ-বৈষম্যের অবসান এবং সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেতনা নির্মাণ। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি আমৃত্যু পথ চলেছেন। গড়ে তুলেছেন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। তুলে এনেছেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জীবন্ত লড়াই-সংগ্রামের মানুষগুলোকে। তাঁদের জীবন-সংগ্রামকে ইতিহাসের পাতায় সাহিত্যিক রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যাকে আমরা বলি রাজনৈতিক সাহিত্য। যে সাহিত্য মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যেই সৃষ্টি হয়। এই সংগ্রামী মেহনতি মানুষের বাস্তব জীবনের কথাগুলোকে লয়, তাল, সুর আর ছন্দে গেঁথে তার শ্রেণীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁদের উজ্জীবিত করতে গড়ে তুলেছেন গণসঙ্গীত শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী।

এই প্রতিষ্ঠান এদেশের মেহনতি মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে। সত্যেন সেন নিজেও অসংখ্য গণসঙ্গীত রচনা করেছেন। তার সঙ্গীতে রয়েছে মেহনতি মানুষের অধিকারের কথা, শ্রম-শোষণের কথা ও শোষণমুক্তির জন্য গণ-বিপ্লবের আহ্বান। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী এদেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারার সংস্কৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সত্যেন সেনের সৃষ্টিকর্ম ও সাহিত্য হল সমাজ বাস্তবতার স্পষ্ট প্রকৃতি-স্বরূপের প্রতিচ্ছবি। তার জীবনের সকল কিছুতেই মৌলিক বিষয় হিসেবে কাজ করেছে মানুষের জীবন-সংগ্রাম ও শ্রম-সভ্যতার

ইতিহাস। তিনি বলতেন এই সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস মূলত মানুষের ইতিহাস। ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ এবং সত্য, সুন্দর ও সাম্যের জীবন গড়াই ছিল তার সাহিত্য-দর্শনের মূলবিষয়। যা ইতিহাসে বিরল। প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা কমরেড সুনীল রায় সত্যেন সেনের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে মূল্যায়ন করে বলেন, 'সত্যেন সেন সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন সাহিত্যিকের খাতায় নাম লিখানোর জন্য নয়, মানুষের সংগ্রাম ও সমাজ-প্রগতির সংগ্রামকে শানিত করে তোলার জন্য'।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম কিংবদন্তি বিপ্লবী সত্যেন সেনের জন্ম ১৯০৭ সালের ২৮ মার্চ। বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ) জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার সোনারং গ্রামের সেন পরিবারে। ছোটবেলায় তার ডাক নাম ছিল লস্কর। বাবা ধরনীমোহন সেন, মা মৃণালীনি সেন। চার সন্তানের মধ্যে লস্কর ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সোনারং গ্রামের সেন পরিবার ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার এক অনন্য উদাহরণ। লস্করের কাকা ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। আর এক কাকা মনোমোহন সেন ছিলেন শিশু সাহিত্যিক।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাইমারি ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনাও পরিবার ও গৃহ শিক্ষকের কাছে সম্পন্ন করেছিলেন। ১৯১৯ সালে সোনারং হাইস্কুলে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ১৯২১ সালে তিনি যখন সোনারং হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তখন থেকেই তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। বাল্যকালেই সত্যেন সেন নিজ হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছিলেন। মাধ্যমিক পাস করে কলকাতায় কলেজে ভর্তি হন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি যুক্ত হন বিপ্লবী দল যুগান্তরের সাথে। ছাত্র অবস্থায় ১৯৩১ সালে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে প্রথম কারাবরণে বাধ্য হন। বহরমপুর বন্দী ক্যাম্পে থেকেই শুরু হয় তার জেলজীবন। এ সময় তিনি ৩ মাস জেলে ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনি ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় বার গ্রেফতার হন। এ সময় তার ৬ বছর জেল হয়। তখন তার স্নেহময়ী মা প্রচণ্ড অসুস্থ ছিল। ছোট সন্তানকে দেখার জন্য শত আকুতি জানিয়েছিলেন পরিবারের কাছে। কিন্তু সে সুযোগ তিনি আর পাননি। সত্যেন সেন ১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পান। ওই বছর শান্তি নিকেতন থেকে তাঁকে দেয়া হয় 'গবেষণা বৃত্তি'। কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি বাংলায় এম. এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে এক সমাবেশে শহীদ হন ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিপ্লবী কথাশিল্পী সোমেন চন্দ। এ সময় ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে সত্যেন সেন কার্যকরী দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় 'কৃষক সমিতি'র মাধ্যমে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষক সমিতির নেতা-কর্মীকে নিয়ে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় কাজ করেন। ১৯৪৬ সালে আইন সভার নির্বাচনে কমিউনিস্ট নেতা ব্রজেন দাস ঢাকা থেকে প্রার্থী হন। ব্রজেন দাসের পক্ষে সত্যেন সেন নির্বাচনী প্রচারণা চালান। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত সকল আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়। ১৯৪৯ সালে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য তাঁকে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী গ্রেফতার করে। আবার দীর্ঘ কারাভোগ। ওই সময় কারাগারে কমিউনিস্টদের প্রতি নানা অত্যাচার ও নির্যাতনে মাত্রা ছিল অনেক বেশী। কমিউনিস্ট পেলেই বেশী অত্যাচার শুরু করে দিত। সত্যেন সেনকেও কারা প্রশাসন নানা

অত্যাচার ও নির্যাতন করে। যার ফলে তার শারীরিক অসুস্থতা ও চোখের পীড়া দেখা দেয়। কারাবাসে অবস্থানকালে সত্যেন সেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ মতাদর্শ ও দর্শনকে জীবনাদর্শন হিসেবে গ্রহণ করে আজীবন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লড়াই-সংগ্রাম করেছেন।

দীর্ঘদিন কারাভোগ শেষে ১৯৫৩ সালে মুক্তি পেয়ে নিজ গ্রাম সোনারংয়ে ফিরে আসেন। ওই সময় নানা প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে তাদের পরিবারের সবাই নিরাপত্তার কারণে কলকাতায় পাড়ি জমান। তিনি এ সময় যুক্ত হন কৃষক আন্দোলনের সাথে।

১৯৭১ সালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তবে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এক পর্যায়ে তার চোখের পীড়া আরো গুরুতর রূপ নেয়। তিনি প্রায় অন্ধ হতে চলেন। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে চোখের উন্নত চিকিৎসার জন্য মস্কো পাঠায়। এখানে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের সাথে পরিচিত হন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। তারাও স্ব-স্ব দেশে গিয়ে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি জানান। মস্কো হাসপাতালে অবস্থানকালে তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সংবাদ পান। সেখানকার বাঙালিদের মুক্তির উল্লাস প্রত্যক্ষ করেন। তিনি নিজেও অশ্রুসিক্ত নয়নে ওই আনন্দ উপভোগ করেন। মুক্ত, স্বাধীন স্বপ্নের স্বদেশ, বাংলাদেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালে। শুরু করেন উদীচী পুনর্গঠনের কাজ। সাহিত্য চর্চাও অব্যহত রাখেন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফলে আবার দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। চিকিৎসার জন্য চলে যান ভারতে। আশ্রয় নেন শান্তি নিকেতনের মেজদিদি প্রতিভা সেনের কাছে। সাহিত্য চর্চা ও অসুস্থতার মাঝে চলে যায় ৮টি বছর। শান্তি নিকেতনের গুরুপল্লীতে ১৯৮১ সালে ৫ জানুয়ারি তিনি মারা যান।

এই কিংবদন্তি বিপ্লবী ৭৩ বছর জীবনের ২৪ বছর কাটিয়েছেন কারাগারে, আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে ৪ বছর আর ২৩ বছরে রচনা করে গেছেন উপন্যাস, গল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, মানবসভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে। তার গ্রন্থ সংখ্যা ৪০টির উপরে।

গানের মাধ্যমে মানুষকে জাগরিত করা সহজ। এই উপলব্দি নিয়ে গণমানুষের জন্য মানুষের জীবন বাস্তবতার গান রচনা করেছেন। তার গানের মূল বিষয়বস্তু হল অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, শোষণমুক্তির জন্য আন্দোলন ও সাম্য-সুন্দর মানুষের পৃথিবী নির্মাণ। গান রচনার মাধ্যমেই মূলত তার লেখালেখি জগতে আশা। পাশাপাশি গানের সুর করা ও গান শেখানোর কাজও তিনি করেছেন।

শ্রমিকদের নিয়ে তিনি তাদের জন্য গান এবং পালা রচনা করতেন। গানের দল গঠন করে শ্রমিকদের এ কবিগান তিনি রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে পরিবেশন করতেন। তার লেখা ১১টি গানের মধ্যে 'চাষি দে তোর লাল সেলাম/তোর লাল নিশানরে' গানটি তখন চাষিদের জাতীয় সংগীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৫৬ সালে বিক্রমপুরের ষোলঘরে কৃষক সমিতির সম্মেলনে প্রথম তারই নেতৃত্বে গানটি গাওয়া হয়। এছাড়া সত্যেন সেন গানের মাধ্যমে বরিশালে মনোরমা বসু মাসিমার 'মাতৃমন্দিরের' জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন।

সত্যেন সেন একজন নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন। জীবনের নানা চড়াই-উৎরাইয়ের বাঁকে তিনি কোথাও আপোষ করেননি। যারা করেছে, তাঁদেরকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি মূলত কোনো লেখাই লেখার জন্য লিখতেন না। তিনি লিখতে মানুষের অধিকারের কথাগুলো। প্রথমে দৈনিক 'মিল্লাত' পরবর্তী সময়ে দৈনিক 'সংবাদ'র মাধ্যমে সত্যেন সেন সাংবাদিকতা করেছেন।

বিপ্লবী কথাশিল্পী সত্যেন সেনের হাতে গড়া গণসাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী। জন্মলগ্ন থেকে উদীচী অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের সমাজ নির্মাণের সংগ্রাম করে আসছে। উদীচী '৬৮, '৬৯, '৭০, '৭১, সালে বাঙালির সার্বিক মুক্তির চেতনাকে ধারণ করে গড়ে তোলে সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। এ সংগ্রাম গ্রাম-বাংলার পথে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় উদীচীর কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। তারা ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর সাথে ছিল। এই গেরিলা বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা।

সত্যেন সেনের সাহিত্যকর্মঃ উপন্যাস– ভোরের বিহঙ্গী (১৯৫৯), রুদ্ধদ্বার মুক্ত প্রাণ (১৯৬৩), অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৯), পাপের সন্তান (১৯৬৯), সেয়ান (১৯৬৯), পদচিহ্ন (১৯৬৯), পুরুষমেধ (১৯৬৯), আলবেরুনী (১৯৭০), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৯৭০), বিদ্রোহী কৈর্বত (১৯৭০), কুমারজীবী (১৯৭০), অপারেজয় (১৯৭০), মা (১৯৭০), উত্তরণ (১৯৭০), একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে (১৯৭১) ইত্যাদি। এছাড়া ইতিহাস আশ্রিত ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে– গ্রামবাংলার পথে পথে (১৯৬৬), আমাদের পৃথিবী (১৯৬৮), মসলার যুদ্ধ (১৯৬৯), এটোমের কথা (১৯৭০), অভিযাত্রী (১৯৭০), মানবসভ্যতার উষালগ্ন (১৯৭১), মনোরমা মাসিমা (১৯৭১), প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১), বিপ্লবী রহমান মাষ্টার (১৯৭৩), সীমান্ত সূর্য আবদুল গাফফার (১৯৭২), জীববিজ্ঞানের নানা কথা (১৯৭৭) ইত্যাদি। ছোটদের জন্যও গল্প লিখে গেছেন তার মধ্যে -পাতাবাহার (১৯৬৮) অন্যতম।

পুরস্কারঃ ১৯৬৯ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ও ১৯৮৬ সালে সাহিত্যে মরণোত্তর একুশে পদক পান।

সত্যেন সেনের গান

'ও আমার দেশের ভাই দেশের ভাই।
আমার মিনতি শোনো শোনো।
শোনোরে ভাই দেশের মানুষ।
মুখ তুলিয়া চাও।
ঘরের ইন্দুর বাঁধ কাটে ভাই।
দেখতে কি না পাও রে।
কাল থাকিতে বিহিত করো নইলে উপায় নাই।
আজ হুঁশ করিয়া চলো রে ভাই।
(আজ) হুঁশ করিয়া চলো
করে নেতায় নেতায় দলাদলি
আমরা হইলাম খুন।

দাউ দাউ কইরা জ্বইলা উঠে
বিভেদের আগুন রে
নিজের গলায় দিলে রে ছুরি
কে বাঁচাইবো তায়
আপন ঘর সামলাও রে ভাই
(আজ) আপন ঘর সামলাও।'

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা– তপন কুমার দে; প্রকাশ কাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

২. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

৩. লেখাটি তৈরির জন্য 'সত্যেন সেন-মহাজীবনের রূপকার' পুস্তিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে। এই পুস্তিকাটি সত্যেন সেনের জন্মশতবর্ষে উদীচী চট্টগ্রাম জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়; শ্রদ্ধাঞ্জলি, সত্যেন সেনের শততম জন্মদিবস, সত্যেন সেন জন্মশতবর্ষ উদযাপন জাতীয় কমিটি, ২৮ মার্চ ২০০৬।

৪. সাপ্তাহিক একতা– উদীচী বার্তায় প্রকাশিত সত্যেন সেন স্মরণে প্রকাশিত লেখা থেকে।

জ্ঞান চক্রবর্তী



১৯৩৮ সাল। দীর্ঘ সাত বছর পর জেল থেকে মুক্তি পেলেন কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী। সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলের সাথে যুক্ত থাকার সন্দেহে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু পুলিশ তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ বা অভিযোগ দাঁড় করাতে না পারলেও জেলে বন্দী অবস্থায় দীর্ঘ সাত বছর তাঁকে দুর্বিসহ জীবন কাটাতে হয়।

তিনি বক্সা বন্দীশিবির থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সরাসরি চলে আসেন কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা কমিটির কার্যালয়ে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর পরিবারে ফেরেননি। জেলে বন্দী অবস্থায় তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, জেল থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি আর জীবন-সংসারে ফিরবেন না। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ। বাবার অঢেল ধন-সম্পদ, জীবন-যৌবনের মোহ, আত্ম-সুখের মরীচিকা সবকিছু বাদ দিয়ে ৩৩ বছরের যুবকটি মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তির সংগ্রামে ফিরে আসেন। যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টিতে। তবে সময় পেলে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিতেন।

পার্টি কমরেড ও আত্মীয়-স্বজন তাকে বহুবার বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো বিয়েতে রাজী হন নি। কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন পার্টি করার কারণে যে কোনো সময় গ্রেফতার হতে পারেন। হয়তো যে কোনো সময়ে আত্মগোপনে চলে যেতে হতে পারে। বা সোমেন চন্দের মতো 'বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি'র (আরএসপি) গুণ্ডারা তার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালাতে পারে। এসব ভেবে তিনি বিয়ে করেননি।

ইতোমধ্যে ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে উঠেছে। ওই সময় ঢাকা জেলায় কমরেড নেপাল নাগ ও কমরেড অনিল মুখার্জী শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বে ছিলেন। কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন। রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তোলেন পার্টি সংগঠন। কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ঢাকার বাইরে গিয়ে কৃষকদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার কাজ অব্যাহত রাখলেন।

মেহনতী মানুষের শোষণমুক্তির কাণ্ডারী কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের শোষণ মুক্তির আন্দোলনে যে সকল মানুষ আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁদের মধ্য কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী অন্যতম। বিত্ত-বৈভবের মোহ তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি বাবার অঢেল ধন-সম্পদ ও যশ-খ্যাতি ত্যাগ করে মেহনতি মানুষের

কাতারে এসে তাদেরই একজন হয়ে সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। গড়ে তুলেছেন শোষণমুক্তির জোরালো লড়াই-সংগ্রাম।

ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের কথা তাকে ছাড়া চিন্তাও করা যায় না। শুধু কমিউনিস্ট আন্দোলনই নয়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও তার ভূমিকা ছিল অনন্য। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি গরীব-দুঃখী, কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ব্যয় করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অগ্রনায়ক ছিলেন তিনি।

কমরডে জ্ঞান চক্রবর্তী জন্মেছিলেন ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে। পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের গোবিন্দ দাস লেনে। তাঁদের আদিনিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। ঢাকা শহরের পাতলা খান লেনে এবং গেন্ডারিয়াতেও তাঁদের বাড়ি ছিল। জ্ঞান চক্রবর্তীর পিতার নাম যামিনী চক্রবর্তী। তিনি ঢাকা শহরের একজন নাম করা আইনজীবী ছিলেন। মা ছিলেন গৃহিনী। তাঁদের পরিবারে ৩টি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন ৩ ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। বিশেষ করে বাবার কাছে। তারপর প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। প্রাইমারি স্কুলের পড়াশুনা শেষে তার বাবা যামিনী চক্রবর্তী তাঁকে জগন্নাথ স্কুল এণ্ড কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯২৬ সালে তিনি এস. এস. সি ও ১৯২৮ সালে জগন্নাথ স্কুল এণ্ড কলেজ থেকে আই. এস. সি পাশ করেন। আই. এস. সি পাশ করার পর তিনি বি. এস. সি-তে পড়াশুনার জন্য ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩০ সালে বি. এস. সি পাশ করার পর তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস. সি-তে ভর্তি হয়েছিলেন।

১৯০৬-০৭ সালে ঢাকায় পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়। ঢাকার অনুশীলন সমিতি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির সভ্য হতে হলে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করার মন্ত্র পাঠ করতে হতো। ঢাকা 'অনুশীলন সমিতি'র আদর্শ ছিল সশস্ত্র বিপ্লব। মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়ানো। সশস্ত্র আন্দোলনকারীরা ইংরেজ আমলা নিধনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করে। 'দেশের মুক্তি কোন পথে' ও 'বর্তমান রণনীতি' বই দুটি প্রকাশ করা হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের জন্যে। সেই সময় বই দুটির দাম রাখা হয়েছিল মাত্র বারো আনা।

আর যাদেরকে জীবন উৎসর্গ করার মন্ত্র পাঠে অযোগ্য মনে হতো তাদেরকে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলনের (অহিংস বা স্বদেশি আন্দোলন) সাথে যুক্ত করে দেয়া হতো। তখন 'স্বদেশবাসীরা' বাজারে বাজারে পিকেটিং করছিলেন বিদেশি দ্রব্য বর্জন করার জন্য।

১৯০৭ সালের ১০ আগস্ট। পুলিশ ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি'র বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। এ সময় 'অনুশীলন সমিতি'র বাড়ি থেকে পুলিশ সন্দেহজনক নথিপত্র, ইস্তেহার এবং নানা ধরনের বিপ্লবী পুস্তিকা নিয়ে যায়। এরপর 'অনুশীলন সমিতি'কে ব্রিটিশ সরকার বেআইনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে সমিতির কার্যক্রম চলছিল খুবই সতর্কতার সাথে এবং গুপ্তভাবে। ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' নিষিদ্ধ হওয়ার পর 'বাণী সংঘে'র মাধ্যমে এই সমিতির কার্যক্রম চলত।

১৯১৭ সাল। সমগ্র ভারতজুড়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলগুলো ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে নিখিল ভারত থেকে স্ব-মূলে উৎখাত করার জন্য নানারকম কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে। ঠিক এই সময় মাত্র ১২ বছর বয়সে জ্ঞান চক্রবর্তী সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'র শাখা সংগঠন 'বাণী সংঘে'র সাথে যুক্ত হন। তখন তিনি স্কুলে পড়তেন। স্কুলের পাঠ্য বইয়ের সাথে 'বাণী সংঘে'র রাজনৈতিক বই-পুস্তক পড়াশুনা শুরু করলেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি একজন তরুণ দেশপ্রেমিক বিপ্লবী হিসেবে গড়ে উঠলেন। তারপর শুরু করেন ব্রিটিশকে উচ্ছেদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। অনেক বছর পর 'বাণী সংঘে'র গোপন কার্যকলাপ ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের চোখে পড়ে।

১৯৩০ সালে জ্ঞান চক্রবর্তীর মা মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় 'বাণী সংঘে'র উপর ব্রিটিশ পুলিশের নজরদারি বহুগুণে বেড়ে যায়। যে কারণে তিনি তাদের ৯ নম্বর গোবিন্দদাস লেনের বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপনে চলে যাওয়ার মাস ছয়েক পর ওই বছর ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আত্মগোপনে থাকাবস্থায় তিনি সকল কার্যক্রম এমন সর্তকভাবে চালাতেন, যেন পুলিশ তার কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ না পায়। তাই তাকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ আদালতে তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ বা অভিযোগ দাঁড় করাতে পারেনি। যে কারণে তাকে বিনা বিচারে আটক করে রাজ বন্দী হিসেবে কোলকাতা প্রসিডেন্সী জেলে রাখা হয়। কিছুদিন পর তাকে বক্সা বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়। এই বন্দী শিবিরটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে, ভুটান সীমান্তে, কুচবিহার জেলার আলিপুর দুয়ারের কাছে পাহাড়ের উপরে। সেখান থেকে পরে তাকে সুদূর রাজপুতনার মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত দেউলী বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়। এসব বন্দী শিবির তখন ব্রিটিশ সরকার নির্মাণ করেছিল স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের আটক রাখার জন্য।

এখানে তিনি বন্দী অবস্থায় ৭ বছর ছিলেন। এই বন্দী শিবিরে তখন অসংখ্য বিপ্লবী বন্দী ছিল। বকসা বন্দী শিবিরের ভিতরেও তখন 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' এই দুই দলে বন্দীরা বিভক্ত ছিল। তাদের খাবার প্রস্তুত করার রন্ধনশালাও ছিল পৃথক পৃথক। এর বাইরে আরেকটি তৃতীয় রন্ধনশালা ছিল। এটি ছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের। আর 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর'-এর উভয় দল থেকে কিছু কর্মীরা এসে যুক্ত হয়েছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সাথে। জ্ঞান চক্রবর্তী কমিউনিস্ট দলে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন।

এ সময় তিনি যে সমস্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন তাদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের কৃষক নেতা আব্দুল রাজ্জাক, মণি সিংহ, সিন্দুর জামাল উদ্দিন বোখারী, হুগলী জেলার কালী সেন, ঢাকার নলীন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ। এদের সান্নিধ্যে এসে তিনি সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কমিউনিজম ও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে সামান্য কিছু বই-পত্র বকসা বন্দী শিবিরে আসতো। এই বই জ্ঞান চক্রবর্তীসহ অন্যান্য তরুণরা খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। এই বন্দী শিবিরে বসেই তার রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তন আসে। তিনি বুঝতে পারেন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে একমাত্র শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সম্ভব। এটিই শোষণ-বৈষম্য অবসানের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পথ। মার্কসবাদের শিক্ষা থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে জনগণকে জাগ্রত ও সংগঠিত করে গণবিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে বিতাড়িত করতে হবে। তাই তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হলেন।

১৯৩৭ সালে জ্ঞান চক্রবর্তীর বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর কারণে ওই সময় তাকে একবার কড়া প্রহরা দিয়ে বক্সা বন্দী শিবির থেকে ঢাকাতে আনা হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে তিনি বক্সা বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পান। মুক্তি লাভের পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন। ইতোমধ্যে ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হওয়ার ৮ মাস পরে তিনি পার্টির সদস্য পদ পান।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসেই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। এই সময় কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তীর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, অর্থাৎ সমস্ত ঢাকায় পার্টি শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। সারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনী ছিল। পার্টি তখন প্রকাশ্য সংগঠনের পথ খুঁজতে থাকে। গোপনে গোপনে পার্টির কাজের ধারাও অব্যাহত থাকে। ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে এই লেখক সংঘের শাখা গড়ে উঠে ঢাকায়। পার্টির কাজের পাশাপাশি এতে যুক্ত হন জ্ঞান চক্রবর্তী। ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি জ্ঞান চক্রবর্তী ও রণেশ দাশগুপ্তের উদ্যোগে ঢাকার গেণ্ডারিয়া হাইস্কুলে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কাজী আবদুল ওদুদ। রণেশ দাশগুপ্ত সংগঠনের সম্পাদক ও সোমেন চন্দ সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন ঢাকার সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সমন্বয়কারী। তিনিই মূলত পেছন থেকে লেখক সংঘের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। সত্যেন সেনও এই লেখক সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন। জ্ঞান চক্রবর্তী ও রণেশ দাশগুপ্তের উদ্যোগে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘ ও গোপন কমিউনিস্ট পার্টির পাঠক্রম গড়ে উঠেছিল। এতে সোমেন চন্দ, কিরণশঙ্কর, অমৃত কুমার দত্তসহ আরো অনেকে যুক্ত হয়েছিলেন। এই পাঠক্রমের প্রশিক্ষক ছিলেন কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী।

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে জ্ঞান চক্রবর্তী ঢাকায় 'কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন' আহ্বান করেন। ওই বছর মে মাসে 'কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন' আহ্বান করার অপরাধে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সে সময় তিনি ৮ মাস জেলে ছিলেন। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে তিনি মুক্তি পাওয়ার পর আত্মগোপনে চলে যান। ওই বছরের শেষের দিকে পুনরায় কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী ও অনিল মুখার্জীকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে। কারণ তাদের কাছে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস' বইটি ছিল। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। তাই এই বই রাখা এবং প্রচার করা অপরাধ। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করে। তাদের ৮ মাস জেল হয়। ১৯৪২ সালের মে মাসে তারা মুক্তি পান।

১৯৩৮-৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, রায়পুরাসহ বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির বিস্তারলাভের কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তীর অপরিসীম অবদান ছিল। তার অবিরাম চেষ্টা আর শ্রমে গড়ে উঠেছিল রেল শ্রমিকদের সংগঠন রেল শ্রমিক ইউনিয়ন। এই রেল শ্রমিক ইউনিয়নে সোমেন চন্দ শ্রমিকদের সংগঠিতকরণের কাজ করতেন।

১৯৪২ সালের শেষের দিকে ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন গোপাল বসাক এবং জ্ঞান চক্রবর্তী এই কমিটির অন্যতম সংগঠক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে গোপাল বসাক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কারণে তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছিলেন না। এ সময় ঢাকা কমিটি সর্বসম্মতি নিয়ে জ্ঞান চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে।

১৯৪৩ সাল। বাংলা ১৩৫০ সন। এই সনটি ইতিহাসে মন্বন্তরের সন হিসেবে পরিচিত। এই সময় ইংরেজ শাসকদের অবহেলার কারণে সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। গ্রাম-বাংলার অনাহারী মানুষ খাবারের জন্য ছুটছে কলকাতার দিকে। গলিতে-গলিতে, রাজপথে-ফুটপাথে অগণিত মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কাক ও কুকুরের সঙ্গে বুভুক্ষু মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খুঁজে ফিরছে ডাস্টবিনে-নর্দমায়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশব্যাপী লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এই দুর্ভিক্ষ থেকে মানুষকে বাঁচাতে জ্ঞান চক্রবর্তী অমানুষিক পরিশ্রম করেন। সমস্ত ঢাকায় জনরক্ষা কমিটি করে লঙ্গরখানা চালু করেন।

জ্ঞান চক্রবর্তী ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দেশভাগের পর কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে চলে আসে। এ সময় ১৫ নম্বর কোর্ট হাউজ স্ট্রীটে পার্টি অফিস ও কারকুনবাড়ি লেনে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে পার্টির কমিউন স্থাপিত হয়। জ্ঞান চক্রবর্তী এই কমিউনে থেকে পার্টির কাজ করতেন। ওই সময় নবাবপুর রোডে পার্টির একটি বইয়ের দোকানও চালু হয়।

১৯৪৬, ১৯৫০ ও ১৯৬৫ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জীবনবাজী রেখে অসীম সাহসিকতার সাথে তিনি দাঙ্গা মোকাবেলা করেন। পাকিস্তান আমলের পুরাটা সময় কেটেছে তার জেল আর আত্মগোপনে। এ সময়কালে তিনি ৩ বার গ্রেফতারসহ ১৩ বছর আত্মগোপনে ছিলেন। আত্মগোপনে থাকাবস্থায় তিনি বিভিন্ন স্থানে পার্টি গড়ে তোলেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনের ছাত্র নেতৃবৃন্দের পিছনে থেকে তাদেরকে এই আন্দোলন সংগঠিতকরণে পথ দেখিয়েছেন। ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন, গাজীউল হকসহ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবকের মতো। এছাড়াও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। ১৯৫৩ সালে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রথম যে একুশের সংকলন বের হয়, এই সংকলনের মূল প্রবন্ধ তিনি ছদ্মনামে লেখেন।

১৯৬২ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের মাত্র ২ মাস পর ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে একটি শিক্ষা রিপোর্ট প্রণয়ন করে। ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত এই রিপোর্টে আইয়ুব শাহীর ধর্মান্ধ, ধনবাদী, রক্ষণশীল, সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাসংকোচন নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। আইয়ুব সরকার এই রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তা ১৯৬২ সাল থেকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। এই শরীফ কমিশন বিরোধী শিক্ষা আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৬৬ সালের ৬দফা আন্দোলনে ও '৬৯ এর ১১দফা আন্দোলনে একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জ্ঞান চক্রবর্তীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তিনি। তরুণ ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক ও কৃষকদের রিক্রুট, ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর যোদ্ধাদের অন্যতম পরিচালক ও সংগঠকও ছিলেন তিনি। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে নবউদ্যমে আমৃত্যু কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির রক্ত পতাকা হাতে নিয়ে অগ্রসেনানী হিসেবে শোষণ মুক্তির লড়াই-সংগ্রামকে অগ্রসর করতে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার বিপ্লবী জীবন থেকে নতুন প্রজন্মের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। কমিউনিস্ট কর্মীরা তো অবশ্যই। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ গড়ার জন্য তিনি আওয়ামী লীগ সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এই হত্যার প্রতিবাদে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে মিছিল করে। জীবনবাজী রেখে এই প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিতকরণেও কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী ভূমিকা রেখেছিলেন।

১৯৭৭ সালের ১৯ আগস্ট এই বীর বিপ্লবী মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী স্মরণে– প্রকাশক: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।

২. সাপ্তাহিক একতা, ১৪ আগস্ট ১৯৮৭।

৩. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

শহীদ কম্পরাম সিং

সত্যেন সেন

দিনাজপুর জেলার লাহিড়ীহাটে মে দিবসের উৎসব। স্বাধীনতা লাভের বছর খানেক আগেকার কথা। দিনাজপুর শহর থেকে লাহিড়ীহাটে যেতে হলে ঠাকুরগাঁ হয়ে যেতে হয়। ঠাকুরগাঁর পরের ষ্টেশন আখানগর। আখানগর থেকে লাহিড়ীহাট পর্যন্ত বরাবর একটা কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে। মাইল সাতেকের পথ। লাহিড়ীহাট নামকরা হাঠ। বহু দূর থেকে লোকেরা সেখানে হাট করতে আসে।

মে সিদবের সভা। বিরাট সভা। কৃষক সমিতির ডাকে চারিদিক্কার গ্রামগুলি ভেঙ্গে লোক এসেছে। এখনও আসছে। হাজার কুড়ি লোক সভায় জমায়েত হয়েছে। দিনাজপুরের বিশিষ্ট কৃষক নেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই এসেছেন।

লাহিড়ীহাট উৎসব সজ্জায় সেজেছে। সভার সামনে বিরাট এক লাল নিশান সগর্বে পত্ পত্ করে উড়ছে। গেট সাজানো হয়েছে লাল ফেষ্টুন দিয়ে। এদিকে, ওদিকে, চারদিকেই লাল নিশানের ছড়াছড়ি। যেদিকেই তাকাও, লালে লাল। মে দিবস সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষের আনন্দ উৎসবের দিন। এই দিনেই সংগ্রামী শ্রমিকদের বুকের রক্তে রঞ্জিত লাল নিশানের জন্ম হয়েছিল। সেদিন থেকে এই লাল নিশান সারাবিশ্বের মজুর, কৃষক ও সমস্ত মেহনতী মানুষকে সংগ্রামের পথ নির্দেশ করে চলেছে।

কিন্তু এই আনন্দ উৎসবের মাঝখানেও একটা দুঃখের কালোছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। একজনের অনুপস্থিতি সবাইকে ব্যথিত করে তুলেছে। এখানে ওখানে বলাবলি চলছে– এমন উৎসবের দিন, এত লোক জড় হয়েছি আমরা, কিন্তু কম্পদা আজ সভায় থাকতে পারল না। এত লোকের মাঝখানেও কেমন যেন খালি খালি লাগছে।

সকল সময় সব কাজে যিনি পুরোভাগে থাকেন, কাজে-কর্মে যার উৎসাহ আর সকলের উৎসাহকে ছাপিয়ে উঠে, সেই কম্পদা বা কম্পরাম সিং আজ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তার অভাবটা সবার মনেই বাজছে। কম্পদার একটি মাত্র ছেলে। অনেক দিন থেকেই সে রোগে ভুগছিল। সেই ছেলে গত রাত্রিতে মারা গিয়েছে। এ অবস্থায় কম্পদা কি করেই বা আসবেন। তিনি ছেলের শবদেহ দাহন করবার জন্য অন্যান্য শ্মশানবন্ধুদের সঙ্গে শ্মশানে গেছেন।

সভার উদ্যোক্তারা সভার কাজ শুরু করবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করছেন। একজন নওজওয়ান সভার আরম্ভ ঘোষণা করবার জন্য শ্লোগান দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল। সেই মিলিত আওয়াজে সারা আকাশটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল।

শ্লোগান থামতেই সভার লোকেরা সচকিত হয়ে শুনল, দূর থেকে অনুরূপ আওয়াজ ভেসে আসছে। এ কি প্রতিধ্বনি? না, প্রতিধ্বনি নয়, লক্ষ্য করে বোঝা গেল, কারা যেন শ্লোগান দিতে দিতে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে আসছে। সম্ভবতঃ কোন গ্রাম থেকে এক দল কৃষক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আসছে। ঠিকই তাই। একটু বাদেই দেখা গেল, একটা মিছিল একটা ঝোপের আড়াল কাটিয়ে হঠাৎ সামনে চলে এল। কারা এরা? সবাই উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

মিছিলটা কাছাকাছি এসে পড়তেই চমকে উঠল সবাই। মিছিলের সামনে সবার আগে এ কে? কম্পদা না? হ্যাঁ, কম্পদাই তো। তার পাশে একটা সাদা থান পরা বিধমা মেয়ে। কম্পদা তার হাত ধরে এগিয়ে আসছেন, আর তার সুপরিচিত জলদগম্ভীর কণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছেন, 'মে দিবস জয়যুক্ত হোক', 'দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও।' মিছিলের লোকেরা গলায় গলা মিলিয়ে তার আওয়াজে সাড়া দিয়ে চলেছে।

সেই মিছিল যখন সভার সামনে এসে দাঁড়াল তখন সবাই দেখল কম্পদার কোমরে গামছা বাঁধা, তার মাথার রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে। পিছনে আরও কয়েকজন শ্মশানবন্ধু, তাদেরও ঐ একই মূর্তি। চেহারা দেখে বোঝা যায় যে, তারা দাহকর্ম শেষ করেই শ্মশান থেকে সোজা সভার জায়গায় চলে এসেছেন। তাঁদের পিছনে শ'খানেক লোক।

থান পরা বিধবা মেয়েটির একটা হাত কম্পদার হাতে, আর এক হাত দিয়ে সে নিজের মুখ চেপে ধরে ফুপে ফুপে কাঁদছে। সে কি কান্না! কিন্তু কম্পরাম সিং এর চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। তিনি সামরিক কায়দায় লাল ঝাণ্ডাকে সেলাম জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন আর সেই অশ্রুমতী মেয়েটিকে পরম স্নেহে নিবিড়ভাবে কাছে নিলেন। এমন একটা দৃশ্য দেখবার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না! হাজার হাজার লোক, কারুর মুখে কোন কথা নেই, সবাই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চ থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নেমে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন দুহাত বাড়িয়ে কম্পদাকে জড়িয়ে ধরলেন। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে কি একটা কথা যেন বললেন। কিন্তু কম্পদার মুখে কোন ভাববিকার লক্ষ্য করা গেল না। তেমনি অবিচল, স্থির। কোন কথা না বলে বিধবা পুত্রবধূর হাত ধরে তিনি মঞ্চের উপর গিয়ে উঠলেন।

সভাপতির অনুমতি নিয়ে কম্পদা কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কুড়ি হাজার লোক উৎকীর্ণ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! কি বলবেন কম্পদা? এই মাত্র একমাত্র ছেলেকে পুড়িয়ে ছাঁই করে এলেন। আর এখনই উঠে দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতা দিতে! এ মানুষ কি পাথর না লোহা দিয়ে তৈরী?

কম্পদা বলে চললেন:

ভাইসব, আজ মে দিবসের সভা। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কেন দেরী হল আপনারা হয়তো তা জানেন। আমার ছেলে, সে তো শুধু আমার ছেলেই ছিল না, সে ছিল আমার বিপ্লবের সাথী, আমার কমরেড। আমার সেই কমরেড আজ আমার পাশে নেই। তাকে চিতার আগুনে ছাই করে দিয়ে এলাম।

ভাইসব, আপনারা হয়তো ভেবেছিলেন যে, আমি সভায় আসব না। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকে বাধাও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ মে দিবসের সভা। এই পবিত্র দিনে এখানে আমার হাজার হাজার ভাইরা মিলিত হয়েছেন। এমন দিনে আমি কি তাদের মধ্যে না এসে থাকতে পারি! ভাইসব, সারাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ কৃষক সন্তান আজ তিল তিল করে মৃত্যুমুখে এগিয়ে চলেছে, বেঁচে থেকেও তারা দিবারাত্রি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। তাদের বাঁচাবার জন্য আমাদের এই সংগ্রাম। তাদের কথা মনে করলে আমাদের এই ব্যক্তিগত দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যায়। আপনাদের সকলের মুখে দিকে তাকিয়ে আমি আমার পুত্রশোক জেড়ে ফেলে দিয়েছি।

সদ্য স্বামীহারা মেয়েটি কম্পদার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়েছিল। কম্পদা তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, কাঁদিস না বেটী, কাঁদিস না। এই যে তোর সামনে হাজার হাজার কৃষক ভাইকে দেখছিস, এরা তোরই ভাই, তোরই আপনজন। এদের সবার সুখ

দুঃখের সঙ্গে তোর নিজের সুখ দুঃখ মিশিয়ে নে। এদের সঙ্গে এক হয়ে সমিতির কাজে আপনাকে ঢেলে দে। এই পথেই শান্তি পাবি, আনন্দ পাবি।

এই বলে পুত্রবধূকে পাশে নিয়ে বসে পড়লেন কম্পদা। বিহ্বল জনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর গগনভেদী ধ্বনি উঠল, 'কম্পরাম সিং জিন্দাবাদ।' ধ্বনির পর ধ্বনি উঠতে লাগল, ওরা কিছুতেই থামতে চায় না।

মে দিবস এদেশে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু লাহিড়ীহাটের সেদিনকার সেই মে দিবসের অনুষ্ঠান এক নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। এ ছবি তুলে ধরার মত। এই ছবি দেখে আমাদের দেশের চাষী, মজুর আর মেহনতী মানুষেরা প্রেরণা পাবে, উৎসাহ পাবে, সাহস পাবে। কিন্তু যার বলিষ্ঠ তুলির আঁচড়ে এই ছবিটি সার্থকভাবে ফুটে উঠবে, কোথায় সেই শিল্পী?

দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাংগা থানার অন্তর্গত উত্তর পারিয়া গ্রামের মাটি উর্বরা। এখানে বহু আত্মত্যাগী ও নির্ভীক কর্মীর সৃষ্টি হয়েছে। কম্পরাম সিং এই গ্রামে জন্মলাভ করেছিলেন। তারা তিন ভাই– কম্পরাম সিং, সন্তরাম সিং আর সেবকদাস সিং। মধ্যবিত্ত কৃষক ঘরের সন্তান, সুখে দুঃখে জীবন কাটছিল। অবস্থার তুলনায় সমাজে তার মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। নির্ভীক চরিত্র আর নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার জন্য তিনি চিরদিনই সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে আসছিলেন।

সমাজের সর্বসাধারণের কল্যাণ কামনা জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁকে এক নতুন পথে টেনে নিয়ে এল। আমাদের দেশে যে বয়সে লোকে আপনাকে সংসার থেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে পরলোকের ভাবনায় ডুবে যায়, সেই সময় পঞ্চাশোর্ধে এসে তিনি নব জন্ম লাভ করলেন। কৃষক আন্দোলনের ঢেউ তখন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ঢেউ দিনাজপুর জেলার চির-নিপীড়িত কৃষক সমাজকে আন্দোলিত ও প্রাণচঞ্চল করে তুলল! বার্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়িয়েও কম্পরাম সিং কৃষক সমিতির আহ্বানে সাড়া দিতে দেরী করেন নি।

কৃষক সমিতির নির্দেশে হাটে হাটে তোলাবটি বা তোলাগাণ্ডি আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। প্রবল প্রতাপশালী জমিদারেরা দীর্ঘদিন ধরে হাটে হাটে তোলা আদায় নিয়ে অকথ্য জুলুম চালিয়ে আসছিল। জমিদারের দুর্দান্ত কর্মচারীরা ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'পক্ষের কাছ থেকেই ভারী হাতে তোলা আদায় করত। নিতান্ত গরীব গরবা মানুষ, যারা দু চার পয়সার কাজ কারবার করতে যেত তারাও তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না।

এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে বা প্রতিবাদ জানাতে গেলে মারপিট খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরতে হত। কৃষকদের এমন মনোবল বা ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছিল না যে, তাদের বিরুদ্ধে সাহস করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সব কিছুই মুখ বুজে সহ্য করে যেত। দীর্ঘ দিন ধরে, শুধু দিনাজপুরে নয়, সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই ধারাই চলে আসছিল। কিন্তু যুগের ধর্মে হাওয়া বদলে গেল। দিনাজপুরের কৃষকেরা জমিদারের এই বল্‌গাহীন জুলুমের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করল!

ব্যাপার দেখে সারাদেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দিনাজপুরের মাটিতে এমন সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। দেখা গেল, গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির লাঠিধারী ভলান্টিয়াররা কুচকাওয়াজ করছে। হাটের দিনে তারা সুশৃংখলভাবে মার্চ করে হাটে হাটে যায়, সারা হাট টহল দিয়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে সুবিধামত জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রচার বক্তৃতা করে আর কিছু সময় বাদে বাদেই আওয়াজ তোলে– 'তোলা

আদায় বন্ধ কর' 'কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ।' তাদের মিলিত আওয়াজে সারা হাটটা গম গম করতে থাকে। হাটুরে লোকেরা হাতের কাজ বন্ধ রেখে মুগ্ধ হয়ে তাদের বক্তৃতা শোনে। ওদের সাহস দেখে তারা অবাক হয়ে যায়।

লাহিড়ীহাট থেকে পাঁচ মাইল দূরে কম্পরাম সিং-এর গ্রাম উত্তর পারিয়া! কম্পরাম সিং লাহিড়ীহাটের তোলাবটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। আন্দোলন দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। জমিদার পক্ষও চুপ করে বসে ছিল না। তারা প্রথম থেকেই থানার লোকদের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে চলছিল। এই সব নিয়ে উপরওয়ালা অফিসারদের সঙ্গেও তাদের দহরম মহরম চলছিল। উপরওয়ালা প্রভুরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যে চাষীরা সাত চড়েও রা' করত না, নিঃশব্দে পড়ে পড়ে মার খেত, তাদের মধ্যে এত সাহস কেমন করে এল? এ তো হবার কথা নয়। এর ভবিষ্যৎ ভেবে ওরা দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে উঠল। আর এদের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। একটা কিছু করতেই হবে।

অবশেষে ওদের যা করবার তাই ওরা করল। কম্পরাম সিংকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিয়ে পুরল। ওরা আশা করেছিল, এরপরে চাষীরা ভয় পেয়ে আন্দোলন থামিয়ে দেবে। কিন্তু ওদের মনষ্কামনা পূর্ণ হল না। ফল হ'ল উলটো। তাদের প্রিয় নেতাকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবার ফলে ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠল চাষীরা। আন্দোলন ভাঙ্গা দূরে থাক, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জমিদার পক্ষ আর সরকার পক্ষের সমস্ত কৌশল ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করে চাষীরাই জয়লাভ করল। লাহিড়ীহাট ভেঙ্গে গেল। কৃষক সমিতির উদ্যোগে নতুন আর একটা হাট গড়ে উঠল। দিনাজপুর আর রংপুর জেলায় এইভাবে কতকগুলি নতুন হাট গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সমিতির হাট'। আজও তারা সেই নামেই পরিচিত।

তিন মাস হাজত খাটবার পর কম্পরাম সিং মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তার নাম তখন সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন থেকে তার কাজ শুধু তার নিজের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না, জেলার নানা জায়গা থেকে তার ডাক আসতে লাগল। বিশ্রামের সময় নেই। নিজের ঘর সংসারের কথা আর ভবিষ্যতের চিন্তা পড়ে রইল পিছনে। তিনি সারাক্ষণের কর্মী হয়ে আপনাকে কাজের মধ্যে ঢেলে দিলেন।

তোলাবটি আন্দোলন থেমে যাবার পর কৃষক আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ জেগে উঠল। সারা উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বর্গা চাষীদের তেভাগা আন্দোলনের প্লাবন বয়ে গেল। এই আন্দোলন সবচেয়ে প্রবল রূপ ধারণ করেছিল এই দিনাজপুর জেলায়। এখানকার মত এত বড় বড় জোতদার আর কোথাও নেই। এমন নিঃস্ব ভূমিহীন চাষীও আর কোথাও দেখা যায় না। সেই জন্যই এখানকার আধিয়ার চাষীরা তাদের জীবনের মায়া ছেড়ে মরিয়া হয়ে লড়তে নেমেছিল।

কম্পরাম সিং তার জ্ঞাতিভাই ঠুমনিয়ার ডোমারাম সিং ও রামপুর মোরানীর অভরণ সিং পলাতক অবস্থায় বলিয়াডাংগা, অটোয়ারী ও রানীশংকাইল এই তিনটি থানায় তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। তাঁদের সকলের মাথার উপর হুলিয়া ঝুলছিল। কম্পরাম সিং দুই বছর পর্যন্ত পলাতক জীবন যাপন করেন। দুই বছর বাদে এই হুলিয়া প্রত্যাহার করে নেবার পর তিনি দেশবাসীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগের নেতারা গদী দখল করে দৌর্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করতে শুরু করল। এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি প্রভৃতি শ্রেণী সংগঠনগুলি চূর্ণ

করে দেবার জন্য সরকারের তরফ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণের পর আক্রমণ চালানো হতে থাকে। শত শত কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। এই সময় ১৯৪৯ সালে কম্পরাম সিংকে গ্রেপ্তার করে রাজবন্দী হিসাবে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। জন্মভূমির বুক থেকে এই তার শেষ বিদায়। দিনাজপুরের চাষীরা কি একবারও ভাবতে পেরেছিল যে, তাদের প্রিয় নেতা কম্পদাকে আর কোনদিন তারা দেখতে পাবে না?

রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরা ওয়ার্ড সাতজন শহীদের স্মৃতি বহন করছে। কম্পরাং সিং সেই সাতজনের একজন। এই সাতজন শহীদের নাম কম্পরাম সিং, দেলওয়ার, বিজন সেন, আনোয়ার হোসেন, সুধীন ধর, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য ও হানিফ শেখ।

১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল। এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দিনেই রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরা ওয়ার্ডে রাজবন্দীদের উপর গুলী চালানো হয়। গুলীবর্ষণের ফলে সাতজন রাজবন্দী নিহত এবং অন্যান্য রাজবন্দীর মধ্যে অনেকেই গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁদের মধ্যে একজনের একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়ছে। তার নাম নুরুন্নবী চৌধুরী।

তখন মুসলিম লীগের আমল। বাইরে দমননীতির রুদ্র তাণ্ডব চলছিল। জেলের ভিতরেও রাজবন্দীদের উপরে চলছিল অমানুষিক দুব্যবহার আর লাঞ্ছনা। ব্রিটিশ আমল থেকে রাজবন্দী হিসাবে তারা যে সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে আসছিলেন, মুসলিম লীগ সরকার কলমের এক খোঁচায় তার সব কিছুই কেড়ে নিলেন। কিন্তু রাজবন্দীরা তা নিঃশব্দে মাথা পেতে মেনে নেয়নি। বিভিন্ন জেলে আটক রাজবন্দীরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তাঁদের এই অধিকারগুলোকে ফিরে পাবার জন্য। এই ব্যাপারে ঢাকা জেল ও আরও কয়েকটি জেলে দীর্ঘ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট চালানো হয়। এই অনশন ধর্মঘটের ফলে ঢাকা জেলে কুষ্টিয়ার শিবেন রায় আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হয়েছেন। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের গুলী চালনার ঘটনা সেই সংগ্রামেরই একটি রক্তাক্ত অধ্যায়।

সরকার ও জেল কর্তৃপক্ষের অপমানজনক ব্যবহারের ফলে জেল কর্তৃপক্ষ ও রাজবন্দীদের পরস্পরের সম্পর্কটা ক্রমেই তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠছিল। ফলে বাদ-বিসংবাদ, ঝগড়াঝাটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেলখানার পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ রাজবন্দীদের উপর এই নির্বিচার ও নির্মম গুলীবর্ষণ তারই চূড়ান্ত পরিণতি।

শোনা যায় রাজধানী ঢাকা থেকে গুলী চালনার জন্য নির্দেশ নিয়েছিল। রাজবন্দীদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে চূর্ণ করে দেবার জন্য ওরা এই নৃশংস জল্লাদের ভূমিকায় নেমেছিল।

২৪শে এপ্রিল তারিখে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বিল সাহেব তার দলবলসহ রাজবন্দীদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ওয়ার্ডে এলেন। সচরাচর এমন সময় তিনি আসতেন না। সেদিন যে পৈশাচিক পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সে কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

বিল সাহেব রাজবন্দীদের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আলোচনা চলতে চলতে কথা কাটাকাটি মধ্য দিয়ে দুপক্ষই উত্তেজনার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছল। সেই সময় বিল সাহেব আচমকা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্য হুকুম দিলেন। সমস্ত কিছুই পূর্ব পরিকল্পিত, আগে থেকেই সব কিছুই ঠিক করা ছিল, আলাপ-আলোচনা একটা ভাঁওতা মাত্র।

দরজাটা বন্ধ করেই বন্দুকধারী সিপাইরা এপাশ থেকে ওপাশ থেকে জানালার শিকের মধ্য দিয়ে গুলী চালাতে শুরু করল। আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না। গুলীতে গুলীতে ঝাঁঝরা

হয়ে পড়ে গেল সবাই! ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে গেল। কিন্তু এতেও তুষ্ট হল না ওরা। প্রথম পর্ব শেষ করে এবার একদল লাঠিধারী সিপাই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। তারপর মনের আক্রোশ মিটাবার জন্য যারা বেঁচে ছিল তাদের বেছে বেছে লাঠিপেটা করতে লাগল। তারপর হত আহতেরা ঐভাবেই ঘন্টা কয়েক পড়ে রইল। যুদ্ধের মধ্যেও শত্রুপক্ষের আহত বন্দীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে তাও হল না। আহতদের মধ্যে যাদের জ্ঞান ছিল তারা আকণ্ঠ তৃষ্ণায় 'পানি পানি' বলে কাতরে মরছিল। কিন্তু নির্মম ঘাতকের দল তা শুনেও শুনল না। স্বাধীনতা লাভের তিন বছর পরে দুর্ভাগা দেশের দেশ-প্রেমিক সন্তানদের এই ভাবেই পুরষ্কৃত করা হল।

সেই সাতটি মৃতদেহ ওরা কোথায় লুকিয়ে ফেলল, তাদের কি গতি করল, কেউ তা জানে না। তাঁদের জন্য কোন স্মৃতি সৌধও ওঠে নি। শুধু খাপরা ওয়ার্ড সেই বেদনাসহ স্মৃতির গুরুভার বুকে নিয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বীর শহীদদের রক্তস্নাত খাপরা ওয়ার্ডের পূণ্যভূমি একদিন কি দেশবাসীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে না?

এইভাবেই জেলের মধ্যে প্রাণ দিলেন আমাদের কম্পদা– দিনাজপুরের কৃষক সংগ্রামের বীর সেনানী কম্পরাম সিং। তখন তার বয়স তেষট্টি। দিনাজপুরের চাষীরা, যারা তাঁকে দেখেছে বা তার কথা শুনেছে, তারা তার কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দিনাজপুর তথা উত্তর বঙ্গের কৃষককর্মীরা এই মহান দেশ-প্রেমিকের জীবকথা শুনে প্রেরণা পায়, উৎসাহ পায়, চলার পথের সন্ধান পায়। তাদের সকলের মধ্যে বেঁচে আছেন আমাদের কম্পদা– দিনাজপুরের কৃষক সংগ্রামের বীর সেনানী কম্পরাম সিং।

তথ্যসূত্র:

১. গ্রাম বাংলার পথে পথে– সত্যেন সেন, কালিকলম প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮১ (বাং)।

খন্দকার আব্দুল বাকি

সাটিয়াচরা গ্রামটি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে টাঙ্গাইলে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। গ্রামটি আরো বিখ্যাত হয়ে আছে কৃষক নেতা খন্দকার আব্দুল বাকির জন্য। খন্দকার আব্দুল বাকি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার সাটিয়াচরা গ্রামে ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা খন্দকার আব্দুল হাকিম ছিলেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা হাইস্কুলের হেড মৌলভী। খন্দকার আব্দুল হাকিমের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। তারা হলেন যথাক্রমে- জহুরুল হক (লাল মিয়া), মাহমুদা খাতুন, হালিমা খাতুন, খন্দকার আব্দুল বাকি, খন্দকার আক্তারুজ্জামান সুজা ও খন্দকার মানিক।

খন্দকার আব্দুল হাকিমের চতুর্থ সন্তান খন্দকার বাকি ছিলেন অন্য সন্তানদের থেকে ব্যতিক্রম। ছোটবেলা থেকেই জেদি এবং প্রতিবাদী। বাবা খন্দকার আব্দুল হাকিম ছিলেন অনেক জমির মালিক। হাইস্কুলের হেড মৌলভী এবং অনেক জমির মালিক হওয়ার কারণে গ্রামের মধ্যে পরিবারটি খুব প্রভাব ছিল। পাশের গ্রাম গোড়ানে খন্দকার বাকির মামার পরিবারও ছিল স্বচ্ছল এবং শিক্ষিত। সবকিছু মিলিয়ে খন্দকার বাকির ছেলেবেলা কেটেছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। খন্দকার আব্দুল হাকিম একজন রক্ষণশীল মানুষ হলেও ছেলেদের তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। আব্দুল হাকিমের অপছন্দের তালিকায় ছিল রাজনীতি। ছেলেরা রাজনীতি করুক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তারপর আবার কমিউনিস্ট পার্টি, তিনি খন্দকার বাকিকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হয়ে আব্দুল হাকিম এক সময় অবাধ্য ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। বের করে দিলে কী হবে খন্দকার বাকিও দমবার পাত্র নন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়েননি। আব্দুল হাকিমের সন্তানদের মধ্যে খন্দকার বাকি কৃষক নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন।

খন্দকার বাকির শিক্ষা জীবন শুরু হয় জামুর্কীর নবাব স্যার আব্দুল গণি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সাটিয়াচরা থেকে মাইলখানেক দূরে অবস্থিত এ স্কুলের ছাত্র হিসেবে তিনি ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। পাস করার পর করটিয়ার সা'দত কলেজে ভর্তি হন। সা'দত কলেজে খন্দকার বাকি লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারলেন না। বাবা মৌলভী খন্দকার আব্দুল হাকিম শিক্ষকতার কারণে মুক্তাগাছা থাকতেন। মুক্তাগাছা শিক্ষকতা করে ছেলের লেখাপড়ার খোঁজখবর রাখা অসুবিধা মনে করে খন্দকার বাকিকে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি করে দিলেন। মুক্তাগাছা ময়মনসিংহের কাছে হওয়ায় তিনি মনে করলেন তার পক্ষে এবার ছেলের খোঁজখবর রাখা অনেকটাই সহজ হবে। সহজ হলে কী হবে। আনন্দমোহন কলেজে গিয়ে রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হল।

রাজনীতি এবং লেখাপড়া পাশাপাশি চলতে থাকে। এ কলেজ থেকে তিনি আই.এ পাস করেন। আই.এ পাস করার পর বি.এ-তে ভর্তি হন। বি.এ-তে ভর্তি হওয়ার পর রাজনীতিতে আগের তুলনায় বেশি সময় ব্যয় করতে থাকেন। যে জন্য তার ওপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। খন্দকার বাকি গ্রেফতার হন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। এসব কারণে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয় নি। যে কারণে তার বি.এ পাস করা হল না। বাবা খন্দকার আব্দুল হাকিম

অনেক চেষ্টা করেও ছেলেকে লেখাপড়ায় মনোযোগী করতে পারলেন না। খন্দকার বাকি রাজনীতিকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান হিসেবে বেছে নিলেন।

স্কুলের ছাত্র থাকাবস্থাই খন্দকার বাকি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। স্কুল ছাত্র বাকির সঙ্গে সে সময় পরিচয় হয় মুসলিম লীগ নেতা টাঙ্গাইলের সন্তান শামসুল হকের। পরিচয়ের পর খন্দকার বাকি মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্য হন। শামসুল হক আবুল হাশিমের পরিকল্পনা মতো ১৯৪৪-৪৫ সালের দিকে গ্রাম-বাংলার যুবকদের মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত করার জন্য কাজ শুরু করেন। এ সময় খন্দকার বাকি শামসুল হকের সঙ্গে নিজ এলাকার বিভিন্ন স্থানে কাজ করে সাফল্য লাভ করেন। তার সাহসিকতা, দক্ষতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অল্প দিনের মধ্যেই শামসুল হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শামসুল হক, খন্দকার বাকিকে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের দিল্লী কনভেনশনে নিয়ে যান। কনভেনশনে 'লাহোর প্রস্তাব' বাদ দিয়ে এক পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে খন্দকার বাকি, আবুল হাশিম ও শামসুল হকের সঙ্গে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

কনভেনশন থেকে ফিরে এসে তিনি শামসুল হকের নেতৃত্বে যুব সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় থাকা যুব সমাজকে নিয়ে ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী সম্মেলনে শামসুল হককে সভাপতি করে গণতান্ত্রিক লীগ নামে একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সংগঠন পাকিস্তানের পূর্ণ আজাদী, গণতন্ত্র ও সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের জন্য আন্দোলনের অঙ্গীকার করে। গণতান্ত্রিক যুবলীগ সরকারের দমননীতির ফলে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। এক পর্যায়ে সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালের ৪ ও ৫ এপ্রিল নেত্রকোনার নাগড়ার মাঠে 'সারা ভারত কৃষক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক হাজং আদিবাসী মেয়ে পিঠে শিশু সন্তানদের বেঁধে সত্তর আশি মাইল হেঁটে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সাথে ছিল হাজংদের বিরাট ভলান্টিয়ার বাহিনী। পথে এদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। কিশোরগঞ্জ থেকেও হিন্দু এবং মুসলমান কৃষকের বিরাট বাহিনী সম্মেলনে অংশ নেয়। ময়মনসিংহের সব এলাকা সহ অন্যান্য জেলা থেকেও প্রতিনিধিরা অংশ নেয়। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। ভারতের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতারা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। নেত্রকোনা কৃষক সম্মেলনের কথা শুনে খন্দকার বাকি উজ্জীবিত হন। নেত্রকোনার কৃষক সম্মেলনে টঙ্ক উচ্ছেদ ও তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনের ফলে সংগঠনের প্রভাব ও শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করার পর শুরু হয়ে গেল টঙ্ক প্রথা বাতিল ও তেভাগা আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের জন্য সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গ্রাম-গঞ্জে কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি করে দিলেন।

১৯৪৬ সালে এক বিরাট জনসভার মাধ্যমে মণি সিংহ টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদের জন্য পুনরায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন। আহবানের পর শুরু হয়ে গেল জঙ্গি আন্দোলন। ওই একই সময়ে ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তেভাগার মূল দাবি ছিল 'নিজ গোলানে ধান তোল', 'আধির বদলে তেভাগা চাই'। এর অর্থ-মোট উৎপাদিত ফসলের দুই ভাগ পাবে ভাগ চাষী, এক ভাগ পাবে মালিক। আরো স্লোগান ছিল 'জান দিব তবু ধান

দিব না'। তখন যে সব জেলায় তেভাগা আন্দোলন জঙ্গিরূপ ধারণ করেছিল তার মধ্যে ময়মনসিংহ অন্যতম। এ আন্দোলনে বাংলার ৬০ লক্ষ বর্গাচাষী অংশগ্রহণ করে। এ অগ্নিঝরা দিনে খন্দকার বাকি আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র। মুসলিম লীগের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন তার ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে। গণতান্ত্রিক যুবলীগের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন নেমে এলে সংগঠনটির অগ্রযাত্রা থেমে যায়। তিনি আন্দোলন সংগ্রামের জন্য অসাম্প্রদায়িক লড়াকু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন।

এ সময় তার সঙ্গে ময়মনসিংহের কমিউনিস্ট নেতাদের যোগাযোগ হয়। যোগাযোগ হওয়ার পর তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। খন্দকার বাকি মুসলিম লীগের রাজনীতি ছেড়ে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ শুরু করেন। '৪৮ সালেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় জঙ্গি কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। পার্টি আসন্ন ধান কাটার মৌসুমকে আবার টঙ্ক ও তেভাগা আন্দোলন শুরুর সময় হিসেবে বেছে নেয়। যে সব জেলায় পার্টির কৃষক সংগঠন কিছুটা ছিল সে সব জেলায় সিদ্ধান্তের পর থেকেই তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। আন্দোলনের ডাক দেয়া হলে খন্দকার বাকি ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকেই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। খন্দকার বাকি ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। এ সময় মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের হাতে তিনি নির্মমভাবে প্রহৃত হন। গুণ্ডাদের আক্রমণের পর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ময়মনসিংহের পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। এরপর জামালপুর ও টাঙ্গাইলে আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন।

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে যায়। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংস্কৃতির ওপর শুরু হয় আক্রমণ। সর্বস্তরে ছড়ানো হয় সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প। প্রয়োজন দেখা দেয়, নতুন ধরনের সংগঠনের। যেখানে সমবেত হবে কমিউনিস্ট ছাড়াও অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। কমিউনিস্ট পার্টি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দালন প্রসারের জন্য 'যুবলীগ' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টি সদস্য, সমর্থক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে 'যুবলীগ' গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পুলিশ বার লাইব্রেরি দখল করে নেয়। পুলিশ বার লাইব্রেরি দখল করে নিলে উদ্যোক্তারা তখন সদরঘাটে গিয়ে একটি বড় নৌকা ভাড়া করেন। বুড়িগঙ্গার বুকে ওই নৌকার মধ্যেই সংগ্রামী যুবকরা সভা করে 'যুবলীগ' গঠন করেন। এর শাখা বিভিন্ন জেলা শহরেও গঠিত হয় এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

যুবলীগের ময়মনসিংহ জেলা কমিটি গঠিত হলে খন্দকার বাকি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। এ সময়ে প্রগতিশীল গণআন্দোলনে যুবলীগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলনে যুবলীগের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবলীগ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেও সামিল হয় এবং 'সিয়াটো-সেন্টো' চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালায়।

'৫৪ সালের নির্বাচনেও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে সংগঠনটি। যুবলীগের এ সব আন্দোলন-সংগ্রামে একজন জেলা নেতা হিসেবে সামনের সারিতে থেকে ভূমিকা পালন করেন খন্দকার বাকি এবং জেল-জুলুম সহ্য করেন। তিনি যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর পরই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। অনেকের মতে, খন্দকার বাকি এ দেশের প্রথম যুব-রাজবন্দী।

ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালে 'সিকিউরিটি প্রিজনার্স রুলস'-এর মাধ্যমে রাজবন্দীদের বিশেষ মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার আইনটি বাতিল করে দেয়। আইনটি বাতিল হওয়ার ফলে রাজবন্দীদের বিশেষ মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। বন্দীদের সঙ্গে শুরু হয় চোর-ডাকাতদের মতো আচরণ। এর প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালে ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা জেলে কমিউনিস্ট বন্দীরা এক ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘট পালন করে। এ ধর্মঘট ছিল দুঃসাহসিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ। খন্দকার বাকি এ ধর্মঘটে অংশ নিতে না পারলেও, যুবলীগ নেতা হিসেবে বন্দী করে তাঁকে ময়মনসিংহ কারাগারে রাখেলে তিনি একাই অনশন ধর্মঘট করেন। জেলখানার ভিতরে খারাপ ব্যবহারে এবং রাজবন্দী হিসেবে বিশেষ মর্যাদা না দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৫১ সালে তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘট করেন। ১৮ দিন ধর্মঘট করার পর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরে পেলে খন্দকার বাকি জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়ে বহুদিন আত্মগোপন করে সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন।

খন্দকার বাকি আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হওয়ার পরও সাংগঠনিক কাজে নিয়মিত টাঙ্গাইলে যাতায়াত করতেন। এ সময় টাঙ্গাইলের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ময়মনসিংহের মতো টাঙ্গাইলেও চলতে থাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি করটিয়ার বাড়ি থেকে গোপনে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। '৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করলে তিনি ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলে দায়িত্ব পালন করেন। ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ সালে। আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সংশোধনী প্রস্তাব এনে দাবি করেন উর্দু ও ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ১১ মার্চ হরতাল ও ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয়। এ সব ধর্মঘট ও হরতালের সময় পুলিশ বিভিন্ন স্থানে লাঠি চার্জ করে এবং আন্দোলনরত নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে। পরে আন্দোলনের মুখে সরকার গ্রেফতারকৃতদের জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

এর মধ্যে ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ভাষণে দম্ভভরে ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। এ বক্তব্যের পর বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ২৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবার বলেন 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'এ ঘোষণার সাথে সাথে হলের মধ্যে উপস্থিত কিছু ছাত্র 'নো নো' বলে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবি আদায় সম্ভব হয় নি। কয়েক বছর পর ১৯৫২ সালে তা সম্ভব হয় রক্তের বিনিময়ে। 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের ডাক দিলে ২০ ফেব্রুয়ারি নূরুল আমিন

সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ছাত্ররা মিছিল করলে পুলিশ গুলি চালায়। ভাষার জন্য শহীদ হন জব্বার, সালাম, রফিক ও আবুল বরকত। আন্দোলন জঙ্গিরূপ ধারণ করে। হত্যাকাণ্ডের পর ২২ ফেব্রুয়ারি সারাদেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলে সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসে।

ঢাকায় গুলি চালানোর খবর পেয়ে টাঙ্গাইল শহর ও সা'দত কলেজ হয়ে ওঠে প্রতিবাদ মুখর। খন্দকার বাকি ছাত্র হত্যার খবর শোনার পর প্রতিবাদের জন্য করটিয়া ও জামুর্কীর ছাত্র যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-যুবকরা ২২ ফেব্রুয়ারি এক বিরাট মিছিল নিয়ে করটিয়া থেকে টাঙ্গাইল শহরে প্রতিবাদ-সমাবেশে যোগ দেয়। জঙ্গি মিছিলটি করটিয়া থেকে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে পায়ে হেঁটে শহরে আসে। মিছিলের অন্যতম সংগঠক ও নেতা ছিলেন খন্দকার আব্দুল বাকি।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়। ভাষা আন্দোলন জাতীয় জাগরণের সূচনা করে যা ক্রমান্বয়ে স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৫২ সালে ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হওয়ার পর টাঙ্গাইলে ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে খন্দকার বাকি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। টাঙ্গাইলে ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয় রাখার জন্য তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতেন। আত্মগোপনে থেকে করটিয়া ব্রিজের কাছে ছাত্র নেতাদের সঙ্গে দেখা করে পার্টি পত্রিকা 'শিখা', জরুরি কাগজপত্র ও সংবাদ পৌছে দিতেন। প্রয়োজনে ছাত্র নেতাদের দিক নির্দেশনাও দিতেন। এভাবে কখনো আত্মগোপনে, কখনো প্রকাশ্যে চলতে থাকে খন্দকার বাকির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৩ সালে গ্রেফতার হওয়ার পর ১৯৫৫ সালে মুক্তি পান। মুক্তি পেলে করটিয়া ও জামুর্কীতে আত্মগোপন করে থাকেন।

পঞ্চান্ন সালে করটিয়ার জমিদার কে. কে. পন্নী করটিয়া বাজার স্থানান্তর করার উদ্যোগ নিলে তিনি দোকান মালিকদের আন্দোলনে সহযোগিতা করেন। জমিদার করটিয়া বাজার ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডের পাশ থেকে সরিয়ে হাটখোলায় স্থানান্তরের উদ্যোগ নেন। বাজারের ব্যবসায়ীরা এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। জমিদারের উদ্দেশ্য ছিল বাজার উঠিয়ে দিয়ে বিল্ডিং নির্মাণ করে জায়গা নিজের দখলে নিয়ে নেওয়া। ব্যবসায়ীরা জমিদারের প্রভাব ও নির্যাতনের ভয়ে কেউ এর প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না। এক পর্যায়ে জমিদারের লোকজন দোকানে দোকানে তালা দিতে শুরু করে। এ অবস্থায় ব্যবসায়ীরা খন্দকার বাকির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খন্দকার বাকি দোকান মালিকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। জমিদার ব্যবসায়ীদের ওপর লাঠিয়াল বাহিনী লেলিয়ে দেয়। জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী বাজার কমিটির সভাপতি কাজিমুদ্দিনকে আক্রমণ করলে তিনি আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করার কারণে জমিদার কে. কে. পন্নী কৃষক নেতা সোলেমান আনছারীকে ধরে আনার জন্য লাঠিয়াল বাহিনীকে নির্দেশ দেয়। আন্দোলনের অন্যতম নেতা সোলেমান আনছারী তখন খন্দকার বাকির পরামর্শে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করে তাকে সবকিছু অবহিত করেন। সব কথা শোনার পর মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী চিঠি দিয়ে জমিদারকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কে. কে. পন্নী দেখা করলে তিনি বলেন, খন্দকার বাকি এবং সোলেমান আনছারী আমার কৃষক সংগঠনের নেতা এদের ওপর নির্যাতন হলে আমি বসে থাকব না। এ কথা শুনে জমিদার আর অগ্রসর হতে সাহস পায়নি।

শেষে ব্যবসায়ীদের দাবি মেনে কে. কে. পন্নী ওখানেই বাজার রাখতে বাধ্য হন। আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। এ আন্দোলনে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন খন্দকার বাকি।

এ দিকে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করলে সেই পথ ধরে সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান ২০ দিন পর ২৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের গদি দখল করে। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের ওপর চালায় তীব্র দমননীতি। খন্দকার বাকিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি দেখা দেওয়ায় সামরিক আইন ঘোষণার আগেই তিনি আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপনে যাবার সময় খন্দকার বাকি একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। নামটি হচ্ছে 'শান্তি'। সামরিক শাসন জারি হওয়ার কিছুদিন পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে করটিয়া থেকে গ্রেফতার করে। করটিয়ার এক বিশ্বাসঘাতক পুলিশকে তার অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়। গ্রেফতার করার পর পুলিশ তার ওপর নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ নির্যাতনের প্রভাব তার শরীরে সারা জীবন ছিল।

পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকার সময় অনেক নেতার মতো তিনিও আওয়ামী লীগ এবং ভাসানী ন্যাপে কাজ করেছেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিদেশনীতি নিয়ে আওয়ামী লীগে মতপার্থক্য দেখা দিলে মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলন আহবান করেন। ঐতিহাসিক এ সম্মেলনে সারাদেশ থেকে ৮৯৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। খন্দকার বাকিও এ সম্মেলনে একজন প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দীর বিদেশনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। খন্দকার বাকি সম্মেলন আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সোহরাওয়ার্দীর বিদেশনীতিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'ন্যাপ' গঠিত হলে খন্দকার বাকি শুরু থেকেই ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে ন্যাপে মতপার্থক্য দেখা দেয়। চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার আদর্শগত বিভক্তির কারণে বামপন্থী দলগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ন্যাপ ভেঙ্গে যায়। কমিউনিস্ট পার্টি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপকে সমর্থন করে। যে কারণে পার্টি সদস্যরা 'ভাসানী ন্যাপের' প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে 'মোজাফ্ফর ন্যাপে' যোগদান করেন। খন্দকার বাকিও তখন হাতেম আলী খানের সঙ্গে টাঙ্গাইলে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপের শাখা গঠনের লক্ষ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। হাতেম আলী খান টাঙ্গাইল জেলা ন্যাপের সভাপতি ও খন্দকার বাকি সাধারণ সম্পাদক হন। পরে কৃষক সমিতির কাজে দায়িত্ব বেড়ে গেলে খন্দকার বাকি জেলা ন্যাপের সহ-সভাপতি পদ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রে ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে টাঙ্গাইলেও ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে যায়। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খন্দকার বাকি যখন আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র, তখন কৃষক আন্দোলনে ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকা উত্তাল। কৃষকদের এ বীরত্বপূর্ণ লড়াই-সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করে ভবিষ্যতে তিনি কৃষক সংগঠনে কাজ করার কথা ভাবতে থাকেন। টাঙ্গাইলে এসে কৃষক নেতা হাতেম আলী খানকে পেয়ে তার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলেন, পার্টি থেকে কৃষক সমিতি করার দায়িত্ব নেবেন। খন্দকার বাকি পঞ্চাশের দশক থেকেই কৃষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন। মৃত্যুর সময় তিনি টাঙ্গাইল জেলা কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

তার প্রচেষ্টায় মির্জাপুর, বাশাইলসহ টাঙ্গাইলের বিভিন্ন জায়গায় কৃষক সমিতির সংগঠন গড়ে ওঠে। খন্দকার বাকির সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে মির্জাপুর ও করটিয়ায় শক্তিশালী কৃষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। তিনি জামুর্কীর সাটিয়াচরা থেকে মির্জাপুর এবং টাঙ্গাইলের মতো দূরত্বে সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতেন। কাজের মধ্যে ছিল কৃষকদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে সভা, নিয়মিত যোগাযোগ, আন্দোলন, পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নকে আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় রাখা। তার সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাধারণ জীবন-যাপন তাকে টাঙ্গাইলে একজন জনপ্রিয় কৃষক নেতায় পরিণত করে। এক পর্যায়ে কমিউনিস্ট নেতা খন্দকার বাকি সকলের কাছে হয়ে যান কৃষক নেতা খন্দকার বাকি।

খন্দকার বাকি ১৯৬৮ সালে আবার গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে পাকিস্তানি শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বদলে যায় রাজনীতির চিত্র। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান হয়। অভ্যুত্থানের ফলে সরকার সারাদেশে শত শত রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এসময় আন্দোলনের মুখে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে খন্দকার বাকিও মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েই কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। কৃষক নেতা হাতেম আলী খান, কমরেড নারায়ণ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়মিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকেন। বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনগণকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি জনগণকে আন্দোলন-সংগ্রামে ঐক্য অটুট রাখার আহবান জানান।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর কৃষক-জনতা দলবদ্ধ হয়ে গ্রাম্য টাউট ও চোর-বাটপারদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। এদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। কৃষক-জনতার এ আক্রমণের ফলে অনেকে নিহত হয়। অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। গ্রামের এ সব টাউট-বাটপারদের বিচারের জন্য গড়ে তোলা হয় গণআদালত। কৃষক-জনতার এ ঐক্য আইয়ুব সমর্থক জোতদার, মহাজন, গ্রাম্য টাউট-বাটপাররা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এ সময় কৃষক-জনতা আইয়ুব সমর্থক দুর্নীতিবাজ চেয়ারম্যান, মেম্বারদের ওপরও আক্রমণ চালায়। হাজার হাজার কৃষক-জনতার এ প্রতিবাদ বিক্ষোভে একজন ভাল মানুষ সৎ এবং দেশপ্রেমিক চেয়ারম্যান মেম্বারের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে জন্য টাঙ্গাইলের কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতারা সতর্ক ছিলেন। খন্দকার বাকি কৃষক সমিতির উদ্যোগে সভা-সমাবেশ করে বক্তব্য রাখতেন, সব চেয়ারম্যান মেম্বারদের এক পাল্লায় মাপা যাবে না। গণআদালতে বিচার এবং কোনো ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করার আগে দেখতে হবে সে সত্যিই আইয়ুব খানের দালাল ও টাউট বাটপার কিনা। মহেড়া, জামুর্কী, গোপালপুর, করটিয়াসহ টাঙ্গাইলের বিভিন্ন জায়গায় তখন সভা-সমাবেশ করে গণআন্দোলনকে সঠিক ধারায় পরিচালিত করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। গণঅভ্যুত্থানের পর ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে ৭০ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। '৭০-এর নির্বাচনে গোপালপুর-ভুয়াপুর আসন থেকে কৃষক নেতা হাতেম আলী খান ন্যাপ-মোজাফ্ফর প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে খন্দকার বাকি গ্রামে গ্রামে গিয়ে তার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। নির্বাচনে হাতেম আলী খান পরাজিত হলেও এ অঞ্চলে কৃষক সমিতির সংগঠন শক্তিশালী হয়। সত্তরের নির্বাচনের পর দেশের রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। আলোচনার নামে চলতে থাকে কালক্ষেপণের পালা। সামরিক বাহিনী ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিতে থাকে নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণের। এ দিকে বিক্ষোভ-আন্দোলনে উত্তাল সারাদেশ। '৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ভিত কেঁপে ওঠে। ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য '৭১ সালের ২৫ মার্চ সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে গণহত্যা চালায়। গণহত্যার পর সারাদেশে সশস্ত্র যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। খন্দকার বাকি এ সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্র, যুবক, কৃষকসহ সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন।

২৫ মার্চের গণহত্যার পর সারাদেশে নিয়ন্ত্রণ আরো জোরদার করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক গোষ্ঠী জেলা শহরগুলোতে ভারী অস্ত্রসহ অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল টাঙ্গাইল শহরের দিকে অগ্রসর হয় পাক হানাদার বাহিনীর শ'দেড়েক গাড়ির কনভয়। আধুনিক ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ছিল এ কনভয়ের সৈন্যরা। ৩ এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইলে প্রবেশ করবে, এ খবর বিভিন্ন সূত্র থেকে আগেই জানতে পারেন সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। ঢাকাসহ সারাদেশে গণহত্যা নির্যাতন-নিপীড়নের খবর পেয়ে ২৬ মার্চ সকালে টাঙ্গাইলে সর্বদলীয় সভা ডাকা হয়। শহরের আদালত পাড়ায় এডভোকেট নূরুল ইসলামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এ সভায় নেতৃবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেন। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদে আওয়ামী লীগ নেতা বদিউজ্জামান খান চেয়ারম্যান ও আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়। লতিফ সিদ্দিকী সশস্ত্র গণবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বও পান। পরিষদের অন্য সদস্যরা হলেন ১. ভাসানী ন্যাপের সৈয়দ আব্দুল মতিন, ২. জাতীয় লীগের আল মুজাহিদী, ৩. মোটর এসোসিয়েশনের হবিবর রহমান খান, ৪. আওয়ামী লীগের শামসুর রহমান খান শাজাহান, ৫. ফজলুর রহমান খান ফারুক, ৬. এডভোকেট নূরুল ইসলাম, ৭. আলী আকবর খান খোকা, ৮. বীরেন্দ্র কুমার সাহা। পরিষদের একমাত্র উপদেষ্টা নির্বাচিত হন অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান।

পাকহানাদার বাহিনী টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করবে এ খবর শোনার পর হাইকমান্ড প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। খবর পাওয়ার পর কয়েক দিন ধরে চলতে থাকে প্রস্তুতি পরিকল্পনা। ১ এপ্রিল সন্ধ্যায় ইপিআর ও মুক্তিবাহিনী নাটিয়াপাড়া গিয়ে ঘাঁটি গাড়ে। নাটিয়াপাড়া দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন করে অর্ধেক ইপিআর ও মুক্তিবাহিনী ২ এপ্রিল সকালে জামুর্কী পাকুল্লা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইপিআর সদস্যরা বিকেলে গোড়ান সাটিয়াচরায় বাঙ্কার খুঁড়ে অবস্থান সুদৃঢ় করে। আনছার-ছাত্র-জনতা এবং মুক্তিবাহিনী ধল্লা থেকে সাটিয়াচরা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশ দিয়ে পজিশন নেয়। ২ এপ্রিল জেল বন্দীদের ছেড়ে দেয়া হয়। বন্দীদের ৮০ জনের একটি দল প্রতিরোধ যুদ্ধে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। প্রতিরোধ যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে চলছে পাক হানাদার বাহিনীর জন্য অপেক্ষার পালা। জীবন দিয়ে হলেও ওদের রুখতে হবে।

১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল ভোরবেলা। পূর্ব দিগন্তে সূর্য তখনো ভালোভাবে ওঠেনি। চারিদিকে অখণ্ড নিরবতা। ঘুমিয়ে আছে গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ। ঘুমিয়ে শিশু, ঘুমিয়ে বৃদ্ধ, নারী-

পুরুষ। এদের কেউ জানে না ৩ এপ্রিল ভোরবেলা কী ঘটতে যাচ্ছে। জানে শুধু যারা দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত সেই প্রতিরোধ যোদ্ধারা। পাকহানাদার বাহিনীর কনভয় টাঙ্গাইল শহরে আসার সময় ধল্লায় যারা প্রতিরোধের দায়িত্বে ছিল তারা শ'দেড়েক গাড়ির কনভয় দেখে গুলি ছুঁড়তে সাহস পায় নি। প্রতিরোধকারীরা ওখান থেকে পিছিয়ে আসে। পাকবাহিনীর কনভয় বিনা বাধায় সকাল সাড়ে পাঁচটায় গোড়ান সাটিয়াচরা এসে পড়ে। ধল্লা থেকে বিনা বাধায় চলে এলেও এখানে রাস্তার পাশ থেকে গর্জে উঠল লাইট মেশিনগান। নায়েব সুবেদার আব্দুল আজিজ প্রথম গুলি শুরু করলেন। মুহূর্তেই গর্জে উঠল আরো পঞ্চাশটি রাইফেল, ছটি এলএমজি, তিনটি রকেট লাঞ্চার ও তিনটি দুই ইঞ্চি মর্টার থেকেও ইপিআর গুলি বর্ষণ করতে থাকে। গুলির শব্দে ঘুম ভাঙে গ্রামের মানুষের। ঘটনার আকস্মিকতায় দিশেহারা হয়ে পড়ে পাকহানাদার বাহিনী। থমকে দাঁড়ায় কনভয়। দশ-বারোটি গাড়ি রাস্তার নিচে উল্টে যায়। সৈন্যরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে রাস্তার দু'দিকে পজিশন নিতে গেলে তাদের উপর ইপিআর ও মুক্তিবাহিনী গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এতে অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

হানাদার বাহিনী কয়েক মিনিট পর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। একের পর এক কামানের গুলি ও হেলিকপ্টার থেকে মেশিনগানের গুলি প্রতিরোধকারীদের বাঙ্কারগুলো গুড়িয়ে দেয়। গোড়ান সাটিয়াচরার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। এ যুদ্ধে ২৪ জন ইপিআর ও ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। গোড়ান সাটিয়াচরার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার পর সকাল নয়টার দিকে নাটিয়াপাড়ার প্রতিরোধকারীরা চলে যায়। কামান, মেশিনগানের সাথে অন্যান্য অস্ত্র থেকেও চলতে থাকে অবিরাম গুলি। গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে চারদিক। গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লেও এ যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। মুক্তিবাহিনী তিনশ' হানাদারকে হত্যা ও দেড়শ' জনকে আহত করে। এছাড়া প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ ধ্বংস হয়। শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হলে পাক হানাদার বাহিনী গ্রামের ভেতর ঢুকে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালায়। পাকবাহিনীর বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রেহাই পায় নি সাটিয়াচরা গ্রামের অন্তসত্ত্বা নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউই। সাটিয়াচরা গ্রামে চলে নির্বিচারে গণহত্যা। নির্বিচারে এ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় খন্দকার বাকির পরিবারও। সেদিন পরিবারের সকলেই ছিল বাড়িতে। ২৫ মার্চের পর নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ঢাকা থেকে মামাতো ভাই ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ নূরুর রহমানের সঙ্গে এ বাড়িতে আসেন তার বন্ধু এম এইচ চৌধুরী, স্ত্রী মিলি চৌধুরী ও গাড়ি চালক। এরা সকলেই হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন।

পাক হানাদার বাহিনী খন্দকার বাকির বৃদ্ধ পিতা খন্দকার আব্দুল হাকিমকে রাইফেলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি ঘরের মধ্যে পড়ে যান। এরপর খন্দকার বাকির ছোট ভাই-বৌ নূরজাহান বেগমকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে পরে গুলি করে হত্যা করা হয়। নূরুজাহান বেগম সে সময় গর্ভবতী ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের সময় খন্দকার বাকি জঙ্গলে পালিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করেন। হত্যাকাণ্ড শেষ হলে পাকসেনারা বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে চলে যায়। খন্দকার বাকি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আহত সংজ্ঞাহীন পিতাকে কোনো রকমে জ্বলন্ত ঘর থেকে টেনে বের করতে সক্ষম হন। পিতাকে বের করার পর তিনি নিহত সকলকে কবর দেন। দু'দিন পর পিতার মৃত্যু হলে তাকেও কবর দেন। গোড়ান সাটিয়াচরার প্রতিরোধ যুদ্ধে খন্দকার বাকির পরিবারকে চরম

মূল্য দিতে হয়েছে। যুদ্ধের ফলে এ বাড়িতে ৬ জন লোক শহীদ হন। ১৯৭১ সালে আরো দু'বার পাকবাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ বীরত্বপূর্ণ লড়াই এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। সাটিয়াচরা গ্রামে গণহত্যার পর গ্রামটি পরিণত হয় বিরানভূমিতে। কয়েকদিন গ্রামে তেমন কোনো মানুষের উপস্থিতি ছিল না। যারা আহত হয়েছিলেন তাদের ভালোভাবে চিকিৎসা করাও সম্ভব হয় নি। ৩ এপ্রিল সাটিয়াচরা গোড়ান, পাকুল্যা, গুনটিয়া ও আছিমতলা গ্রামের শতাধিক মানুষ শহীদ হন। প্রতিরোধ যোদ্ধারা পাকহানাদার বাহিনীকে টাঙ্গাইল প্রবেশে বিরত রাখতে না পারলেও এ যুদ্ধ মানুষকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। টাঙ্গাইলে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের আরো ব্যাপক প্রস্তুতি। পাকিস্তানী স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর প্রতি মানুষের ঘৃণা আরো বৃদ্ধি পায়।

পরিবারের এ মর্মান্তিক ঘটনার পর খন্দকার বাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। খন্দকার বাকি ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে আসামের ডালুতে যান প্রশিক্ষণ নিতে। সেখানে প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি দেশে ফিরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ভারতের মেঘালয়ে থাকার সময় তার হৃদরোগ দেখা দেয়। হৃদরোগ সম্পর্কে তিনি কারো কাছে তেমন কিছু বলতেন না। তবে তিনি গোপনে গোপনে ওষুধ খেতেন। হৃদরোগকে উপেক্ষা করেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এগিয়ে আসে গ্রামের কৃষক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নারী সহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। মুক্তিযুদ্ধ, জনযুদ্ধে পরিণত হয়।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়, দু'লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দেয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের শোষণ সামরিক শাসন, সাম্প্রদায়িক ও ভাষার ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধন করে। রচিত হয় পাকিস্তানি স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে '৭২ সালের সংবিধান। সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। স্বাধীন দেশে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করার নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। খন্দকার বাকি বাড়ি ফিরে এসে ভাইয়ের সংসারে স্থান নিলেন। সাটিয়াচরার প্রতিরোধ যুদ্ধের দিন আপনজন হারিয়ে এ বাড়ির বেঁচে যাওয়া অন্য সদস্যরা ছিলেন গভীর শোকে আচ্ছন্ন। খন্দকার বাকি ও আপনজন হারিয়ে মর্মাহত। এত বড় ত্যাগের পরও স্বপ্ন দেখছে মানুষ। এগিয়ে নিতে চাইছে দেশ। নতুন করে গড়তে চাইছে সব কিছু। খন্দকার বাকিও সব ব্যথা বুকে নিয়ে কাজ শুরু করলেন পার্টি গড়ে তোলার।

কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বন্ধু সংগঠন মোজাফ্‌ফর-ন্যাপেও তিনি কাজ শুরু করেন। খন্দকার বাকি ১৯৭২ সালে মোজাফ্‌ফর-ন্যাপ টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হন। মহকুমা শহর টাঙ্গাইল ১৯৬৯ সালে জেলা হলেও গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কারণে টাঙ্গাইলে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া তখন প্রকাশ্যে পার্টির নামে কাজ করাও ছিল খুব অসুবিধা। যে কারণে এতদিন ময়মনসিংহ জেলা কমিটির মহকুমা শাখা হিসেবেই কাজ চলে। খন্দকার বাকি সক্রিয় হলেন পার্টি এবং পার্টি গণসংগঠন গড়ে তুলতে। খন্দকার বাকি কৃষক নেতা হাতেম আলী খান ও কমরেড নারায়ণ

বিশ্বাসের সঙ্গে পরিকল্পনা করে পার্টি এবং গণসংগঠনের ভিত্তি অনেকখানি শক্তিশালী করতে সমর্থ হন। বিশেষ করে তার অক্লান্ত পরিশ্রমে করটিয়ায় ছাত্র ইউনিয়নের ভাল সংগঠন গড়ে ওঠে। যারা সা'দত কলেজ ও টাঙ্গাইল জেলায় ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। পরে অনেকে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মোজাফ্ফর-ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত হন। এ সময় খন্দকার বাকি সাটিয়াচরা থেকে সাইকেল নিয়ে নিয়মিত করটিয়া ও টাঙ্গাইল যাতায়াত করতেন। নারায়ণ বিশ্বাসের আদালত পাড়ার বাসায় প্রয়োজনে হাতেম আলী খানের সঙ্গে রাতে থেকছেন। সংগঠন এগিয়ে নেওয়ার জন্য চলেছে নানা পরিকল্পনা। যোগাযোগ করেছেন পার্টি সদস্য, সমর্থকদের সঙ্গে। ভুলে গেছেন নিজের হৃদরোগের কথা। কঠোর পরিশ্রমে রোগ আরো বেড়ে যাচ্ছে। রোগ বাড়লে কী হবে পার্টি, কৃষক সমিতি তার কাছে প্রাণের থেকেও প্রিয়। কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বাকি কৃষক নেতা হাতেম আলী খানের সঙ্গে গোপালপুর, ভুয়াপুর, মির্জাপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় কৃষক সভা, সমাবেশ, গ্রাম বৈঠক, হাটসভা করে সমিতির সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করে তোলেন।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে গোপালপুর থানার ভেঙ্গুলা বাজারে কৃষকদের সমাবেশে হাতেম আলী খান ও জামালপুরের পার্টি নেতা অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে তিনিও বক্তব্য রাখেন। সভা শেষ করে আসার সময় পথে বার বার বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ছিলেন তিনি। সেদিন তিন জনই বাজারে এক দোকানে রাত্রি যাপন করেন। এর কয়েকদিন পর ১৯৭৩ সালের ২৩ জুন টাঙ্গাইল থেকে বাড়ি ফিরে দুপুর বেলা খাওয়ার পর গাছের নিচে চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। মৃত্যুর পর কৃষক নেতা খন্দকার বাকিকে সাটিয়াচরা গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। তার মৃত্যুর খবর শুনে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের কেন্দ্রীয় এবং জেলা নেতারা উপস্থিত হয়ে শোক প্রকাশ করে শেষ বিদায় জানান। তার অকাল মৃত্যু টাঙ্গাইলের কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য বিরাট ক্ষতি। খন্দকার বাকির মৃত্যু কমিউনিস্ট ও কৃষক আন্দোলনে শূন্যতার সৃষ্টি করে। যে শূন্যতা পূরণ করা ছিল খুবই কঠিন। খন্দকার বাকি তার সংগ্রাম মুখর রাজনৈতিক জীবনে অনেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, খোকা রায়, রবি নিয়োগী, আলতাব আলী, শামসুল হক, পুলিন বকসী, সত্যেন সেন অন্যতম। টাঙ্গাইলে কৃষক নেতা হাতেম আলী খান, কমরেড নারায়ণ বিশ্বাস, ভাবা সৈনিক উপেন মালাকার, কমরেড বিনয় ভূষণ সরকার ছিলেন তার লড়াই-সংগ্রামের সাথী এবং ঘনিষ্ঠ জন।

কমরেড মণি সিংহ ছিলেন তার পার্টি ও কৃষক সংগঠনের নেতা। খন্দকার বাকি বিপদে-আপদে অর্থকষ্টে নানা সময় তার বড় বোন সৈয়দা মাহমুদা খাতুনের কাছে আশ্রয় এবং সাহায্য পেয়েছেন। করটিয়ায় বসবাসকারী এ বোন তাকে খুব ভালবাসতেন। করটিয়ায় বোনের বাড়িতে বহুদিন তার আত্মগোপনে কেটেছে। এ বাড়িতে থেকে তিনি করটিয়ায় ছাত্র ইউনিয়নের শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। খন্দকার বাকি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। খন্দকার বাকি কম বয়সেই রাজনীতিক হিসেবে জনগণের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। সব সময় ভাবতেন সংগঠন নিয়ে, যে কারণে প্রতিদিনই ব্যস্ত থাকতেন সাংগঠনিক কাজে। সভা, সমাবেশ, কৃষকদের গ্রাম বৈঠক, নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই কেটেছে তার জীবনের বেশির ভাগ সময়।

তিনি সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন। খন্দকার বাকি কমিউনিস্ট পার্টি করার কারণে দু'দশকেরও বেশি সময় কারাগার ও আত্মগোপনে থেকেছেন। সহ্য করেছেন মুসলিম লীগের গুণ্ডা এবং পুলিশ বাহিনীর নির্যাতন।

খন্দকার বাকি ছিলেন এমন একজন রাজনীতিক যিনি দেশের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সাধারণভাবে মানুষের কর্মজীবন বলতে যা বোঝায় চাকুরি অথবা ব্যবসা তিনি এর কোনোটার মধ্যেই জড়িত হন নি। সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন রাজনীতি, যে জন্য তিনি বিয়েও করেন নি। কমিউনিস্ট পার্টি করার কারণে বাবা খন্দকার আব্দুল হাকিম তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। সে সময় পার্টির সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন কিন্তু মেহনতি মানুষের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করতে পারেন নি। খন্দকার বাকি ছিলেন প্রচার বিমুখ, যে কারণে তার সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় নি। তাছাড়া এতদিন পর তার ঘনিষ্ঠজনেরা অনেক ঘটনাই ভুলে গেছেন। খন্দকার বাকি ছিলেন এমন একজন রাজনীতিক যার অবদানের তুলনায় তাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক কম। তিনি চেয়েছিলেন সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

লেখক: উৎপল সাহা

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের পাঁচ বিপ্লবী - উৎপল সাহা, প্রকাশক: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনি; প্রকাশকাল একুশে বইমেলা ২০১০।

অনিল মুখার্জী



পরাধীন ভারতে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা, পাকিস্তান আমলে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণের স্বাধিকারের আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক ও সংগঠক, উপমহাদেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ অনিল মুখার্জী।

১৯১২ সালের ১০ অক্টোবর (১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৫ আশ্বিন) শুক্রবার রাত্রি দু'টার সময় অনিল মুখার্জীর জন্ম হয় তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশ (অধুনা বাংলাদেশ)-এর ঢাকা জেলার (অধুনা মুন্সীগঞ্জ জেলার) মুন্সীগঞ্জ শহরে। তার পিতা অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন মুন্সীগঞ্জে দেওয়ানি আদালতের কেরাণী ছিলেন। তাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল সিরাজদিঘা থানাধীন মালপদিয়া গ্রামে। পরবর্তীকালে মুন্সীগঞ্জ শহরে তাদের বাড়ি নির্মিত হয়। তার মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী।

দেশের মুক্তির প্রেরণা ও অবহেলিত মানুষের প্রতি মমত্ব তিনি শৈশব থেকেই পেয়েছিলেন কিছুটা পারিবারিক সূত্রে, পাঁচ-ছ'বছর বয়সে সন্ধ্যার পর মা আধঘন্টা-একঘন্টা সময় ঘুমপাড়ানি কাহিনী বলে ও গান শুনিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতেন। 'হাতে খড়ি' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা ছিল তার জীবনের অমূল্য সম্পদ। রোজ চোখের জল ফেলে কেঁদে কেঁদে শুনতেন ক্ষুদিরাম-কানাইলালের গল্প আর গান্ধীজির 'হিমালয়ের তলদেশে পাতালপুরীর অস্ত্রাগার'-এর কাহিনী, মা ঘুমপাড়ানি গান গাইতেন ক্ষুদিরামের ফাঁসির উপর বাংলার বাউলদের অমর সৃষ্টি: 'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি'।

বিভিন্নভাবে দেশপ্রেমের ফল্গুধারা পরিবারের মধ্যে প্রবহমান ছিল। বড় মামা জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তার ব্যুৎপত্তি ছিল। Modern Review পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। রাজ কর্মচারী হয়েও স্বদেশি মনোভাব পোষণের জন্য তাকে ভুগতে হয়। তিনি যখন চট্টগ্রামের সাবজজ ছিলেন, তখন দীনবন্ধু এন্ড্রুজ তার বাসায় অতিথি হিসাবে ছিলেন। এই অপরাধে তার আর কোন পদোন্নতি ঘটেনি। গোপাল হালদারের 'রূপনারায়ণের কূলে' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

ছেলেবেলায় তিনি মার মুখে তার ঠাকুরমার গল্প শুনতেন। বর্ধিষ্ণু বড় কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ঠাকুরমা হরকুমারী ঠাকরাণ ছিলেন অসাধারণ স্বাধীনচেতা মহিলা, প্রচলিত রক্ষণশীল

নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে গ্রামের 'অস্পৃশ্য' কৃষক ও কুটিরশিল্পীদের বাড়ি বাড়ি যেতেন এবং তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনে সাধ্যমতো বিহিত করতেন। তাদের অসুখে-বিসুখে টোট্‌কা ওযুধ ও পথ্য নির্ধারণ করে দিতেন। রোগীর জন্য যাদের সরু পুরনো চালের ভাত এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার সঙ্গতি ছিল না, তাদের তার বাড়ি হতে ভাত ও জল নিয়ে আসতে বলতেন। সে যুগে গ্রামে নলকূপ ছিল না। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী প্রতিরোধ করার জন্য তিনি বাড়িতে একটা বড় ফিল্‌টার তৈরি করেছিলেন। পুত্রবধূরা দিনে পঁচিশ-ত্রিশ কলসী জল পুকুর থেকে টেনে এনে সিদ্ধ করতেন এবং তারপর অঙ্গার, বালু প্রভৃতির সেই ফিল্‌টারে পরিশোধন করতেন। 'হাতে খড়ি' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, যে ঠাকুরমাকে তিনি কখনো চোখে দেখেননি, কিভাবে মায়ের গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি তার কল্পনার নায়িকা হয়ে উঠেছিলেন।

তাছাড়া তার বাবার এবং বিশেষভাবে মায়ের সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি তার শৈশবের চিন্তা গঠনে সহায়তা করেছে। মেধাবী বড়দাকে তার ভাইরা আদর্শ স্থানীয় বলে মনে করতেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের জন্য বিএ পড়ার সময় কলেজ বয়কটে অংশ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার হলে বিএ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির জন্য মনোনীত হলেও স্বদেশি মনোভাবের জন্য তিনি স্কুল শিক্ষকতার মত দরিদ্র পেশা বেছে নেন।

যখন তার বয়স আট বছর, তার বাবা নারায়ণগঞ্জে বদলি হয়ে আসেন এবং তিনি নারায়ণগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ছোটবেলা থেকে পত্রপত্রিকা পড়া এবং দেশ বিদেশের খবরাখবর জানার জন্য প্রবল আগ্রহ ছিল। দেশজুড়ে তখন অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনের প্রবল উত্তেজনা, হীরালাল কর্মকারের দোকানে একটা বাংলা কাগজ নেয়া হতো। সেখানে তিনি নিয়মিতভাবে গিয়ে বানান করে করে পত্রিকা পড়ে শোনাতেন নিরক্ষর হীরালালকে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা তার মনকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করে। এদিকে তাদের পরিবারে বড়দাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটছে।

অল্প বয়সেই তিনি নিজেকে দেশের মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গিত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। তখন তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। অষ্টম, নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় কিছু কমিউনিস্ট প্রচার পুস্তিকা পাঠের সুযোগ ঘটে। সাংবাদিক জন রীডের লেখা 'টেন ডেস্‌ দ্যাট শুক দি ওয়ার্লড' বইটি তিনি পড়েন। নিপীড়িত শ্রমিক, কৃষকদের জন্য তার নিবিড় অনুভূতি। কিন্তু তাদের মুক্তির জন্য ও দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনই তার কাছে অগ্রাধিকার পেল। পরবর্তীকালে গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তার মধ্য দিয়ে তার এই ভ্রান্তির অপনোদন ঘটে।

১৯৩০ সালে নারায়ণগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আইএ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন তাকে 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট অব ১৯৩০' (যা 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' নামে কুখ্যাত) অনুযায়ী গ্রেফতার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়। ১৯৩২ সালে তিনি ঢাকা জেল হতে আইএ পরীক্ষা দিয়ে তাতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে তাকে কুখ্যাত হিজলি বন্দীশিবিরে প্রেরণ করা হয়। ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে তাকে হিজলি বন্দীশিবির থেকে এনে নারায়ণগঞ্জে পিতৃগৃহে অন্তরীণ করা

হয়। অন্তরীণ আদেশ লঙ্ঘন করে তিনি বৈপ্লবিক কাজের জন্য আত্মগোপন করেন। কিছু দিনের মধ্যেই কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরের নিকটে হরিচরণ রায় চৌধুরী ও অজিত সেন নামক ওই জেলার অনুশীলন সমিতির দুজন শীর্ষস্থানীয় কর্মীর সহিত গ্রেফতার হন। পুলিশের ঘেরাও-এর মধ্যে পড়লে গ্রেফতার এড়াবার জন্য পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। একজন পুলিশ সার্জেন্ট তাকে তাক করে পিস্তল তুললে তিনি সেই পিস্তলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আহত অবস্থায় ধরা পড়ে ঢাকা জেলে প্রেরিত হন। অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকাতে তার তিন বছর কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা জেলে তিনি এবং আরো কয়েকজন রাজনৈতিক কয়েদীদের উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, পত্রিকা, রাত্রে পড়ার জন্য বাতি, বই-পুস্তক ও খাতাপত্র রাখার ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেন এবং পঁয়ষট্টি দিন তা চালিয়ে জেল কর্তৃপক্ষকে বেশ কিছু দাবি মানতে বাধ্য করেন। কিন্তু অনশন করে জেল আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে তার ন'মাস কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে জেল আইন ভঙ্গ করার একই অভিযোগে তার কারাদণ্ড দু'দফায় আরো দু'বছর বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে তাকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা হয়। বস্তুত আন্দামানে প্রেরণের অভিপ্রায়েই জেলসমূহের আইজি মি. ফ্লাওয়ারডিউর প্ররোচণায় এভাবে জেলদণ্ড বাড়ান হয়।
আন্দামানের কারাজীবন অনিল মুখার্জীর রাজনৈতিক চিন্তা জগতে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। সমগ্র মানবজাতির মুক্তির দিগ্‌দর্শন হিসাবে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে ব্যক্তিগত অথবা মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় রোমান্টিক উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু সমাজ বদল করা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন শ্রমজীবী মেহনতী জনগণকে সংগঠিত করা। তিনি আন্দামান সেলুলার জেলের কমিউনিস্ট বন্দীদের সংগঠন 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন'-এ যোগদান করেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে মার্কস, এঙ্গেলস, বুখারিন প্রভৃতি ক্ল্যাসিক গ্রন্থ অধ্যয়নে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে একটি টেপ্-রেকর্ড করা সাক্ষাতকারে তার এই অধ্যয়ন পর্বের সুন্দর বিবরণ পাই। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই পড়তে তিনি কখনো কোন পরিশ্রম বা কষ্ট অনুভব করেননি। কিন্তু এই সমস্ত বই পাঠ করে মর্মার্থ উপলব্ধি করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো। প্রথম দিকে অনেক সময়ই বেশ কয়েক পাতা পড়ার পরে খেয়াল হয়েছে যে এতক্ষণ তিনি যা পড়েছেন, তার কিছুই বুঝতে পারেননি। কিন্তু একাগ্রতার সঙ্গে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের তত্ত্বকে আত্মস্থ করেন। তিনি নিজে পড়েছেন আবার অন্যদের পড়িয়েছেন। প্রয়োজনে অন্যদের কাছেও পাঠ নিয়েছেন। তার সাথে ছিল অনবরত আলাপ-আলোচনা, যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক। সেদিন থেকে আমৃত্যু অনিল মুখার্জী তার তাত্ত্বিক অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছেন।
১৯৩৭ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন ও মুক্তির দাবিতে আন্দামান বন্দীদের ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। তার সমর্থনে দেশেও বিরাট গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় নেতাদের আবেদনে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার হয়। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে তাকেও দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাকে প্রথমে আলিপুর এবং পরে দমদম জেলে রাখা হয়। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।
জেলে থাকাকালে তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করেন যে মুক্তি পেয়ে মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। জেলে ঢোকার প্রথম দিকেই তিনি এ মিল জোলার

'জার্মিনাল' উপন্যাস পড়েন। এই বই তার জীবনে শ্রমিকদের সম্বন্ধে একটা আগ্রহের সৃষ্টি করে, তাদের শক্তি সম্বন্ধে আস্থার সৃষ্টি করে। এরপর ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' পড়ে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ পান। মার্কসবাদী তত্ত্ব অধ্যয়নের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তার কাজ করার আকাঙ্ক্ষা সুদৃঢ় হয়। তিনি নারায়ণগঞ্জকে বেছে নেন। এখানে তার ছাত্রজীবন কেটেছে। তার রাজনৈতিক পরিচয় ও অনেক বন্ধুবান্ধব থাকায় কাজের কিছুটা সুবিধা আছে। মুজাফ্‌ফর আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ী তাকে উৎসাহ দিলেন।

নারায়ণগঞ্জে পাট, হোসিয়ারী প্রভৃতি শিল্পের মজুরদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও তিনি মূলত সূতাকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই কাজে তিনি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার গোপাল বসাক এবং নেপাল নাগের সাহচর্য লাভ করেন। তখনকার দিনে শ্রমিকদের মধ্যে সূতাকল শ্রমিকরাই ছিল বেশি। স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকায় স্বদেশি মালিকরা কয়েকটি কাপড়ের মিল তৈরি করেছিল। নারায়ণগঞ্জে ছিল ঢাকেশ্বরী ১নং, ঢাকেশ্বরী ২নং, চিত্ত রঞ্জন এবং লক্ষ্মী নারায়ণ মিল। আর ঢাকায় ছিল ঢাকা কটন মিল। তিনি প্রথমে লক্ষ্মী নারায়ণ মিলের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন এবং পরে তাকে ভিত্তি করে অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। এইভাবে গড়ে ওঠে ঢাকা জেলার সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন যা ছিল তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের তিনটি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের একটি।

শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাকে শ্রমিক বস্তিতে থাকতে হয়। সারা দিনে খাওয়ার কোন স্থিরতা ছিল না। গোড়ার দিকে দিনের বেলায় অনেক দিনই অভুক্ত থাকতে হত, রাতে কোন পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে খেতেন। অকৃত্রিম দরদ ও সহমর্মিতা দিয়ে তিনি শ্রমিকদের মন জয় করেছেন। কোন শ্রমিকের কলেরা হয়েছে– তিনি নিজ হাতে পরিচর্যা করেছেন, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করেছেন, শিয়রে বসে বাতাস দিয়েছেন। তার আন্তরিক আচার-আচরণের ফলে শ্রমিকরা তাকে আপনজন বলে মনে করত। এমনকি শ্রমিক পরিবারের মা, বোনেরা তাকে তাদের পরিবারের একজন বলেই গ্রহণ করেছিল। শ্রমিকরা তার কাছে এসে জীবনের নানা সমস্যার কথা অকপটে আলোচনা করত। তার অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল। আন্দোলনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার তীক্ষ্ণ নজর থাকত। যেমন, শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধে তিনি অস্ত্রের ব্যবহার করতে বারণ করেছিলেন। অস্ত্রের ব্যবহারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, তাই লাঠি দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। এই সব লড়াইয়ে তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে লাঠি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রমিকদের সাথে তাদের সামনে থেকে। তার নেতৃত্বে সংগঠিত ১৯৪৬ সালের ঢাকার সূতাকল শ্রমিকদের রক্ত-ঝরা ধর্মঘট ও সংগ্রাম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার সংগ্রামের সাথে সাথে শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তারের কঠিন কাজ তিনি অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালে গেট পাহারায় বসে নানা রকম রাজনৈতিক আলোচনা হত। শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়, শ্রমিক শ্রেণীকে আদর্শ ও শ্রেণীগতভাবে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে তিনি মার্কসবাদ-লেলিনবাদের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। শ্রমিকদের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তার কমিউনিস্ট চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। 'হাতে খড়ি'তে তিনি লিখেছেন, 'শত শত শোষিত, নিপীড়িত ভাইবোন ও মায়েদের সংস্পর্শে আসার ফলে জীবনের একটা বৃহত্তর অর্থ পেয়েছি, আনন্দ পেয়েছি। ত্যাগ, ধৈর্য, সাহস ও মমত্ববোধ যে কত মহৎ স্তরে

পৌছুতে পারে, তা এদের কাছেই শিখেছি। এরাই আমাকে শক্তি যুগিয়েছে। বিপ্লবী আদর্শে দৃঢ় রেখেছে, সংগ্রামী দৃঢ়তা শিখিয়েছে।'

শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সাথে তিনি ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন করার কাজে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আত্মগোপন অবস্থায় তিনি গ্রেফতার হয়ে ছ'মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। ঢাকা জেলে থাকার সময় তিনি শ্রমজীবী মানুষের জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে সহজবোধ্য করে 'সাম্যবাদের ভূমিকা' বইটি লেখেন। পার্টির উপর বেআইনী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে ১৯৪৩ সালে এই মূল্যবান বইটি প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রচারে বইটি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। বইটি অনেকবার পুনর্মুদ্রিত হয় এবং একাধিক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে যেমন পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গে (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে) বইটি নিষিদ্ধ থাকায় হাতে লিখে লিখে প্রচারিত হত। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়স্থানেই বইটি এখনো জনপ্রিয়। বইটির জনপ্রিয়তার প্রতিফলন পাওয়া পায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যয়ের 'কিম্‌লিস্‌' উপন্যাসে শ্রমিক চরিত্রের পাঠ্য বই হিসাবে বইটির উল্লেখে। পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বইটির পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের (১৯৫৬) সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারতের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন বইটিকে মার্কসবাদী আলোচনার অনবদ্য সংযোজন বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে শুধু কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের নয়, অন্যান্য বামপন্থী ও প্রগতিশীল ও রাজনৈতিক কর্মীদের তাত্ত্বিক বিকাশেও বইটির অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত ও স্বাধীন হলে অনিল মুখার্জী তার জন্মভূমি পূর্ববাংলাতেই থেকে যান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে কমিউনিস্টদের উপর ব্যাপক দমননীতি নেমে আসায় তিনি আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। এই আত্মগোপন অবস্থাতে তিনি ১৯৫০ সালে গ্রেফতার হন। মুসলিম লীগ সরকার তার বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় খুনের মামলা দিয়ে তাকে ফাঁসিতে আটকানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু মামলা টিকাতে না পারায় খুনের মিথ্যা অভিযোগ থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে যান। কিন্তু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় আবু হোসেন মন্ত্রীসভার আমলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মুক্তিলাভের অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তথাকথিত পুলিশ ধর্মঘটের অজুহাতে কমিউনিস্ট নেতৃবর্গকে গ্রেফতার শুরু করা হলে তাকে আত্মগোপন করতে হয়। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় তাকে আত্মগোপন অবস্থায় পার্টির কাজ করতে হয়। ১৯৫৬ সালে পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকে আমৃত্যু তিনি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পুরোধার কাজ অক্লান্তভাবে করে গিয়েছেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষুদ্র একটি দল থেকে একটি প্রসারিত জাতীয়-ভিত্তিক পার্টিতে রূপান্তরিত করার কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পার্টির গণভিত্তির বিস্তার এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে পার্টির ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬৮ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তুতিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ৬০-এর দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মাওবাদী বিভেদনীতির ফলে সৃষ্ট সংকটকালে পার্টিকে সঠিক আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতিতে অবিচল রাখার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে এবং ১৯৮০ সালের

তৃতীয় কংগ্রেসেও তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। সচেতন ও প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরি, পার্টির মতাদর্শ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিকতা বিভাগের পরিচালনার গুরু দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৬তম পার্টি কংগ্রেসে এবং তৎপরবর্তী ৭৫টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বমহাসম্মেলনে পার্টি প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করে সম্মেলনের প্রস্তুতিতে অবদান রাখেন। তিনি ১৯৭৩ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলন এবং বিভিন্ন সময়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের তার নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালে তিনি তার দ্বিতীয় বিখ্যাত বই 'শ্রমিক আন্দোলনে হাতে খড়ি' লেখেন। পরবর্তী সময়ে 'মুক্তধারা' প্রকাশনা থেকে 'হাতে খড়ি' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। কলকাতা থেকেও একটি সংস্করণ বের হয় সেখানকার 'শ্রমিকদের এবং শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের জন্যও যথেষ্ট মূল্যবান' বিবেচনা করে। বইটি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি 'স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি' নাম দিয়ে একটি নিবন্ধ লেখেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে সে লেখাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে বইটির কয়েকটি সংস্করণ বের হয়। মার্কসীয় তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের উপর লেখা এ বইটি একটি অমূল্য সংযোজন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচনায় কমিউনিস্ট পার্টি যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা নুতন প্রজন্মের জানার জন্য বইটি খুবই জরুরি।

পাঠাভ্যাসের মত তার লেখার অভ্যাসও ছিল ব্যাপক। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সাপ্তাহিক 'একতা', দৈনিক 'সংবাদ'সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে তিনি বহুবিষয়ে লিখেছেন। পাকিস্তান আমলে গোপন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'শিখা'য় তিনি 'আলীম' নামে অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছেন। অন্যত্র সংস্কৃতি বিষয়ে লিখেছেন। তিনি এক সজীব ও সৃজনশীল মনের অধিকারী ছিলেন। নানা রকম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি শিশু, কিশোর-কিশোরীদের জন্য নুতন ধাঁচের কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'হারানো খোকা' নাম দিয়ে এগল্পগুলো ঢাকা থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি কবিতাও লিখেছেন।

মহৎ এই মানুষটির আকাঙ্ক্ষা ছিল কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতেই যেন তার জীবনাবসান ঘটে। তার মৃত্যু এসেছে তার আকাঙ্ক্ষার মতই। ১৯৬৮ সাল থেকেই তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। কিন্তু তার কর্মব্যস্ততা হ্রাস পায়নি। ১৯৮২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সারাদিন তিনি ব্যস্ততায় কাটিয়েছেন বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সম্মেলনে। সম্মেলনের কাজের শেষে ঘরে ফিরে তার রাতের নিদ্রাই পরিণত হয়েছে চিরনিদ্রায়। ঘুমন্ত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়।

লেখক: অতীশ মুখার্জী

তথ্যসূত্র:

১. অনিল মুখার্জীর স্মরণ সংখ্যা ২০১১ পুস্তিকা থেকে নেয়া, প্রকাশক: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।

খোকা রায়



ছোটবেলা থেকেই তিনি ও তার আরো তিন ভাইবোন পড়াশোনা করতেন ময়মনসিংহ শহরে মামার বাড়িতে থেকে। মামার বাড়িটি ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ঘেরা। খোকা রায়ের দাদামশাই শ্যামাচরণ রায় ছিলেন শহরের বিখ্যাত আইনজীবি ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন মডারেটপন্থী বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অনুসারী। পাঁচ মামার সবাই ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক, যুগান্তর দলের সক্রিয় সদস্য। ফলে বাড়িতে সবসময়ই পুলিশের আনাগোনা ছিল। খোকা রায় দেখেছেন, পুলিশ বাড়ি থেকে তার মামাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পর মামারা আবার জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন। এই বাড়ির মেয়েরাও ছিলেন সাধারণভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী। এ রকম পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে খোকা রায় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলের সাথে যুক্ত হন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপ্লবী খোকা রায় নামে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেন।

খোকা রায়ের জন্ম ১৯০৭ সালে ময়মনসিংহ জেলায়। তার আসল নাম সুধীন্দ্র রায়। তার বাবার নাম নরেন্দ্র কিশোর রায়। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন আইনজীবী, পরবর্তীতে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তিনি ব্যাংকের চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক।

১৯২১ সালে সারা ভারত জুড়ে মাহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ময়মনসিংহ শহরেও সেই আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়। উকিল-মোক্তাররা কোর্ট-কাচারি এবং ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষরাও এতে অংশ নেন। অসহযোগ আন্দোলনের সেই ঢেউয়ে খোকা রায়ও স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্যাপকভাবে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করতে থাকে। 'আন্দোলনে অহিংসার মৌলিক নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে' এই অজুহাতে কংগ্রেস এই আন্দোলন খুব বেশিদিন চালায়নি। এতে বিপ্লবীদের সাময়িক কর্মকাণ্ড কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে। সে সময় খোকা রায় প্রায় ৪/৫ বছর পাড়ায়-পাড়ায় লাইব্রেরি ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালান।

১৯২৪ সালে খোকা রায় সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯২৬ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯২৮ সালে একই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইতিহাস বিভাগে এম. এ. ভর্তি হন। থাকতেন জগন্নাথ হোস্টেলে। ১৯২৯-৩০ সালে বিপ্লবী কার্মকাণ্ডের পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে নামেন। এই সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা ইউনিটের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৩০ সালে কংগ্রেস দেশব্যাপী 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের ডাক দেয়। কিন্তু নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে অনেক স্থানেই তা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। জগন্নাথ ছাত্রাবাসের প্রভোস্ট কয়েকজন কর্মচারীকে সাথে নিয়ে এসে ছাত্রদের 'স্বাধীনতা দিবস'-এর কর্মসূচি বাতিল করার কথা বলেন। কিন্তু ছাত্ররা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে 'স্বাধীনতা দিবস'-এর কর্মসূচি পালন করেন। এই অপরাধে খোকা রায়সহ আরো একজনকে হোস্টেল থেকে বহিস্কার করা হয়। ঢাকায় তখন খোকা রায়ের থাকার তেমন কোনো জায়গা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি ময়মনসিংহে ফিরে যান। ফলে তার আর এম. এ. পরীক্ষা দেয়া হয়ে ওঠেনি।

ময়মনসিংহে ফিরে আবার কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। কংগ্রেস কর্মীরা তখন শহরে মদ ও গাঁজার দোকান বন্ধের জন্য আন্দোলন করছিলেন। এই আন্দোলনের জের ধরেই খোকা রায়কে গ্রেফতার করার জন্য জামালপুর থেকে শেরপুর যাওয়ার পথে পুলিশ গুদারা ঘাটে ওঁৎ পেতে থাকে। খোকা রায়ের সাথে তখন আরো কয়েকজন বিপ্লবী সহকর্মী ছিলেন। পুলিশকে দেখা মাত্র বিপ্লবী দলের সদস্যরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেন। পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। তবে ওই বছরের (১৯৩০ সাল) নভেম্বরের ৩০ তারিখে আরো এক সহকর্মীসহ ময়মনসিংহ থেকে পুলিশ খোকা রায়কে গ্রেফতার করে। জামালপুরে এক বিশেষ আদালতে খোকা রায়ের ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কারা কর্তৃপক্ষ প্রথমে খোকা রায়কে জামালপুর সাবজেল ও পরে ময়মনসিংহ জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল এবং সবশেষে আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসন দেয়। ১৯৩৩ সালে আন্দামান সেলুলার জেলে থাকাবস্থায় সেখানকার বন্দীরা জেল জীবনের দুঃসহ জীবনের প্রতিবাদে চিফ কমিশনারের কাছে তিন দফা দাবিনামা পেশ করেন। এই তিন দফা দাবির মধ্যে ছিল– ভালো খাদ্য, জেলে আলোর ব্যবস্থা, বই ও পত্রিকা পড়ার সুযোগ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে দাবি না মানলে বিপ্লবীরা অনশন শুরু করেন। অনশন অবস্থায় জোর করে খাওয়াতে গিয়ে তিনজন বিপ্লবীকে হত্যা করে জেল কর্তৃপক্ষ। এই খবর বাংলায় ছড়িয়ে পড়লে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে জেলের ভিতরে ও বাইরে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাহাত্মা গান্ধীসহ অনেক দেশবরেণ্য নেতাই বিপ্লবীদের অনশন থামানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। একটানা ৪৬ দিন অনশন করার পর বিপ্লবীদের দাবি মেনে নেয় কর্তৃপক্ষ।

রাশিয়ায় মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এর প্রভাবে বাংলার বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা তখন কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৫ সালেই ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সোভিয়েত বিপ্লব ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব তখন জেলখানার বন্দীদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। আন্দামানও এর ব্যাতিক্রম ছিল না। বন্দীরা অনেকেই সে সময় গোপনে জেলের ভিতর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠ শুরু করেন। খোকা রায় আন্দামান জেলে থাকা অবস্থাতেই প্রথমে

'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' ও পরে মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ পড়ে ফেলেন। সে সময় তিনি মানসিকভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এসব কারণেই আন্দামানকে তখন বলা হত বিপ্লবীদের মার্কসিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেই মূলত বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে রাজনৈতিকভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার দীক্ষা নেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৩ সালেই ৩২ জন বিপ্লবী জেলখানায় কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গড়ে তোলেন। জেলখানায় এটিই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শাখা। ১৯৩৭ সালের ২৫ জুলাই আন্দামান জেলের বন্দীরা পুনরায় তিন দফা দাবিতে অনশন শুরু করেন। এবারের তিন দফা দাবি ছিল– সকল রাজবন্দীদের মুক্তি, আন্দামান বন্দীদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত সব রাজনৈতিক বন্দীকে কমপক্ষে ডিভিশন 'টু'-র বন্দী হিসেবে গণ্য করা। এতে বিভিন্ন জেলের অন্যান্য বন্দীরাও অংশ নেন। একটানা ৩৭ দিন অনশন-আন্দোলনের এক পর্যায়ে বন্দীরা দেশে ফেরার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। অনেককেই এসময় আন্দামান থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাগারে বদলি করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে কর্তৃপক্ষ খোকা রায়কে আন্দামান থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসে। আলিপুর জেল থেকে ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে তিনি যেদিন ছাড়া পান সেদিনই জেল গেইটে তাকে আবার গ্রেফতার করে পুলিশ। বিনা বিচারে বন্দী হিসেবে তাকে প্রেসিডেন্সি কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অক্টোবর মাসে পাঠিয়ে দেয়া হয় নদীয়া জেলা কারাগারে। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে তিনি মুক্তি পান। এই সময়টা খোকা রায়ের বিপ্লবী জীবনের এক বিরাট বড় পরিবর্তনের সময়। তিনি বলেছেন, '১৯৩০ সালে যখন জেলে গিয়েছিলাম তখন ছিলাম একজন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কর্মী। ১৯৩৮ সালে যখন জেল ও অন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলাম তখন হয়েছিলাম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী। ১৯২১ সালে আমার যে রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে তার সার্থক পরিণতি হয়েছিল।'

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর খোকা রায় ময়মনসিংহ শহরে ফিরে আসেন। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী তখনও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল নিষিদ্ধ। খোকা রায় প্রথমে গোপনে গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের সংগ্রাম গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। ১৯৩৮ সালের মে-জুন মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম দিকে কমিউনিস্টরা এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কোন ভারতীয় যেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ না দেন সে জন্য তখন তারা শ্লোগান তোলেন 'নয় এক পাই, নয় এক ভাই'। এই শ্লোগান ব্রিটিশদের খুবই ক্ষিপ্ত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকার সারাদেশে কমিউনিস্টদের গ্রেফতার করার এক আদেশ জারি করে। তখন খোকা রায় আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু নাৎসি জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি পুরো পাল্টে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স মিলে জার্মান বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানায়। তখন ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টি এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে আখ্যা দিয়ে সোভিয়েত বাহিনীকে সহযোগিতার ঘোষণা দেয়। ফলশ্রুতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়। ১৯৪২ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ বলে গণ্য হয়। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে খোকা রায় পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য তথা প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলির সদস্য নির্বাচিত হন। এই দায়িত্ব পালনকালে তিনি ময়মনসিংহ জেলায় কৃষক-ছাত্র-যুব আন্দোলন গড়ে তোলায় অবদান রাখেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে যে দাঙ্গা হয় সেই দাঙ্গার বিরুদ্ধে খোকা রায় সে সময় পার্টির পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরে নোয়াখালিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে সেখানেও তিনি ছুটে যান। যদিও সে সময় কমিউনিস্টরাও এই দাঙ্গার শিকার হন।

এই সময় বাংলায় যুগ যুগ ধরে শোষিত ও নির্যাতিত বাংলার মেহনতি কৃষক ও ক্ষেতমজুররা তেভাগা ও টঙ্ক আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামন্তবাদী শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেই আন্দোলনে কমরেড খোকা রায় কখনো ময়মনসিংহ, কখনো শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা প্রভৃতি স্থানে গিয়ে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই সংগ্রামের কারণে তখন ব্রিটিশ শাসকদের মসনদ নড়ে উঠেছিল। সংগ্রামের সরাসরি বিরোধীতা করেছিল তৎকালীন মুসলিম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। ফলে তিনমুখী বিরোধীতার মুখে সংগ্রাম গড়ে তুলতে গিয়ে সেদিন এদেশে কমিউস্টিদের কী পরিমাণ নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার বর্ণনা পওয়া যায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলো থেকে–

১. আন্দোলনের এলাকাগুলোতে পুলিশ ২২ দফায় অসংখ্য রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল! সে গুলিতে বাংলার ৭০ জন কৃষক নরনারী নিহত হয়েছিলেন। বাংলার সবুজ মাঠ সমিরউদ্দিন, শিবরাম, চিয়ার সাঁই, রাশমণি, সুরেন্দ্র, তৎনারায়ণ প্রমুখ শহীদদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

২. কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির ৩ হাজারের বেশি নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পুরেছিল।

৩. দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, ২৪ পরগনা, মেদেনিপুর প্রভৃতি জেলার বহু কৃষক রমণী পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছিলেন।

৪. আন্দোলনের সময় বহু গ্রামে কৃষকদের শত শত কুটির পুলিশ ধুলিস্যাৎ করেছিল। পুলিশ কৃষকদের অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি আবার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কমিউনিস্টদের উপর নেমে আসে দমন-পীড়ন। এই অবস্থায় বাংলার অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এক গভীর সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। তখন খোকা রায় দেশত্যাগ না করে গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে জোরদার করতে এদেশেই থেকে যান। খোকা রায় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে থেকে প্রায় এক দশক বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। ১৯৫১ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন, যা ১৯৫২

সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ণতা পায় সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে খোকা রায়ের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পাশাপাশি পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষি মানুষের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিই সেসময় প্রথম লিখিত এক প্রবন্ধে দাবি জানিয়েছিলেন। সে সময় তিনি আলী আশরাফ ছদ্মনামে 'পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা সে সময় খুবই সাড়া জাগিয়েছিল।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ক্ষেত্র কিছুটা প্রসারিত হয়। এসময় দলীয় বক্তব্য প্রচারের জন্য একটি মুখপত্র বের করার চেষ্টা করেন নেতৃবৃন্দ। 'জনতা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ডিক্লারেশনও পাওয়া যায়। সেই পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব ছিল খোকা রায়, বারীণ দত্ত, কেজি মোস্তাফা, আলী আকসাদ ও জহির রায়হানের উপর। কিন্তু এই পত্রিকাটি বের হবার সাথে সাথেই পাকিস্তান সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। তখন খোকা রায় ও বারীণ দত্ত মিলে 'যুগের দাবি' ও 'মার্কসপন্থী' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এর কিছুদিন পর পাকিস্তান সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করে। ফলে ১৯৫৪ সালের ৪ জুলাই আবার পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এর তিন সপ্তাহ পর পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। খোকা রায় আবার আন্ডাগ্রাউন্ডে চলে যেতে বাধ্য হন।

১৯৫৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক শাখার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে খোকা রায় পার্টির প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক শাসন জারি করে। ফলে সারা দেশে আবার রাজনীতি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'মস্কো-পিকিং' দ্বন্দ্বের সূচনা হওয়ায় এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও তার ঢেউ লাগে। এখানেও কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। খোকা রায় তখন কমিউনিস্ট পার্টির 'মস্কো-পন্থীদের' সাথে অবস্থান নেন। উভয় পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা মিলে ১৯৬৭-৬৮ সালে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেন। খোকা রায় সেই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এরপর খোকা রায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকলে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসেন বারীণ দত্ত।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে খোকা রায় পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে ভারতে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করেন। পার্টির উদ্যোগে তখন নিজস্ব ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরিতে এসময় খোকা রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সেসময় ভারতের কোচিনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস হচ্ছিল। সেই কংগ্রেসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কমরেড মণি সিংহ, খোকা রায়, বারীণ দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে সমর্থ হন। দেশ স্বাধীন হবার পর কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। খোকা রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দেশ পুনর্গঠনে অবদান রাখেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করলে দেশের রাজনৈতিক

পরিস্থিতির আবার অবনতি হতে থাকে। এসময় খোকা রায়সহ পার্টির নেতৃবৃন্দ আত্মগোপনে চলে যান। তার শরীরও খারাপ হতে থাকে। এরপর ১৯৭৬ সালে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানেই ১৯৯২ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খোকা রায় ১৯৪৩ সালে জুঁইফুল রায়কে বিয়ে করেন। জুঁইফুল রায় ছিলেন পার্টির একজন সার্বক্ষণিক নেত্রী। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী। ১৯৪০ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এদেশের নারী আন্দোলনে তার ভূমিকা অনন্য। পরে তিনি ১৯৫৯ সালে কলকাতায় চলে যান। সেখানে দীর্ঘদিন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। জুঁইফুল রায় ১৯৯৭ সালের ১২ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তাদের এক কন্যা জয়শ্রী গাঙ্গুলি।

এই লেখাটি তৈরির জন্য খোকা রায়ের লিখিত 'সংগ্রামের তিন দশক' বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে। খোকা রায়ের একমাত্র মেয়ে জয়শ্রী গাঙ্গুলির উদ্যোগে যা ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে বর্ধিত সংস্করণ হিসেবে প্রকাশ করেছেন অমূল্য গাঙ্গুলি। বইটিতে ভূমিকা লিখেছেন সিপিআই (এম) পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাবেক রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। ছবিও এই গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

লেখক: চন্দন সাহা রায়

রবি নিয়োগী



রবি ও মনি দু'ভাই পিঠাপিঠি, দারুণ সখ্যতা দু'জনের। ছেলেবেলা থেকেই রবি ছিলেন গরীব-মেহনতি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। আশেপাশে কোনো বস্ত্রহীন গরীব মানুষ দেখলে দু'ভাই তাদের মায়ের কাঠের সিন্দুক খুলে জামা কাপড় চুরি করে বিলিয়ে দিয়ে আসতেন। কিন্তু ঘটনার শেষ সেখানেই হতো না। এক ফাঁকে মনি মাকে বলে দিতেন, তোমার সিন্দুকে এই এই জিনিস নেই। সিন্দুক খুলে মা কথার সত্যতা খুঁজে পেতেন। জিনিসপত্র গেল কোথায়, কে নিল? মনি ভাইয়ের নাম বলে দিতেন। মা তলব করামাত্র হাজির হতেন রবি। চড় চাপড় পড়তো পিঠে। অম্লান বদনে তা হজম করতেন রবি। পর মুহূর্তে দু'ভাই মিলেমিশে একাকার। কিছুদিন পরেই আবার ঘটতো একই ঘটনা।

রবির পুরো নাম রবীন্দ্র চন্দ্র নিয়োগী, যিনি 'বিপ্লবী রবি নিয়োগী' নামেই জন-মানুষের কাছে কিংবদন্তীতুল্য। তার জন্ম বাংলা ১৩১৬ সালের ১৬ বৈশাখ, ইংরেজি ১৯০৯ সালের ২৯ এপ্রিল শেরপুরের এক বিখ্যাত জমিদার পরিবারে। (যদিও ইংরেজি তারিখটি নিয়ে একটু বিতর্ক আছে)। বাড়ির নাম 'নিয়োগী লজ'। তার পিতার নাম রমেশ নিয়োগী ও মাতা সুরবালা নিয়োগী। রবি নিয়োগীরা ছিলেন ১১ ভাইবোন। পিতা রমেশ নিয়োগী পারিবারিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি শেরপুরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অবদান রাখেন। শেরপুরের একটি পাঠাগার পরিচালনায় তিনি দীর্ঘদিন অবদান রাখেন।

রবি নিয়োগীর শিক্ষা জীবনের শুরু শেরপুর ভিক্টোরিয়া একাডেমিতে। পরে তিনি সেখান থেকে গোবিন্দপুর পিস মেমোরিয়াল-এ ভর্তি হন। ১৯২৬ সালে সেখান থেকেই তিনি মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। স্কুলে পড়ার সময় মাত্র ১১ বছর বয়সেই রবি নিয়োগী খেলাফত আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। তার ভাই মণীন্দ্র চন্দ্র নিয়োগী, যার ডাক নাম মনি। তিনি ছিলেন গোপন বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সদস্য। অথচ তিনি এই দলের সদস্য হিসেবে এতোটাই গোপনে কাজ করতেন যে, বাড়ির কেউ-ই সে সম্পর্কে কিছুই জানত না। পরে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় মণীন্দ্র নিয়োগী জামালপুরে পিকেটিং কার্যক্রমে অংশ নিতে গেলে পুলিশ তাকে আটক করতে যায়। তিনি উল্টো পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েন। পুলিশ পাল্টা ধাওয়া করলে তিনি ব্রহ্মপুত্র নদী সাঁতরে শেরপুরে পালিয়ে আসেন। পুলিশ সেখানেই তাকে গ্রেফতার করে। তখনই বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই মামলায় তিনি ছয়-সাত বছর জেল খাটেন।

১৯২৬ সালে রবি নিয়োগী ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। সেখানে গিয়েই তিনি পুরোদমে জড়িয়ে পড়েন সশস্ত্র বিপ্লবী দল যুগান্তরের সাথে। শহরে অবস্থিত ধীরেণ সেনের শরীরচর্চা কেন্দ্রে গিয়ে শুরু করেন নিয়মিত শরীরচর্চা। ময়মনসিংহে তখন যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির শক্ত ঘাঁটি। একদিন আনন্দমোহন কলেজে এক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ বিনা কারণে ছাত্রদের গালাগালি করতে থাকে। রবি নিয়োগী ও তার বন্ধুরা এতে ভীষণ ক্ষেপে যান। শেষে রেগেমেগে পুলিশকে জোর করে ধরে এনে পুকুরে ফেলে দেন। এ ঘটনায় রবি নিয়োগীর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করে। কলেজ কর্তৃপক্ষও তাকে বহিস্কার করে। এদিকে ধীরেণ সেনের শরীরচর্চা কেন্দ্রে অনুশীলন ও যুগান্তরের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায় তিনি সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তখন পুলিশের দায়ের করা মামলা থেকে বাঁচতে তিনি কলকাতায় পালিয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে ভর্তি হন বিদ্যাসাগর কলেজে। কিন্তু কলেজে ভর্তি হলেও পড়াশোনা আর হয়ে ওঠেনি। সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামী সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জীবন চ্যাটার্জি প্রমুখদের সংস্পর্শে এসে একের পর এক রাজনৈতিক সংগ্রামেই নিজেকে আরো বেশি করে নিমগ্ন করে রাখেন রবি নিয়োগী।

বিপ্লবী রবি নিয়োগীর জন্ম কিন্তু একটি সামন্ততন্ত্রী পরিবারে। যে সামন্ততন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল ব্রিটিশরা নিজেদের শাসন শোষণ ব্যবস্থাকে এদেশে পাকাপোক্ত করতে। কিন্তু তাদের সেই ইচ্ছা চিরস্থায়ী হয়নি। আক্রমণ আসে সেই সামন্তবাদী পরিবারের ভিতর থেকেই। তারা প্রথমে স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জাতীয় চেতনাই ছিল সেই বিদ্রোহের মূলে। কিন্তু সেই চেতনা থেকে সরে এসে এরা ক্রমান্বয়ে মিশে যায় মেহনতি তথা আপামর মানুষের মহামুক্তির মিছিলে। নানা ঘটনা-পরম্পরা ও অভিজ্ঞতায় পোড় খেতে খেতে তাদেরই একাংশ বিদ্রোহী থেকে পরিণত হন বিপ্লবীতে, জাতীয় চেতনাদীপ্ত স্বাদেশিকতাকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠেন শ্রেণীচ্যুত আন্তর্জাতিকতাবাদী। রবি নিয়োগী তাদেরই একজন।

কলকাতাতে থাকাবস্থায়ই তিনি রাজনীতির মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯২৯ সালে সিদ্ধান্ত নেন শেরপুরে ফিরে আসবেন এবং 'আইন অমান্য আন্দোলনকে' সংঘটিত করবেন। শেরপুরে আইন অমান্য আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৯৩০ সালের দিকে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেয়। তখন তিনি সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময় তিনি ছিলেন নিখিল বঙ্গ কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সদস্য। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পিকেটিং করতে গিয়েই তিনি প্রথমবার গ্রেফতার হন। ১৯৩৮ সালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু যখন কংগ্রেসের প্রচার কাজ চালাতে শেরপুরে আসেন তখন সেই সভাতে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী রবি নিয়োগী। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় তাকে নিজ বাড়িতে দু'বছর অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। ১৯৪২ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। একই বছর তিনি ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে নেত্রকোনা জেলার দলার গ্রামে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় তার অংশ হিসেবে ১৯৪৩ সালে নালিতাবাড়িতে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হয়। সেখানে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এই সম্মেলনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এই সম্মেলন সফলভাবে সমাপ্ত করার কারণেই নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। নেত্রকোনা জেলার এই কৃষক আন্দোলন তখন ভারত উপমহাদেশে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

দেশভাগের পর এদেশের অনেক কমিউনিস্ট নেতাই দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছিল। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় রবি নিয়োগী ও তার স্ত্রী জ্যোৎস্না নিয়োগী উভয়েই ময়মনসিংহ জেলে ছিলেন। তখন রবি নিয়োগীর মা-বাবা ও অন্যান্য ভাইবোনেরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি দেশত্যাগ করতে নারাজ। তার সোজা কথা– 'যেতে হয় তোমরা চলে যাও। এদেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। মরতে হয় এদেশেই মরব।' তিনি আর দেশত্যাগ করেননি। অথচ শেষবার যখন স্বৈরাচার এরশাদ সরকার আশি বছর বয়সে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠায় তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রে বলা হয়েছিল 'তিনি ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশেও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত এবং সেজন্য ওই আমলেও তিনি বারবার গ্রেফতার হয়েছেন।' স্বাধীন দেশেও রবি নিয়োগী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

সমাজতন্ত্রের প্রতি রবি নিয়োগীর বিশ্বাস অবিচল ছিল চিরকাল। এজন্য কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল নিরবচ্ছিন্ন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। শেরপুর জেলার নেতৃত্ব দিয়েছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় ঘটলে এদেশের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে চলে যান। কিন্তু রবি নিয়োগী তখন আরো শক্ত হাতে পার্টির লাল পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেন। এ সম্পর্কে একদিন তার এক সহকর্মী তাকে প্রশ্ন করেন– 'দাদা, সোভিয়েতে এসব কী হচ্ছে? মৌলিকত্ব ঠিক রেখে সংস্কার বড় কঠিন কাজ, সাম্রাজ্যবাদীরা সক্রিয়, মূল সমাজতন্ত্রই শেষ পর্যন্ত মারা যাবে না তো?' তখন রবি নিয়োগী সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন–'আরে না, না, সমাজতন্ত্রের বিকল্প নাই। সমাজতন্ত্র বাদ দিয়া করবাডা কী? ধনতন্ত্র? কাড়াকাড়ি, মারামারি? ওই ব্যবস্থায় কিচ্ছু হবো না, সমাজতন্ত্র থাকবই।.. এরা পারবো না, কয়দিন বুং-বাং করবো আরকি। হ্যাঁ? কেমনে পারবো? পারবো না, সমাজতন্ত্র একটা বিজ্ঞান। এর কোনো বিকল্প নাই। মানুষ বাঁচাইতে হইলে, সভ্যতা টিকাইতে হইলে এছাড়া আর কোনো পথ নাই, এখানে আসতেই হবে।' রবি নিয়োগী শুধু রাজনৈতিক সংগঠন নয়, শিশু-কিশোর, সাংস্কৃতিক সংগঠনকেও সংগঠিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। মুক্ত জীবনের বাইরে রবি নিয়োগীর বাকী সবটাই ছিল জেল জীবন। কিন্তু সেই জেল জীবনও ছিল সংগ্রামমুখর।

১৯৩০ সালের দিকে শেরপুরে সত্যাগ্রহের সময় গাঁজা-মদের দোকান ভাঙ্গা আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। গ্রেফতারের পর প্রথমে তাকে জামালপুর ও পরে ময়মনসিংহ জেলে আটক রাখা হয়। জেলেও তিনি রাজবন্দীদের মর্যাদার জন্য আন্দোলন করেন। জেলে আন্দোলনের কারণেই জেল কর্তৃপক্ষ তাকে দমদম জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে প্রায় একবছর পর মুক্তি পান। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেন। অস্ত্র কেনার টাকা সংগ্রহ করার জন্য কলকাতা থেকে চলে আসেন ময়মনসিংহে। ১৯৩১ সালে শেরপুর ঢোকার মুখে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তখনকার 'গুদারাঘাট শুটিং কেইস' মামলায় রবি নিয়োগীর সাত বছর জেল হয়। এসময় তিনি ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলে বেশ কিছুদিন বন্দী ছিলেন। কিন্তু রাজশাহী জেলে থাকাবস্থায় জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে গুলি করে হত্যা প্রচেষ্টার জন্য তাকে শাস্তি হিসেবে আন্দামানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আন্দামান তখন কালাপানির দ্বীপ। রবি নিয়োগী সেখানে যান 'মহারাজ জাহাজ'-এ করে। রবি নিয়োগী যখন আন্দামানে যান, তখন সেটি ছিল দ্বিতীয়

ব্যাচ। এর আগেও ২৫ জনের একটি বিপ্লবী দলকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে আন্দামান সেলুলার জেলে থাকাবস্থায় সেখানকার বন্দীরা জেল জীবনের দুঃসহ জীবনের প্রতিবাদে চিফ কমিশনারের কাছে তিন দফা দাবিনামা পেশ করেন। এই তিন দফা দাবির মধ্যে ছিল-ভালো খাদ্য প্রদান, জেলে আলোর ব্যবস্থা করা এবং বই ও পত্রিকা পড়ার সুযোগ দেয়া। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে দাবি না মানলে বিপ্লবীরা অনশন শুরু করেন। অনশন অবস্থায় তিনজন বিপ্লবীকে জোর করে খাওয়াতে গিয়ে হত্যা করে জেল কর্তৃপক্ষ। এই খবর বাংলায় ছড়িয়ে পড়লে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে জেলের ভিতরে ও বাইরে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীসহ অনেক দেশবরেণ্য নেতাই বিপ্লবীদের অনশন থামানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। একটানা ৪৬ দিন অনশন করার পর বিপ্লবীদের দাবি মেনে নেয় কর্তৃপক্ষ।

আন্দামানকে তখন বলা হত বিপ্লবীদের মার্কসসিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেই মূলত বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে রাজনৈতিকভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৩ সালেই তারা ৩২ জন বিপ্লবী জেলখানায় কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গড়ে তোলেন। জেলখানাতে এটিই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শাখা। ১৯৩৭ সালের ২৫ জুলাই আন্দামান জেলের বন্দীরা পুনরায় তিন দফা দাবিতে অনশন শুরু করেন। এবারের তিন দফা দাবি ছিল– সকল রাজবন্দীদের মুক্তি, আন্দামান বন্দীদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত সব রাজনৈতিক বন্দীকে কমপক্ষে ডিভিশন 'টু'-র বন্দী হিসেবে গণ্য করা। এতে বিভিন্ন জেলের অন্যান্য বন্দীরাও অংশ নেন। একটানা ৩৭ দিন অনশন-আন্দোলনের এক পর্যায়ে বন্দীরা দেশে ফেরার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করেন।

বিপ্লবী রবি নিয়োগী আন্দামানের বন্দীদশা থেকে যেদিন মুক্তি পান তার পরদিনই আবার দিনাজপুরে গ্রেফতার হয়ে যান এবং দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট থানায় প্রেরিত হন। ১৯৩৮ সালে ছাড়া পেয়ে সেখানেই কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়েন। ১৯৩৯ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন। এবার ছাড়া পান ১৯৪১ সালে। ১৯৪১ সালেই আবার 'না এক ভাই, না এক পাই' অর্থাৎ 'যুদ্ধে যাব না' শ্লোগান দেয়ার অপরাধে রবি নিয়োগী নিরাপত্তা আইনে তিন মাসের জন্য আটক থাকেন। পাকিস্তান আমলে তার জেল জীবনের সূচনা ঘটে স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মাথায়। এসময় বৃহত্তর ময়মনসিংহে কৃষকরা টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে তিনি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন। ছাড়া পান ১৯৫৩ সালে। এসময় তার স্ত্রী জোৎস্না নিয়োগীও ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে রবি নিয়োগীকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ ধর্মঘটে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৫৫ সালে আবার গ্রেফতার হন তিনি। কিছুদিন পর তিনি ছাড়া পান। কিন্তু একই বছর খাদ্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে পুনরায় আটক হন। ছাড়া পান ১৯৫৬ সালে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার আইয়ুব খান ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত রবি নিয়োগীকে কারাগারে আটক রাখে। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে ১৯৬৫ সালে রবি নিয়োগীকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করা হয়। একই বছরের শেষ দিকে তিনি একবার ছাড়া পেলেও পরে আবার গ্রেফতার হয়ে যান। ছাড়া পান

১৯৬৯ সালে। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতার মসনদ দখল করলে রবি নিয়োগী বন্দী হন। ছয় মাসের জন্য জেল খাটেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ডালু, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, মহেন্দ্রগঞ্জ সীমান্তের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ও মুক্তিযোদ্ধা মোটিভেশন ক্যাম্পে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। এসময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার শেরপুরের বাড়িটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। দেশ স্বাধীন হলে তিনি দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি বেশ ভালোভাবেই মুক্তাবস্থায় থেকে কাজ করেন মানুষের জন্য। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর থেকেই পাল্টে যেতে থাকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। আবার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত রবি নিয়োগী নিরাপত্তা আইনে কারাগারে আটক থাকেন। এরশাদের স্বৈরশাসনামলে ১৯৮৮ সালে শেষ বারের মতো বৃদ্ধ বয়সে আবার কারারুদ্ধ হন রবি নিয়োগী।

রবি নিয়োগী তার বিরানব্বই বছরের জীবনে ৩৪ বছর জেলে কাটিয়েছেন। পাকিস্তান আমলে চব্বিশ বছরের মধ্যে ২০ বছর তিনি জেলেই ছিলেন। আত্মগোপনে কেটেছে আরো প্রায় দুই যুগ। একবার নিজের এই জেল জীবন নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শুধু বঙ্গবন্ধু সরকার ছাড়া সব সরকারই আমাকে জেলে নিয়েছে। আমি কি ওদের জন্য এতই ভয়ঙ্কর? মানুষের মুক্তির কথা বলি, এরচেয়ে বেশি তো নয়।'

রবি নিয়োগী ১৯৪১ সালে বিক্রমপুরের যোগেশ মুজমদারের কন্যা জ্যোৎস্না রানী নিয়োগীকে বিয়ে করেন। তখন রবি নিয়োগীর বয়স ৩১ বছর। তিনি ছিলেন রবি নিয়োগীর যোগ্য সহধর্মিনী। জ্যোৎস্না নিয়োগী রবি নিয়োগীর ঘরে এসেছিলেন একজন সাধারণ মেয়ে হিসেবে। কিন্তু কালে কালে তারা একই বৃন্তের দু'টি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিলেন। জ্যোৎস্না নিয়োগী ছিলেন এদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তিনি শুধু নারী মুক্তি নয়, এদেশের শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির আন্দোলনেরও এক অসামান্য অগ্রসৈনিক। তার জীবনের প্রায় বারো বছর কেটেছে জেল ও আত্মগোপনে। এমনকি নবজাত শিশু কাজল নিয়োগীকে কোলে নিয়ে এক পর্যায়ে জ্যোৎস্না নিয়োগী কারা নির্যাতন ভোগ করেন। সংসারের কাজ ও রাজনীতির মাঠ তিনি সামলেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। সাহিত্যের প্রতি ছিল তার প্রচণ্ড ঝোঁক। এসব কারণেই আরেক বিপ্লবী চারণ সাহিত্যিক সত্যেন সেন জ্যোৎস্না নিয়োগীকে অভিহিত করেছিলেন 'আশ্চর্য মেয়ে' হিসেবে। রবি নিয়োগী ও জ্যোৎস্না নিয়োগীর তিন ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেমেয়েরা হলেন– রণজিৎ নিয়োগী, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী দাশগুপ্তা, কাজল নিয়োগী ও সজল নিয়োগী। রণজিৎ নিয়োগী কবি ও চিত্রশিল্পী, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা স্বাধীন বাংলা বেতারের সঙ্গীতশিল্পী ও উদীচী কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রী, সজল নিয়োগী শিক্ষকতার পেশার সাথে জড়িত আর কাজল নিয়োগী প্রকৌশলী।

রবি নিয়োগী দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন এবং এই পেশার উন্নতির জন্য সংগঠন গড়ে তুলেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গণ থেকে রিপোর্ট করতেন। এসব রিপোর্ট ভারতের কলকাতার 'কালান্তর' পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হত। তিনি ছিলেন 'দৈনিক সংবাদের' অবৈতনিক সংবাদাদাতা। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালের ১৬

ডিসেম্বর তিনি শেরপুরে 'সাংবাদিক সমিতি' গঠন করেন এবং তিনি এই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে শেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের তিনি আজীবন সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন।

বিপ্লবী রবি নিয়োগী তার বিপ্লবী জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ অনেক সংবর্ধনা পেয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে; ১৯৮৯ সালে ডালু গণহত্যা দিবস সম্মাননা; ১৯৯১ সালের ২৫-২৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বাই বীর সাভারকর স্মৃতি ট্রাস্ট রাষ্ট্রীয় স্মারক সম্মাননা; ১৯৯১ সালে পুণার তিলক ট্রাস্ট সম্মাননা ও মহানগর পালিকা সম্মাননা; ১৯৯৪ সালে জিতেন ঘোষ কল্যাণ ট্রাস্ট সম্মাননা; ১৯৯৫ সালে মাস্টারদা সূর্যসেন পরিষদ কর্তৃক সম্মাননা; ১৯৯৬ সালে তেভাগা সম্মাননা; ১৯৯৬ সালে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্মাননা; ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে সম্মাননা; নকলা-নালিতাবাড়ি একাডেমি সম্মাননা; বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম সম্মাননা।

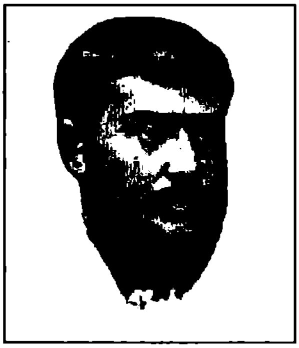
লেখক: চন্দন সাহা রায়

তথ্যসূত্র:

১. 'বিপ্লবী রবি নিয়োগী ও জ্যোৎস্না নিয়োগী স্মারক গ্রন্থ' সম্পাদক– ড. সুধায়ম দাস, অক্টোবর, ২০০৬ সাল।

মনীষী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

যতীন সরকার



লোকে তাকে জানে স্বদেশি যুগের অন্যতম যুগান্তর সাধক ও বিপ্লবী প্রবর্তক বলে। ভূপেন দত্ত একদিকে কট্টর মাৎসিনিপন্থি, অপরদিকে কট্টর মার্ক্সপন্থি। অধিকন্তু তিনি আবার নৃতত্ত্ব-শাস্ত্রী এবং সমাজ-সেবকও বটে।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত– জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮০, মৃত্যু ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬১। তিনি ছিলেন বিশ্বখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ। কলকাতার অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ নাথ দত্তই সন্ন্যাসী হয়ে নাম ধারণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারই অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ কিন্তু অগ্রজের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল হয়েও নিজে আধ্যাত্ত্ববাদী বা সন্ন্যাসী হননি। বদলে হয়েছিলেন বস্তুবাদী ও সমাজবিপ্লবী। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তথা মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস-রচনায় বাঙালিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। সংবাদপত্রসেবীও ছিলেন তিনি। সংবাদপত্রের মাধ্যমেও তিনি ঐতিহ্য-চেতনা ও বিপ্লব-ভাবনায় দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনেই যোগদান করেন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে ব্যারিস্টার পি. মিত্র যে নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ সেই সমিতির সদস্য হন ১৯০২ সনে। এখানেই তিনি বিপ্লবী যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ ও ভগিনী নিবেদিতার সাহচর্য লাভ কারেন। এ সময় তিনি ইতালীয় বিপ্লবী মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। অরবিন্দের সহায়তায় তিনি বিপ্লবীদের মুখপাত্র সাপ্তাহিক যুগান্তর-এর সম্পাদক হন ১৯০৬ সনে। যুগান্তর সম্পাদনা ও সোনার বাংলা নামে একটি বে-আইনি ইস্তেহার প্রকাশের জন্য ১৯০৭ সনে তিনি এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তির পর তিনি ছদ্মবেশে আমেরিকায় চলে যান এবং ১৯১২ সনে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। এর দুবছর পর ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই আমেরিকা ছেড়ে বার্লিন চলে যান এবং ভূপেন্দ্রনাথও তাদের সহযাত্রী হন। বার্লিনে অবস্থান করেই তারা বিপ্লব-আন্দোলনকে জোরদার করতে মনোযোগী হন। ভূপেন্দ্রনাথ ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ সন পর্যন্ত বিপ্লবীদের

সংগঠন বার্লিন কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। শুধু বিপ্লবী কাজকর্মই নয়, এ সময়ে তিনি সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের গবেষণা করে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান (১৯২৩)। জার্মান অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি ও জার্মান এশিয়াটিক সোসাইটির তিনি সদস্য ছিলেন। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদানের জন্য ১৯২১ সনে ভূপেন্দ্রনাথ মস্কোতে যান। সে সময় তার সঙ্গী ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সেই সম্মেলনে আরও দুজন বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েত নেতা লেনিন ভূপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ভূপেন্দ্রনাথ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র রচনা করে লেনিনকে দিয়েছিলেন। মস্কো থেকেই তৎকালীন ভারতের জন্য শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের একটি কর্মসূচি তিনি ১৯২২ সনে অনুষ্ঠিত ভারতের কংগ্রেসের অধিবেশনে পাঠিয়েছিলেন। দেশে ফিরে ১৯২৭-২৮ সনে তিনি কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হয়েছিলেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন ১৯২৯ সনে। কংগ্রেসের সদস্য হয়েও দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার আদায়ের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সে সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব ১৯৩০ সনে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুকে দিয়ে গ্রহণ করাতেও তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন ১৯৩৬ সনে। দুবার তিনি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ও গণসংস্কৃতি সম্মেলনসহ বহু সংগঠনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযুক্তি ছিল। ভূপেন্দ্রনাথের বিপ্লবী চিন্তা ও বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের পরিচয় কমিউনিস্ট নেতা ডাক্তার রণেন সেনের লেখায় উঠে এসেছে এভাবে 'ড. দত্ত ত্রিবেণীর মতো তিনটি বিপ্লবী ধারার সঙ্গমস্থল ছিলেন। এগুলো হল জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন, কংগ্রেস ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গমস্থল।'

আর মনীষী বিনয় সরকারের ভাষায়– 'সকলেই জানে যে, ভূপেন দত্ত সেকালের রামকৃষ্ণপন্থিও নন আর একালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পথও মাড়ান না। ভূপেন দত্তকে কট্টর মার্ক্সবাদী বলা যায় কিনা, এ বিষয়ে আমার মনে কিছু সন্দেহ আছে। কট্টর কথাটি যদি ডগমাটিজম-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়, তা হলে তো তাকে কোনোমতেই কট্টর বলতে পারি না আমরা। তার আখ্যা হওয়া উচিত মুক্তমতি ঐতিহ্য-সচেতন মার্ক্সবাদী। কট্টর মার্ক্সবাদীরা স্বামী বিবেকানন্দকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেই মনে করেন। ভূপেন্দ্রনাথ কিন্তু রামকৃষ্ণপন্থি না হয়েও কিংবা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পথ না মাড়িয়েও বিবেকানন্দের সদর্থক চিন্তার মর্মগ্রাহী হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের পূর্বে এই উপমহাদেশের কেউই নিজেকে সোস্যালিস্ট বলে ঘোষণা করেননি– কোনো রাজনৈতিক নেতাও নন, কোনো বুদ্ধিজীবী- চিন্তাবিদও নন। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসী হয়েও ছিলেন সোস্যালিজমের দৃঢ় সমর্থক। সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রকে তিনি বলতেন শূদ্ররাজত্ব। বিবেকানন্দ তার বর্তমান ভারত বইয়ে ইতিহাসের ধারাটিকে যে দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন তাকে অনায়াসে মার্ক্সপন্থার প্রায় সংলগ্ন বলা যেতে পারে- যদিও মার্ক্স-এঙ্গেলসের রচনার সঙ্গে তার কোনো পরিচয় ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় পরিভাষা ব্যবহার করে তিনি ব্রাহ্মণযুগ, ক্ষত্রিয়যুগ, বৈশ্যযুগ ও শূদ্রযুগ মানব ইতিহাসকে চার ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তার নিজের যুগকে বৈশ্যযুগ অর্থাৎ এ সময় সমাজ চলছে বৈশ্যরাজ বা ধনিক-বণিকদের শোষণমূলক শাসনে। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন

যে, বৈশ্যযুগের অবসান ঘটবে এবং শূদ্ররাজত্ব অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের শাসন আসবেই আসবে। সেই শূদ্ররাজত্ব তো সোস্যালিজম ছাড়া আর কিছুই নয়। বিবেকানন্দ সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠাকে একান্ত কাম্য ও অপরিহার্য বলে মনে করতেন, বিবেকানন্দ-অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ সেই সোস্যালিজমকে লক্ষ্যবিন্দুতে রেখেই তার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অগ্রজের মতো তিনিও ছিলেন চিরকুমার।

বহু ভাষাবিদ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বহু রচনা বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল– অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, যুগসমস্যা, তরুণের অভিযান, জাতি সংগঠন, সাহিত্যে প্রগতি, ভারতীয় সমাজপদ্ধতি (৩ খণ্ড), বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, বাংলার ইতিহাস, 'Dialectics of Hindu Ritualism' 'Dialectics of Land Economics of India & ZzVivekananda the Socialist প্রভৃতি।

ভারতীয়দের ইতিহাস লিখিবার বোধ নাই-পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতদের এরকম অভিমত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মেনে নিতে পারেননি। ঠিক যে পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য দেশে ইতিহাস লিখিত হয়েছে, প্রাচীন ভারতে সে পদ্ধতিতে কোনো ইতিহাসগ্রন্থ লিখিত হয়নি বটে, কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, 'ঋকবেদ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের শেষকাল পর্যন্ত পুস্তকসমূহে নানাবিধ সংবাদ রহিয়াছে যাহা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীন ভারতের জাতিতত্ত্ব, অর্থনীতি, ব্যবহার, ধর্ম, কৃষ্টি প্রভৃতির সঠিক সংবাদ উদ্ধার করা যায়।'

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি তিন খণ্ডের ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার সে বিশ্বাসকে সত্য বলে প্রমাণ করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোতে এই উপমহাদেশের ইতিহাসকে যেভাবে তিনি আলোকিত করে তুলেছেন, সে সম্পর্কে রাধারমণ মিত্র খুব সঠিকভাবেই মন্তব্য করেন–

'..প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যাহা অন্ধকার ছিল তাহা আলোকিত হইয়াছে, যাহা নিরর্থক ছিল তাহা অর্থপূর্ণ হইয়াছে, যাহা মৃত প্রাণহীন ছিল তাহা সজীব প্রাণবন্ত হইয়াছে। এখানেই ড. দত্তের কৃতিত্ব ও মৌলিকত্ব। তার পূর্বে কোনো দেশি বা বিদেশি ঐতিহাসিক বা ভারততত্ত্ববিদ এমনকি মার্ক্সবাদীও এ কাজ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই যারা ভারতের কাল্পনিক নয়, বাস্তব ইতিহাস জানিতে চান.. তারা সকলেই আচার্য ভূপেন্দ্রনাথের নিকট চিরঋণী থাকিবেন। মার্ক্সবাদী তো বটেই। কারণ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দেশে যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছে অথচ এ যাবৎ শ্রেণীসংগ্রামের উদাহরণ দিতে হইলে তাহাদের কথায় কথায় ইউরোপীয় ইতিহাসের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অতঃপর আমাদের দেশেই তাহারা প্রচুর উদাহরণ পাইবেন।'

তবু বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী লেখক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মনে করেন– 'ঐতিহাসিক হিসেবে ভূপেন্দ্রনাথকে এখনও তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। অথচ তিনি শুধু পথিকৃৎ নন, সফল ব্যাখ্যাকার। তথ্য সংগ্রহ করেই তার কাজ শেষ হয় না, বিষয়গতভাবে তার বিশ্লেষণ করেন একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মডেল হিসেবে এ কাজ গ্রাহ্য হওয়া উচিত।'

মডেল হিসেবে যে এ কাজ একেবারেই গ্রাহ্য হয়নি, এমন কথাও অবশ্য আমরা বলতে পারি না। প্রত্যক্ষভাবে যারা রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাস রচনা করেননি, এরকম অনেক মার্ক্সবাদী বিদ্বানও ভূপেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক পদ্ধতির সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ও জ্ঞানচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। যেমন-

দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদ সম্পর্কীয় গবেষণার মধ্য দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসচর্চার অনেক তথ্য-উপাত্ত তিনি উদ্ঘাটন করেছেন।
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে ভূপেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার বহন করেছেন, এরকম আরও অনেক বাঙালি সাধকের কথাই বলা যেতে পারে। এদেরই একজন ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী ও মনীষী রেবতী বর্মণ (১৯০৩-১৯৫২)। ভূপেন্দ্রনাথের কাছে পাঠ গ্রহণ করেই উনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তথা মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রেবতী বর্মণ তার নানা রচনায় মার্ক্সীয় ইতিহাস দর্শনকে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে এনেছিলেন।
তবু একালে যে-বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে ভূপেন্দ্রনাথের ও তার সাথীদের কীর্তির সঙ্গে পরিচিত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই ক্ষুদ্র হয়ে আসছে, সে কথাও অস্বীকার করা যাবে না। এ অবস্থাটি কোনোমতেই বাঞ্ছিত নয়।
বিশ শতকের শেষের দশকে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সমাপ্তি সাধিত হয়ে গেছে বলে সাব্যস্ত করে বসে আছেন যারা, যারা মনে করেন পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য ভূপেন্দ্রনাথের রচনাবলি পাঠ করা ও তার জীবন ও কর্মের খোঁজ নেওয়াটা একান্তই জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

লেখক: যতীন সরকার

দেবেন সিকদার



উপমহাদেশের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড দেবেন সিকদার ছিলেন একজন দৃঢ় মনোবল সম্পূর্ণ সাচ্চা কমিউনিস্ট। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত মাফিক পদক্ষেপ, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, মার্কসবাদী রাজনীতিতে স্বঘোষিত সমর্থক, কাজের মধ্যদিয়ে পার্টি সভ্য পদ লাভ, কর্মী থেকে পার্টি নেতৃত্ব সর্বোপরি মার্কসীয় দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ ও ঘটনাই যেন তাকে একজন বিজ্ঞ কমিউনিস্ট হিসেবে দাঁড় করিয়াছে।

শুধু তাই নয়, ১৯৬৭ সালে (সিলেট) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে তিনিই সর্বপ্রথম 'স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র কায়েম'র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহিত হয়। তার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল 'রাজশাহী জেল বিদ্রোহ' এবং 'আখ বিদ্রোহে'র তিনিই ছিলেন মূল রূপকার ও দিক-নির্দেশক। রাজনীতিতে তার দীর্ঘ ২২ বছর ঘটনাবহুল গোপন জীবনে আন্দোলন সংগ্রামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ব্যক্তি হিসেবে দেবেন সিকদার ছিলেন শান্ত প্রকৃতির, বিনয়ী ও স্বল্প ভাষী। সকলেই তাঁকে নানা বলে ডাকতেন। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার শোলকাটা গ্রামে একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে কমরেড দেবেন সিকদার জন্ম গ্রহণ করেন। মাতার নাম শ্রীমতি মাতঙ্গিনী দেবী। পিতা কৃষি কাজের পাশাপাশি পান, মরিচ, তামাক, দই-ঘোল, কাপড় ও মুদিখানা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবসা করতেন। ছোটকাল থেকে পিতার সাথে তার এসব কাজে অংশগ্রহণ ছিল। ১৯২৯ সালে বার বছর বয়সে সাত বছর বয়সি সাবিত্রী রানীর সাথে তার বিয়ে হয়। ওই বছরেই তিনি চতুর্থ শ্রেণি হতে লেখাপড়া বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম শহরের রহমতগঞ্জে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে গৃহ ভৃত্যের কাজ শুরু করেন। চাকুরি জীবনের দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে ২২ এপ্রিল গভীর রাতে ভয়ঙ্কর গোলাগুলি ও বন্দে মাতরম ধ্বনীতে সমস্ত শহর জেগে উঠলে লোক মুখে ও কানাকানিতে তিনি জানতে পারেন মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টলার বিপ্লবীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই ঘটনা জেনে তিনি আপন মনে সিদ্ধান্ত নেন যে, 'আজ থেকে আমিও একজন বিপ্লবী ও বিপ্লবীদলের সদস্য'। শুরু হয় তার রাজনৈতিক জীবন। সেই থেকে তিনি দৈহিকভাবে গৃহভৃত্য হলেও মানসিকভাবে একজন দৃঢ়মনা বিপ্লবী।

এরপর বিভিন্ন পেশা বদলের মধ্য দিয়ে তিনি চাকুরি নেন চট্টগ্রাম শহরের জেম্‌জ ফিনলে নামক এক বিলাতী জাহাজ কোম্পানির অফিসে পাখা টানার বয় হিসেবে। ১৯৩৩ সালে তিনি ওই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বার্মাগামী জলজাহাজে করে আরাকান গিয়ে পৌঁছান। আরাকানে তার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি শ্রী যোগেষ দত্ত ও মাতুল শ্রী বরদা চৌধুরী অবস্থান করতেন। সেখানে যাবার তার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী দলের পলাতক গোপন নেতাদের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠায় দলের পত্র বহন করা। আরাকান থাকাকালে তিনি ধানের গুদামে ও ইটের ভাটায় কুলির কাজ করেন। কয়েক মাস পরে চট্টগ্রাম ফিরে এসে পূর্বের চাকুরিতে বহাল হন। পরবর্তীতে 'পাখা বয়' থেকে প্রমোশনে দপ্তরী, পিয়ন এবং জরুরি পত্র বাহক হিসেবে সাইকেল পিয়ন পদে উন্নীত হন। বেতন বৃদ্ধি পেয়ে মাসিক তিন টাকা থেকে দাড়ায় বার টাকা বত্রিশ পয়সায়। ১৯৩৭ সালে তিনি আরও অনেকের সাথে সন্ত্রাসবাদ বর্জন করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চট্টগ্রামে জেলা শাখায় যোগদান করেন। কমরেড দেবেন সিকদার যেহেতু সর্বহারা শ্রমিক ছিলেন সেহেতু তিনি কাজ করতেন শ্রমিক ফ্রন্টে। ১৯৩৭ সালে বার্মা ওয়েল শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে কাজ করেন।

১৯৪০ সালে ৭ আগস্ট গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে তাকে চাকুরি থেকে বহিষ্কার করে গ্রামের বাড়িতে নজরবন্দীর নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি এই অন্যায় আদেশ সাহসের সাথে থানার দারোগার মুখে ছুড়ে দিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের হেড অফিসে গিয়ে অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে ওই হুকুম নামা পরিবর্তন করান। এতে তিনি নজর বন্দী রইলেন ঠিকই তবে গ্রামে নয় শহরের গুসাইডাঙ্গা নামক পাড়ায়। সেখানে তিনি পেশা বদল করে একটি ধোপা খানার শরিকদার হন। অন্যতম শরিকদার ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম আসামী আন্দামান (দিপান্তর) ফেরত কমরেড মালিন ঘোষ। এছাড়া দুবেলা খাওয়া থাকার বিনিময়ে শহীদ পুলিন ঘোষের কাকার বাড়িতে ছাত্র পড়াতেন। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 'গণযুদ্ধে' মোড় নেয়। ঐসময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে কমরেড দেবেন সিকদারের উপর থেকে নজরবন্দী আদেশ প্রত্যাহার হয়ে যায়। কিন্তু পার্টির নির্দেশে আরও দু'টি সেলের সাথে দেবেন সিকদারের সেলের কাজ গোপনে থেকে যায়। ১৯৪২ সালে ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামের কদুরখিল গ্রামে চট্টগ্রাম জেলা পার্টির প্রকাশ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালের দিকে কমরেড দেবেন সিকদার পার্টি সভ্যপদ লাভ করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রতিনিধি হয়েই সম্মেলন অংশ গ্রহণ করেন। প্রকাশ থাকে যে, ওই সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড পি.সি. যোশী ও অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে সারা বাংলায় মহামন্বন্তরে ৫০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়। পার্টি তখন শক্তিশালী ও কার্যকরী 'পিপলস রিলিফ কমিটি' গঠন করে। তিনি ওই সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কৃষি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৩ সালে তার জীবনে একটি বড় ধরণের ঝড় বয়ে যায়। পারিবারিক কলহ ও তার বেকারত্বজনিত কারণে দুলাল কান্তী নামে দেড় বছরের পুত্র এবং মঞ্জু নামে পাঁচ বছরের এক কন্যা সন্তান রেখে তার স্ত্রী সাবিত্রী রানী গলায় ফাঁসি দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা তার জীবনে বড় আঘাত হানে। পরবর্তীতে পার্টির আহ্বানে তিনি সার্বক্ষণিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে চট্টগ্রাম জেলার কোয়েপাড়া গ্রামে পার্টির চট্টগ্রাম জেলা সম্মেলনে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর কমিউনিস্টদের ব্যর্থতার কারণে

১৯৪৮ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৪/১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান নামে দু'টি দেশ স্বাধীন হলে পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি 'ভূখা মিছিল' করার সিদ্ধান্ত নিলে কমরেড দেবেন সিকদার জনতার মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে ভূখা মিছিল কর্মসূচির বিরোধিতা করেন। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ বার্মা দখল করে চট্টগ্রামের উপর আক্রমণ শুরু করলে জেলা পার্টির সিদ্ধান্ত ও জেলা পার্টি অফিসকে কেন্দ্র করে মুসলিমলীগ কর্মীদের অযথা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, পরিশেষে পুলিশের হয়রানী সব মিলে পার্টির কিছু নেতৃত্ব আত্মগোপনে কাজের সিদ্ধান্ত নিলে কমরেড দেবেন সিকদারের গোপন জীবন শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে কলিকাতায় গোপনে তৎকালীন পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান সেন্ট্রাল কমিটির কংগ্রেসে তিনি প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হন। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে যায়। ১৯৬৭ সালে (সিলেটে) পূর্ব পকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে প্রস্তাবিত দু'টি দলিল আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে যায়, প্রস্তাবিত তৃতীয় দলিলটি উপস্থাপন করেন কমরেড দেবেন সিকদার। প্রস্তাবিত দলিলটি প্রথম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পরে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়। এটা ছিল এক ঐতিহাসিক দলিল: ১. পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ব বাংলায় পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে, ২. পূর্ব বাংলা প্রধানত মার্কিন সমর্থক পাকিস্তানি শাসকদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, ৩. রাজনীতির মর্মবস্তু হবে 'স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র কায়েম করা। তবে কৌশলের কারণে পার্টি ও দেশের নাম হবে সাময়িকভাবে পূর্ব পাকিস্তান। প্রকাশ থাকে যে, এই কংগ্রেসে কমরেড দেবেন সিকদারের দলিল গৃহিত হবার পরও সুবিধাবাদীরা তাকে পার্টির নেতৃত্বে না রেখে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে রাখলেন। পার্টি কংগ্রেসের পর অন্যান্য নেতৃত্ব গৃহিত দলিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৯ মাস পার হবার পরও উপস্থাপন করেন না। অপর দিকে পার্টি নেতাদের কৌশলে গৃহিত দলিলকে বাইপাস করে সুবিধাবাদী চরিত্রের জন্য চট্টগ্রামের লালদিঘার পাড়ে ৫০ হাজার শ্রমিক জনতার সমাবেশে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের ঘোষণা দেওয়ার অপরাধে কমরেড দেবেন সিকদারসহ আরও কয়েকজন নেতাকে পার্টি বহিষ্কার করে। অতপর কমরেড দেবেন সিকদারের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে 'পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়'। কমরেড দেবেন সিকদার উক্ত পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। পার্টির দলিলে দেবেন সিকদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, 'পিন্ডী ও ওয়াশিংটনের আওতামুক্ত-স্বাধীন সার্বভৌম জনগণের গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র কায়েম করা'ই এই পার্টির মূল লক্ষ্য। এই দলিলের অপরাধে পার্টির সেক্রেটারি কমরেড দেবেন সিকদারের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৬৮-৬৯ গণ আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর সাথে উক্ত কর্মসূচিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র' গঠনের প্রবক্তা হিসেবে ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মামলা প্রকাশের ২ মাস পর ঢাকা জেল বিদ্রোহের ঘটনার চেষ্টা চালানোর অজুহাতে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে তাকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭১ সালে তিনি রাজশাহী জেলের প্রায় ১২৫০ জন কয়েদিকে সংগঠিত করে 'রাজশাহী জেল বিদ্রোহ' সফল করেন (১৯৭১-২৮ মার্চ)। জেল থেকে বের হয়ে ৪/৫ দিন দেশের মধ্যে পার্টির অন্যান্য নেতা কর্মীদের সাথে দেখা করার চেষ্টার পর তিনি ভারতে চলে যান। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ৭ মে ১৯৭১ বাংলাদেশের ভেড়ামারা থানায় এসে পূর্বের পার্টির নেতাদের সাথে কথা বলে

ঐক্যমতে আসতে না পেরে পুনরায় ভারতে চলে যান। ১৯৭২ সালে তার নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ মজদুর পার্টি' গঠিত হয়। এরপর বিপ্লবীদের ঐক্যের স্বার্থে 'বাংলাদেশের মজদুর পার্টি' ও বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল.) এক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। নব গঠিত পার্টির নাম হয় 'বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল.)।' মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্টদের বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছেন। ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে কমরেড দেবেন সিকদার 'আখ আন্দোলনে'র কারণে নাটোরের লালপুরে আসেন। নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস কেন্দ্রীয় আখ আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি আন্দোলনকে জাতীয় ভিত্তিতে রূপ দেবার জন্য চুয়াডাঙ্গার কেরু এন্ড কোং সুগার মিল মিলনায়তনে আখচাষীদের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে তার প্রস্তাবে 'বাংলাদেশ আখচাষী ইউনিয়ন' নামে আখচাষীদের কেন্দ্রীয় তথা জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে ঢাকা জেলা ক্রীড়া মিলনায়তনে আখচাষী ইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মেলনে তিনি 'বাংলাদেশ আখ চাষী ইউনিয়নে'র সভাপতি নির্বাচিত হন।

তার পরিকল্পনায় গ্রামে গ্রামে আখচাষীদেরকে সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন উৎসাহী নেতা-কর্মীরা। অপর দিকে তিনি ঢাকায় গিয়ে সকল বাম প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের নিয়ে সমন্বয় করতে থাকেন। ফলে ১৯৮৯ সালে আখ মাড়াইকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে উঠে, সর্বোপরি আখচাষীদের আন্দোলন রূপ নেয় 'আখ বিদ্রোহে'। মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেও তিনি আখ আন্দোলনের সফল নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৯৪ সালের ৯ জানুয়ারি মহাবিপ্লবী গণমানুষের নেতা সকলের নানা কমরেড দেবেন সিকদারের জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুর পর তার স্মৃতিকে ধারণ করার জন্য 'কমরেড দেবেন সিকদার কেন্দ্রীয় স্মৃতি পরিষদ' গঠিত হয়েছে। তার লেখা অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- 'বাংলাদেশে কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি ও কমিউনিস্ট ঐক্য প্রসঙ্গে', 'কমিউনিস্ট জাহাজগুলি জলে ভাসাবেন কারা', 'গল্পনয় ঘটনা, রাজনীতি কি ও কেন?', 'সমাজতন্ত্র কি ও কে?', 'জ্ঞানের উৎসাহ', 'দ্বৈত শোষণের যাতাকলে বাংলার আখচাষী তথা কৃষক সমাজ', বাংলার কৃষক আন্দোলন ও মাওলানা ভাসানী, হাতির ধর্মঘট, গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর ২২ বছরের গোপন জীবন, মহা আড়ম্বরে দূর্গা উৎসব প্রভৃতি।

লেখক: আনছার আলী দুলাল

নারায়ণ বিশ্বাস

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার বিশ্বাস বাথুলী গ্রামের এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে নারায়ণ বিশ্বাস ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বাস পরিবারের নামেই এ গ্রামের নামকরণ করা হয় বিশ্বাস বাথুলী। গ্রামের তিন-চতুর্থাংশ সম্পত্তির মালিক ছিল বিশ্বাস পরিবার। নারায়ণ বিশ্বাসের ঠাকুর্দা জগৎ দাস বিশ্বাস তালুক ক্রয় করে পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করেন। জগৎ দাস বিশ্বাস পৈত্রিক সূত্রেও তালুক পেয়েছিলেন। সব মিলে বিশ্বাস পরিবারের তালুক ছিল পাঁচটি। নারায়ণ বিশ্বাসের বাবা অবিনাশ বিশ্বাস ছিলেন তাই একজন ধর্ণাঢ্য জোতদার ব্যক্তি।

মা সরোজিনী বিশ্বাস। অবিনাশ বিশ্বাস ও সরোজিনী বিশ্বাসের চার ছেলে ও দুই মেয়ে যথাক্রমে সুশীল বিশ্বাস, বাণী বল্লভ বিশ্বাস, নারায়ণ বিশ্বাস, শম্ভু বিশ্বাস, মায়া বিশ্বাস ও বুড়ি বিশ্বাস। নারায়ণ বিশ্বাসের বাবা ছিলেন শিক্ষানুরাগী। ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য তার ছিল খুব আগ্রহ। বড় ছেলে সুশীল বিশ্বাস ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। নারায়ণ বিশ্বাসও লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন। অন্য ছেলেমেয়েরাও ছিলেন শিক্ষিত। পরিবারের বাইরে গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেও বিশ্বাস পরিবার কাজ করেছে। বিশ্বাস বাথুলী গ্রামে স্কুলের জন্য জমি দান করেছিলেন নারায়ণ বিশ্বাসের পরিবার। স্কুল ছাড়া এলাকার বাজারের জন্যও জমি দিয়েছিল এ পরিবার।

নারায়ণ বিশ্বাসের ছেলেবেলা কেটেছে এ গ্রামে। তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় নিজ গ্রাম বাথুলীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে কয়েক মাইল দূরে জামুর্কীর নবাব স্যার আব্দুল গণি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র নারায়ণ বিশ্বাস নিয়মিত স্কুলে যেতেন এবং মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতেন। এ স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেন। পাসের পর ১৯২৫ সালে ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই তার রাজনীতিতে হাতেখড়ি। স্কুল জীবনেই লেখাপড়া আর রাজনীতি হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে চলতে থাকে।

১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংলায় এক বিরাট গণজাগরণের সৃষ্টি করে। ১৯২১ সালে আন্দোলন জঙ্গিরূপ ধারণ করলে চৌরিচৌরার (যুক্তপ্রদেশ) থানা আক্রমণের ঘটনায় মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন মাঝ পথে থামিয়ে দেন। এতে তরুণদের মধ্যে গভীর হতাশা নেমে আসে। ফলে তরুণদের মধ্যে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পায়। সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ড গ্রাম বাংলায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে যোগদান করে। বাংলায় তখন দু'টি প্রধান সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী দল ছিল। একটি যুগান্তর দল, অন্যটি অনুশীলন সমিতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় থেকেই টাঙ্গাইলে অনুশীলন সমিতি গড়ে ওঠে। সমিতিতে বেশ কিছু সদস্য তখন সক্রিয় ছিল। অনুশীলন সমিতির সংগঠন ছিল খুব সুশৃঙ্খল। সমিতির সদস্যদের দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হত। বিভিন্ন আখড়ায় এদের নিয়ে চলত শরীরচর্চা এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করার পালা। সদস্যদের অস্ত্র চালনা ও বোমা নিক্ষেপের প্রশিক্ষণও দেওয়া হত। নারায়ণ বিশ্বাস গ্রামে থাকতেই সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতিতে নাম লেখান। সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে নিজ এলাকায় কাজ করার পর তিনি কলেজে পড়তে ঢাকা যান।

১৯২৫ সালে ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। ঢাকায় তখন অনুশীলন সমিতি আর যুগান্তর দলের ব্যাপক বিস্তার ঘটে গেছে। ১৯০৭ সালের মধ্যে অনুশীলন সমিতির ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঁচশটি শাখা খোলা হয়। নারায়ণ বিশ্বাস সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রাখেন। জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ পাশ করার পর তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স পড়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরও তিনি একজন বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী। একদিকে লেখাপড়া, অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন।

এভাবেই তখন চলছে তার দিন। ১৯৩০ সালে মাষ্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে ৯৫ জনের একটি দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বিপ্লবী দল চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার, ব্যারাক ও রেলস্টেশনে আক্রমণের মাধ্যমে ১৮ এপ্রিল রাত ১০টায় অভ্যুত্থানের সূচনা করে। শহর ১০ দিন পর্যন্ত বিদ্রোহীদের দখলে থাকে। ব্রিটিশরা চট্টগ্রাম বন্দরে তাদের সৈন্যদের একত্রিত করে। কলকাতা থেকে আরো সৈন্য আসার জন্য সাহায্য চাওয়া হয়। সে সময় বিদ্রোহীরা মূল শহর ত্যাগ করে শহরতলীতে পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এখান থেকে অভ্যুত্থান দমন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহীরা আত্মরক্ষামূলক গুলি চালাতে থাকে। দুঃসাহসিক এই অভিযানে ব্রিটিশদের অস্ত্রাগারগুলো লুট করে নেয় বিদ্রোহীরা। এই অভ্যুত্থানের ঘটনায় অনেক বিপ্লবী নিহত হয়, অনেকের জেল ও ফাঁসি হয়।

চট্টগ্রামের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঘটনা সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে বাংলায়। বৈপ্লবিক আন্দোলন শহর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ সময় ব্রিটিশরা ব্যাপক দমননীতি চালায় এবং বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে থাকে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই তরুণ যুবকদের গ্রেফতার করা শুরু হয়। নারায়ণ বিশ্বাস এসময় খুব সাবধানে চলাফেরা করতে আরম্ভ করেন। সাবধানে চলাফেরা করলে কী হবে? একসময় ঠিকই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। ১৯৩০ সালে কার্জন হলে তার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। তিনি খুব সাবধানে এসে পরীক্ষা দিচ্ছেন। পরীক্ষা প্রায় শেষ, আর একটা পরীক্ষা হলেই শেষ হবে অনার্স ফাইনাল। গ্রেফতার হওয়ার আশংকায় খাতায় নামও লেখেন নি কিন্তু নাম না লিখলেও পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে পরীক্ষার হল থেকে ধরে নিয়ে গেল। সে কারণে তার পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স পাস করা আর হল না। বিজ্ঞানের ছাত্র নারায়ণ বিশ্বাস পরের বছর ঢাকা জেলখানায় বসে বি.এ পরীক্ষা দিয়ে ভাল ফল করেন।

ঢাকা জেলে পরীক্ষা শেষ হলে তাকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তর করা হয়। জেলে কমিউনিস্ট নেতাদের সংস্পর্শে এসে তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। জেলখানার ভিতরেও কর্তৃপক্ষের অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। নারায়ণ বিশ্বাসের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই রাজশাহী জেলের অন্য বন্দীদের ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে তিনি কর্তৃপক্ষের অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দাবি আদায় করেছেন। রাজশাহী কারাগারের ভেতর অনেকগুলো আম গাছ ছিল। কয়েদীরা কোনোদিন সে আম খেতে পারত না। আমগুলো জেলখানার কর্মকর্তা আর কর্মচারীরাই শুধু খাবে, এটাই যেন নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আন্দোলন করে এ নিয়ম ভেঙেছিলেন। তিনি যতদিন রাজশাহী জেলে ছিলেন ততদিন কয়েদীদের দিয়ে আম পাড়িয়ে সবার মধ্যে ভাগ করে দিতেন। নারায়ণ বিশ্বাস রাজশাহী জেল থেকে মুক্তি পেলে কিছুদিন পর আবার গ্রেফতার হয়ে বীরভূমের সিউড়ি এবং কলকাতা সেন্ট্রাল জেলে কাটান। কয়েক বছর জেল খেটে মুক্তি পান।

মুক্তি পাওয়ার পর নারায়ণ বিশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এল.এল.বি-তে ভর্তি হন। সেখান থেকে এল.এল.বি পাস করেন। জেল, জুলুম, হুলিয়ার পরও নারায়ণ বিশ্বাস সবগুলো পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তার ইংরেজি ভাষায় দখলও ছিল খুব ভাল। আইনে লেখাপড়া শেষ করলেও রাজনীতিই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। যে কারণে রাজনীতি বাদ দিয়ে আইন পেশা কখনো তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে নি। তিনি টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের আদালতে ওকালতি করলেও তা করেছেন মূলত গরিব মানুষ ও রাজনীতিকদের জন্য। যাদের কাছ থেকে কোনো টাকাই তিনি নিতেন না।

নারায়ণ বিশ্বাস ওকালতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে রাজনীতিতে 'হোলটাইমার' বা সার্বক্ষণিক হিসেবে নিয়োজিত হলেন। উচ্চবিত্ত শ্রেণির সন্তান, জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দাঁড়ালেন শ্রমিক কৃষকদের কাতারে। বেছে নিলেন সাধারণ জীবন-যাপন। বাবার ইচ্ছে ছিল বড় ছেলে সুশীল বিশ্বাসের মতো নারায়ণ বিশ্বাসও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবে। কিন্তু তিনি হলেন রাজনীতিক। নারায়ণ বিশ্বাস যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তার দাদা সুশীল বিশ্বাস পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন তারপরে ১৯৬২-৬৭ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি দাদার কারণে ভর্তিও হলেন পদার্থ বিজ্ঞানে কিন্তু রাজনীতি করতে গিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে পাস করা হল না। তবে অধ্যাপক বা অর্থবিত্তের মালিক না হলেও একজন কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

পূর্ববঙ্গে ১৯৩৭-৩৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সংগঠন গড়ে উঠতে থাকলে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন ছেড়ে পার্টিতে যোগদান করেন। পার্টি সংগঠন গড়ে ওঠার ফলে আন্দোলন-সংগ্রামে পার্টির শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সময় বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে পার্টি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নারায়ণ বিশ্বাসও সংগ্রামের পাশাপাশি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন।

১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি ময়মনসিংহ জেলা কমিটি গঠিত হওয়ার পর টাঙ্গাইল মহকুমা পার্টি গঠনের কাজ শুরু হয়। নারায়ণ বিশ্বাসের তৎপরতায় পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। বেশ কিছু ছাত্র ও তরুণের সঙ্গে নারায়ণ বিশ্বাস ও পার্টি সদস্য বিন্দুবাসিনী স্কুলের এক শিক্ষক যোগাযোগ স্থাপন করেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে পার্টি সদস্য হন। সে সময় হারান সেন নামে একজন পার্টি সদস্য ষড়যন্ত্রমূলক মামলার কারণে রংপুর অঞ্চল থেকে টাঙ্গাইলে আত্মগোপন করে কাজ করতেন। বাশাইলের যতীন বোসও তখন টাঙ্গাইল শহরে থেকে কাজ করতেন। টাঙ্গাইল পোস্ট অফিসের পোস্ট মাষ্টারের ছেলে কানাই লাল ব্যানার্জী বিন্দুবাসিনী স্কুলের ছাত্র থাকাবস্থায়ই চল্লিশের দশকের গোড়াতে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৪৭ সালে তার বাবার চাকুরির বদলির কারণে কলকাতায় চলে গেলে তিনিও চলে যান। চল্লিশের দশকে টাঙ্গাইলে আরো যারা পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে মুসলিম লীগ ছেড়ে আসা সৈয়দ নওয়াজের আলী, বরকত আলী, আন্দামান জেল থেকে মুক্তি পাওয়া নরেন ঘোষ, বিনয় ভূষণ সরকার, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, অঞ্জলি ঘোষ, কালিপদ চক্রবর্তী, তার দিদি সূর্য বাগচী, শিবনাথ স্কুলের শিক্ষক জ্ঞান রায়, তার ছেলে ঢাকার শ্রমিক নেতা সত্য রায়, কংগ্রেস থেকে আসা আশুতোষ রায়, সোফিয়া খান, রোকেয়া বেগম খন্দকার, আব্দুল বাকি, উপেন মালাকার প্রমুখ অন্যতম। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে

উপেন মালাকার, খন্দকার বাকি ও সোফিয়া খান টাঙ্গাইলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাথমিক সাংগঠনিক কাঠামোও তৈরি করেছিলেন নারায়ণ বিশ্বাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যের অভাবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। সময়টি ছিল বাংলা ১৩৫০ সাল। দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যায়। এ দুর্ভিক্ষ ছিল ব্রিটিশ সৃষ্ট। ব্রিটিশ প্রশাসনের বণ্টন ব্যবস্থার দুর্বলতা, খাদ্য ঘাটতি সত্ত্বেও অব্যাহত শস্য রপ্তানি এর জন্য দায়ী। এ সময় ভারতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় খাদ্য আমদানি না করে ১০ লক্ষ টন খাদ্য রপ্তানি করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ফ্যাসিবাদী জাপানের আক্রমণে কোনঠাসা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পূর্ববঙ্গ হতে সরকারের মজুত খাদ্য যানবাহন ও নৌকায় করে সরিয়ে নেয়। এর ফলে হঠাৎ করে দ্রুত খাদ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধি পেয়ে তা ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি যুদ্ধের আগের তুলনায় দশগুণেরও বেশি দাঁড়ায়। জাপানি আক্রমণের কারণে ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সৈন্যরা পালাতে থাকে। ১৯৪২ সালে জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে দ্রুত সেটি দখল করে নেয়। বার্মায় ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয় হয়। যুদ্ধে ইন্দো-ভারতীয় বাহিনীর অনেক সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। বাকিরা ভারতের দিকে পশ্চাদপসারণ করে। যুদ্ধ ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধারণা করেছিল জাপানি আক্রমণের হাত থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। যে কারণে ব্রিটিশ প্রশাসন সরকারের নির্দেশে মজুত খাদ্য এবং সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন পূর্ববঙ্গ হতে ভারতের অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়। ফলে এ অঞ্চলে খাদ্যের অভাব দেখা দেয় এবং যানবাহন সরিয়ে নেওয়ার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। জাপানিদের আক্রমণের মুখে ব্রিটিশ সৈন্যরা এ অঞ্চলের মানুষকে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ফেলে রেখে পালাতে থাকে। এ অবস্থায় শুরু হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা। খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তীব্র সংকট দেখা দেয়। সুযোগ বুঝে কিছু বড় ব্যবসায়ী মুনাফার লোভে ধান, চাল ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য মজুদ করতে থাকে।

এতে খাদ্যদ্রব্যের সংকট আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য কৃষক, ক্ষেতমজুর ও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে অনেকে টাকা দিয়েও খাদ্যের অভাবে খাদ্য কিনতে পারেন নি। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে একশ্রেণীর মজুতদার এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে 'ভাত দাও, ফ্যান দাও' বলে চিৎকার করতে করতে ক্ষুধার তাড়নায় উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ মানুষ লুটিয়ে পড়তে থাকে বাড়িঘর, অলিগলি, রাজপথ ও মাঠে-ময়দানে। এভাবে না খেতে পেয়ে মৃত্যুবরণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

এ ভয়াবহ অবস্থার সবচেয়ে বেশি শিকার হয় ক্ষেতমজুর, গ্রামের গরিব মানুষ, শহরের শ্রমজীবী মানুষ ও বস্তিবাসী। দুর্ভিক্ষের বলি হয় শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সকলেই। দুর্ভিক্ষের কারণে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যায়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ ভুলে যায় নীতি-নৈতিকতা। কৃষকরা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে হারাতে থাকে জমিজমা। ভয়াবহ এ দুর্ভিক্ষে বাংলায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করেন। ময়মনসিংহ জেলায় প্রাণ দিতে হয়

৫০ হাজারের মত লোককে। ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয় অনেকগুলো লঙ্গরখানা। পার্টির উদ্যোগে খোলা এ লঙ্গরখানাগুলোতে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা সদস্যরাও অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যেখানে লঙ্গরখানা খোলা সম্ভব হয় নি সেখানে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের কাছে তা পৌছে দেয়া হয়। দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতার তুলনায় পার্টির এ উদ্যোগ ছিল সামান্য। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা ছাড়াও সমাজের বিবেকবান মানুষ ও অন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও এগিয়ে এসেছিলেন এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকে মোকাবেলা করার জন্য।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় নারায়ণ বিশ্বাস দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন জীবন বাঁচাতে নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়াই ছিল তার প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য। দুর্ভিক্ষের সময় নারায়ণ বিশ্বাস টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ শহরে কাজ করেছেন। তিনি এ সময় বিভিন্নভাবে চাল, আটা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে সাহায্য করার জন্য সরকারের উদ্যোগে যে 'ফুড কমিটি' হয়েছিল তিনি ছিলেন সে কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য। টাঙ্গাইলের এ কমিটিতে কংগ্রেস ছাড়াও মুসলিম লীগের নেতারাও সদস্য হিসেবে ছিলেন। এ কমিটি সরকারি সাহায্য হিসেবে যেসব খাদ্যশস্য আসত সেগুলো বণ্টন করতেন। 'ফুড কমিটি' টাঙ্গাইল শহরসহ কয়েকটি জায়গায় লঙ্গরখানা খুলেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগেও খোলা হয়েছিল কয়েকটি লঙ্গরখানা। নারায়ণ বিশ্বাস কর্মী বাহিনী গঠন করেছিলেন। কমিউনিস্ট কর্মী বাহিনী নিয়ে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পার্টি ব্রিটিশ সরকার ও তাদের দোসর মজুতদার মুনাফাখোরদের মুখোশ জনগণের সামনে খুলে দিতে ব্যাপক প্রচার চালায়। এতে সরকার ও মজুতদারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। প্রচার চালানোর পাশাপাশি পার্টি নেতৃত্ব বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতের পাঞ্জাবসহ অন্যান্য অঞ্চলে খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ সংগ্রহে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। এ সময় পার্টির আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ভারতের গণনাট্য সংঘ'। গণনাট্য সংঘ বিভিন্ন স্থানে নাটক ও গানের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরে। কলকাতা শহরেও গণনাট্য সংঘ যে অনুষ্ঠান করেছিল তা দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য খুব কার্যকরী হয়েছিল। সে সময় কিছু নাটক সারা বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও 'জবানবন্দী' দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। নাটকগুলো দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে থাকা মানুষকে বাঁচানোর জন্য পার্টির নেতা-কর্মীরা নেমে পড়েন ত্রাণ কাজে। কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী, পার্টি সমর্থক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করে পার্টি। কলকাতা ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে সরকারের খোলা লঙ্গরখানায় পার্টি কর্মীরা অক্লান্তভাবে কাজ করে। পার্টির উদ্যোগেও বিভিন্ন জায়গায় লঙ্গরখানা খোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় তাতে কমিউনিস্ট পার্টি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ায় এবং যুদ্ধে নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিবাদী ইতালী ও জাপানের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তিকে সমর্থন করে। কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় সাংগঠনিক তৎপরতাও অব্যাহত রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। লালফৌজের প্রবল আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত হয়ে যায় নাৎসি বাহিনী। লালফৌজের কাছে বার্লিনের পতন হলে ১৯৪৫ সালের ৯ মে নাজি বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। খবর পেয়ে দুনিয়া জয়ের স্বপ্নে বিভোর হিটলার বার্লিন শহরের এক ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে আত্মহত্যা করেন। জার্মানির পতনের পর ইতালির পতন হয়। গণঅভ্যুত্থানে ইতালির একনায়ক ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি রোমের রাস্তায় প্রতিবাদী জনতার হাতে মৃত্যুবরণ করেন। ফ্যাসিস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়ের ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জোরদার হয়। জেগে ওঠে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ। দেশে দেশে তীব্র হতে থাকে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ঝাঁপিয়ে পড়ে। পার্টি এ সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করে। পার্টির নেতৃত্বে এ সব সংগ্রামে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের গণজাগরণের ঢেউ বাংলার সব জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। 'ভিয়েতনাম দিবস' উপলক্ষে ময়মনসিংহ শহরে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এ বিক্ষোভে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল ও কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। 'ভিয়েতনাম দিবস'-এর বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশ গুলি চালালে ময়মনসিংহ শহরে অমলেন্দু নামে একজন ছাত্রকর্মী শহীন হন। নারায়ণ বিশ্বাস পার্টির নীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে নারায়ণ বিশ্বাসের স্বপ্ন ছিল একটি শোষণহীন অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন ভারত। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রে কমিউনিস্টদের ওপর জুলুম নির্যাতন অব্যাহত থাকে। মুসলিম লীগ সরকার দেশ পরিচালনায় প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তীব্র দমন পীড়ন চালাতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে অনেক আন্দোলন সংগ্রামের ফলে সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের জেলখানায় রাজবন্দীর মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছিল। যে কারণে জেলে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা বিশেষ মর্যাদা পেতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার তা বাতিল করে দেয়। এতে জেলখানায় রাজবন্দীরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ব্রিটিশ আমলে ১৯৪০ সালে যে 'সিকিউরিটি প্রিজনার্স রুলস' ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালে সরকার তা বাতিল করে দেয়। সরকার যুক্তি দেয়, 'ব্রিটিশ আমলে যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে তাদের দেশপ্রেমিক হিসেবে বিবেচনা করা হত। কারণ তখন দেশে বিদেশি শাসন ছিল। এখন আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছি, স্বাধীন হয়েছি। এখন যারা রাজবন্দী তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে স্বাধীনতা বিপন্ন করার চেষ্টা করছেন। তাদের দেশপ্রেমিক হিসেবে বিবেচনা করার কোনো কারণ নেই।' রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সরকার এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে জেলখানায় বন্দীদের সঙ্গে চোর-ডাকাতদের মতো আচরণ শুরু হয়। আইনত তারা তৃতীয় শ্রেণির বন্দী না হলেও তাদের

সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদীদের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হত। এর প্রতিবাদে সারাদেশে জেলখানায় অনশন ধর্মঘট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হয়েছিল সব জেলের বদলিকৃত বন্দীদের মাধ্যমে।

পরিকল্পনা মত কমিউনিস্ট বন্দীরা প্রথম অনশন ধর্মঘট শুরু করেন ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ থেকে। এ সময় জেল কর্মচারী ও সরকারি কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নেওয়ার মৌখিক আশ্বাস দিলে ১৫ মার্চ ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। এতে নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের সঙ্গে আলোচনা করেই দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেয়। কিন্তু কোনো দাবিই মানা হয় না। প্রথম ধর্মঘট হয় রাজশাহী জেলে, একটানা ৩৮ দিন চলার পর দাবি আদায় ছাড়াই তা প্রত্যাহার করা হয়। অন্যান্য জেলেও ঢাকার চেয়ে বেশি দিন ধর্মঘট চলে কিন্তু দাবি আদায় ছাড়াই প্রত্যাহার করতে হয়। প্রথম ধর্মঘট সফল না হওয়ায় মে মাসে দ্বিতীয় ধর্মঘট শুরু হয়। দ্বিতীয় ধর্মঘটের সময় শৃঙ্খলার ওপর জোর দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় পার্টির অনুমতি ছাড়া কেউ অনশন ভঙ্গ করলে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে। দ্বিতীয় ধর্মঘট ঢাকায় চলে চল্লিশ দিন। রাজশাহীতে চলে একচল্লিশ দিন। প্রথম ধর্মঘটের মতো এই ধর্মঘটও ভঙ্গ করা হয় দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাসের ভিত্তিতেই। এবার আশ্বাস দেন জেলমন্ত্রী মফিজ উদ্দীন আহমদ, মুসলিম লীগ এম.এন.এ ফকির আব্দুল মান্নান ও কংগ্রেস দলীয় এম.এন.এ মনোরঞ্জন ধর। প্রতিনিধি দল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর সরকার দাবি না মেনে জুলুম-নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ধর্মঘটীদের দেশদ্রোহী বলে উল্লেখ করে।

এরপর শুরু হয় তৃতীয় অনশন ধর্মঘট। তৃতীয় ধর্মঘট ঢাকায় চলে চল্লিশ দিন। রাজশাহীতে চলে পঁয়তাল্লিশ দিন। তৃতীয় ধর্মঘটের পর রণেশ দাশগুপ্ত, ব্রজেন দাস, দেবেশ ভট্টাচার্য ও নারায়ণ বিশ্বাসসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার পর জেলে বিচার শুরু হয়। রাজবন্দীরা আইনজীবীর মাধ্যমে মামলায় লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজবন্দীরা আইনজীবীর পরামর্শ মতো মামলায় হাজির হওয়া থেকে বিরত থাকেন। তারা এ বিষয়ে তাদের অপরাগতার কথা বিচারককে জানিয়ে দেন। আইনজীবীর এ পরামর্শের কারণে রাজবন্দীদের শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নি। তারা সাজা না পেলেও অনশনের ষষ্ঠ দিনে ৬ নম্বর সেলের মধ্যে বুকের ওপর চড়ে জোর করে খাওয়ানোর সময় শিবেন রায়ের মৃত্যু হয়। ডাক্তার থাকার নিয়ম থাকলেও ডাক্তার ছাড়াই ওয়ার্ডাররা খাওয়ানোর সময় ফুসফুসের মধ্যে নল ঢুকে ফুসফুস ছিদ্র হয়ে তার মৃত্যু হয়। খুলনা জেলে বিষ্ণু বৈরাগীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ধর্মঘট ঢাকায় চলে আটান্ন দিন। রাজশাহীতে চলে চৌষট্টি দিন। ঢাকা জেলে মহিলা বন্দী নাদেরা বেগমের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে চতুর্থবার ধর্মঘট হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর এ ৯ মাসে চার বার অনশন ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে রাজবন্দীরা। এতে মোট ১৫০ দিনের মতো ধর্মঘট করেছিলেন রাজবন্দীরা। শেষ পর্যন্ত নূরুল আমিন সরকার বন্দীদের কিছু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। এরপর সকলে মিলে অনশন ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জেলখানায় আমরণ অনশনের মাধ্যমে এ মরণপণ লড়াই ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ অনশন আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে জেলখানায় প্রথম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ আন্দোলন। পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িকতা-শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেলে যাওয়া, আর হত্যা-চুরি-ডাকাতি করে জেলে

যাওয়া এক কথা নয়। রাজবন্দীরা জেলে অনশনের মাধ্যমে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ১৯৪৯ সালে যখন মানবাধিকারের ধারণাই আমাদের এখানে তৈরি হয় নি সে সময় জেলখানায় এ ধরনের আন্দোলন করা এবং কিছু হলেও দাবি আদায় করা কমিউনিস্টদের দৃঢ়তা এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নারায়ণ বিশ্বাস ঢাকা জেলে ঐতিহাসিক এ আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন অসম সাহসিকতা আর দৃঢ়তার সাথে। কমরেড মণি সিংহের 'জীবন সংগ্রাম' বইয়ে নারায়ণ বিশ্বাসের অনশন ধর্মঘটে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নারায়ণ বিশ্বাস জেলখানায় ঐতিহাসিক আন্দোলনের পর আরো অনেকের সঙ্গে মুক্তি পান। এ সময় তিনি টাঙ্গাইলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবার যোগাযোগ গড়ে তোলার সুযোগ পান। টাঙ্গাইলে তার যাতায়াত বেড়ে যায়। নূরুল আমিন সরকার কৃষক আন্দোলনের ওপর তীব্র দমননীতি চালানোর পর কমিউনিস্ট পার্টির সভা-সমাবেশে পুলিশ ও মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের মাধ্যমে মিলিত আক্রমণ চালানো শুরু করে। ১৯৪৮-৪৯ সালের দিকে মুসলিম লীগের এ গুণ্ডামি ঢাকায় ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে নবাবপুর রোডে কমিউনিস্ট পার্টির বইয়ের দোকান মুসলিম লীগের গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে লুট করে। কোর্ট হাউজ স্ট্রিটের পার্টি অফিসে মুনীর চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, সরদার ফজলুল করিমের মতো ব্যক্তিরাও তখন লীগের গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। হাজার খানেক লোক অফিস ঘেরাও করে আক্রমণ করে, তখন অফিসের ভিতরে থাকা মাত্র কুড়িজন যুবক সাহসের সাথে তা প্রতিরোধ করেন। আধঘন্টাব্যাপী খণ্ডযুদ্ধের পর গুণ্ডারা চলে যায়। সভা-সমাবেশে আক্রমণ করে নেতাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা এবং পুলিশের সেখানে গিয়ে গ্রেফতার সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম লীগের এ গুণ্ডামি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা বহুদিন অব্যাহত থাকে। ময়মনসিংহ জেলায়ও তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় পার্টির প্রকাশ্য কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক নেতা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান।

টাঙ্গাইলে নারায়ণ বিশ্বাসের ওপর মুসলিম লীগের গুণ্ডারা আক্রমণ করে তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এতে টাঙ্গাইলের গণতান্ত্রিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এভাবে আক্রমণের পরও মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের কোনো শাস্তিই সরকার দেয় নি অথচ প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটানো হয় এ ঘটনা।

ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে ব্রিটিশ পুলিশ নারায়ণ বিশ্বাসকে টাঙ্গাইল থেকে গ্রেফতার করে। ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে বিক্ষোভ আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ পুলিশ তখনও অনেককে গ্রেফতার করে। নারায়ণ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে ফৌজদারি আদালত প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে ফৌজদারি আদালত জেলা সেটেলমেন্ট অফিসে রূপান্তরিত হয়েছে। আদালতে নিয়ে তাকে প্রকাশ্যে লাঠিপেটা করে নির্যাতন করা হয়। এ খবর শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লে আদালত প্রাঙ্গণে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। সমবেত মানুষ ব্রিটিশ পুলিশের এ আচরণের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানায়। নির্যাতনের পর পুলিশ তাকে জেলখানায় পাঠায়। নারায়ণ বিশ্বাস কিছুদিন পরই মুক্তি পান।

ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত রূপ লাভ করলেও আন্দোলনের শুরু ১৯৪৮ সাল থেকেই। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই প্রস্তাব করেন উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের

প্রথম অধিবেশন বসলে একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে তিনি এ দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও মন্ত্রী গজনফর আলী বলেন, 'উর্দু কোন প্রদেশের ভাষা নয়, উর্দু হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির প্রতীক।' পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরা একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে, কাজেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।' মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধিতার মুখে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। মুসলিম লীগের বাঙালি সদস্যরাও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। প্রস্তাব বাতিল হলেও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এ সংবাদে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের পর বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা করে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে অভিনন্দন জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভা ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সব জেলায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ধর্মঘট সফল করার জন্য ছাত্ররা ব্যাপক তৎপরতা চালায়।

ইতোমধ্যে সভার পর ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি, গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও তমুদ্দুন মজলিস প্রভৃতি সংগঠন নিয়ে 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। 'সংগ্রাম পরিষদ'-এর ডাকে হাইকোর্ট, সচিবালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ ধর্মঘট আহ্বানকারীদের প্রতি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। হাইকোর্টসহ বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করার সময় ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। 'সংগ্রাম কমিটি'র নেতা নঈমউদ্দীনের বিবৃতির মাধ্যমে জানা যায়, ১১ মার্চের ধর্মঘটের সময় বিভিন্ন ঘটনায় আহতের সংখ্যা দুইশত জন, গুরুতর আহত আঠার জন, পুলিশ গ্রেফতার করে নয়শতজন আন্দোলনরত নেতাকর্মীকে। এদের মধ্যে উনসত্তর জনকে জেলে রেখে বাকিদের মুক্তি দেওয়া হয়।

১১ মার্চের গ্রেফতার নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৩, ১৪ ও ১৫ মার্চ ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর, যশোরে ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। আন্দোলনে ভয় পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুউদ্দিন 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতাদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যাপারে একমত হন। নাজিমউদ্দিনের সাথে 'সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতাদের আলোচনার সময় তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। তর্ক-বিতর্ক হলেও ১৯ মার্চ ছিল জিন্নাহ সাহেবের প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরের তারিখ। ফলে খাজা নাজিমউদ্দিন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আপোষে বাধ্য হন। কালক্ষেপণের কোনো সুযোগ তখন ছিল না। আলোচনায় তিনটি শর্তে আপোষ হয়। শর্ত তিনটি হচ্ছে- ক. আন্দোলনের কারণে ধৃত সকল রাজবন্দীর মুক্তি দেয়া। খ. বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম করা এবং ইংরেজি উঠে যাওয়ার পর বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা। গ. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা।

আপোষের পর 'সংগ্রাম পরিষদ' আন্দোলন প্রত্যাহার করলে নাজিমউদ্দিন মন্ত্রী সভা আপোষের তৃতীয় শর্তটি পূরণ না করে বিশ্বাসঘাতকতা করে। পূর্ব নির্ধারিত ১৯৪৮ সালের

১৯ মার্চ মুসলিম লীগ প্রধান ও পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সফরে এসে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার লোকের সামনে দম্ভভরে ঘোষণা দেন, 'উর্দু, এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এ ঘোষণার ফলে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কার্জন হলের এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতার সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'উর্দু' হবে বলে আবার ঘোষণা করেন। তখন কয়েকজন ছাত্র 'নো নো' বলে প্রতিবাদ করেন। এ সব ঘটনার পর ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে যায়। আন্দোলন তখনকার মত থেমে গেলেও মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পায়। বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণে জিন্নাহ সাহেবের জনপ্রিয়তাও হ্রাস পায়। ১৯৪৮ সালে নারায়ণ বিশ্বাস ঢাকায় ছিলেন। সে সময় তিনি কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে মুসলিম লীগের গুণ্ডারা কমিউনিস্ট পার্টির সভা-সমাবেশের ওপর হামলা এবং নেতাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা শুরু করে। এমনকি মেয়েদের সমাবেশও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। অন্যদিকে সরকারের তীব্র দমননীতি, গুণ্ডা বাহিনী আর পুলিশের মিলিত আক্রমণের ফলে অনেক নেতাই '৪৮ সালের মাঝামাঝি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। আত্মগোপনে থেকেই নেতৃবৃন্দ আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করতেন। গোপন বৈঠক, সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য যোগাযোগ এ সবই চলত খুব সাবধানে। কারণ, পুলিশের চোখে পড়লেই গ্রেফতারের ভয় ছিল।

আত্মগোপনে থাকার পরও নারায়ণ বিশ্বাস ১৯৪৮ সালে আরো অনেক নেতার সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে যান। জেলে ১৯৪৮ সালের ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটের পর মুক্তি পান । ১৯৪৮ সালের ধর্মঘটের পর '৫০ সালে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে অনশন ধর্মঘটে সাত জন কমিউনিস্ট নেতা পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। একই সময় দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। দাঙ্গার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে থাকে। ১৯৪৭ সালের পর নতুন করে এ দেশত্যাগ পার্টিকে আবার দুর্বল করে দেয়। এ সব বিপর্যয়ের পাশাপাশি তখন কতগুলো ইতিবাচক ঘটনাও ঘটে। এর মধ্যে '৫০-এ কোরিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি আন্দোলনের সূচনা, প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ ও পার্টি সমর্থকদের নিয়ে ১৯৫১ সালে অসাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠন 'যুবলীগ' গঠন, সংবিধানের মৌলনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতি।

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় মুসলিম লীগের সম্মেলনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্য অনুসরণ করে বলেন-'উর্দু, এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এ বক্তব্যের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ক্ষোভ রাজনীতিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করে। '৫২ সালে এসে মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা অনেকখানি হ্রাস পায়। দমনপীড়ন, দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি ও দুর্নীতির কারণে সরকারের প্রতি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় অধিকার বোধ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

খাজা নাজিমুদ্দিনের ওই ঘোষণার ফলে ৩০ জানুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট করে। একই দিন আন্দোলন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দল ও সংগঠন নিয়ে

একটি 'সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকা বার লাইব্রেরিতে গঠিত হয়। 'সংগ্রাম পরিষদ' ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালনের ডাক দিয়ে সারাদেশে সভা, মিছিল ও ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। 'সংগ্রাম পরিষদ'-এর এ কর্মসূচি বানচাল করার জন্য প্রতিক্রিয়াশলী নূরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঢাকার ছাত্র সমাজ সরকারের এ নিষেধাজ্ঞা মেনে নেয় নি। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্রদের ছোট ছোট মিছিল একটার পর একটা বের হতে থাকে। ভাষার দাবিতে ছাত্রদের এ শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে বরকত, সালাম, জব্বার ও রফিক শহীদ হন। পরদিন ২২ তারিখ হাইকোর্ট, কার্জন হল, নবাবপুর এলাকায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন চারজন। ঢাকার রাজপথে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে জ্বলে ওঠে। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় শহীদদের গায়েবি জানাজায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়। ঢাকায় রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করে রেলের চাকা বন্ধ করে দেয়। আশপাশের শিল্পাঞ্চলেও শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির পর ঢাকাসহ সারাদেশে হাজার হাজার ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী জনতা 'খুনি নূরুল আমিনের শাস্তি চাই' 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনিতে রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলে। এ বিক্ষোভ চলে কয়েকদিন ধরে। বিক্ষোভ এবং গণজোয়ারে আতঙ্কিত হয়ে নূরুল আমিন সরকার সংগ্রামী জনতা ও রাজনৈতিক দলের ওপর তীব্র দমননীতি চালায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, যুবলীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের শত শত নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে জেলখানায় প্রেরণ করে। এ সময় ঢাকায় নারায়ণ বিশ্বাস গ্রেফতার হন। গ্রেফতার করে নারায়ণ বিশ্বাসকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় নারায়ণ বিশ্বাস আত্মগোপনে থেকে পার্টির নির্দেশে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সরকারের দমননীতির পরও ১৯৫৪ সালে বাংলাকে পাকিস্ত ানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। '৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয়। পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার ৩০৯ আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৯টি। যুক্তফ্রন্ট ও সহযোগী দলগুলো পায় ২৭০টি। ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হলে রাজনীতিতে কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনেক রাজবন্দীকে এ সময় মুক্তি দেওয়া হয়। নারায়ণ বিশ্বাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১৯৫৪ সালে মুক্তি পান। এ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করা হয়। ১৯৫৪ সালের ৪ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি আবার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নারায়ণ বিশ্বাস আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন।

বেশ কিছুদিন পর আবার রাজনৈতিক পরিবেশের কিছুটা উন্নতি হলে প্রকাশ্যে শুরু হয় পার্টির কাজকর্ম। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। ইস্কান্দার মীর্জার জারি করা সামরিক শাসনের পথ ধরে তাকে সরিয়ে দিয়ে ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান প্রেসিডেন্টের গদি দখল করেন। আইয়ুব খান দেশের সব ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়ে সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করেন। বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে তখন কিছুই ছিল না। এ সময় নারায়ণ বিশ্বাস গ্রেফতার হয়ে

যান। গ্রেফতার হওয়ার পর দীর্ঘদিন কারাগারে কাটিয়ে ১৯৬০ সালে সামরিক শাসন উঠে গেলে তিনি মুক্তি পান। আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশলী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে ১৯৬১ সালের শেষের দিকে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবর রহমান ও তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কমরেড মণি সিংহ ও খোকা রায়। বৈঠকে দু'দলের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে সমঝোতা হয়। '৫৮ সালে গ্রেফতার হয়ে জেল খেটে মুক্তি পাওয়ার পর দাদা অধ্যাপক সুশীল বিশ্বাস নারায়ণ বিশ্বাসের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ে করার পক্ষে নারায়ণ বিশ্বাসের মত ছিল না। তিনি কিছুতেই বিয়ে করবেন না।

একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসেবে কারাভোগ, নির্যাতন, আত্মগোপন আর হুলিয়া ছিল যার জীবনের সাধারণ ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই তিনি জীবনের সঙ্গে কাউকে জড়াতে চান নি। সে সময় অনেক বিপ্লবী রাজনৈতিক নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে বিয়ে করেন নি। শেষে সুশীল বিশ্বাস নারায়ণ বিশ্বাসকে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। মেয়ে বলেন, একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবীকে সেবা করার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। এ কথা শোনার পর নারায়ণ বিশ্বাস বিয়েতে মত দেন। ময়মনসিংহের সুপরিচিত কবিরাজ অবনি মোহন বাগচীর মেয়ে লীলা বাগচীর সঙ্গে তিনি ১৯৬১ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। লীলা বাগচী বিয়ের পর শিক্ষকতার কারণে ময়মনসিংহেই থাকতেন। তিনি নারায়ণ বিশ্বাসকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তা করতেন। বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা লীলা বাগচী বেতনের সামান্য কিছু টাকা নিজের জন্য রেখে বাকি টাকা প্রতি মাসে নারায়ণ বিশ্বাসকে দিতেন পার্টির কাজে লাগানোর জন্য।

আইয়ুব খানের জুলুম-নির্যাতনের পরও ষাটের দশক আন্দোলন-সংগ্রামে উত্তাল হয়ে ওঠে। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তি এবং হামিদুর রহমান কমিশনের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই আন্দোলন সামরিক শাসন সম্পর্কে মানুষের ভয় ভেঙ্গে দেয় যা অন্যান্য আন্দোলনে মানুষের অংশগ্রহণের পথ খুলে দেয়। ছাত্রদের এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষ সহ ডেমরা, টঙ্গী ও তেজগাঁ অঞ্চলের বহু শ্রমিক যোগ দেয়। ১৯৬৩ সালের পুরো সময় জুড়েই শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব দাবিতে সারাদেশের শিল্পাঞ্চলগুলোতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এদিকে ছাত্র-জনতা ও শ্রমিকদের আন্দোলনে ভীত হয়ে আইয়ুব খান আন্দোলন দমনের জন্য ভারত বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগান। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কাশ্মীরের হযরত বাল মসজিদে ইসলাম ধর্মের কিছু পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব খান ভারত বিরোধী জিগির তুলে বেতারে এক উস্কানিমূলক ভাষণ দেয়ায় খুলনা ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল মহল ও ঢাকার জাতীয় দৈনিকগুলোর ভূমিকায় দাঙ্গা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। ১৯৬৪ সালে ছাত্ররা শিক্ষা দিবস পালনের ডাক দিলে ছাত্র আন্দোলন জোরদার হয়।

এদিকে হঠাৎ করে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধ শুরু হলে আইয়ুব খান সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশরক্ষা আইন জারি করেন। যুদ্ধের কারণে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করা হয়। কমিউনিস্ট

পার্টির নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। যুদ্ধের সময় নারায়ণ বিশ্বাসকে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে ময়মনসিংহ কারাগারে রাখা হয়। ময়মনসিংহ জেল থেকে তিনি ১৯৬৭ সালে মুক্তি পান। জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার সময় কয়েদীদের মধ্যে অনেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ময়মনসিংহ জেলে থাকার সময় কয়েদীদের সঙ্গে এমনি গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার। নারায়ণ বিশ্বাস মুক্তি পাওয়ার পূর্বেই ১৭ দিন চলার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ও নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানে পাক-ভারত যুদ্ধ থেমে যায়। দু'দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি আ. ন. কসিগিন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্যোগের ফলে আ. ন কসিগিন, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও আইয়ুব খানের উপস্থিতিতে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'তাসখন্দ ঘোষণা' স্বাক্ষরিত হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩-১০ জানুয়ারি। এতে শান্তির পথ খুলে যায়। উত্তেজনা প্রশমিত হয়। দু'দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের পরে ১৯৬৬ সালের শুরুতে শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। এ কর্মসূচি পেশ করার পর পূর্ব পাকিস্তানে গণসংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। ৬ দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতির স্বায়ত্বশাসনের অধিকারের কথা বলা হয়েছিল। ৬ দফা আন্দোলন জোরদার হওয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সমর্থন আরো কমে যায়। আওয়ামী লীগ ৬ দফাকে মুক্তি সনদ বললেও কমিউনিস্ট পার্টি তা মানতে পারে নি।

নারায়ণ বিশ্বাস যখন '৬৭ সালে মুক্তি পান তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বদলে যায়। তীব্র দমনপীড়ন সত্ত্বেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৯৬৯ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থান হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজপথ আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। জনগণের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে মিছিল-সভা-সমাবেশ। নারায়ণ বিশ্বাস আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৬ দফার পর ছাত্র সমাজের পক্ষে ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ, ছাত্রলীগ ও ডাকসুর ১১ দফা গণআন্দোলন সংগঠনে বিরাট অবদান রাখে। ১১ দফায় ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। ১১ দফা ব্যাপক মানুষের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। নারায়ণ বিশ্বাস পাকিস্তান শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ইয়াহিয়া খান '৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নিয়ে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করতে থাকে। আলোচনার আড়ালে চলতে থাকে আক্রমণের প্রস্তুতি। শেষে ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক হানাদার বাহিনী। রাতের নিরবতা ভেঙ্গে গর্জে ওঠে মেশিনগান। ঢাকা শহরে পাকবাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষের ওপর সেনাবাহিনীর এ হামলা ছিল অপ্রত্যাশিত। এ রাতে হত্যা করা হয় হাজার হাজার মানুষকে। এ রকম অবস্থার মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। মানুষ রাজনীতিক ও ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে রাস্তায় বিভিন্ন জিনিস ফেলে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। রাজারবাগ, পিলখানায়ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় পাক হানাদার বাহিনী। এ প্রতিরোধ সামান্য হলেও তা মানুষের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। নারায়ণ বিশ্বাস স্বাধীনতার সংগ্রামেও একজন সংগঠক ছিলেন। তিনি ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ, জামালপুর ও টাঙ্গাইলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। নারায়ণ বিশ্বাস পার্টির নির্দেশে ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বয়সের কারণে তার পক্ষে সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। যে জন্য পার্টি তাকে ভারতে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করার আগে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে সহযোগিতার দায়িত্ব দেয়। নারায়ণ বিশ্বাস মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ময়মনসিংহ ও জামালপুরের একটি গ্রুপ নিয়ে মেঘালয় প্রদেশের সীমান্ত পার হয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ যান। সিপিআই অফিসে যোগাযোগ করেন। এই অফিসেই তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মহেন্দ্রগঞ্জ থানা কমিটির অফিসে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিল ৩৫-৪০ জনের একটি গ্রুপ। ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের এ গ্রুপটিকে নারায়ণ বিশ্বাস মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে জুন মাস পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেন। জুন মাসের শেষ দিকে তিনি কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় পার্টির নির্দেশে অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। জুন মাসের শেষে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিম্বর এর জন্য ক্যাম্পে চলে যান। প্রশিক্ষণ শেষে গেরিলা গ্রুপটি ১১ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সে সময় সিপিআই মহেন্দ্রগঞ্জ থানা কমিটির সম্পাদক কমরেড আলাউদ্দীন পার্টি সদস্যদের থাকা-খাওয়া ও সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখেন। মহেন্দ্রগঞ্জ সিপিআই অফিসে সবাই মেঝেতে একই বিছানায় রাতে ঘুমাত। নারায়ণ বিশ্বাস প্রবীণ এবং নেতৃত্বানীয় কমরেড হওয়ার কারণে মেঝেতেই সবাই মিলে আলাদা বিছানায় তার জন্য শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আলবদররা তার আদালত পাড়ার বাড়িটি দখল করে নেয়। বাড়িটিকে রাজাকাররা ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে। একাত্তর সালে নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়িতে লুট করার পর অগ্নি-সংযোগ করা হয়। দেশ স্বাধীন হলে রাজাকাররা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। নারায়ণ বিশ্বাস কলকাতা থেকে পার্টির আরো অনেক নেতার সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন।

পাকিস্তানি শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের পথ ধরে একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়। দু'লক্ষ মা-বোন তাদের ইজ্জত বিসর্জন দেয়। পঙ্গুত্ব বরণ করে হাজার হাজার মানুষ। জ্বালিয়ে দেয়া হয় অসংখ্য ঘরবাড়ি। রাজনীতিকদের কাঁধে দায়িত্ব এসে পড়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠনের। স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পায়। নারায়ণ বিশ্বাস প্রথমে তার বাড়ি থেকে পরে পাশেই মীর মজিবর রহমানের বাড়ি ভাড়া নিয়ে পার্টির কাজ করতে থাকেন। মীর মজিবর রহমান যিনি সকলের কাছে আবু মিয়া নামে বেশি পরিচিত ছিলেন, তার বাড়িটি ছিল তখন পার্টির অস্থায়ী কার্যালয়। সে সময় এখানে নিয়মিত আসতেন কৃষক নেতা হাতেম আলী খান, খন্দকার আব্দুল বাকি, উপেন মালাকার, জ্যোতিষ বসু, বিনয় ভূষণ সরকারসহ কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক নেতা। স্বাধীনতার পর নারায়ণ বিশ্বাস পার্টি ও গণসংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জেলার শীর্ষ নেতাদের নিয়ে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। তিনি ১৯৭২ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে মস্কোসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেন এবং সে দেশের নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। টাঙ্গাইল '৬৯ সালে মহকুমা থেকে জেলা হলেও টাঙ্গাইলের পার্টি ময়মনসিংহ জেলা কমিটির

শাখা হিসেবেই কাজ করত। বিভিন্ন কারণে '৭৩ সালের আগে জেলা কমিটি করা সম্ভব হয় নি। '৭৩ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা কমিটি গঠিত হলে নারায়ণ বিশ্বাস জেলার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর আগে তিনি ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। নারায়ণ বিশ্বাস কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকার সময় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপে কাজ করতেন। ন্যাপ বিভক্ত হলে তিনি মোজাফ্ফর ন্যাপের টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সহ-সভাপতি হন। স্বাধীনতার পর নারায়ণ বিশ্বাস, হাতেম আলী খান, খন্দকার আব্দুল বাকির অক্লান্ত পরিশ্রমে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকে গণসংগঠন।

নারায়ণ বিশ্বাস পার্টি থেকে শ্রমিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। টাঙ্গাইল জেলা বাস শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনিই মূলত শ্রমিকদের সংগঠিত করে ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নারায়ণ বিশ্বাস বাস শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা ছিলেন। '৭০ সালে বাস শ্রমিকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করার সময় নারায়ণ বিশ্বাস গ্রেফতার হন এবং কয়েক মাস জেল খাটেন। তিনি যখন বাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন তখন বিভিন্ন সময় শ্রমিকদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা মিছিল করেছে। বাস শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পর তিনি হামিদপুরে ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন। ইউনিয়ন দু'টি পরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। স্বাধীনতার পর তিনি মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল কর্মচারী ইউনিয়ন গঠন করেন। কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা তাকে উপদেষ্টা মনোনীত করেন। নারায়ণ বিশ্বাস গোড়াইয়ের টাঙ্গাইল কটন মিলে শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্যও বেশ কিছু দিন কাজ করেছেন। টাঙ্গাইল শহরের হোটেল শ্রমিকদের মধ্যেও তার প্রভাব ছিল। হোটেল শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

তার মূল কর্মকাণ্ড রাজনীতি হলেও তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। দৈনিক সংবাদের জেলা সংবাদদাতা হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। নারায়ণ বিশ্বাস সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী ও শিশু সংগঠন খেলাঘর আসর গড়ে তোলার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকায় সত্যেন সেনের মাধ্যমে উদীচীর জন্ম হলেও টাঙ্গাইলে উদীচীর কমিটি হয় ১৯৭৩ সালে নারায়ণ বিশ্বাসের আদালত পাড়ার বাড়িতে। উদীচী গঠনের এ সভায় নারায়ণ বিশ্বাস নিজেও উপস্থিত ছিলেন। এর আগে একই জায়গায় ১৯৭২ সালে শিশু সংগঠন খেলাঘর আসরের কমিটি গঠিত হয়। নারায়ণ বিশ্বাস টাঙ্গাইলে সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি গঠনেও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। নিঃসন্তান নারায়ণ বিশ্বাস শিশুদের খুব ভালবাসতেন। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাঘর যাতে সব সময় সক্রিয় থাকে সে জন্য তিনি সব সময় খেলাঘরের খোঁজ-খবর রাখতেন। তিনি শিশুদের জন্য রেডক্রস থেকে মাঝে মধ্যেই গুড়ো দুধ ও বিস্কুট এনে দিতেন। স্বাধীনতার পর টাঙ্গাইলে নতুন করে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠিত ও আন্দোলনমুখী করার লক্ষে তিনি খন্দকার আব্দুল বাকিকে নিয়ে কাজ শুরু করেন। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এ সময় টাঙ্গাইলে একটি সংগঠিত ও প্রগতিশীল সংগঠন হিসেবে ছাত্র সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। সংগঠনটি ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করতে থাকে। নারায়ণ বিশ্বাসের স্বপ্ন ছিল তার আদালত পাড়ার বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতির অফিস গড়ে তোলা। কিন্তু নারায়ণ বিশ্বাসের এ স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের ভেতর গজিয়ে ওঠা লুটেরা ধনিক শ্রেণির কার্যকলাপের ফলে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। এ সময় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, দুর্নীতি, মজুতদার, মুনাফাখোরদের দৌরাত্ম্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে খাদ্যের সংকট সৃষ্টি করে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। দলের ভেতর শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্বদানকারী তাজউদ্দীন আহমদ কোনঠাসা হয়ে পড়েন। মোস্তাকের নেতৃত্বে ডানপন্থী অংশ শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে। মোস্তাক দলের ভেতরে থেকে সিআইএ ও সেনাবাহিনীর একটি অংশ নিয়ে শুরু করে ষড়যন্ত্র। এ সময় সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এবং উগ্র বামপন্থী শক্তি দেশকে আরো সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেও অনেক সময় বক্তৃতা দিতে গিয়ে দেশের দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন। যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা কমে যায়। ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে মুজিব তার প্রগতিশীল কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ-মোজাফ্ফর আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাকশালে যোগদান করে। বাকশালে যোগদান করলেও কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড ও নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।

কিন্তু সংগ্রাম এবং ঐক্যের নীতিতে ঐক্যই বেশি প্রাধান্য পাওয়ায় পার্টি সরকার বিরোধী দল হিসেবে মানুষের কাছে সে ভাবে গ্রহণযোগ্য হয় নি। আওয়ামী লীগের ভেতর গজিয়ে ওঠা লুটেরা ধনিক শ্রেণি এবং তাদের সমর্থক নেতারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাকশাল কর্মসূচির তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ও দলের ভেতরে তার প্রভাবের কারণে বিরোধিতা চলতে থাকে খুব গোপনে। শেষ পর্যন্ত মোস্তাকের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক সামরিক অভ্যুত্থানে ধানমন্ডির বাড়িতে সপরিবারে নিহত হলে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে। এ হত্যাকাণ্ডের খবর নারায়ণ বিশ্বাস প্রথম জানতে পারেন নাজির হোসেনের কাছে। পার্টি নেতা নাজির হোসেন নারায়ণ বিশ্বাসকে সূর্য ওঠার আগেই খবরটি দেয়ার জন্য তার আদালত পাড়ার বাড়িতে যান। খবরটি পাওয়ার পর তিনি শহর ছেড়ে গ্রামে আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত নেন। নারায়ণ বিশ্বাস কিছুক্ষণের মধ্যেই নাজির হোসেনের সঙ্গে তার গ্রামের উদ্দেশ্যে শহর ত্যাগ করেন। পায়ে হেঁটে দেওলার কাছে পৌঁছলে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে একটি সেনাবাহিনীর গাড়ির মুখোমুখি হন। এ পরিস্থিতিতে তিনি গ্রেফতার হবেন সে কথাই চিন্তা করছিলেন কিন্তু গাড়িটি না থেমে চলে যায়।

নারায়ণ বিশ্বাস এবার গ্রেফতারের হাত থেকে রক্ষা পান। এ রকম পরিস্থিতিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক দিয়ে অগ্রসর না হয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে নাজির হোসেনের বাড়ি চামুরিয়ায় গিয়ে ওঠেন। সেখানে তার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। সাহেবদের মতো দেখতে এ রকম একজন মানুষের এ গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। তাকে দেখে সকলের কৌতুহল বেড়ে যায়। অনেকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেন এবং একে অপরের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চান, লোকটি কে? চামুরিয়ায় থাকা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে পাঁচ-ছয় দিন পর তিনি এখান থেকে ময়মনসিংহ চলে যান। সেখানে তার স্ত্রী লীলা বাগচী এবং পার্টি নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পর ভারতে চলে

যাবার কথা ভাবতে থাকেন। ময়মনসিংহে কিছুদিন অপেক্ষা করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হলে নারায়ণ বিশ্বাস ভারতে চলে যান। সেখানে গিয়ে হুগলির উত্তর পাড়ায় দাদা সুশীল বিশ্বাসের বাড়িতে ওঠেন। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর নারায়ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়। যে কারণে তিনি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ভারতে গিয়ে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পার্টি নেতাদের পরামর্শে ইন্দো-ভিয়েতনাম মৈত্রী সমিতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন। এ CUNIC (Culcutta Univercity Natinal Intigration Council) ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিলনক্ষেত্র। এখানে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতিও গড়ে উঠেছিল। CUNIC-এর পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক শান্তিময় রায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘরের মধ্যেই ছিল এ কার্যালয়টি। এক পর্যায়ে নারায়ণ বিশ্বাস অফিস পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এখানে নিয়মিত আসতেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, কল্পনা যোশী, কমলা মুখার্জী, রনেশ দাশগুপ্ত, প্রবোধ রঞ্জন সেন, আন্দামান ফেরত খুসু দত্ত রায়, আশু ভরদ্দাজ প্রমুখ ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী। নারায়ণ বিশ্বাস হুগলির উত্তর পাড়া থেকে এখানে নিয়মিত আসতেন।

কাজ করতে করতে এ সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কিছুটা সুস্থ হলে তিনি রিসড়া সেবা সদনে চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেবা সদনে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীর স্থান হয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ওয়ার্ডে। সেখানে অনুশীলন সমিতির বেশ কয়েকজন সংগ্রামী ছিলেন। তাদের সঙ্গে স্মৃতিচারণ নানা আলোচনা ও কথোপকথনে তার সময় ভালই কাটত। প্রয়োজন হলে নারায়ণ বিশ্বাস স্বাধীনতা সংগ্রামী বা বাংলাদেশের অন্যান্য লোকদের এখানে চিকিৎসা এবং থাকার সুযোগ করে দিতেন। বাংলাদেশের লোকদের সহযোগিতা করার জন্য তিনি সব সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। দেশের প্রতি তার ছিল গভীর ভালবাসা। নারায়ণ বিশ্বাসের ইচ্ছে ছিল টাঙ্গাইলে ফিরে আসা। বয়স, অসুস্থতা ও দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে তার সে ইচ্ছে অপূর্ণই থেকে গেছে। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে স্ত্রী লীলা বাগচী চাকুরি জীবন শেষ করে ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় চলে যান। মৃত্যুর সময় রিসড়া সেবা সদনে তিনি স্বামীর পাশেই ছিলেন। নারায়ণ বিশ্বাস দীর্ঘ বর্ণময় এক রাজনৈতিক জীবনের ইতি টেনে ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল সেবা সদনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওয়ার্ডে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু সংবাদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত কালান্তর পত্রিকায় ছাপা হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

এ দেশে নারায়ণ বিশ্বাসের প্রায় ছ'দশকের রাজনৈতিক জীবনে অনেক বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠ সম্পক। নারায়ণ বিশ্বাসের আন্দোলন সংগ্রামের সাথী ছাড়াও জেলখানায় পরিচয় হয়েছে অনেক জাতীয় নেতার সঙ্গে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, কমরেড মণি সিংহ, জননেতা তাজউদ্দিন আহমদ, আন্দামান ফেরত বিপ্লবী রবি নিয়োগী, বিপ্লবী খোকা রায়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিখ্যাত কবি বুদ্ধদেব বসু ছিলেন নারায়ণ বিশ্বাসের বন্ধু। দুজনে একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন ছিলেন তার খুব কাছের মানুষ। বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক কবির চৌধুরী ১৯৪৬-৪৭ সালে টাঙ্গাইলে ফুড ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন নারায়ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক গড়ে ওঠে। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে নারায়ণ বিশ্বাসের রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন কৃষক নেতা হাতেম আলী খান, কৃষক নেতা ভাষা সৈনিক খন্দকার আব্দুল বাকি, ভাষা সৈনিক উপেন মালাকার, ভাষা সৈনিক সোফিয়া খান, কমরেড বিনয় ভূষণ সরকার, আলতাব আলী, জ্যোতি বসু, পুলিন বক্সী প্রমুখ নেতৃবন্দ। সে সময়ের ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে বিমান বিহারী দাস ও নাজির হোসেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। নারায়ণ বিশ্বাস সম্পদশালী পরিবারের সন্তান হয়েও একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন।

শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সারা জীবন কাজ করেছেন। পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য ছুটে গেছেন বিভিন্ন জায়গায়। টাঙ্গাইল শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে তিনি ছিলেন সকলের সুপরিচিত কমরেড নারায়ণ বিশ্বাস। তার সততা নিষ্ঠা ও সংগ্রামী জীবন তাকে একজন মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। তিনি এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তাকে সব সময় রাজনীতি করতে হয়েছে। বিভিন্ন সময় পার্টি নিষিদ্ধ থাকার কারণে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ করতে হত। সে জন্য তার অনেক ঘটনাই মানুষের কাছে অজানা থেকে গেছে। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ। নারায়ণ বিশ্বাস রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন সমাজ সেবা হিসেবে। লাভজনক পেশা হিসেবে নয়। তিনি বলতেন, 'আমরা পার্টির নেতা হতে চাই না, আমরা কর্মী। মানুষের মাঝে আমাদের স্থান। আমরা স্বীকৃতির আশায় বা অপেক্ষায় থাকিনা বা প্রশংসার জন্য কিছু করি না। এগুলোর বিচ্যুতি মানুষকে পিছিয়ে দেয়।' এখানে নারায়ণ বিশ্বাসের একটি আদর্শবাদী মানসিক দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করছি। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী হওয়ার কারণে ভারতে থাকার সময় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা পেতেন। প্রতি মাসে ভারত সরকার তাকে এ ভাতা দিত। স্বাভাবিক নিয়মেই স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সে ভাতা আজীবন পাবেন। এ জন্য স্বামীকে স্ত্রীর নামে একটি নমিনেশন দিয়ে রাখতে হয়। আত্মীয়-স্বজনরা নারায়ণ বিশ্বাসকে এ নমিনেশন দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম না করলে কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামী হয় না। এটা কোনো উত্তরাধিকার নয়।' যে কারণে নারায়ণ বিশ্বাসের স্ত্রী বিদ্যাময়ী গার্লর্স স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা লীলা বাগচী সে ভাতা থেকে বঞ্চিত হন। অথচ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর সে ভাতা পেতেন বা এখনও পাচ্ছেন।

এ দেশে প্রথম দিকেই যারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন নারায়ণ বিশ্বাস ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। নারায়ণ বিশ্বাস রাজনীতি করার কারণে ২৮ বছর জেল খেটেছেন। আত্মগোপনে থেকেছেন বহুদিন। বেশ কয়েকবার তার ওপর শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয়েছে। নারায়ণ বিশ্বাসের রাজনৈতিক জীবন ছিল দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে মুখরিত। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তার ছিল অবিচল আস্থা। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজতন্ত্রই মানুষকে প্রকৃত গণতন্ত্র ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

লেখক: উৎপল সাহা

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের পাঁচ বিপ্লবী - উৎপল সাহা, প্রকাশক: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনি; প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা– ২০১০।

সরোজ মুখার্জী



আমাদের অসংখ্য যোগ্য বিপ্লবী পূর্বসুরীর অন্যতম একজন কমরেড সরোজ মুখার্জী। আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড সরোজ মুখার্জীর জন্ম ১৯১১ সালের ১৪ জানুয়ারি বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার বাহাদুরপুর গ্রামে। এ বছর (২০১১ইং) তার জন্মশতবার্ষিকী। শত বছর পূর্বে পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিবেশে কেউই যখন ঘরে বসে থাকতে পারেনি, তখন কিশোর সরোজ মুখার্জীও মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্কুলে পড়া অবস্থায় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দলে যোগদানের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি পর্বে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্কুল জীবনেই ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব তার উপর এমনভাবে পড়ে যে বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে তার সম্পর্কে কিছু না জানা সত্ত্বেও বর্ধমান শহরে যে বিশাল মিছিল হয়েছিল সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কমরেড সরোজ মুখার্জীর লেখা 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা' দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' ও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা দুটি তাঁকে কী পরিমাণ প্রভাবিত করেছে।

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য , আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।'

রবীন্দ্রনাথের এই লাইগুলোর মাধ্যমে মানুষের শ্বাশ্বত চাহিদাগুলো তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাস্তবে তার সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই চাহিদাগুলো থেকে বঞ্চিত দেখে তিনি মনে মনে যখন ক্ষুব্ধ...

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাশে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারির খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!'

নজরুলের এই লাইনগুলো তখন তাঁকেও বিদ্রোহী করে তোলে– প্রতিবাদী করে তোলে। স্কুল পড়ুয়া সরোজ মুখার্জীর মানসিক এই অবস্থায় ভারতবর্ষ কেন ইংরেজের পরাধীন– কি করে দেশকে স্বাধীন করা যায় এইসব জানবার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এই আগ্রহ থেকে ওই বয়সেই মাৎসিনী, গ্যরিবল্ডী, ডি ভ্যালের, ড্যানব্রীন এদের জীবনী পড়তে শুরু করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' পড়ে রাজপুতদের ও মারাঠাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা লাভ করেন। কবির কবিতা যেমন পাঠকের মনকে দোলায়িত করে, উদ্বেলিত করে তেমনি একজন নেতার বক্তব্যও শ্রোতাকে আন্দোলিত করে। স্কুল পড়ুয়া সরোজ মুখার্জীর ওই রকম মানসিক অবস্থায় ১৯২৪ সালে কলকাতা টাউন হলের এক জনসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-এর একটি বক্তৃতা সেই দিন দেশের সেবায় দেশের মানুষের সেবায়, পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার বাসনায় ব্যাকুল সরোজ মুখার্জীকে রাজনৈতিক দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তব ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯২৪ সালেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগদান করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক সেই উত্তাল দিনগুলোয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সভা-সমাবেশের পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজে ধারাবাহিকভাবে শত ব্যাস্ততার মধ্যেও লেখাপড়ায় ছিলেন অটল। ১৯২৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৩ বিষয়ে লেটারসহ স্টার মার্ক পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ থেকে আই. এস. সি পাশ করেন। বি.এস.সি. পরীক্ষার সময় গ্রেফতার হওয়ার পরে জেলে বসে বি. এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। আই. এস. সি পড়ার সময় প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ডা. ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত-র সাথে পরিচয় হয়। তার কাছ থেকেই তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। জ্ঞানপিপাসু সরোজ মুখার্জী, ডা. ভূপেন নাথ দত্ত-এর কাছ থেকে ব্রেজনভ-এর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' ও 'মার্কস-এঙ্গেলস্ জীবনী' এবং কিরকাপের 'হিস্ট্রি অব সোসিয়ালিজম' বই সংগ্রহ করে পড়তে থাকেন। এই সময় জার্মানির Wonder Vogel Movemen: কলকাতার যুবকদের খুবই অনুপ্রাণিত করেছিল। তারই প্রভাবে দলবেধে গ্রামে গিয়ে গান ও প্রচার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কলেজ পড়ুয়া সরোজ মুখার্জীও অন্যদের সাথে দলবেধে গ্রামে চলে যান।

নজরুলের 'চল্ চল্ চল, উর্ধ্বগগনে বাজে মাদল/নিম্নে উতলা ধরনীতল' গানটা তার খুবই প্রিয় ছিল। এর একটা লাইন তার মনকে বিশেষভাবে অনুরণিত করত। লাইনটা হল– 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত'। এভাবে গ্রামে গিয়ে কয়েকদিন থেকে এক নতুন অভিজ্ঞতা– গ্রাম জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। এই সময় দুনিয়াব্যাপী ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সঙ্কট গভীর থেকে গভীরতর হতে শুরু করে। কারখানাগুলোতে শ্রমিক বিক্ষোভ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে– কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘট, মেথর ও ঝাড়ুদাড় ধর্মঘট, পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট। শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্র ছিলেন সরোজ মুখার্জী। তার কলেজের পাশে একটি জুট মিল ছিল। সেখানেও শ্রমিকদের আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং সরোজ মুখার্জী ওখানকার শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে লেগে যান। এভাবে, প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন তিনি। এসময় 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সংস্পর্শেও আসেন। সব মিলিয়ে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ১৯৩১ সালের শেষ দিকে তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আমৃত্যু তিনি

কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর প্রথমে সিপিআই এবং পরবর্তীতে সিপিআই (এম)-এর রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে এবং ১৯৮২ সালে রাজ্য কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৮ সালে সিপিআই (এম)-এর জলন্ধর কংগ্রেস থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং ১৯৮৫ সালে কলকাতা কংগ্রেস থেকে পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। আমৃত্যু এই পদে ছিলেন। ১৯৭১ সালে বর্ধমান জেলার কাটোয়া কেন্দ্র থেকে কমরেড সরোজ মুখার্জী লোক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

কমিউনিস্ট সাংবাদিক হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে কমরেড সরোজ মুখার্জীর নাম। ১৯৩৪ সালে মাসিক গণশক্তির সম্পাদক হিসেবে তার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। ১৯৮৩ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি দৈনিক 'গণশক্তি' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। বিপ্লবী সাংবাদিকতার কাজ কিভাবে করতে হয়। পার্টির মুখপত্র কিভাবে চালাতে হয় তা জানতেও কমরেড সরোজ মুখার্জীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন পার্টি পত্রিকা বাণিজ্যিক পত্রিকার মতো পরিচালিত হতে পারে না। পার্টি পত্রিকা পরিচালিত হবে পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মীদের দ্বারা। যেহেতু পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মীদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল তারা পেশাদার বিপ্লবী, তাই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সব কর্মীর কাছে এটাই সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর এটাই তাঁদের সবচেয়ে বড় গর্ব। এই গর্ববোধই প্রকৃত কমিউনিস্ট সাংবাদিক সৃষ্টি করতে পারে। তিনি নিজে সাংবাদিক হয়ে ওঠার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়েই এগুলো ভাবতেন। বক্তা এবং শ্রোতা সাধারণ এঁদের নিয়েই তো জনসভা বা সমাবেশ। জনগণকে বাদ দিয়ে বক্তার ছবি ছাপা নিরর্থক। তিনি অহেতুক এবং ঘনঘন পার্টি নেতাদের প্রোট্রেট ছাপাও পছন্দ করতেন না। তিনি ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রচারও পছন্দ করতেন না।'

কমরেড সরোজ মুখার্জী ১৯৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের অসংখ্য বিপ্লবী পূবসুরীর ন্যায় কমরেড সরোজ মুখার্জীও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাননি। তিনি তার আমৃত্যু বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরবর্তী যুগের বিপ্লবীদের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবেন। কমরেড সরোজ মুখার্জী তার সংগ্রামী সুদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিপ্লবী তত্ত্ব আয়ত্ব করার যেমন চেষ্টা করেছেন তেমনি সেই তত্ত্বকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। এভাবেই একজন আদর্শ কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে উঠতে হয়। এজন্যই কমরেড সরোজ মুখার্জী আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে থাকবেন।

কমরেড সরোজ মুখার্জীদের ন্যায় আদর্শ নিষ্ঠ, মানুষের প্রতি মমত্ববোধসম্পন্ন, আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা পালনকারী, আত্মগোপনে যাওয়া বা কারাবরণে প্রস্তুত এমনকি জীবন দিতেও নির্ভিক–এমন অসংখ্য কমরেড সারা ভারত বর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা প্রথম সারির ভূমিকা পালন করেছে। তারপরও সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ডা–সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বর্ষের বিভক্তি প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এক কলঙ্কজনক ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই বিভক্তির কারণে এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তানকে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অস্ত্র ব্যবসা ক্রমবর্ধমান হারে চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই দেশ অস্ত্র প্রতিযোগীতায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। অথচ দুই দেশের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে অসহায় জীবন যাপন করছে। এই

অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। জঙ্গীবাদের উত্থান নতুন এক বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই অঞ্চলকে। জঙ্গীবাদ Shadow of imparialism (সাম্রাজ্যবাদের ছায়া) ছাড়া আর কিছু নয়। জঙ্গীবাদের প্রাণভোমরা হল সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত না করে জঙ্গীবাদ ধ্বংস করা যাবে না। অথচ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জঙ্গীবাদ মোকাবেলার নামে আফগানিস্তান দখল করেছে। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে শান্তি রক্ষী মোতায়েনের নামে সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য একটাই কমিউনিস্ট শাসিত অর্থনীতিতে ক্রমঅগ্রসরমান চীনকে আক্রমণের পরিস্থিতি তৈরি করা। যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বাঁচে না। আমেরিকার সামরিক শিল্প নির্ভর অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হলে মানব সভ্যতা বিধ্বংসী আর একটি বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দেবে মানবজাতির উপর। আর সেই বিশ্ব যুদ্ধের জ্বালা মুখ করতে চাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়াকে। একদিকে চীন অন্যদিকে ভারত এই দুই শক্তিই বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে একদিকে আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসা রমরমা করবে অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়াকে জ্বালামুখ করে ক্রমশক্তি অর্জনকারী ওই দুই শক্তির অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করবে। এই খেলায় মেতে উঠছে আমেরিকা। এই বিপদ মোকাবেলা করার জন্য এই অঞ্চলের কমিউনিস্টদের ঘরে-বাইরে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখা দরকার। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে বিপ্লবী ধারায় অগ্রসর করার ক্ষেত্রে ওই দেশের কমিউনিস্টরা প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ না করে Parliamentarian form of Democracy ধারার রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রেই বেশি ব্যস্ত। ভারতীয় বুর্জোয়ারা কমিউনিস্টদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতে ব্যস্ত রেখে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে কমিউনিস্টরা বিপ্লবী রাজনীতি পাশকাটিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীনে রাজ্য ক্ষমতায় থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা করে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র থেকে অনেকটা সরে এসেছে। এবারের বিধান সভার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধি যদি হয় এবং ভারতের কমিউনিস্টরা যদি বিপ্লবী ধারার শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতিতে ফিরে আসে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের সাথে একই ধারায় ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত রাজনীতির ধারায় অগ্রসর হয় তবেই বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ মোকাবেলা করে এই অঞ্চলের বিপ্লবী ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। অন্যথায় অগ্নীযুগের বিপ্লবীরা বিপ্লবী রাজনীতির জন্য যেমন অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সত্ত্বেও ৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে এই অঞ্চলকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তেমনি বর্তমান কমিউনিস্টরাও সাম্রাজ্যবাদী কৌশল মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে এই অঞ্চলকে আর একটি আত্মবিধ্বংসী ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিবে। মানব জাতির ভবিষ্যৎ কমিউনিস্টদের হাতে। বুর্জোয়াদের হাতে নয়।

লেখক: শংকর আচার্য

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের বিপ্লবী জন্মশতবর্ষ ২০১১– সম্পাদনা: শেখ রফিক, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৪ অক্টোবর ২০১১।

বিনয় চৌধুরী



জন্ম ১৪ জানুয়ারি ১৯১১। বাবা গিরীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মা বিলাসিনী চৌধুরী। গ্রাম বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার সিহ্গ্রাম। ওই থানারই শুটরা গ্রামে মামারবাড়িতে জন্ম। সচ্ছল পরিবার, পরিবারে শিক্ষার চল ছিল। মেধাবী ছাত্র। বর্ধমান মিউসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর শ্রীরাপুর কলেজে পাঠরত অবস্থায় স্বাধীনতার সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়ে যুগান্তর দলে যোগদান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সরোজ মুর্খাজির জন্ম একই বছরে একই দিনে এবং একই স্কুল কলেজের সহপাঠী বন্ধু ও আমৃত্যু বিনয় চৌধুরী সহকর্মী। ১৯২৮ সালে কলেজে পড়ার সময়েই পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি, পঞ্চানন বসু (শুলেদা), অতুল্য ঘোষ, ভূপেন দত্ত ও অন্যান্যদের সাথে পরিচয়। চুঁচুড়ায় হুগলি জেলা ছাত্র সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভাষণ দেন। ১৯৩০-এ শ্রীরামপুর কলেজে হোস্টেলে ২৬ জানুয়ারি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ করেন।

কলেজে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার ও ৬ মাস জেল। ১৯৩১ সালে বর্ধমানে যুব সম্মেলনে ভূপেন দত্তর ভাষণ শুনে মার্কসবাদী চিন্তাচেতনার প্রসারে উদ্যোগী হন। ওই বছরেই চন্দননগরে প্রলেতারিয়ান রেভালিউশনারি পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তখনকার দিনে সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের ধারণা মতো বর্ধমান জেলার মেমারিতে বেগুট গ্রামে তাঁর নেতৃত্বে ডাকাতির পরিকল্পনায় হরেকৃষ্ণ কোঙার ধরা পড়েন ও ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে আন্দামানে নির্বাসিত হন, কিন্তু তিনি আত্মগোপনে যেতে সমর্থ হন। ১৯৩৩ সালে বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে ৪ বছর জেল হয়। জেলেই মার্কসবাদে দীক্ষা এবং মুক্তির পর মুজফ্ফর আহ্মদের সাথে সাক্ষাৎ ও ১৯৩৮ সালে পার্টি সদস্যপদ পান। তিনি রানীগঞ্জ পেপার মিলের শ্রমিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নেন। এই সময়েই সুকুমার ব্যানার্জি শহীদ হন। গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাস কারাবাস। আসানসোল, রানীগঞ্জ, ধানবাদ এলাকায় শ্রমিকদের সংগঠনে আত্মনিয়োগে ও কয়লা শ্রমিক ইউনিনের প্রথম সম্পাদক, সেই সময়েই বর্ধমানে ক্যানেল কর বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনেরও সংগঠক। শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য হাওড়ার চেঙ্গাইলে ও বর্ধমানের কুলটিতে শ্রমিক হিসাবে কাজও করেন। যুদ্ধের সময়ে আড়াই বছর আত্মগোপনে থাকতে হয়। জেলা থেকে বহিষ্কৃতও হন। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৪৩ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে প্রতিনিধি। সেই সময় বর্ধমান জেলা পার্টিরও সম্পাদক। ১৯৪৮ সালে পার্টি জেলা কমিটি ভেঙ্গে বর্ধমান ও

আসানসোল পৃথক জেলা কমিটি হলে তিনি আসানসোল জেলার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে আত্মগোপনে থাকাকালীন ১৯৫০ এ গ্রেপ্তার ও নানা জেল ঘুরে ঘুরে বক্সা বন্দীশিবিরে আটক। আত্মগোপনে থাকাকালিন শেফালী চৌধুরীর সাথে বিবাহ। তখন তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য। ১৯৫২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বন্দী অবস্থায় বর্ধমান কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী বর্ধমানের মহারাজাকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। বিধানসভায় মোট ৯ বার নির্বাচিত হন। বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। পাঁচের দশক থেকে তিনি মূলত পার্টি ও কৃষক সংগঠনেই নেতৃত্ব দেন। ১৯৬২ সালে অবিভক্ত পার্টি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য থাকাকালীন আত্মগোপনে যান। সংশোধনবাদ ও অতি বামপন্থার বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৪ সালে সি পি আই (এম) গঠিত হওয়ার সময় থেকে রাজ্য কমিটির সদস্য এবং ১৯৭২ থেকে আমৃত্যু রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৭৪ সালে শিকার সম্মেলনে কৃষকসভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত ও অমৃত্যু সেই পদে আসীন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত রাজ্য কৃষকসভায় সভাপতি থাকার পর স্বাস্থ্যের কারণে অব্যাহতি। ১৯৭৫-৭৭ জরুরি অবস্থা চলাকালে আত্মগোপনে থেকে সংগঠন পরিচালনা করেন। ১৯৭৭ সালে ভূমিদপ্তর ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে ভূমি আন্দোলনে নেতৃত্বদান ও অপারেশন বর্গা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপকারের ভূমিকা পালন করেন। কৃষকদের ভূমিসংস্কার আইনের পরিবর্তন হয় তাঁরই উদ্যোগে। ১৯৯৬ সালে স্বাস্থ্যের কারণে বিধানসভা থেকে অব্যাহতি নেন। ১৯৭৮ সালে দশম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯০ সালে পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাস্থ্যের কারণে ১৯৯৮ সালে সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। ইস্পাতের মতো কঠিন শরীর শেষের দিকে ভাঙ্গতে শুরু করে। ১৯৯৮ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া ত্বরানিত হয় এবং ২০০০ সালের ৬ মে রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটে আমাদের ছেড়ে চলে যান। মৃত্যুর আগেই তিনি চক্ষু ও দেহ দান করে যান। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর দেহ নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে তুলে দেওয়া হয়। শ্রমিক, কৃষক ও পার্টি সংগঠনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নেতা এবং কমিউনিস্ট আর্দশবোধ ও নৈতিকতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। পত্রপত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু কোন সংকলন প্রকাশিত হয় নি। তাঁর রচিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপরেখায় এক অমূল্য দলিল। রাজ্য কমিটির অনুরোধে তিনি 'অতীতের কথা, কিছু অভিজ্ঞতা' নামে পুস্তকটি রচনা করেন যা কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক মূল্যবান দলিল। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার পরবর্তী অধ্যায়টা আর রচনা করে যেতে পারেন নি। এ আমাদের আফশোস।

অনুসরণযোগ্য আর্দশ মানুষ

বিনয় কোঙার

সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, সি পি আই (এম)

জন্ম ও মৃত্যু–দুই জীবনের অংশ। বিনয়দা জন্মেছিলেন, তিনি চলেও গেছেন এটাই নিয়ম। প্রতিদিন কত মানুষ জন্মাচ্ছে, কত মানুষ মারা যাচ্ছেন, কে মনে রাখে, কার কী আসে যায়? ও পুকুরের জলে বৃষ্টি ফোটার মতো ছোট্ট বুদবুদ তুলে তা নিমেষে মিলিয়ে যায়। মানুষ মনে

রাখে তাদেরই, সমষ্টি হিসাবে জলপ্রপাতকে, নদীকে, সমুদ্রকে। তেমনি কিছু মানুষ আছেন যাঁরা কোটি মানুষের সমবেত শক্তি ও গুণাবলীর প্রতীক, যাঁরা চলে যাওয়ার সময় গভীর ক্ষত রেখে যান। কালের নিয়মে বিস্মৃতির ধূলা যতই জমে উঠুক, ইতিহাসের পাতা থেকে কখনই তা মুছে যায় না। বিনয়দা সেই রকমই একজন মানুষ।

কেউ মারা গেলে আত্মজনেরা কাঁদে। কিন্তু আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পারিবারিক সর্ম্পকের উপর থেকে ভাবালুতার পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে তাকে নগদ লেন-দেনের সম্পর্কে পরিণত করেছে। তাই কেউ মারা গেলে শোকে মগ্ন থাকার সময়ও আত্মজনেরা সর্তক থাকে যাতে সিন্দুকের চাবি অন্য শরিকের হাতে না পড়ে। তা ছাড়া আত্মজনদের কাঁদাটা মনুষ্যজাতির একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়, মনুষ্যত্বের অন্যান্য অনেক জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। কিন্তু কিছু মানুষ জম্মান যাঁরা পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে কোটি কোটি বঞ্চিত, পদানত, আর্তমানুষের মুক্তির যজ্ঞে নিজেকে বিলিয়ে দেন, যাঁরা চলে গেলে রক্ত-সম্পর্কের বাইরে অগণিত মানুষ স্বজন হারানোর বেদনায় মথিত হয়। বিনয়দা সেই মানুষদের একজন।

তাঁর দীর্ঘ জীবনের দৌলতে আমরা পেয়েছি অনেক, কিন্তু তাঁকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে অনেক বেশি। এই দীর্ঘ জীবনে তাঁকে দেখতে হয়েছে কত প্রিয় কমরেড শত্রুর আক্রমণে শহীদ হয়েছেন। প্রয়াত হয়েছেন অনেক অনুজ সহকর্মী। শোকসভায় ভাষণ দিতে হয়েছে চোখের জলকে সংযত রেখে। পরবর্তী কালে শোকসভায় যেতে আর তাঁর মন চাইত না, বলতেন– আর পারি না, কষ্ট হয়।

অনেকদিন ধরে তার স্নেহচ্ছায়ায় থেকেছি, তাঁর সহকর্মী হবার সৌভাগ্যও হয়েছে। ৬/৭ বছর বয়স থেকে বিনয়দার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে যখন কিছু বন্দী মেয়াদ শেষের আগেই মুক্তি পান, তাঁদের মধ্যে আমার দাদা অর্থাৎ প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙারও ছিলেন। বিনয়দাও মেয়াদ শেষে এই সময়ে মুক্তি পান। দাদা মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর সাথে মাঝে মাঝে তিনিও আমাদের বাড়িতে আসতেন। বৌদি যখন দাদার হাত ধরে রাস্তায় নামলেন তখন বিনয়দাই তাঁর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। বৌদি ছিলেন কার্যত তার নিজের বোন, তাই দাদার বা আমার ছেলেমেয়েরা বিনয়দাকে কখনো জেঠু বলেনি, মামা বলত। বৌদি পার্টি অফিসে চলে যাওয়ার পর, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বর্ধমানে কখনও মিঠাপুকুরের অফিসে কখনও বড়বাজারের অফিসে কতবার বিনয়দার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কতইনা স্নেহ পেয়েছি। তখনও জানতাম না যে মহৎ চরিত্রের এই মানুষটির সহকর্মী হবার সৌভাগ্য অর্জন করব।

বয়সে চার বছরের বড় বিনয়দাই ছিলেন দাদার প্রথম গুরু। এই সময়েই আমার জন্ম। বাবা কৃষক পরিবার থেকে আসা সামন্ততান্ত্রিক চেতনার মানুষ, দাদার নাম রেখেছিলেন হরেকৃষ্ণ। আমার নামও কোনো ঠাকুর দেবতার নামেই রাখার কথা। কিন্তু আমার নাম রেখেছিলেন দাদা। এই নামকরণে সম্ভবত দাদার ওপর বিনয়দার প্রভাবই কাজ করেছিল।

শ্রেণী বিভক্ত বৈষম্যের সমাজে, যেখানে ছলে, বলে কৌশলে অপরকে ঠেলে এগিয়ে যেতে না পারলে প্রতিযোগিতায় তলিয়ে যেতে হয়, সেখানে একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য অনেক সাধনা করতে হয়। ব্যক্তিজীবনে নিজের ও পরিজনদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যা দাবি করে, আদর্শ তাতে অনুমতি দেয় না। নিজের ভিতরে অবিরাম তীব্র দ্বন্দ্বে বা শ্রেণীসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়েও যাঁরা আদর্শের প্রতি অবিচল থাকতে পারেন – একমাত্র তাঁরাই কমিউস্ট

হতে পারেন, থাকতে পারেন। বিনয় চৌধুরী ছিলেন তেমনই একজন যিনি মহান আদর্শ হতে জীবনে কখনও বিচ্যুত হননি।

বাবা মায়ের এক পুত্র, এক কন্যা। ১৩ বছরে বয়সে পিতৃহীন হলেও অসহায় ছিলেন না। ৬/৭ একর জমিও ছিল। স্বচ্ছল পরিবার। দূর গ্রামে বাস হলেও বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ ছিল। নিজে মেধাবী ছাত্র। ব্যাক্তিজীবনে সমৃদ্ধির প্রশস্ত দরজা খোলা ছিল। কিন্তু সেই নিশ্চিত আত্মকেন্দ্রিক জীবনকে ধিক্কার জানিয়ে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে কঠিন সংগ্রামের চিরকালীন পথকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাননি।

কত পুরনো কথা মনে পড়ছে। পাঁচের দশকের প্রথমভাগ, তখন আদালতের রায়ে পার্টি আইনি হয়েছে। বিনয়দা বিধায়ক হওয়ায় তখন মুক্ত তবে কেষ্টদা, মটরদা (শাহেদুল্লাহ্) তখনও গোপনে। গলসি থানার জি টি রোডের ধারে একটি মাদ্রাসায় আমার জীবনে প্রথম কৃষককর্মী সম্মেলন। তারই কিছুদিন আগে কোচবিহারে গুলি চালনায় বকুল-বন্দনা শহীদ হয়েছেন। রক্তে তখন প্রথম যৌবনের জোয়ার। হঠকারি বক্তব্য নিয়ে বিনয়দার সঙ্গে তর্ক লাগিয়ে দিলাম। আমি উত্তেজিত, কিন্তু বিনয়দা অচঞ্চল, প্রশান্ত, হাস্যমুখ, কিছুক্ষণ আলোচনা করে তর্কে ক্ষান্তি দিয়ে তিনি বললেন– ঠিক আছে, আজ থাক। মনে মনে আমার তখন একটু গর্ববোধ, ভাবখানা– বিনয়দা পিছু হটেছেন, কিছুদিন বাদে একটু পরিণত চেতনাতেই বুঝেছিলাম যে আমার যুক্তি ছিল অসার, বিনয়দাই সঠিক। মাথা নিচু করে বিনয়দার কাছে সেই ভ্রান্তি স্বীকার করলে তিনি হেসে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন– তিনি জানতেন যে আমি ভুল বুঝব। ভাল কী মন্দ জানি না, তবে বিনয়দার এইটাই ছিল স্বভাব। বিতর্কিত রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কর্মীসভায় বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখলেও, ব্যক্তিগত পর্যায়ের তর্কবিতর্কে বেশি সময় লিপ্ত থাকতেন না। একটা নির্দিষ্ট সীমার পর নীরব থাকাই পছন্দ করতেন।

সংগ্রামের ময়দানে থেকে ধাপে ধাপে পার্টির সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছেন, কিন্তু নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হওয়ার, নিজেকে উজ্জ্বল করে তোলার পেটি বুর্জোয়া সুলভ বাসনা বিনয়দার চরিত্রে ছিল অবিশ্বাস্য। সংগঠনের মধ্যে নীতিহীন ব্যক্তিত্বের সংঘাতে তিনি বেদনাহত হতেন। উচ্চতর পদকে তিনি অধিকতর দায়িত্বের বিষয় বলে মনে করতেন, ক্ষমতার উপাদান বলে মনে করতেন না। জীবনে কোনোদিন ক্ষমতাশীল হতে পারলেন না। এই অক্ষমতাই ছিল তাঁর জীবনের অমূল্য সম্পদ, এর জন্যই তাঁর সামনে শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে যেত।

আদর্শবোধে তিনি ছিলেন দৃঢ় ও অচঞ্চল। তিনি প্রায়ই বলতেন, "পথের এদিক ওদিক হতে পারে, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু আদর্শের লক্ষ্য যদি স্থির না থাকে তাহলে পথ চলা পণ্ডশ্রম।" একটা উদাহরণ দিতেন। রায়না থানার সহজপুর গ্রামের গরিবরা ছিল পার্টির অন্তঃপ্রাণ, এখানেই একসময় বিপদবারণ রায়কে পুলিশের হাত থেকে মুক্ত করতে গিয়ে সন্তোষ-যুগল শহীদ হয়েছিলেন। সেই গ্রামে একসময় বিনয়দা, বিপদদা লুকিয়ে ছিলেন। গরিবরা গ্রামে পাহারা রেখেছিলেন। পুলিশ আসছে সংকেত পেয়েই বিনয়দারা বেরিয়ে পড়লেন। অন্ধকার রাত, টর্চ জ্বালানোর উপায় নেই। আলপথ দিয়ে গ্রাম এড়িয়ে তারা পথ চলতে শুরু করলেন, সারারাত হেঁটে যখন ভোরের আলো ফুটছে তখন তাঁরা বুঝলেন যে অন্ধকারে নিশান ভুলে তাঁরা সেই সহজপুর গ্রামেই পৌছেছেন, কপাল ভাল

পুলিশ তল্লাশি করে তখন ফিরে গেছে। অনেকবার এই গল্প করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে আর্দশ ঠিক রাখতে হবে। রণকৌশল যে রণনীতির খণ্ডিত অংশ, তিনি সব সময় সেটা স্মরণে রাখতেন। রণকৌশল যে চালাকি নয়, সেটা স্মরণ করিয়ে বারে বারে বলতেন, "চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না।"

কমিউনিস্টরা মানুষ। বিচারে ভুল হয়, সিদ্ধান্তে ভুল হয়। ভুল করাটা তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন না, কিন্তু ভুল স্বীকার করতে এবং তা সংশোধন করতে অস্বীকার করলে তিনি তা অপরাধ বলে মনে করতেন। ১৯৬৯ সাল। জমির আন্দোলনে জমিদারী প্রভুত্বের বহুদিনের অবরুদ্ধ ক্ষোভ বিদ্রোহে ফেটে পড়ছে। ভরা নদী কিছুটা উছলে পড়ে। কিছু ভুল-বিভ্রান্তির সংশোধনী করার জন্য কর্মী সভা হয়। সদরের একটি গ্রামে জমির আন্দোলনের তীব্র বিরোধী একজনের একটি পুকুর দখল করে নেওয়া হয়, যেটা খাস বা উদ্বৃত্ত নয়। কর্মীরা বোঝেন যে ভুল হয়েছে, তা সত্ত্বেও অনেক খেটেখুটে সভা করে, মানুষজনকে নিয়ে দখল করা হয়েছে সুতরাং এখন ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, তাছাড়া এখন ছাড়লে সম্মান থাকবে না এই কথা বলেন। বিনয়দা তাদের বললেন– নেশার ঘোরে বাড়ির সদর দরজার সামনে সারা রাত খেটে একটা গর্ত করেছ, নেশা ছুটে যাওয়ার পরও খেটে করেছ বলে কি গর্তটা রেখে দেবে? তাছাড়া ভুল সংশোধন করলে মর্যাদা কমে না, বরং বাড়ে, গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন আরও বেশি পাওয়া যায়। কমরেডরা বুঝেছিলেন।

বিনয়দা সশস্ত্র বিপ্লবী দলে ছিলেন, বোমা পিস্তল ধরেছেন, আত্মগোপনে থেকেছেন, তাঁর মতো বিশিষ্ট চেহারা নিয়ে আত্মগোপন করা কঠিন, তা সত্ত্বেও ধরা পড়েননি, ক্ষিপ্ত গতিতে সতর্কতা নিয়ে সাইকেলে ও হেঁটে চলাফেরা করেছেন, সঙ্গে থেকেছে একটা থলি যার মধ্যে সর্তকতার সুতো থেকে আরম্ভ করে ঔষধ পর্যন্ত– একজন মানুষের যা কিছু দরকার সব থাকত, পুলিশের চরকে শারীরিক শক্তিতে পরাস্ত করে সরে পড়েছেন, অফুরন্ত সাহস নিয়ে জনগণকে উদ্দীপ্ত করে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অথচ জনগণ ও পার্টি কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন ধীর, স্থীর, কোমল চরিত্রের মানুষ। শোষণ ব্যবস্থার প্রতি অন্তরে তীব্র ঘৃণা ছিল বলে হয়তো বাইরে এতটা কোমল হতে পেরেছেন।

সৎ, চরিত্রবান, আদর্শবাদী মানুষদের দেবচরিত্র বলার রেওয়াজ আছে। কেন যে এই বিপরীত মূল্যায়ন, তা জানি না। কারণ প্রাচীন সমাজে প্রভু শ্রেণীর যে নায়কদের দেবতা বলে চিত্রিত করা হয়ে থাকে– শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, লুব্ধতা, নিষ্ঠুরতা ও লাম্পট্যে তারা এক এক শিরোমণি। তাই বিনয়দাকে দেবতাসদৃশ বলতে পারলাম না। শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজে মানুষের চরিত্র কেমন হবে জানি না – তবে বিনয়দাকে সেই অনাগত যুগের মানুষ ভাবতে ভাল লাগে।

দুগর্ত মানুষদের জন্য ছিল তাঁর মমত্ববোধ। তাঁদের সেবা করার কামনাতেই বোধহয় প্রথম জীবনে রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগ দেন। দুর্গত মানুষদের সেবা করতে গিয়েই দুগর্তির উৎস সন্ধানে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে পথ বেয়ে কমিউনিস্ট আদর্শে শামিল হয়েছিলেন কিনা জানি না। দর্শনের ভিন্নতা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তাঁর মমতা বজায় ছিল।

বিনয়দার হৃদয়টা ছিল যতটা উদার, আবেগ ছিল ততটাই কম। সংগ্রামে চলার পথে, জয়-পরাজয়ে, বিপদে-আপদে, সুবিধা-অসুবিধায় তিনি থাকতেন নির্বিকার। কোনো ঘটনায় চাঞ্চল্য বা অধীরতা ছিল তার স্বভাবের বাইরে। গল্প-গুজব করা, রঙ্গরসিকতা করা বা জমিয়ে আড্ডা মারা, চলার পথে এসব অপ্রয়োজনীয় না হলেও, বিনয়দার এসবের বিশেষ

আগ্রহ ছিল না। কিন্তু দূরত্ব সৃষ্টিকারী গাম্ভীর্য তাঁর ছিল না– যে কোনও কথা তাঁকে স্বচ্ছন্দে বলা যেত।

বিনয়দার শরীরের কাঠামো ছিল ভয়ঙ্কর কঠিন। তাঁর মা-র কাছ থেকেই এটা পেয়েছিলেন। বিনয়দার বোন বুড়িদির কাঠামোও একইরকম। মেদহীন পাতলা চেহারা কিন্তু অস্থি ও পেশি প্রচণ্ড শক্তিধর, নিয়মিত ব্যায়ামে তা আর পুষ্ট। এই শক্তি নিয়ে একটা কাহিনী আছে। চারের দশকে উনি নিত্যানন্দ চৌধুরী সঙ্গে বর্ধমান জেলে বন্দী ছিলেন। নিত্যানন্দ চৌধুরী তখন জেলে বিনয়দাদের গুরু বলে পরিচিত। সেই সময়ে এক বলশালী গুণ্ডা সর্দারও জেলে বন্দী ছিল এবং সেও ছিল তার নিজের জগতের গুরু বলে পরিচিত। সেই সর্দারের ধারণা ছিল যে নিত্যানন্দ যখন তাঁর দলের গুরু, তখন তিনিও নিশ্চয় খুব বলশালী। সেই ধারনায় সে একদিন নিত্যানন্দদাকে পাঞ্জা লড়ার আহ্বান জানালে, তিনি হেসে বললেন যে তাঁর সঙ্গে কী লড়বে? বিনয়দাকে দেখিয়ে তিনি বললেন যে আগে তাঁর শাগরেতকে হারাতে পারলে তবে তিনি লড়বেন। বিনয়দার চেহারা দেখে সে হেসে অস্থির। কিন্তু লড়াই শুরু হতেই বিনয়দার কব্জির মোচড়ে সর্দার একেবারে কাত। লড়াইয়ে হেরে সর্দার বিনয়দার বদলে নিত্যানন্দদাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, কারণ তার ধারণা যে শিষ্যের যদি এত শক্তি হয়, তাহলে গুরুর শক্তি কত ভয়ঙ্কর।

রাজ্য কেন্দ্রে পুরোপুরি আসার আগে পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় মাটি কামড়ে থেকে সংগ্রাম ও সংগঠনকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে গড়ে তুলেছেন, শ্রমিক-কৃষক দুই ফ্রন্টেই কাজ করেছেন, আত্মগোপনে থেকেছেন, জেলে গেছেন, জেলে থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, পুলিশের নিপীড়ন অকাতরে সহ্য করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে নিজের থাকা, খাওয়া, পোশাক, চিকিৎসা– এসব ক্ষেত্রে তাঁর ভিতরে এক অসহায় শিশু বাস করত, যে অভিভাবক ছাড়া চলতে পারত না। বর্ধমান শহরে শহীদ কালোদা ছিলেন তার অভিভাবক, যদিও সাংগঠনিকভাবে বিনয়দা ছিলেন তাঁর নেতা।

ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি কঠোরভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সংযমী। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। সশস্ত্র বিপ্লবী জীবনের পথ ধরে তিনি পার্টিতে এসেছিলেন। এই বিপ্লবীদের সংগঠন ছিল অনেকটা গুরুবাদী, ব্যক্তিপ্রধান কেন্দ্রিক। সেই জীবনের ব্যক্তিতান্ত্রিক অভ্যাসের প্রভাব পার্টি জীবনে কারও ক্ষেত্রে প্রকাশ পাওয়ার বাস্তবতা থাকে। কিন্তু বিনয়দার জীবনকে এ অভ্যাস অসর্তকভাবেও কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। পার্টি দীর্ঘ জীবনে দক্ষিণপন্থী বামপন্থী বিচ্যুতি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে, নিজে সেই বিতর্কে অংশ নিয়েছেন, সঠিক পথনির্দেশে অবদান রেখেছেন, কিন্তু কোনোদিন তাঁর মধ্যে উপদলীয় মনোভাবের কোনো প্রকাশ কারও নজরেও পড়েনি। পার্টি অভ্যন্তরের বিতর্ককে কখনও বাইরে আনেন নি। নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতিরিক্ত সতর্ক। সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় কোনোদিন পাঁচ মিনিট দেরিতেও তাঁকে আসতে দেখিনি। বিমানবন্দর বা স্টেশন যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি হাতে বাড়তি সময় নিয়ে বের হতেন। রাস্তায় জ্যাম হতে পারে বা কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, গাড়ি খারাপ হয়ে যেতে পারে, যদি পৌছাতে না পারেন– এই ছিল তার দুশ্চিন্তা। দায়িত্ববোধে উদগ্রীব।

নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট শূচিতার মূর্ত প্রতীক। রাইটার্সে মন্ত্রী থাকাকালে শুনেছি যে আর্থিক প্রশ্ন জড়িত আছে এমন কোনও আদেশে সই করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় সতর্ক। তাঁর এই অতি সতর্কতা অনেক সময় মজার খোরাক

হয়েছে বা তাঁকে ভীতু বলে মনে হয়েছে। সত্যই তিনি ভীতু ছিলেন, তবে তা তিনি ছিলেন শ্রেণীশত্রুতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নয়, ছিলেন অনৈতিকতার স্পর্শ সম্পর্কে।

তাঁর বক্তৃতার ভাষা ছিল সহজ, কিন্তু অত্যন্ত মার্জিত ও ভদ্র, অসতর্কভাবে তিনি কখনও চটুল শব্দ ব্যবহার করতেন না।

আমরা আছি, আমরা থাকব বিনয়দার ঐতিহ্য নিয়ে। বিনয়দা মহান কমিউনিস্ট মতাদর্শেরই সন্তান। জন্মকালে সব শিশুই পবিত্র নিষ্পাপ। সেই শিশু বড় হয়ে যে নীচ, স্বার্থপর, মিথ্যাচারী, আত্মকেন্দ্রিক, প্রবঞ্চক, বিবেকহীন লম্পট হয়ে ওঠে– সেটা জননীর গর্ভের দোষ নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই তাকে অমানবিক পশু করে তোলে। তাই সমাজব্যবস্থা বদলের স্বপ্ন দেখতে হলে নিজেদের এই সমাজের কালিমা থেকে মুক্ত থাকতে হয়। পাঁকে বাস করেও পাঁক থেকে মুক্ত থাকা কঠিন কাজ। উচ্চ আদর্শবোধ নিজেকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এটা সম্ভব নয়। মার্কস এই জন্যই বলেছিলেন যে, সমাজ বদলাতে হলে নিজেদেরকে বদলাতে হয়। নিজের ভিতরে অবিরাম আদর্শগত সংগ্রামই এর হাতিয়ার। বিনয়দা সেইটাই পেরেছিলেন। সরল্য, সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন, নিজেকে জাহির না করা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিজের যেটুকু ক্ষমতা তাকে উজাড় করে দেওয়া এইসব গুণাবলী আদর্শের জোরেই অর্জন করেছিলেন। এইগুলি কমিউনিস্ট গুণাবলী। কিছু কিছু কমিউনিস্ট বিদ্বেষী আছেন যাঁরা বিনয়দার এইসব গুণাবলীকে তাঁর কমউনিস্ট আদর্শবোধ হতে বিচ্ছিন্ন করে, জন্মগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। পুঁজিবাদী সমাজের নীতিহীন ক্লেদাক্ত জলার মধ্যে নৈতিকতার প্রতিভূ হিসাবে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসীরাই যে একমাত্র পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বিনয়দা তারই একটি চূঁড়া মাত্র– এই সত্যটি তারা গোপন করতে চায়।

শ্রমিক-কৃষক, দুই ফ্রন্টেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, তবে জীবনের শেষ ৬০ বছর মূলত কৃষক আন্দোলনেই লিপ্ত থেকেছেন। কৃষক সমস্যা ও আন্দোলন, সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল গভীর। ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন, তেভাগা থেকে বর্গা অপারেশন পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্ব ছিল বিস্তৃত। ছয়ের দশকে হরেকৃষ্ণদার নেতৃত্বে জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে গণ অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে, তাকে আরও পরিণতির দিকে নিয়ে যান বিনয়দা। যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আজ গণতন্ত্রকে প্রসারিত করেছে ও গ্রামের চেহারা বদলিয়ে দিয়েছে তারও প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। তাঁকে হারিয়ে কৃষক আন্দোলন দূর্বল হয়ে গেল। পরবর্তী প্রজন্মের দায় রইল এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার।

বয়সে কুড়ি বছরের বড়, ছোট থেকে দেখেছেন। খুবই স্নেহ করতেন। অসুস্থ হলে উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। বাইপাস সার্জারির পর তিনি বারে বারে বলতেন– যেন সাবধানে থাকি, নিয়ম মেনে চলি। সেই স্নেহ করার মানুষটা আজ চিরকালের মতো হারিয়ে গেছেন।

দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক দিয়েছেন, কিন্তু নিঃস্ব হয়ে যাননি। বৈষয়িক কিছু পাননি, কিন্তু মানুষের যে ভালবাসা শ্রদ্ধা পেয়েছেন তার পরিমাপ করার মতো কোনো পরিমাপ যন্ত্র এখনও তৈরি হয়নি। এর একাংশও যদি কারও ভাগ্যে জোটে সে ধন্য। আমাদের কমরেডদের কি এর জন্য একটু লোভ হবে না।

বিনয়দা নেই। তাঁর সমকালীন যে শ্রেষ্ঠ সন্তানগুলি কৃষক আন্দোলনকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা একে একে প্রায় সবাই বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শের মৃত্যু নেই। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় সত্ত্বেও বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও তার ভয়ঙ্কর

পরিণতি দাবি করছে যে, সমাজতন্ত্রের বিকল্প নেই। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমেই পথ করে এগিয়ে যেতে হবে। চিরকালই পচাগলা সমাজ আমাদের কলুষিত করার চেষ্টা করে, কেউ কেউ তার শিকারও হয়। অবিরাম আদর্শগত সংগ্রাম দ্বারা আমরা কলুষমুক্ত হই। ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা আমাদের পার্টির জন্য গর্ভ বোধ করি। চূড়ান্তভাবে কলুষিত সমাজের মধ্যে এত বেশি উচ্চ মানবিকগুণ সম্পন্ন মানুষ আমাদের মধ্যে ছাড়া আর কোথায় আছে? এই গর্ববোধ নিয়েই আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে বিনয়দার ঐতিহ্যকে আমরা অম্লান রাখব।

বিনয়দার চেয়ে যোগ্যতর নেতৃত্ব হয়তো অতীতেও এসেছেন, ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই আসবেন, তবু অনুসরণযোগ্য আদর্শ মানুষ হিসাবে তিনি থেকে যাবেন ব্যতিক্রমীদের অন্যতম হিসেবে। কমিউনিস্ট নৈতিকতা ও শুচিতার মূর্ত প্রতীক, আত্মপ্রচারে বিমুখ, আপনভোলা মানুষ বিনয়দা, চলে গেলেন। ঋজু দীর্ঘদেহী, মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝোঁকা, ধীর পদক্ষেপ– এই পরিচিত ছবিটা আলিমুদ্দিন ষ্ট্রিটের অফিস থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শ ও শুচিতার প্রতীক হিসাবে তিনি ভাস্বর থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

গোপাল বসু



জন্ম ১ মে ১৯১১। অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ভৌমিকপাড়া গ্রামে। বাবা অখিলচন্দ্র বসু। মা সরলা বসু।

ম্যাট্রিক পাশ করেন ঢাকার বরোদী হাই স্কুল থেকে। ছাত্রাবস্থাতেই অনুশীলন দলে যোগ দিয়ে পুলিশের নেক নজরে পড়ায় নৈহাটিতে দাদা নলিনী বসুর বাড়িতে চলে আসেন। ভর্তি হন হুগালির মহসীন কলেজে। কলেজে পড়াকালীন বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সহযোগিতায় বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৯৩০ সালে কলেজের পড়াশোনা শেষ করে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। তখন তিনি নৈহাটি কংগ্রেসের সম্পাদক। ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৪-এ মুক্তি পেলেও ব্রিটিশ পুলিশ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলিতে তাঁর ঢোকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বে তিনি আত্মগোপনে থেকে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৩ এ ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। বারাকপুর এবং আলিপুর জেলে তাঁকে রাখা হয়। কিছুদিন বাদে মুক্তি পেলেও মুক্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি মেহেদীপুর ও বর্ধমান জেলায় তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি ফিরে যান অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। পুলিশ খোঁজাখুজি শুরু করলে আত্মগোপন করে ঢাকায় যান এবং সুরাপাড়া হাই স্কুলে শিক্ষকতার সাথে মুক্ত হন। পরে ফিরে আসেন।

নৈহাটিতে ফিরে তিনি বারাকপুর শিল্প এলাকায় বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫২ সালে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৬৪ সালে তিনি সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ১৯৭৭-এ অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তিনি নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৫৭, ৬২, ৬৯, ৭১ এবং ৭৭ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হন।

১৯৯৯-এর ১৪ জানুয়ারি নৈহাটিতে নিজস্ব বাস ভবনে তাঁর জীবনাসান হয়।

এক আপোষহীন বিপ্লবীর কথা

অজিত বসু

সদস্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির, সি পি আই (এম)

গোপাল বসু সম্পর্কে লিখতে হলে প্রথমে আমার নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা দরকার। কারণ নৈহাটিতে গোপালদার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের শুরু ১৯২৯ সালে, আর আমার সাথে তাঁর পরিচয় সম্ভবত ১৯৪২ সালে। ফলতঃ তাঁর প্রথম জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ কিছুটা তাঁর কাছ থেকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় শোনা, কিংবা তৎকালীন সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা। এছাড়া নৈহাটি বইমেলার ১৯৯২ সালের স্মারক পত্রিকায় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, তাতে গোপালদা তাঁর বাল্যজীবনের এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিককার বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। গোপালদার প্রয়াণের পর বর্তমানে প্রয়াত অনন্ত চক্রবর্তী, 'গোপালদাঃ কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতি' নামে একটি লেখায় তথ্যভিত্তিক বহু ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেনে।

গোপালদার জন্ম ১৯১১ সালে, শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক দিন পয়লা মে-তে ঢাকায় ভৌমিক পাড়ায়। পারিবারিক পরিবেশই ছিল ব্রিটিশ শাসন বিরোধী। পরিবারের বায়োজৈষ্ঠরা প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সবটা মিলিয়ে তাঁর এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। গ্রামের এক বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তারকপ্রসন্ন দে, যিনি গৌহাটি ষড়যন্ত্র মামলায় বহুদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। বিদ্যালয় জীবনে তিনি অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন এঁর দ্বারা। ধীরে ধীরে তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন ও সাথে সাথে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে সতীশ পাকড়াশী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পুলিন দাস, মদন ভৌমিক, অমৃত হাজরা, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি প্রমুখ অনুশীলন সমিতির নেতাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। জগন্নাথ কলেজে থাকাকালীন তিনি অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন। এই সংগঠনের সম্মেলন হয় ১৯২৮ সালে ঢাকায়। সেখানে ভূপেন দত্ত, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, বিনয় সরকার প্রমুখেরা এসেছিলেন। ঢাকায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি সন্ত্রাসবাদের বিকল্প হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান জানান। গণঅভ্যুত্থান কীভাবে সন্ত্রাসবাদের বিকল্প হতে পারে তার পথ নির্দেশ ছিল সেই ভাষণে। তৎকালীন সময়ে ঢাকায় দাড়িয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বলাটা খুব সহজ ছিল না। ফলতঃ সেই ভাষণ নিয়ে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে, গোপালদার চিন্তার জগতে যার ভূমিকা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯২৯ সালে ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর অনুশীলন সমিতির নেতৃত্ববৃন্দ তাঁকে সংগঠক হিসাবে বাঁকুড়া কিংবা রাজশাহীতে পাঠানোর প্রচেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু কিছু অসুবিধার কারণে তা বাস্তবায়িত হতে বিলম্ব হয়। এমতাবস্থায় গোপালদার দাদা কলেজে ভর্তি হবার জন্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। গোপালদা নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় তাঁর দাদা তাঁকে হুগলি মহসিন কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য বলেন। অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দ তাঁকে অনুমতি দেওয়ায় তিনি ১৯২৯ সালে নৈহাটিতে তাঁর দাদার কাছে চলে আসেন, যিনি নৈহাটিতে রেলে চাকরি করতেন।

গোপালদার জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুর আলোচনার আগে তৎকালীন নৈহাটির রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের একটা বিবরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক। নৈহাটি অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের জন্মভূমি হলেও এখানাকার স্বাধীনতা আন্দোলনের পতাকা কিংবা সন্ত্রাসবাদের সংগঠন হিসাবে মূল ভূমিকা ছিল যুগান্তর দলের। যার প্রথম পুরুষ ছিলেন হালিশহরের শ্রী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। নৈহাটিতে যুগান্তর দলের প্রধান সংগঠক ছিলেন সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন গোপালদার দীর্ঘদিনের সাথী রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল শূর প্রমুখ। সেই সময়ে সন্ত্রাসবাদী বিভিন্ন সংগঠনগুলির মধ্যে একটা অবিশ্বাসের বাতাবরণ ছিল। কিন্তু সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উদার মনোভাব এবং সাথে সাথে গোপালদার সকলের সাথে একসঙ্গে চলার মানসিকতা খুব দ্রুত তাঁকে নৈহাটির সশস্ত্র সংগ্রামীদের কাছের লোক, নিজের লোক বলে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করল। এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার যে বিশের দশকের গোড়ায় কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার আগে মুজফ্ফর আহ্মদ ও আব্দুর রেজ্জাক খাঁ তাঁদের বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড শুরু করার ভিত্তিভূমি হিসাবে নৈহাটি-কাকিনাড়া অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী গোপাল চক্রবর্তী নদিয়া জুটমিলে এবং আরেক অভিযুক্ত ভাটপাড়ার কালিদাস ভট্টাচার্য গৌরিপুর জুট মিলে শ্রমিকের কাজ করতেন। শ্রমিক হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করতে সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ও কালীদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাজ করতেন। ১৯২৩ সালে গৌরিপুর মিলে শ্রমিকরা ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়, যার ফলে সত্যনারায়ণ এবং কালীদাস দা দুজনেই ছাটাই হয়ে যান। এই সংগ্রামের মধ্যেই আবির্ভাব হয় শ্রমিকনেত্রী হিসাবে গরিফার সন্তোষ কুমার গুপ্তার, যিনি পরিচিত ছিলেন 'মাইজী' নামে। শ্রমিক আন্দোলনে নারীদের ভূমিকার ক্ষেত্রে আরও দুটি নাম অবধারিত ভাবে এসেই পড়ে– (১) বলশেভিক পার্টির সুধা রায় ও (২) প্রভাবতী দেবী (দাশগুপ্তা)। গোপালদার কমিউনিস্ট পার্টিতে আসার প্রেক্ষাপট হিসাবে ইতিহাসের এই অধ্যায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৯ সালে নৈহাটিতে আসার সাথে সাথেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে বিপ্লবী যতীন দাশের আত্মাহুতির সংবাদ পেয়েই মহসীন কলেজে ধর্মঘট হয়। নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুলেও ধর্মঘট হয় এবং ধর্মঘটের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় গোপালদা বক্তব্য রাখেন। ১৯৩০ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার রায়, আব্দুল গণিদের সঙ্গে গোপালদাও ছিলেন। এরপর ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম সত্যাগ্রহী হয়েছিলেন আব্দুল গণি, গোপাল দা কলেজ ত্যাগ করে বারাসাতের সর্দ্দারহাটি ক্যাম্পে প্রথম সত্যাগ্রহী হয়ে যান। এর মধ্যেই নীলা ক্যাম্পে গুলি চলে। আশু দলুই মারা যান। সত্যনারায়ণদার নির্দ্দেশে গোপালদা নীলা ক্যাম্পে যোগ দেন। সর্দ্দার হাটি ক্যাম্পে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রভাস সরকার। নীলা ক্যাম্পে থাকাকালীন সত্যনারায়ণদার সাথে গোপালদাও গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ সালে দেখা যাচ্ছে বিপিনদার নির্দেশে তিনি আত্মগোপন করেছেন এবং আবার গ্রেপ্তারও হয়েছেন। পরবর্তীতে আবার নৈহাটিতে ফিরে এসে কলেজে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে তিনি কোচবিহারের হলদিবাড়িতে আত্মগোপন করেন। সেখান থেকে আবার ঢাকায়। সেখানে প্রায় তিন বছর গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ১৯৩৫ সালে সাধারণ নির্বাচন

উপলক্ষে তিনি নৈহাটিতে ফিরে আসেন। তখন বামপন্থীরা সবাই কংগ্রেসের টিকিটে লড়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে বারাকপুরের প্রার্থী ছিলেন নীহাররেন্দু দত্ত মজুমদার। নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে চিন্তার নতুন জাগরণ শুরু হয়েছিল। সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, মার্কসবাদ সম্পর্কে জানার আগ্রহ সেই সময়কার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, জেলে আটক নেতাদের কাছ থেকে ও বিভিন্ন সূত্র মারফত এই নতুন ভাবনার খবর বাইরে এসে পৌঁছেছিল। তারই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মার্কসসীয় দর্শন সংক্রান্ত বই পত্র পড়া শুরু। এই সময়ে যাঁরা তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সত্যনারায়ণদা ছাড়াও ছিলেন মোহিত মৈত্র। এই পুরো সময়টাই ১৯৪৫ পর্যন্ত ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতাও ছিলেন গোপালদা। এই সময়ে ১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। প্রস্তাবক সম্ভবত ছিলেন সত্যনারায়ণদা। ওই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে ইউনিট বা শাখা কমিটি ছিল না। তখন বলা হত সেল। টিটা গড় থেকে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত যে 'সেল' ছিল তার প্রথম সম্পাদক ছিলেন নীহার মজুমদার। ১৯৩৯ সাল থেকে গোপালদা তার সম্পাদক ছিলেন, তখন এর পুরোটাই ছিল কলকাতা জেলা কমিটির অংশ। যার সম্পাদক ছিলেন সরোজ মুখার্জি। ২৪ পরগনা জেলা কমিটি তৈরি হয় ১৯৪১ সালে মেটিয়াবুরুজে। তার আগে ছিল Organising Committee যেটি ছিল বজবজে। তার সদস্য ছিলেন সত্যনারায়ণদা, নিত্যানন্দ চৌধুরী ও অমূল্য সেন। প্রথম জেলা কমিটি সদস্যদের মধ্যে এই তিনজন ছাড়াও যুক্ত ছিলেন প্রভাস রায় ও গোপালদা।

এই যে সময়, এই সময় ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে নৈহাটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৩৭ সালে ABSF-র ২৪ পরগনা জেলার সম্মেলন নৈহাটিতে হয়। ১৯৩৯ সালে জয়নগরে হয় পরবর্তী সম্মেলন। উল্লেখ্য যে এই সম্মেলনে সম্ভবতঃ জ্যোতি বসু প্রকাশ্য জনসভায় প্রথম ভাষণ দেন। ১৯৩৬ সালে আত্মগোপন করতে তিনি নৈহাটি ছেড়ে মাঝে বাটানগরে (বজবজ অঞ্চলে) ছিলেন। যেখানে তাঁর আর এক ভাই চাকরি করতেন। ওই অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গোপালদার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। গোপালদা গ্রেপ্তার হন। যখন মুক্তি পান তখন তাঁকে ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে কলকাতাসহ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি জেলা ও বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা এলাকাগুলি থেকে Externment Order ধরিয়ে দেওয়া হল। গোপালদা ঢাকাতে চলে যান এবং পুণরায় আত্মগোপন করেন। ১৯৪২ সালে পার্টির উপর থেকে বেআইনি আদেশ প্রত্যাহার হলে তিনি নৈহাটিতে ফিরে আসেন। ১৯৪৩ সালে নৈহাটিতে কমরেড রঘুনাথ সিং-এর বিস্কুট কারখানায় জেলা পার্টির সম্মেলন হয়। যার প্রধান সংগঠক ছিলেন গোপালদা। ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ ৫০-এর মন্বন্তরে পীড়িত মানুষদের রিলিফ দিতে যে আন্দোলন শুরু হয় তারও পুরোভাগে ছিলেন গোপালদা। তিনি এই সময় একই সঙ্গে নৈহাটি ও বজবজে দুটি এলাকাতেই তার কাজকর্ম চালিয়ে যান। এখানে উল্লেখ্য যে বজবজে থাকাকালীন অবস্থাতেই নীরেন ঘোষও ওই এলাকাতে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন।

গোপালদার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি বিশেষ দিক হল নৈহাটির লাইব্রেরী আন্দোলন। প্রথমে তরুণ সংঘ লাইব্রেরি ও সমন্বয় সদন ও পরবর্তীকালে কেশব সেন

পাঠাগারের সৃষ্টি সবকটারই পিছনে ছিলেন গোপালদা। গোপালদার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায় ভাটপাড়া অঞ্চলের রক্ষণশীল পরিমণ্ডল থেকে উজ্জ্বল ছাত্রদের সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে। ভাটপাড়ার চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, সুধাময় ভট্টাচার্য (বড়), সীতাংশু ভট্টাচার্য, ডাঃ জোতিপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রমুখ বহু মেধাবী ছাত্র ও যুবকদের কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৪৬ সালে রসিদ আলি দিবসে নৈহাটিতে এক বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। ইংরেজ সৈন্যদের গুলি বর্ষণে ইসহাক, মুনিয়া, কাহারসহ তিনজন শহীদ মৃত্যু বরণ করেন। সৈন্যদের হাত থেকে তাদের মৃতদেহ উদ্ধারে গোপালদা নেতৃত্ব দেন। সঙ্গে ছিলেন আশু ব্যানার্জি। এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে নৈহাটি সরকার বাড়ির মাঠে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, নৈহাটি রাজনৈতিক ইতিহাসে সেটি একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে স্থানাধিকার করে আছে। ওই বছরেই সারা বাংলায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয় তা সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম লজ্জাজনক ঘটনা। এক্ষেত্রে শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে গোপালদা, রঘুনাথ সিংহ প্রমুখের নিরলস চেষ্টা এই এলাকাকে অনেকাংশে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এই সময়ে আরো একজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি হলেন কংগ্রেসের শ্রী বিশ্বনাথ সিংহ। উথালপাথাল করা এই যে সময়, সে সময় প্রায় সমস্ত উজ্জ্বল ও মেধাবী ছাত্রদের কমিউনিস্ট সংগঠন ও তার গণসংগঠনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গোপালদার ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে নৈহাটির যে ভূমিকা তার পিছনেও গোপালদার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অপরিসীম।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ২৪ পরগনা জেলা পার্টির সংগঠনে গোপালদার ভূমিকা প্রায় সবারই জানা। ১৯৪৮ সালের সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেওয়া ও তার পূর্ববর্তী তেভাগা আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া সর্বক্ষেত্রেই গোপালদা সেনাপতির ভূমিকা পালন করে গেছেন। পার্টির মধ্যে আদর্শগত প্রশ্নে আন্তঃপার্টি সংগ্রামে তার দৃঢ়তা অনুকরণীয়। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন লড়াই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট স্পষ্ট করে দেয়। আর্ন্তাজাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিতর্কের রেশ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এসে পড়েছিল, সে ক্ষেত্রে তাঁকে কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে দেখিনি। নীতিগত প্রশ্নে, আদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রশ্নে তাঁর দৃঢ় মনোভাব, যুক্ত ২৪ পরগনার কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে বিধানসভায় প্রথমে কমিউনিস্ট প্রার্থী পরবর্তীতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। প্রথমবার জয়ী হন ১৯৫৭ সালে।

নৈহাটিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) গঠিত হওয়ার পর এখানে আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয় গোপালদার তত্ত্ববধানে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে কতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেটি তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচালক তা প্ররিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই আঞ্চলিক কমিটিতে যেমন আমি অধ্যাপক অনন্ত চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য, বিশু দাস, জগদীশ সরকার প্রমুখ ছিলেন তার পাশাপাশি রাজদেও রাম, নাগা সিং, গেটয়ী পরামাণিকের মতো শ্রমজীবি মানুষের সরাসরি প্রতিনিধিত্বকারী কমরেডদের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সি পি আই (এম) গঠিত হওয়ার অব্যাহতি পরেই যে নতুন মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হয় ২৪ পরগনা জেলার সংগঠনে তার প্রতিফলন কম পড়ার ক্ষেত্রে গোপালদা, প্রভাস রায়, নীরেন ঘোষ, শান্তি ঘটক, তরুণ সেনগুপ্ত, রাধিকা ব্যানার্জি, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য প্রমুখ অসংখ্য জেলা নেতাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিপূর্ণতারই পরিচালক।

১৯৭০ সাল থেকে সারা রাজ্যে যে রাজনৈতিক হানাহানি শুরু হয়েছিল গোপালদার সঠিক আদর্শগত অবস্থান এর কালেই নৈহাটি তার মধ্যে একটি ব্যতিক্রম হিসাবেই গণ্য হত। গোপালদা নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালের তার আদর্শগত যে অবস্থান, সে অবস্থানে সুদৃঢ় থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামকেই সর্বদা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। ফলে বিভিন্ন প্ররোচনা সত্ত্বেও নৈহাটিতে ব্যক্তি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনকেই একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭২-এর সাধারণ নির্বাচনের পর যে অজস্র সংখ্যক পার্টি কর্মী গৃহ ছাড়া হয়েছিলেন, তাদের এক বিরাট অংশকে গোপালদার নেতৃত্বে নৈহাটিতে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয়েছিলেন। গোপালদার বাড়িতেও পার্টি নেতা থেকে শুরু করে বহু সাধারণ কর্মী আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত লড়াই-এ ব্যক্তি আক্রমণকে গোপালদার সর্বদাই পরিহার করে চলতেন। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম থেকে তাঁর জীবৎকাল পর্যন্ত পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শগত প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তা অনেকেরই জানা, কিন্তু যেটি উল্লেখ করা আমার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে সেটি হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও সংগঠনের মধ্যে বিভাজনকে তিনি কখনই খুশি মনে মেনে নিতে পারেননি। তিনি যেটা বারংবার বলতেন সেটি হল– কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে চলা মতাদর্শগত সংগ্রাম শুধুমাত্র পার্টির প্রাণ শক্তিকেই প্রকাশ করে না সাথে সাথে সমস্ত পার্টি কর্মীকে তাত্ত্বিকভাবে পূর্ণতা পেতে সাহায্য করে।

গোপালদা সম্পর্কে সমস্ত কথা বলার পরেও তাঁর জীবনে একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে সেটি হল তার স্ত্রী ডাঃ কমলা বসুর ভূমিকা। রাজনীতি ও সমাজসেবাকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করার পর বিভিন্ন সময়ে যে আক্রমণ ও অত্যাচারের মুখোমুখি গোপালদা হয়েছেন, কমলাদি ব্যতিরেকে সেই সংগ্রাম চালানো কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। এই মহিয়সী মহিলার ভূমিকা ১৯৭২ সালের পরবর্তীকালে তার বাড়িতে থাকা কিংবা সে বাড়িতে যাওয়া যে কোনও সাধারণ পার্টি কর্মী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকরির সূত্রে ১৯৪০ সালে ইছাপুরে আসি। তার আগে অবশ্য ছাত্র আন্দোলনের সূত্রে আমার রাজনীতির সংস্পর্শে আসা। কিছুদিনের মধ্যেই লেবার পার্টির মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। ইছাপুরে এসে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার সূত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। এই সময়ে লেবার পার্টি থেকে বহু নেতা ও কর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। আমি ও প্রয়াত শান্তি ঘটকসহ বহু লেবার পার্টির কর্মী একই সাথে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। ১৯৩৯-৪০ সালে পার্টিতে এখানকার মতো শাখা ছিল না। সাংগঠন ছিল এলাকাভিত্তিক। এবং এগুলোর নাম ছিল সেল। টিটাগড় থেকে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত একটি সেল ছিল, ১৯৩৯ সাল থেকে তার সম্পাদক ছিলেন গোপালদা। সেলগুলির অন্তর্গত কতকগুলি পার্টি কমিউন কাজ করত। যেমন– ইছাপুরের গোয়ালা পাড়ায় প্রয়াত অবলা সরকারের বাড়িতে একটি কমিউন ছিল। জগদ্দলের ডাঃ রামরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে এবং ভাটপাড়ায় শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মায়ের (লক্ষ্মীদি) নেতৃত্বে আরেকটি কমিউন পরিচালিত হত। আমি ইছাপুরের কমিউনে থাকতাম। প্রয়াত অবলা সরকার সম্পর্কে আমার বৌদি ছিলেন। বয়সের কারণে স্মৃতির কিছুটা বিভ্রম হয়েছে, ফলে

সমস্ত কমরেডদের নাম স্মরণে আনা যাচ্ছে না, তবুও মুরারী মিত্র, কুঞ্জ বসু, অনিল ভট্টাচার্য, ভোলা সরকার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে মনে আছে। এখানেই যামিনী সাহাও পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। আমার জন্মভূমি যশোহরের কালনা গ্রামের যতীন ভট্টাচার্যের মাধ্যমেই আমার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিক ছিলেন।

১৯৩৮-৩৯ সাল ও পরবর্তীকালে নৈহাটির শ্রমিক অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন– সংগঠন তথা পার্টি সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ চৌধুরী একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৩৯ সালে 'All Bengal Students Federation'-এর ২৪ পরগনা জেলার যে সম্মেলন জয়নগর-এ হয় তাতে নৈহাটি থেকে দেবকুমার রায় ছাড়াও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনা দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই যে উদ্বাস্তুর ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়ে নৈহাটিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯৪৮ সালে পার্টি আবার বেআইনি ঘোষিত হয়। এ সময়ে উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনে গোপালদা একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। নৈহাটি ও কাঁকিনাড়া স্টেশনের পূর্বদিকের অঞ্চলে এই সব-হারানো উদ্বাস্তুদের ফাঁকা জমিতে বসানো হয়। এই আন্দোলনে নৈহাটিতে যাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল তাদের মধ্যে ছিলেন মহাদেব ভট্টাচার্য, বিমল দত্ত, অমল দত্ত, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, দ্বিজেন ঘোষ, সত্যেন দাস, অঞ্জলি সোম (পাল), রমেন চৌধুরী, শোভনা দত্ত প্রমুখ। ১৯৪৯ সালে বিজয়নগর কলোনির পত্তন এবং এটাই প্রথম কলোনী।

গোপালদা অত্যন্ত কঠোর চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর আচরণ ও কথাবার্তা প্রায়শই কর্কশতার পর্যায়েই পড়ত। আসলে গোপালদা রেখে ঢেকে কথা বলতে পারতেন না কোনোদিনই। এটা তাঁর স্বভাবগত অকৃত্রিমতার বিশেষ দিক ছিল। কিন্তু এই কঠোরতা কেবল সাধারণ মানুষ কিংবা নিচুতলার কর্মীদের দিকেই উন্মুক্ত থাকত না, উঁচু-নিচু সর্বক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে তিনি সমদর্শী ছিলেন।

১৯২১ সালে ঢাকার বারাদি হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় ভারতে প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন ঘটে। এই উপলক্ষে ছাত্রদের ব্রোঞ্জের স্মারক পদক দেওয়া হয়। গোপালদা তা নিতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক গোবিন্দদাস চৌধুরি তাঁর এই মানসিকতার প্রশংসা করেন। সহপাঠীরা তার এই দৃঢ়তা ও প্রধান শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া দেখে অনুপ্রাণিত হয়। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর পাড়ার এক জ্যাঠামশাই কলকাতা থেকে একটা লাল রঙের কুকুর নিয়ে আসেন, গোপালদার জ্যাঠামশাই তার নাম রাখেন 'ডায়ার' (মাইকেল ও ডায়ারের নামে)। এই সব টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে চেনা যায়, গোপাল বসুকে। যাঁর ইতিহাস আসলে এক বিপ্লবীর ইতিহাস। তাঁর স্বপ্ন পূরণের সংগ্রাম এগিয়ে চলুক।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশ কাল ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী



জন্ম ৯ অক্টোবর ১৯১১। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার রুদ্রকরগ্রামে। বাবা জানকী নাথ চক্রবর্তী। মা গিরিবালা দেবী।

খুব ছোট বয়সেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হন। অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন তাঁকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেন তৎকালীন অনুশীলন সমিতির অন্যতম সংগঠক সীতানাথ দে। কিশোর প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী তখন মাঝে মাঝে মামার বাড়ি যেতেন। সেখানেই প্রতিবেশী সীতানাথ দে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। নিষিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার শুরু করেন সেই কিশোর বয়সেই। অনুশীলন সমিতির সদস্য হওয়ার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সমিতির আঞ্চলিক সংগঠনের সামনের সারিতে চলে আসেন। তাঁর দেশপ্রেম, দুর্জয় সাহস, সাংগঠনিক দক্ষতা, তাঁর নৈতিক সততা, সুন্দর স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণগুলি নেতাদের কাছে তাঁকে খুবই প্রিয় করে তোলে, ফলে আঞ্চলিক স্তর থেকে জেলাস্তরে এবং জেলাস্তর থেকে রাজ্য স্তরে তিনি সমিতির মুখ্য সংগঠক হয়ে ওঠেন। ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। কিন্তু তিন বছর পড়ার পর তাঁকে কলেজ ছেড়ে পালাতে হয়। কারণ ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। আত্মগোপন করেই অনুশীলন সমিতির কাজ চালাতে থাকেন। ১৯৩২ সালে জলপাইগুড়ি স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তার স্যুটকেসে আগ্নেয়াস্ত্র এবং ব্রিটিশ বিরোধী পত্র পত্রিকা ছিল। বিচারে তাঁর সাত বছরে জেল হয়। কারা জীবনের সেই শুরু। তবে শুরু থেকেই পালানোর চেষ্টায় ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী। জলপাইগুড়িতে কিছু দিন কারাবাসের পর তাঁকে যখন পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে কলকাতায় পাঠানো হচ্ছিল, তখন চলন্ত ট্রেনে বাথরুমের জানালা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান। ওই লাফে তাঁর বাঁ পায়ে ভীষণ চোট লাগে। ১৯৩৩ সালের ২৮ অক্টোবর পুনরায় গ্রেপ্তার হলেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী। এবার হিলি রেল স্টেশনে ডাকাতির অভিযোগে আরও সঙ্গীদের নিয়ে ধরা পড়েন তিনি। ডাকাতির মূল পরিকল্পনার অভিযোগ ছিল তাঁরই বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ সরকারের গঠন করা একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল এবার ফাঁসির হুকুম দিল প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর। এই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন রাইটার্স বিল্ডিংসে বিনয়, বাদল দীনেশের হাতে নিহত পুলিশ কমিশনার সিম্পসনের ভাই টমাস ইলিয়াস সিম্পসন। তবে শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে আবেদনের ভিত্তিতে ফাঁসির আদেশ রদ হয়। কলকাতা হাইকোর্টের তখনকার প্রধান বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জি প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর

ফাঁসি রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদায় ও দম্ভে এতটাই আঘাত লেগেছিল যে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখতে খোদ লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করেছিল তারা। যদিও সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। তখন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে আন্দামানে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। সেখানেও রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদার দাবিতে অনশন ও আন্দোলন শুরু করেন। পরে আন্দামান থেকে আলিপুর ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। ১৯৪৬ সালে আগষ্টের ১৩ তারিখ তিনি মুক্তি পান।

প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী জেলে থাকাকালীন মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিভিন্ন মার্কসবাদী সাহিত্য ও বই পড়ে তিনি মানুষের মুক্তির সঠিক পথের হদিশ পান। তাঁকে মার্কসবাদে আকৃষ্ট করে তুলতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন ডাঃ নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্রথমদিকে তিনি আর এস পি তে যোগদান করেন। পাঁচের দশকের শুরুতে তিনি যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। পার্টি বিভাজনের পর সি পি আই (এম)-এ যোগ দেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী। কিছুদিনের জন্য পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছিলেন।

দেশভাগের পরই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী। নেতৃত্ব দেন উদ্বাস্তু আন্দোলনে। ইউ সি আর সি'র সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এসেছিলেন। প্রাক্তন এম পি মার্কসবাদী ফরওয়াড ব্লকের নেতা সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী যকন ইউ সি আর সি' সভাপতি হন তখন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ছিলেন কার্যকরী সভাপতি। সুহৃদ মল্লিক চৌধুরি প্রয়াত হবার পর ১৯৭৮ সালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী হন সভাপতি। সেই সময় থেকে হালিশহরে অনুষ্ঠিত ইউ সি আর সি'র সুবর্ণজয়ন্তী সম্মেলন পর্যন্ত তিনি সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শারীরিক অক্ষমতার জন্য তাঁকে ওই সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে 'পরামর্শদাতা' রূপে সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কংগ্রেসে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে বহুবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। তাঁর গতিবিধির ওপর বাধা আরোপ করা হয়েছিল।

২০০২-এর ২১ অক্টোবর তাঁর জীবনাবসান হয়।

শিক্ষা নিতে হবে তার জীবন থেকে

সমর মুখার্জি

সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, সি পি, আই (এম)

প্রথম পরিচয়:

প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বাস্তুহারা আন্দোলনের মাধ্যমে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৫৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির একটি বর্ধিত সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের মধ্যে পার্টির বিভিন্ন ফ্রন্টের দায়িত্ব বন্টনের সিদ্ধান্ত হয়। সরোজ মুখার্জির প্রস্তাব অনুযায়ী বাস্তুহারা ফ্রন্টের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হল। আমি তখন ছিলাম পার্টির হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক ও একজন পি সি ও (অর্থাৎ প্রাদেশিক কমিটির সংগঠক)।

পার্টির দায়িত্ব পাওয়ার পর উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। আমি এই দায়িত্ব পাওয়ার আগেই ১৯৫০ সালে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ গঠিত হয়েছে। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেছেন ১৯৫১ সালে। ১৯৫৩ সালে

যখন ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ওঁদের কেন্দ্রীয় অফিস ৯৩/১এ, বহুবাজার ষ্ট্রিটে হাজির হই তখন দেখি যে এই অফিসটি এক পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়ির নিচের তলার একটি ঘর। এই বিল্ডিং ও এই ঘরটির সঙ্গে তখন আমার পুরোনো সম্পর্কের কথা মনে পড়ে।

আমার এই পুরোনো সম্পর্কের পটভূমিকা ও ইতিহাস যা নেতাদের জানিয়েছিলাম তা নিম্নরূপ: প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মতোই আমিও যখন স্কুল ছাত্র ছিলাম তখনই সক্রিয় রাজনীনিতে জড়িয়ে পড়ি। স্কুলে ছাত্র সমিতি গঠন করি। আমি পড়তাম হাওড়া জেলার আমতা গ্রামের হাই স্কুলে। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের তরফ থেকে যে আইন অমান্য আন্দোলন ও হরতালের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল তাতে সাড়া দিয়ে আমতা হাই স্কুলে দীর্ঘদিন ব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পরিচালনা করি। স্কুল কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট শেষ হওয়ার পর আমাকে ওই স্কুল থেকে বিতাড়িত (Rusticate) করে।

ওই সময় বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁরই নামে পরবর্তীকালে বহুবাজার স্ট্রিটের নাম বিপিন বিহারী স্ট্রিট হয়। তিনি আমাকে কোনো একটি কলকাতার স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য দু'বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাতে সফলকাম না হয়ে তিনি শেষে আমাকে বললেন যে, 'তোমাকে গিরিন ব্যানার্জির স্কুলে ভর্তি করে দেব'। গিরীন ব্যানার্জি ছিলেন বহুবাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনে বিপিন গাঙ্গুলীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। তাই তিনি তাঁর স্কুলে ১৯৩২ সালে দশম শ্রেণীতে আমাকে ভর্তি করে নিলেন। এই স্কুল থেকেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করি। এই স্কুল বিল্ডিং-এর নিচের তলার যে ঘরটিতে ইউ সি আর সি'র কেন্দ্রীয় অফিস ছিল ১৯৩২ সালে সেই ঘরেই আমি ছাত্র হিসাবে ক্লাশ করেছি।

১৯৫০ সালে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদেরর প্রতিষ্ঠাতা সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচত হন শ্রদ্ধেয় অম্বিকা চক্রবর্তী। অম্বিকাদার সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল দমদম জেলে। ১৯৪০ সালে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে আমি যখন দমদম জেলে যাই সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হায়। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর নামের ও ওঁর বিপ্লবী জীবনের পটভূমিকার সঙ্গে সংবাদপত্র মারফৎ আগেই পরিচিত ছিলাম। যতদূর মনে আছে উদ্বাস্তু ফ্রন্টের পার্টি দায়িত্ব পাওয়ার পর ইউ সি আর সি'র অফিসেই তাঁর সাথে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়। সেই সময় থেকে তাঁর সক্রিয় জীবনের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত যুক্তভাবে উদ্বাস্তু আন্দোলনের ও ইউ সি আর সি সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। ফলে তাঁর বিপ্লবী ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে।

বিপ্লবী জীবনের পটভূমিকা:

ইউ সি আর সি'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার আগে অম্বিকা চক্রবর্তীর যেমন ছিল এক বিপ্লবী জীবনের পটভূমিকা (চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার দখলের সংগ্রাম) সেই রকম প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর উদ্বাস্তু আন্দোলন ও সংগঠনের প্রাণপুরুষে পরিণত হওয়ার আগে যে বিপ্লবী পটভূমিকা ছিল তা হয়তো এখনকার প্রজন্মের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে তাই তাঁর বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস ও উদ্বাস্তু আন্দোলনে তার অসামান্য অবদান বার বার তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে যাতে তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা সক্ষম হয়।

তাঁর বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে তিনি নিজে কোনো স্মৃতিকথা লেখেননি। কিন্তু তিনি নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এ্যান্ড লাইব্রেরি (Nehru Memorial Museum and Library)-কে তাঁর জীবনী-সম্পর্কে যে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছেন তা বই আকারে প্রকাশের পূর্ণ সত্ব ও অধিকার কেবল ওই প্রতিষ্ঠানকেই দিয়ে গেছেন। দিল্লিতে যেদিন তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে সেই তারিখটা হচ্ছে ১৯৭৬ সালের ১১ নভেম্বর। যেহেতু তাঁর ওই রেকর্ড করা আত্মজীবনী প্রকাশে বাইরের কোন সংগঠন বা ব্যক্তির আইনগত অধিকার নেই তাই আলাদা পুস্তিকা হিসাবে ইউ সি আর সি এটি ছাপাতে পারছে না। তবে তাঁর বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস জানতে এই দলিল যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

ওই দলিলে তাঁর জন্মদিন লেখা আছে ১৯১১ সাল, ৯ অক্টোবর। তাঁর বিপ্লবী জীবন শুরু হয়েছে স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই। ফরিদপুর জেলার রুদ্রকর নামে যে গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামের হাই স্কুলেই তিনি পড়াশোনা করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে ঢাকায় যান ডাক্তারি পড়ার জন্য। তাঁর স্কুল জীবন শুরুর আগেই তাঁদের গ্রাম অনুশীলন সমিতির একটি শক্ত কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ওই গ্রামে অন্য কোনো পার্টির অস্তিত্ব ছিল না।

অনুশীলন সমিতি ছিল বিপ্লবীদের একটি গোপন সংগঠন যার লক্ষ্য ছিল দেশকে ব্রিটিশের গোলামি, শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুতি করা। সে জন্য এই সমিতির যাঁরা সদস্য হতেন তাঁদের শপথ নিতে হত দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করার ও জীবনের নৈতিক মানকে উন্নত রাখার। তাঁদের কাজ হবে সমিতির সংগঠনকে বাড়ানোর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা, অস্ত্র সংগ্রহ করা, অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং নেওয়া ও দেওয়া, অস্ত্রকেনার জন্য টাকা সংগ্রহ করা, সেজন্য প্রতিক্রিয়াশীল ধনীদের বাড়িতে বা টাকা বহনকারী সরকারী, বে-সরকারী মেল ব্যাগ লুঠ করা প্রভৃতি। এই সব অস্ত্র দিয়েই অত্যাচারী ব্রিটিশ আমলাদের হত্যা করে সমগ্র দেশকে তাঁরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন বলে তাঁদের বিশ্বাস ছিল।

প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির সদস্য হওয়ার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সমিতির আঞ্চলিক সংগঠনের সামনের সারিতে চলে আসেন। তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর দুর্জয় সাহস, তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতা, তাঁর নৈতিক সততা, তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণাবলী নেতাদের কাছে তাঁকে খুবই প্রিয় করে তোলে। ফলে আঞ্চলিক স্তর থেকে জেলা স্তরে এবং জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তরে তিনি সমিতির মুখ্য সংগঠক হয়ে ওঠেন। তিনি ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে ভারতে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসকের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভও বাড়তে থাকে। বিপ্লবীদের গোপন কাজকর্মও প্রসার লাভ করে। গান্ধিজীর নেতৃত্বে শুরু হয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ-বিরোধী অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন ও বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন। এই আন্দোলন যাতে কোনক্রমেই বিপ্লবী আন্দোলানের ও ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর পথে না যায় তার জন্য গোড়া থেকেই গান্ধিজী সতর্ক ছিলেন। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের কাছ থেকে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' আদায় বা স্বায়ত্তশাসন অর্জন। ১৯২৮ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেসের অধিবেশনে ৫০ হাজার শ্রমিক মিছিল করে এসেছিলেন, তারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বনি তুলেছিলেন। মতিলাল নেহরু ছিলেন ওই অধিবেশনের সভাপতি। ওই অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু ও সুভাস বোসরা পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব উথাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে

৯৭৩ ভোট ও বিপক্ষ ১৩৫০ ভোট পড়ে। বাংলারবিপ্লবীরা ভেবেছিলেন কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবী গ্রহণ করবে। কিন্তু কংগ্রেসের এই মনোভাবে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আত্মত্যাগের জন্য তৈরি হন। এই ১৯২৮ সালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। তিনি ফেরারি হয়ে যান। ওই আত্মগোপন অবস্থায় তিনি বিপ্লবীদের বোমা বানানো, পিস্তল ছোঁড়ার ট্রেনিং দিতেন।

তিরিশের দশক ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের কাল। ১৯৩০ সালে গান্ধিজী লবণসত্যাগ্রহের আহ্বান জানালেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল হয় এবং চট্টগ্রামে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করা হয়। এই অভ্যুত্থানে মাস্টারদার সহযোদ্ধা ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষরা। ২৯ আগস্ট ১৯৩০ পুলিশের আই জি ল্যোমান ঢাকায় বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। মেদিনীপুরের তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট পেডী, ডগলাস ও বার্জ পর পর বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। ৭ অক্টোবর ১৯৩০ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং রাজগুরু, সুখদেবের ফাঁসি হয়।

এই সময়কালের মধ্যে ১৯৩২ সালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী অস্ত্র সমেত ধরা পড়েন এবং তাঁর ৭ বছর কারাদণ্ড হয়। এই কারাদণ্ড তাঁকে তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা–এই চিন্তা তাঁকে মানসিকভাবে পীড়ত করে বলে তিনি জেল থেকে পালানোর জন্য উপায় চিন্তা করতে থাকেন। যখন তিনি এই চিন্তা করছেন তখন তাঁর কাছে সুযোগ এল চলন্ত ট্রেন থেকে বন্দী অবস্থায় পালানোর।

জলপাইগুড়ি জেলে আটক ছিলেন দেশপ্রিয় জে এম সেনগুপ্ত। তাঁর সাথে অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মপ্রচেষ্টা সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি তাদের সাথে মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন। তিনি রোজ বিকালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী যে সেলে আবদ্ধ ছিলেন সেই সেলের সামনে এসে দাঁড়াতেন এবং উভয়ের মধ্যে আলোচন হত। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁকে বলেন কারাগারের বাইরে যেতে হবে, সেখানে মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে অনেক কাজ বাকি রয়েছে, আমার পার্টিকে (অনুশীলন সমিতি) আরও শক্তিশালী করতে হবে। দেশপ্রিয় তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়েছিলেন।

চলন্ত ট্রেন থেকে পালিয়ে তিনি চড়খাইতে আত্মগোপন করেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক পলায়নের সংবাদ বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়। পুলিশ চারদিকে তাঁর সন্ধান শুরু করে। এদিকে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর পরনে জেল কয়েদির পোশাক। তিনি চড়খাইতে যে বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন তাদের কাছ থেকে ধুতি, শার্ট চেয়ে পরেন। তারপরদিন গরুর গাড়িতে চেপে বালুরঘাট চলে যান। বালুরঘাটে এক মুসলিম পরিবারে আশ্রয় নেন। বগুড়া কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডাঃ অবদুল কাদের চৌধুরী। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁকে দলে রিক্রুট করেন। ডাঃ আব্দুল কাদের চৌধুরী পরবর্তীকালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হিলি সেল ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ আবদুল কাদের চৌধুরীকে দলে আনতে পারায় সমাজের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং আত্মগোপনকারীদের আশ্রয়স্থল খোঁজার সমস্যা মেটে। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী আত্মগোপনে থাকাকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমান-সাঁওতালিদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন। বিপ্লবী সংগঠন গড়ার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বিশেষ করে পিস্তল বোমা ও বোমা বানানোর মালামাশলার জন্য। তাই তাঁরা ঠিক করলেন হিলি স্টেশনে সরকারী টাকা ভর্তি ব্যাগ লুঠ করবেন।

১৯৩৩ সালের ২৮ অক্টোবর রাত প্রায় দুটো, বগুড়া জেলার শেষপ্রান্তে অবস্থিত হিলি রেলস্টেশন সংলগ্ন বিশালগঞ্জ, উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র, ১৫টি চালকল, অনেকগুলো বিড়ি ফ্যাক্টরি। দার্জিলিং মেল এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ পিস্তল ও বন্দুকধারী বারো জন যুবক হেঁকে উঠল– কেউ দৌড়াদৌড়ি করবেন না। যে যার জায়গায় আছেন দাঁড়িয়ে থাকুন। আমরা কারো ক্ষতি করব না। অতর্কিত এই ঘোষণায় সবাই হতচকিত। মুহূর্তের মধ্যে দুঃসাহসিক এই বিপ্লবীর দল রেলের টেলিফোন ব্যবস্থা অকেজো করে দিয়ে ট্রেন থেকে দুটি বিরাট কাঠের বাক্সের ডালা ভেঙ্গে টাকা ভর্তি দুটি মেল ব্যাগ নিয়ে তীব্রগতিতে ছুটতে থাকেন। এই বারো জনের দলে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি, সত্যব্রত চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, সরোজকুমার বসু, হরিপদ বসু, প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল, আবদুল কাদের চৌধুর। এঁরা সবাই বগুড়া জেলার। রাজসাহীর সালু পান্ডে, রামকৃষ্ণ সরকার ওরফে মণ্ডল, অশোক ঘোষ, শশধর সরকার ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী। এই সময়ে গুলি বিনিময়ে দুজনের মৃত্যু হয় যাঁরা এই দলের কেউই ছিলেন না। কিন্তু ব্যাগ নিয়ে পালানোর পথে পরের দিন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী সহ ৭ জন ধরা পড়ে যান। এই দুটি ঘটনাই প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর নামকে সমগ্র দেশের সামনে পরিচিতি করে তোলে।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচার চলাকালীন সময়ে দিনাজপুর জেলে ব্রিটিশ সরকারের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেবাইন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে বলেন তোমাদের চারজনের ফাঁসি হবে এবং ডাঃ আবদুল কাদের সহ কয়েকজনের দ্বীপান্তর ও অন্যান্যদের বড় বড় সাজা হবে। এরপরে পুলিশের আরেকজন বড় কর্তা তাঁর সাথে দেখা করে কোনো বক্তব্য আছে কিনা জানতে চায়। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী সাফ জানিয়ে দেন তাঁর কোনো কিছু বলার নেই। স্পেশাল ট্রাইবুনাল বেঞ্চ এর প্রধান বিচারপতি ইলিয়াস সিম্পসন এবং দু'জন ভারতীয় বিচারপতির মামলার রায়ে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, সত্যব্রত চক্রবর্তী ও সরোজ বসুর ফাঁসির আদেশ ও আন্যান্যদের দীর্ঘমেয়াদী সাজা হয়। এই বিচারপতি সিম্পসন ছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর ৮ ডিসেম্বর ১৯৩০ অলিন্দযুদ্ধে বিনয়কৃষ্ণ বোসের গুলিতে নিহত কারাধ্যক্ষ সিম্পসনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিপ্লবীদের ওপর তার জাতক্রোধ। আই বি অফিসের রচিত বয়ানে রায় ঘোষিত হল না। ট্রাইবুনালের বিচারের পর আসামীদের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টে তখন প্রধান বিচারপতি ছিলেন জস্টিস মন্মথ মুখার্জি। হাইকোর্ট আসামীদের মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেয়। ভারত সরকার তখন হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিলের কাছে আপীল করে। প্রিভি কাউন্সিল হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখে।

কলকাতার জেলখানায় তাঁর প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার চলেছিল তার বিস্তারিত কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন নেহরু মিউজিয়ামের কাছে দেওয়া তাঁর বক্তব্যে। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে জেলে বহুদিন ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা হয়। কিন্তু অত্যাচার তাঁর মনোবলকে ভাঙ্গতে পারেনি।

১৯৩৪ সালে তাঁকে পাঠানো হয় আন্দামান সেলুলার জেলে। সেখানে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তিনি ৩৭ দিন অনশন ধর্মঘট পালন করেন। আন্দামান বন্দীদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনার পর তিনি ছিলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যেখানে তিনি ২৮ দিন অনশন ধর্মঘট করেন।

আন্দামানে রাজবন্দীদের এটা দ্বিতীয় অনশন। ১৯৩৩ সালে প্রথম বারের মহাবীর সিং, মোহিত মৈত্র ও মোহন কিশোর নমঃদাস মারা যান। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীদের এই দ্বিতীয়

অনশনে সময় মহাত্মা গান্ধী ২৭ আগস্ট ১৯৩৭ ভারতের ভাইসরয়ের মারফৎ আন্দামান বন্দীদের অনশন ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবিতে দেশে সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, ছাত্রধর্মঘট ইত্যাদি হয়। বাংলাদেশে বন্দীমুক্তি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলায় তখন হক মন্ত্রিসভা। হক মন্ত্রিসভা বন্দীমুক্তি প্রশ্নে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করে। ২৮ জুন ১৯৩৭ বরিশালের এক জনসভায় ফজলুল হক রাজবন্দীদের মুক্তির বিরোধীতা করেন। এই নিয়ে বাংলাদেশে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ২৪ জুলাই ১৯৩৭ 'নিখিলবঙ্গ রাজবন্দী দিবস' পালন করে। আন্দামান সেলুলার জেলের অনশনকারী বন্দীদের দাবি ছিল– (১) সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের অন্তরীণ রাজবন্দী এবং অন্যান্য দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, (২) দমনমূলক সমস্ত আইন এবং অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে, (৩) বর্তমানে আন্দামানে যে সব রাজনৈতিক বন্দী আছেন তাঁদের ভারতবর্ষে পাঠাতে হবে এবং আর কখনও আন্দামানে পাঠানো যাবে না, (৪) সমস্ত দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের 'বি' ক্লাস কয়েদী হিসাবে গণ্য করতে হবে। বাংলার কুখ্যাত লাটসাহেব এন্ডারসন বন্দীদের দাবি উপেক্ষা কারেন। ২ আগস্ট ১৯৩৭ আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে কলকাতা টাউন হলের সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ওই সভায় আন্দামান বন্দীদের দাবির সমর্থনে আন্দোলন করার জন্য 'আন্দামন রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য কমিটি' গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সহ সভাপতির হলেন শরৎচন্দ্র বসু, মেয়র সনৎ কুমার রায়চৌধুরী, ডাঃ আর আহমেদ ও জে সি গুপ্ত। সম্পাদক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমিটিতে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি, হেমন্তকুমার বসু, শিবনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ অনেকে। সভা থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত একটি টেলিগ্রাম আন্দামান বন্দীদের পাঠানো হয়। তাতে লেখা ছিল 'Bengal anxious to know state of health of her exiled sons who are on hunger strike. The country is solidly behind you.' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ইউনাইটেড প্রেসের মাধ্যমে ৭ আগস্ট বন্দীদের মুক্তির দাবি জানান। আন্দামান বন্দীদের প্রতি সরকারের মনোভাবের প্রতিবাদে ১২ আগস্ট থেকে দেউলি বন্দীশিবিরের দুই শত এবং প্রেসিডেন্ট ও আলিপুর জেলের ৪৮ জন রাজবন্দী আনশন শুরু করেন। অবশেষে গান্ধিজীর অনুরোধে ২৯ আগস্ট বন্দীরা অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৩৮ সালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। ১৯৩৯ সালের আগস্টে মাসে পুনরায় আলিপুর ও দমদম জেলের রাজবন্দীরা ২৮ দিনের অনশন ধর্মঘট করেন। এই অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ নিয়ে গান্ধিজীর দূত হিসাবে এসেছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মহাদেব দেশাই। রাজবন্দীরা অনশনে অটল রইলেন। এরপর এলেন সুভাষ বসু, শরৎ বসু, মুজফ্ফর আহ্মদ ও সোমনাথ লাহিড়ী। বন্দীরা অনশন ভাঙ্গেন।

১৯৪০ সালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজনকে মারাত্মক বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে আন্দামান জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন।

এই সময় ভারতের রাজনীতিতে অনেক সুদূরপ্রসারী ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির পরাজয় ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভে বিশ্বের দিকে দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপনিবেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম দুর্বার হয়ে ওঠে। ভারতে

ধর্মঘটের পর ধর্মঘট ঘটতে থাকে। বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহের সংগ্রাম ও তাদের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট, বাংলাদেশে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই ঐতিহাসিক ডাক তার কর্মচারিদের ধর্মঘট হয়। এই সময় আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে বিধানসভার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বিধায়ক কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু ও লিগ নেতা লালমিঞা ইস্তাহার বিলি করেন। জ্যোতি বসু বন্দীদের মুক্তির দাবিতে প্রস্তাব আনতে চাইলে স্পীকার তা বাতিল করে দেন। বাংলায় তখন সুরাবর্দীর মন্ত্রিসভা। দেশে দাঙ্গা চলছে। তিনি বন্দীদের সাথে দেখা করে তাঁদের জিজ্ঞেস করেন মুক্তি পেলে তাঁরা কী করবেন। বন্দীরা বলেন তারা সর্বপ্রথম দেশের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপন ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবেন। অবশেষে ১৯৪৬ সালের ৩১ আগস্ট প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীরা মুক্তি পান। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর সাথে মুক্তি পাওয়া চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের সংগ্রামের বীর লালমোহন সেন নোয়াখালীতে দাঙ্গা থামাতে গিয়ে কারামুক্তির কয়েকদিনের মধ্যে নিহত হলেন। ৩১ আগস্ট ১৯৪৬-এ ঢাকা জেল থেকে যে ১৮ জন রাজবন্দী ছাড়া পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন – ১) অনন্ত সিংহ, ২) গণেশ ঘোষ, ৩) সুবোধ চৌধুরী, ৪) সহায়রাম দাস, ৫) সুখেন্দু দস্তিদার, ৬) লালমোহন সেন, ৭) সুকুমার সেনগুপ্ত, ৮) কামাখ্যা ঘোষ, ৯) সোমাদা চক্রবর্তী, ১০) প্রিয়দা চক্রবর্তী, ১১) প্রভাত চক্রবর্তী, ১২) হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, ১৩) অমূল্য রায়, ১৪) জগদানন্দ মুখার্জি, ১৫) বিরাজ দেব, ১৬) প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ১৭) জীতেন গুপ্ত, ১৮) সীতানাথ দে।

ঢাকা মেলে কলকাতা এলেন। পথে ট্রেনের স্টেশনে স্টেশনে তাঁদের বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আলিপুর জেলে থেকে ছাড়া পান – অম্বিকা চক্রবর্তীদের দল। ছিলেন সুধীন চ্যাটার্জি হেম বক্সী, নলিনী দাস, সুরেন কর, সুরেশ দাস, প্রফুল্ল সেন প্রমুখ।

১৯৮৬ সালে হিলিতে ঐতিহাসিক দুঃসাহসিক হিলি মেল রেড এর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আমি, প্রশান্ত শূর, শৈলেন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও তাঁর ওই মেল রেড-এর সাথী সত্যব্রত চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলাম। ওই দিন অঞ্চলে বিশেষ সাড়া পড়েছিল।

১৯৪৬ সালে দাঙ্গার পরই মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষের ভিত্তিতে কংগ্রেস ভারত বিভাগ মেনে নেয়। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হল। লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু জনগণ উদ্বাস্তুতে পরিণতি হল। দুটি রাষ্ট্রে ব্রিটিশের শোষণ অব্যাহত রইল। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হল। দুটি রাষ্ট্র পরস্পর শত্রুতে পরিণতি হল। কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনবার্সনের দায়িত্ব অস্বীকার করে তাদের বিদেশী বলে ঘোষণা করল। তারপরই শুরু হল উদ্বাস্তুদের বাঁচার ও পূর্ণবাসনের জন্য সংগঠিত সংগ্রাম।

অনুশীলন সমিতি থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে:

আন্দামান জেলে থাকার সময়ে তিনি মার্কসবাদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। ওই জেলে বন্দী আরো অনেক বিপ্লবী মার্কসবাদী সাহিত্য পড়ে ও জেলের মধ্যে মার্কসবাদী আলোচনা চক্রে যোগ দিয়ে বিপ্লব সম্পর্কে তাঁদের আগের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আন্দামান জেলে মার্কসবাদী আলোচনা চক্রের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ নারায়ণ রায়।

জানা গেছে যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি কিছুদিন আর এস পি'র সদস্য হয়েছিলেন এবং উদ্বাস্তু আন্দোলনেও প্রথমে আর এস পি পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র উদ্বাস্তু সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। পরে যখন তাঁকে পার্টি সদস্যপদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে তখন তিনি ভিন্ন পার্টি থেকে আমাদের পার্টিতে আসছেন এই কারণে পার্টির উচ্চতর কমিটির অনুমতি আবশ্যক হয়ে পড়ে। সেই সময় মুজফ্ফর আহ্‌মদ (কাকাবাবু) ছিলেন প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে। আমি গোপাল ব্যানার্জি ও রবি গাঙ্গুলীর কাছ থেকে জেনেছি যে কাকাবাবু এই প্রস্তাব শুনে মন্তব্য করেছিলেন– 'আপনারা প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস জানেন না। তাঁর মতো লোক আমাদের পার্টির সদস্য হলে মর্যাদা বাড়বে।'

উদ্বাস্তু আন্দোলনের পুরোভাগে:

উদ্বাস্তু আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা আগের প্রজন্মের উদ্বাস্তুদের, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল ও জনগণের বিশষভাবে জানা ছিল। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তা জানে না। তিনি এমনভাবে পুরোপুরি নিজেকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন যে তাঁকেই উদ্বাস্তুদের অনেকে মনে করতেন উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রাণ ও প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তি।

ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসতে বাধ্য হল তাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি এবং তার সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের অমানুষিক আচরণ ও ওদের আবার পূর্বপাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য করার চেষ্টা যেখানে তারা আর কোনো রকমেই ফিরে যেতে রাজি নয় সেই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জীবনে যে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা সামাল দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পুর্বাসনের জন্য সংগ্রাম ছিল খুবই কঠিন। এই লড়াইয়ে উদ্বাস্তুদের নিজস্ব শক্তিকে সংগঠিত করে যে নতুন ধরনের এক সংগ্রাম শুরু হল তা হল আইন ও দমনকে অগ্রাহ্য করে পতিত ও জঙ্গলের জমিকে দখল করে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম পরিত্যাক্ত বাড়িগুলিকে জবরদখল করা।

প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী বাঁকুড়া জেলা বাস্তুহারা পরিষদ প্রকাশিত সুখেন্দু খাঁ ও জীবন রঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নির্বাচিত কয়েকটি লেখা' পুস্তিকাতে লিখেছেন '...এখানে একটা কথা যথেষ্ট গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, এ রাজ্যে জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার আমি একজন আদি ও প্রথম সারির নেতা।... উদ্বাস্তুদের জন্যে প্রথমেই আমরা জবরদখল কলোনি গড়তে শুরু করি। রেলের জমি, কেন্দ্রীয় সরকারের জমি ... খালি জমি দেখলেই আমরা উদ্বাস্তুদের তা দখল করে নেওয়ার জন্যে আহ্বান জানাতাম। উদ্বাস্তুদের আমরা বলে দিয়েছিলাম যে যেখানে বসেছ সেখান থেকে নড়বে না। এই জঙ্গি, বেপরোয়া মানসিকতা ধীরে ধীরে গড়ে দেওয়া হয়েছিল। এক এক জায়গায় জমিদারের গুণ্ডারা পুলিশ নিয়ে কলোনি ভাঙ্গতে আসত। কোনো হাঙ্গামা খবর পেলেই আমি সেখানে দৌড়ে যেতাম। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ঘুরে ঘুরে আমি জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা করি। কলোনিগুলিতে রাতারাতি ঝুপড়িঘর তুলে দেওয়া হত। নিচে বাঁশের খুঁটি, বাড়ি তৈরির পরই আমরা প্রাথমিক স্কুল তৈরির ওপরে জোর দিয়েছিলেন। সেই সময় আমার কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতাম। উদ্বাস্তুদের মধ্যে তখন আমার জনপ্রিয়তা ছিল প্রচণ্ড। মনে আছে – বর্ধমান জেলার দামোদর চরে যেখানে আমি উদ্বাস্তুদের নিয়ে জবরদখল কলোনি গড়েছিলাম – সেখানে পাল্টা একটি দল রাজনীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে আসে। উদ্বাস্তুরা তাদের জিজ্ঞেস করেছিল 'প্রাণদা কোনদিকে, আপনার সঙ্গে আছেন তো।'

'... মনে আছে সেই সময় আমাদের আন্দোলন চলত দু ভাগে– প্রথমত জমি জবরদখল করা এবং দুই, সরকারের কাছে আশ্রয়শিবির তৈরি করার আর্জি জানানো। সেই সময় রাজ্য পুনর্বাসন কমিশনার ছিলেন হিরন্ময় ব্যানার্জি। তাঁর কাছ থেকেও আমরা বহু সহযোগিতা পেয়েছি। হিরন্ময় ব্যানার্জির কাছে বার বার আর্জি জানিয়ে অধুনা ই এম বাইপাসের ধারে পঞ্চান্নগ্রাম প্রকল্প গড়ে তুলি। কৃষিজীবি, উদ্বাস্তুদের জন্য হয় হেরোভাঙ্গা প্রকল্প। এখানে একথা আবার বলি আমরা সবসময় মনে রাখতাম মানুষকে সংগঠিত না করলে কোনো বড় ধরনের কাজ করা যায় না। আমরা তাই জোর দিতাম জবরদখল বা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সাংগঠনিক দিকটিতে।' উদ্বাস্তু আন্দোলনে তাঁকে বহুবার সরকারি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৬ বনগাঁ মহকুমার গুয়ার্কসাইট ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে তাঁকে ও হেমন্তকুমার বিশ্বাসকে পুলিশ নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। ওই ১৯৫৬ সালের ৩ জুলাই নদিয়া জেলার পি এল ক্যাম্পের সম্মেলনে তাঁকে ও ভদ্রকালী ক্যাম্পে নেত্রী সরযূবালা বলকে অংশগ্রহণে পুলিশ বাধা দেয়। ওই সালেই তাঁকে বাঁকুড়া জেলায় পুলিশ ঢুকতে দেয়নি।

১৯৫৭ সালে সমস্ত উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ইউ সি আর সি-র তীব্র আন্দোলনকে তিনি সংগঠিত করেন। তিনি ক্যাম্প দুর্নীতি, অব্যবস্থা, কথায় কথায় সাহায্য বন্ধ, শিয়ালদহ স্টেশন, কাশীপুর, দাসপাড়া, ঘুষুড়ী ইত্যাদি ক্যাম্পে অসংখ্য উদ্বাস্তু শিশু ও নরনারীদের মৃত্যুর বিরুদ্ধে ইউ সি আর সি-র তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৭ শিয়ালদহ স্টেশনে দীর্ঘদিন অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে বিধানসভা অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। ২ জুন ১৯৬১ ইউ সি আর সি-র ষষ্ঠ সম্মেলন রাণাঘাটে রূপশ্রীপল্লীতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরি, গৌরি কুণ্ডু ও আমার ওপর ওই অঞ্চলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়। ১৯৭০-এর জানুয়ারিতে উড়িষ্যার কটকের কাছে ইদগা কলোনিতে উড়িষ্যা রাজ্য চতুর্থ উদ্বাস্তু সম্মেলনের তিনি উদ্বোধন করেন এবং উড়িয়া ও বিহার প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলন করেন। দণ্ডকারণ্যে ক্যাম্পে গুলিচালানার প্রতিবাদ জানাতে তিনি, আমি ও সুহৃদ মল্লিক ওই চৌধুরী ক্যাম্পে বিশ সহস্রাধিক উদ্বাস্তুদের সভা করেছিলাম। আমি রায়বেরিলি জেলে আটক উদ্বাস্তু বন্দীদের সাথে দেখা করি।

বামপন্থী দলগুলির সহযোগিতায় ইউ সি আর সি'র নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্বাস্তু আন্দোলন আজও অব্যাহত আছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এখনও তার বৈষম্যমূলক নীতি পরিবর্তন করেনি। ১৯৪৭ সাল থেকে উদ্বাস্তুদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা একদিকে যেমন বামপন্থী দলগুলি ও পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থনে শক্তিশালী হয়েছে অপরদিকে তেমনি বামপন্থী আন্দোলনও শক্তিশালী হয়েছে। এরফলে একদিকে যেমন পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে ও পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা সৃষ্টি হয়েছে।

অপরদিকে তেমনি যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকার উদ্বাস্তু আন্দোলনের দাবিগুলিকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে কেন্দ্রের উপর ধারাবাহিক চাপ সৃষ্টির ফলে উদ্বাস্তু আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যদিও উদ্বাস্তুদের একটা বড় অংশকে জোর করে দণ্ডকারণ্যে ও বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে তবুও বৃহত্তর অংশই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থেকে ভারতের নাগরিক বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রায় দুহাজারের কাছাকাছি জবরদখল কলোনি

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন খাতে উদ্বাস্তুদের যে সব ঋণ দেওয়া হয়েছিল তা পরে মকুব হয়েছে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যখন বামপন্থী নেতাদের ডেপুটেশনের সামনে কবুল করেন যে বামপন্থী সরকার তথ্য দিয়ে যদি প্রমাণ করতে পারে যে উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব নেবে। তখন বামপন্থী সরকার তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সরকারি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটিতে আমাকে চেয়ারম্যান করা হয় ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও অনিল সিংহকে সদস্য করা হয়। আমরা তখন ছিলাম ইউ সি আর সি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই কমিটি আড়াই বছর ধরে সরেজমিনে তদন্ত করে যখন রিপোর্ট প্রস্তুত করে ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রের কাছে ৭৫০ কোটি টাকার দাবি উত্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে তার আগেই কেন্দ্রে জনতা সরকারের পতন ঘটে ও ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা আসেন। যদিও রাজ্য সরকার কমিটির সুপারিশকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে কেন্দ্রের কাছে ৭৫০ কোটি টাকার দাবি রাখেন কিন্তু কেন্দ্র সে দাবি মানতে অস্বীকার করে। কেন্দ্র পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রীর পদই বিলোপ করে দেয়। ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সব সরকারগুলির কাছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বার বার এই দাবি উত্থিত হয়েছে। প্রশান্ত শূর পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার পর কেন্দ্রের কাছ থেকে যখন প্রস্তাব আসে যে থোক্ টাকার বিনিময়ে (Packge deal) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের অধ্যায় শেষ করে দিতে হবে তখন মূল্যবৃদ্ধির অবস্থায় ৭৫০ কোটি টাকার দাবির ভিত্তিতেই কেন্দ্রে কাছে ১৭২৬.৫০ কোটি টাকার দাবি রাখা হয়েছে। ওই কমিটির রিপোর্ট বলা হয়েছে (যা ১৯৮১ সালে তৈরি হয়েছিল) যে উদ্বাস্তু জনগণের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে।

কেন্দ্রের কাছে ইউ সি আর সি'র দাবি বামপন্থী সরকারের দাবিতে পরিণত হয়েছে। এটা উদ্বাস্তু আন্দোলনের সব থেকে বড় জয়। তাই বামপন্থী সরকারের সাফল্যের সঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলনের ও পুনর্বাসনের সাফল্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

আন্দোলনের ভিতর দিয়েই প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ইউ সি আর সি'র সর্বোচ্চ নেতৃত্বে এসেছিলেন। প্রাক্তন এম পি মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা সুহৃত মল্লিক চৌধুরী যখন ইউ সি আর সি'র সভাপতি হন তখন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ছিলেন কার্যকরী সভাপতি। সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী প্রয়াত হওয়ার পর ১৯৭৮ সালে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী হন সভাপতি। সেই সময় থেকে হালিসহরে অনুষ্ঠিত ইউ সি আর সি'র সুবর্ণজয়ন্তী সম্মেলন পর্যন্ত তিনিই সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শারীরিক অক্ষমতার জন্য তাঁকে ওই সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে পরামর্শদাতা রুপে সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

আজ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোই যথেষ্ট নয়। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের দায়িত্ব ও প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

কমরেড প্রমথনাথ নন্দী

রেড নন্দী নামে সর্বাধিক পরিচিত প্রমথনাথ নন্দী এক অবিস্মরণীয় নাম। ঘিওর থানার পয়লা ইউনিয়নস্থ কুষ্টিয়া গ্রামে ১৯১১ সনের ১৫ জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা লালবিহারী নন্দী তার শৈশব অবস্থায়ই পরলোকগমন করেন। পিতৃহারা অবস্থায় তার লেখাপড়া শুরু হয় এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি কৃতী ছাত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তিনি তেরশ্রী হাইস্কুল থেকে ১৯২৮ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ হতে আই. এস. সি. পাশ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এস. সি. ও বি. এ. এবং বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। এরপর তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি লাভের গৌরব অর্জন করেন। ছাত্রজীবন হতেই তিনি নিজেকে সমাজসেবায় উৎসর্গ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই পশ্চিম মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় তার জনকল্যাণ যশ ছড়িয়ে পড়ে। নিছক নিজের নাম প্রচারের জন্য নয়, বরং এই এলাকার মেহনতি মানুষের কল্যাণের জন্য তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু এই পার্টির কর্মধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে জনগণের স্বার্থে কথা বলার দায়ে তাকে কয়েকবার কারাভোগ করতে হয়। জমিদারী ও ইজারাদারী প্রথা উচ্ছেদকল্পে তিনি অনেকবার সোচ্চার ধ্বনী উচ্চারণ করেন। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তেরশ্রী হাই স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। কিছুদিন তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজেও শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেও তার আসল উদ্দেশ্য ছিল শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কামনা। তেরশ্রীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তার শ্রম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ বিরোধী 'প্রতিবাদ' নামক নিজের লেখা একটি নাটক মঞ্চস্থ করার দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রাজনীতি ছাড়াও তিনি দুঃস্থ জনগণের জন্য সবকিছুই করে গেছেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আয়নাপুর বাধ নির্মাণ। যা এলাকার লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষার কাজে সাহায্য করছে। দেশে দুর্ভিক্ষ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং নিজের হাতে স্যালাইন তৈরি করে শত শত লোকের জীবন রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। কমরেড জিতেন ঘোষ তার 'গরাদের আড়াল থেকে' গ্রন্থে প্রমথ নন্দী সম্পর্কে লিখেছেন, 'প্রমথ নন্দী ছিলেন এক তালুকদার বংশজাত। নিজে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। গ্রামের হাই স্কুলেই তিনি শিক্ষকতা করতেন। স্কুলের মালিক ছিলেন স্থানীয় এক বড় জমিদার। প্রমথ বাবু কৃষক সংগঠন ও জমিদারী উৎখাতের আন্দোলন করতেন বলে তিনি কর্তাদের সু-নজরে ছিলেন না। তবে ইচ্ছে থাকলেও কর্তারা তার চাকরি নাকচ করতে সাহসী হতেন না। কারণ প্রমথ বাবু যেমন ছিলেন ছাত্রদের তেমনি জনগণের অতি প্রিয় মাস্টার বাবু। তার বিপক্ষে একটা আঙ্গুল তুললেই ছাত্র-জনতা ক্ষেপে উঠতেন। প্রতিবাদের ঝড় বইত। প্রমথ বাবু এখন এদেশে নেই, তবু এ অঞ্চলের বয়োবৃদ্ধরা তাদের মাস্টার বাবুকে শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করে।'

রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, জল নেই, কাদা নেই, রাত নেই, দিন নেই একখানা ছাতা হাতে নিয়ে মাস্টার বাবু গ্রামের কৃষকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন, বৈঠক করতেন, সভা করতেন। তাদের ভালো মন্দের সংবাদ নিতেন। কলেরা লাগলে প্রমথ বাবুকে দেখা যেতো গ্রামে গ্রামে, কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশন দিতে। রোগীর বাড়িতে বাড়িতে প্রতিষেধক ওষুধ ছড়াতেন। নদী থেকে প্লাবন এসে জমির ফসল নষ্ট করে দেয় বলে গ্রামের কৃষকদের নিয়ে তিল্লীর আয়নাপুরের কাছে এই প্রমথ বাবুই মস্ত বড় এক বাধ তৈরি করেছিলেন। শিক্ষার অভিমান বা বংশ মর্যাদার অহমিকা কিছুই তার ছিল না।

গণমানুষের মুক্তির সংগ্রামী নেতা প্রমথনাথ নন্দী ১৯৮১ সালের ১৫ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় জনগণ প্রতি বছর আজও তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারী হওয়ার পর সহকর্মীদের পীড়াপিড়ীতে প্রমথ বাবু ভারতে চলে যান। ১৯৭৩ সালে পুনরায় তিনি কর্মীদের ডাকে সাড়া দিয়ে আরাম আয়েসের জীবন ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য আবু মো. সায়েদুর রহমানের উদ্যোগে তেরশ্রী কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। সারা জীবনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার আলোকে তার তিনটি স্বপ্ন ছিল–

ক. দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের জন্য মাতৃ সদন ও শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন;

খ. নিঃস্ব শিশুদের জন্য হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিনা খরচে থাকা খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করা এবং

গ. প্রগতিশীল সমাজকর্মীদের অধ্যয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

প্রমথ নন্দীর মা ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্রের কন্যা। প্রমথ নন্দীর স্ব-গ্রাম ঘিওরের কুষ্টিয়াতেই তার বাড়ি ছিল। ব্রজসুন্দর মিত্র চাকরির অর্থে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। প্রমথ নন্দীর মা ব্যতীত তার অপর কোনো সন্তান না থাকায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রমথ বাবুই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। তিনি ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন– ছিলেন তীক্ষ্ম বুদ্ধিমান। তার মেধা ও দক্ষতার জন্য উক্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের নিমিত্ত চিরকুমার প্রমথ বাবু মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জনগণের কল্যাণের জন্য উইল করে দিয়ে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন।

লেখক: মাহফুজা খানব ও তপন কুমার দে

তথ্যসূত্র:

গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রাকশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, ঢাকা।

ত্রিদিব চৌধুরী

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায় ত্রিদিব চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর পৈতৃক দেশ ছিল পাবনা জেলার হরিহরপুর গ্রামে। জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁর পিতা গোবিন্দ চৌধুরী ছিলেন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর। পিতার কর্মক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরেই ত্রিদিব স্কুলে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল থেকে ১৯২৬ সালে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করে তিনি কৃষ্ণনাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। ইন্টারমিডিয়েটেও তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

বিদ্যালয় ছাত্রাবস্থাতেই ত্রিদিবের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে তিনি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা 'অনুশীলন সমিতি'তে যোগ দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই তিনি অনুশীলন দলের প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবীন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩১ সালে বহরমপুরেই তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বহরমপুর জেল ও দেওলি বন্দী শিবিরে আটক থাকেন। জেলে থাকাকালে ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩৬ সালে অর্থনীতি নিয়ে এম. এ পাশ করেন।

১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভের পর তিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস সংসদীয় অফিসের সচিব পদেও কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে ত্রিদিব মার্ক্সবাদী ও সমাজবাদী মতাদর্শকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রেভলুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠিত হলে দল সংগঠনের কাছে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। নতুন দল গড়ে ওঠার কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৪০ সালের মে মাসে ত্রিদিব ও অন্যান্য সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রেফতার হন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাকে জেলে আটক করে রাখা হয়।

বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের সমিতির সঙ্গে ত্রিদিব সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তিনি সহ-সভাপতি, আর. এস. পি-র সাধারণ সম্পাদক, পার্লামেন্ট দলীয় গ্রুপের নেতা এবং দলের তাত্ত্বিক মুখপত্র 'দি কল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি 'ক্রান্তি' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। আর. এস. পি-র রাজনৈতিক মতবাদ ও তাত্ত্বিক বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেছেন।

ত্রিদিব চৌধুরী ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। সম্পন্ন পরিবারে জন্মেও তিনি সাদামাটা-অনাড়ম্বর জীবনাচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন সময়ে চোদ্দ বছর কারাবাসে কাটিয়েছেন। সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন। গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে তার অবদান ভোলার নয়। প্রায় তিন দশক কাল ধরে তিনি আর. এস. পি-র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বহরামপুর কেন্দ্র থেকে তিনি পর পর সাতবার লোকসভায় নির্বাচিত হন। 'ঢাকুদা' নামে জনপ্রিয় ত্রিদিব চৌধুরী ১৯৯৭ সালের ২১ ডিসেম্বর মারা যান।

লেখক: সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও রাখী চট্টোপাধ্যায়

তথ্যসূত্র:

১. বাংলার মুক্তি-সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও রাখী চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: গ্রন্থমিত্র, ১/বি, রাজা লেন, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল ৫ মে ২০০৫।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র



'এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার,
এসো শিল্পী, এসো বিশ্বকর্মা, এসো স্রষ্টা
রসরূপ মন্ত্র দ্রষ্টা,
ছিন্ন কর, ছিন্ন কর বন্ধনের এ অন্ধকার।'

পেশীতে পেশীতে রক্তের লাল আলো দিয়েই অমাবস্যার কালোকে ধুয়ে দিতে বরাবরই সচেষ্ট এক প্রাণ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'এসো মুক্ত কর' কবিতায় এভাবেই বন্ধনের সকল অন্ধকার ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন নিজের জীবনের স্বাভাবিক পথচলায়।

বাংলাদেশের পাবনা জেলার জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম ১৯৩৮ বঙ্গাব্দের ১৭ কার্তিক (১৯১১ খ্রিস্টাব্দ), শ্রীরামপুরে। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এস.সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. (১৯৩৪) পাশ করেন। এরপর তিনি চাটার্ড অ্যাকাউন্টেসি কোর্স করার জন্য আর্টিকল ক্লার্ক হিসেবে একটি অডিট ফার্মে যোগ দেন। পরে সংগীত সাধনাই হয়ে ওঠে তার প্রধান উদ্দেশ্য। কৈশোরে তার কাকা হরিচরণ চক্রবর্তীর কাছে তার মার্গসঙ্গীতে হাতেখড়ি, পরে মার্গসঙ্গীতের শিক্ষা নেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন ইন্দিরাদেবী ও সরলাদেবীর কাছে।

চল্লিশের দশকে জ্যোতিরিন্দ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই সংঘ পরে ভাগ হয়ে প্রগতি লেখক সংঘে এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘে পরিণত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র ভারতীয় গণনাট্য সংঘেরও ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় রায়, শম্ভু মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্র মিত্র, প্রমুখ ছিলেন এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা। এই সময়েই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর 'নবজীবনের গান'-এর রচনা ও সুরের অভিনবত্ব এবং 'মধুবংশীর গলি' কবিতার বলিষ্ঠতা শিল্প-সাহিত্যামোদী মহলে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর রচিত বিখ্যাত গান 'এসো মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার' ভারতের মুক্তি আন্দোলনে প্রেরণার কাজ করেছিল। পঞ্চাশের দশকে তিনি মেদিনীপুরে কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। কিছু কাল পরে এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি দিল্লি চলে যান। প্রথমে তিনি সঙ্গীত নাটক একাডেমির সঙ্গে

যুক্ত হন। পরে 'ব্যালে ইউনিট'-এর সঙ্গীত অধিকর্তারূপে 'ভারতীয় কলা কেন্দ্র'-তে যোগ দেন। এই সময় তিনি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-কে একটি নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেন যাতে জোর দেওয়া হয় সীতার চরিত্রে অবহেলিত দিকগুলিকে। ১৯৭৩ সালে তিনি পূর্ব জার্মানি যান। ১৯৭৪ সালে ভারতীয় কলা কেন্দ্র থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানে সঙ্গীতশিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত হন। তিনি বিভিন্ন চলচ্চিত্রের আবহসঙ্গীত রচনা করেছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তথ্যচিত্র রবীন্দ্রনাথ, ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার। ছবিতে সুর রচনার পাশাপাশি তিনি পুতুল নাচের ইতিকথা ছবিতে একটি গানও গেয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কৃতিত্ব হল বিষ্ণুদের কবিতা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'-এ সুরদান।

'বটুকদা' নামে পরিচিত বিশিষ্ট কবি ও সঙ্গীতসাধক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একাধারে এত কাজ তিনি করতেন যে সমসাময়িক সকলে তাকে জিনিয়াস বলে জানতো। 'নবজীবনের গান'-এর স্রষ্টার জীবনাবসান ঘটে হায়দ্রাবাদ থেকে হাওড়ায় ফেরার পথে চলন্ত ট্রেনে ১৯৭৭ সালের ২৫ অক্টোবর।

যে গুটিকয়েক মানুষ কোন দিন থামেন নি, মন যাদের বরাবর সজাগ ও সচেতন ছিল, ওই বিশ্বাসে ও অনুভবে যারা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তাদের কৃত্য, আমৃত্যু যারা পথ হেঁটেছেন মাথা উঁচু করে– জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাদের একজন।

লেখক: সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও রাখী চট্টোপাধ্যায়

তথ্যসূত্র:

১. বাংলার মুক্তি-সন্ধানী – সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও রাখী চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: গ্রন্থমিত্র, ১বি, রাজা লেন, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল ৫ মে ২০০৫।

সুধা রায়

সুধা রায় ১৯১১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি স্কুল জীবনে বিপ্লবী আদর্শে নিজেকে দীক্ষিত করেন। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যুর ফলে তিনি ঢাকায় মাতামহ অশ্বিনীকুমার গুহঠাকুরতার কাছে চলে যান। ঢাকা ইডেন স্কুল ও কলেজে তিনি লেখাপড়া করেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক ছাত্রী ছিলেন লীলা রায় (নাগ) পরিচালিত দীপালি সংঘের সক্রিয় সদস্য। শহীদ লতিকা সেন ছিলেন সুধা রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্কুল জীবনেই দুজনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বিপ্লবী মতাদর্শে। অনুশীলন দলের কাজের সঙ্গে সুধা রায় যুক্ত হন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সবরকম আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। বিপ্লবীদের গোপন কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

পারিবারিক প্রয়োজনে ১৯৩১ সালে আই এ পাশ করার পর তিনি চলে যান কলকাতায়। সেখানে ১৯৩৩ সালে বাংলা অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সাথে যুক্ত হন। পরে তিনি তার দাদা শিশির রায়ের প্রভাবে লেবার পার্টিতে যোগ দেন। ওই সময় একই সঙ্গে তিনি আশুতোষ কলেজে লেখাপড়া করেন, আবার পারিবারিক ও আর্থিক প্রয়োজনে কমলা গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। আর এইসব করতে করতেই শ্রমিক মজুর আন্দোলনে সক্রিয় অংশও নিয়েছেন। বিশেষত তার কর্মস্থল ছিল ডক-মজদুরদের মধ্যে। জুটমিল শ্রমিকদের মধ্যেও তিনি কাজ করেছেন। বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন বন্দর মজদুর শ্রমিক নেত্রী হিসেবে। এই সময় কলকাতা কর্পোরেশনের ধাংগরদের মধ্যে প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সাকিনা বেগম প্রমুখ নেত্রী কাজ করে প্রভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সুধা রায়কে ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন তার দাদা শিশির রায়। তখন ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে আসত বাংলাদেশের বাইরের মূলত বিহারের উর্দু ও হিন্দিভাষী ও উড়িশ্যার গরীব মানুষরা। সেই সময় কোন মহিলা শ্রমিক বন্দরে কাজ করতেন না। এমনকি পরিবার নিয়ে মজুররাও এখানে থাকতেন না। প্রচণ্ড শোষণ নিপীড়নের শিকার এই সব শ্রমিকদের জীবন যাত্রার শৃঙ্খলা বোধ ছিল না। সুধা রায় তখন ২৪/২৫ বছর বয়সের তরুণী, সামাজিক রক্ষণশীল পরিবেশের বাধা উপেক্ষা করে অসীম সাহস ও ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক বস্তি অঞ্চলে নির্দ্বিধায় কাজ করতে চলে যেতেন পার্টির নির্দেশে। তিনি ওই সমস্ত ঘিঞ্জি এলাকায় পায়ে হেঁটে সংগঠনের কাজ করতেন। রোজ কলকাতা থেকে স্কুল ছুটির পর শ্রমিক বস্তিতে আসতেন। এমনও অনেক সময়ে হয়েছে যে প্রচারের কাজ সংগঠিত করতে গিয়ে রাত হয়ে গেছে, তিনি বস্তিতে শ্রমিকদের সঙ্গে থেকে গেছেন। কোন ধরনের বিপদের মধ্যে পড়তে হয়নি তাকে, কারণ শ্রমিকরাই দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাকে রক্ষা করার। সকালে কলেজ, দুপুরে স্কুল, বিকেল থেকে রাত অবধি শ্রমিক এলাকায়, এমনও অনেকদিন কেটেছে ঠিকমতো আহারও জোটেনি। অর্ধাহারে বা অনাহারে থেকেও অদম্য মানসিক জোরে তিনি অক্লান্ত শ্রমদান করেছেন সংগঠন তৈরির স্বার্থে।

সমসাময়িক শ্রমিক নেত্রীদের থেকে সুধা রায় ছিলেন ব্যতিক্রমী চরিত্রের। সন্তোষকুমারী দেবী, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সাকিনা বেগম, বিমলাপ্রতিভা দেবী প্রমুখ নেত্রীরা মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং আদর্শবাদী চিন্তার আবেগে তাড়িত হয়ে নির্যাতিত শ্রমিকদের

পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সুধা রায়ের চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত ছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শ তাই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতেই তিনি এ-কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কলকাতা ডক শ্রমিক ধর্মঘটের সময় তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার কাজে সুধা রায় ছিলেন সক্রিয়। তিনি ধর্মঘটী নেতাদের প্রথম সারিতে ছিলেন না, কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে গোপনে সংগঠন করার কাজে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের তীব্র অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে তাঁকে বহু অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। সুধা রায়ই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী যিনি শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের শ্রেণী-অবস্থান বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন।

বিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষের দিকে শিশির রায়, বিশ্বনাথ দুবে, প্রমোদ সেন, মনোরঞ্জন রায়, নির্মল সেনগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। বলশেভিক পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ছিলেন তিনি এবং ডক মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথম মহিলা যিনি ডক লেবার বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। বন্দর ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যও তাকে প্রচুর শ্রম দিতে হয়েছে। ধর্মের জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সরকারপক্ষ দাঙ্গা বাধিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গতে যখন বদ্ধপরিকর তখন শ্রমিক ঐক্য রক্ষার স্বার্থে দুটি শর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে ইউনিয়ন ভাঙ্গার অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হলেন তিনি শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলশ্রুতিতে। এই কাজ সফল হয়েছে প্রধানত সুধা রায়ের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে।

বন্দর এলাকায় পরে পার্টির নির্দেশে তিনি চটকল মজদুরদের মধ্যে কাজ করতে এগিয়ে এলেন। তার কর্মক্ষেত্র ছিল ব্যারাকপুর চটকল শ্রমিক বস্তি। এখানেও তিনি নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকারি গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'সুধা রায় লেবার পার্টির একজন উল্লেখযোগ্য কর্মী। তিনি ব্যারাকপুর ও শহরতলি শ্রমিক এলাকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বস্তিতে বস্তিতে ছোট ছোট গ্রুপ মিটিং করতেন। তিনি স্টাডি গ্রুপ তৈরি করে নিয়মিত পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বোধ জাগাবার জন্যে পড়াতেন। যে রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুধা রায় সেই সময় শ্রমিকদের মধ্যে সাম্যবাদী মতবাদ পৌঁছে দিয়েছে তা এ-যুগেও বিরল। কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বদেশপ্রেমী হিসেবে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে পারিবারিক আর্থিক দায়িত্বভার লাঘব হলে তিনি স্কুল-শিক্ষকতা ছেড়ে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী হিসেবে তিনি সারা ভারতবর্ষেই সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেনে। ওই সময়ই কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সদস্যদের উদ্যোগে যে ফ্যাসিবিরোধী সভা ডাকা হয়েছিল তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। সেখান থেকে কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন গড়ে ওঠে যার কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন সুধা রায়। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালির ত্রাণকার্যে সুচেতা কৃপালনী ও অরুণা আসফাক আলির সঙ্গে তিনিও ছিলেন। তাকে বেশ কয়েক বছর আত্মগোপন অবস্থায় কাজ করতে হয়েছে।

স্বাধীনতার পর দলমত নির্বিশেষে মহিলাদের নিয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। সেই অনুযায়ী কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলের মহিলা গণসংগঠন ও নির্দলীয় বিশিষ্ট মহিলাদের নিয়ে ১৯৫৩ সালে একটি সর্বদলীয় মহিলা সংযোগ কমিটি গড়ে ওঠে, যার যুগ্ম-আহ্বায়িকা ছিলেন কমলা মুখার্জী (মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি) এবং সুধা রায় (বলশেভিক পার্টি)।

১৯৫৪ সালে কলকাতায় জাতীয় মহিলা কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আহ্বায়ক ছিল জাতীয় মহিলা কোঅর্ডিনেশন কমিটি। এই উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়, সুধা রায় তার অন্যতম সহ-সম্পাদক। সারাভারত কংগ্রেসেই গড়ে উঠল 'ভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশন' (এন এফ ডব্লিউ)। এই সংগঠনের সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন সুধা রায়। ১৯৬৬ সালের ২৮ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশনের ডাকে বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি এবং খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে পুলিশের গুলিচালনার প্রতিবাদে শহীদ মিনারে (তৎকালীন মুনমেন্ট ময়দান) যে উল্লেখযোগ্য মহিলা সমাবেশ হয়েছিল সেখানে অন্যতম বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুধা রায়।

জাতীয় মহিলা ফেডারেশন প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৫৪ সালে তিনি বিশ্ব নারী সংঘের সম্মেলনে কোপেনহেগেন যান। ১৯৫৫ সালে 'ইউনাইডেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের' সভানেত্রী হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। ট্রেড ইউনিয়নের নেত্রী এবং মহিলা আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বিভিন্ন কর্মসূচিতে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ পর্ষদের সভানেত্রী এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্যদের সদস্য হয়েছিলেন তিনি। সরকার প্রদত্ত 'স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন' তিনি কখনও গ্রহণ করেননি।

বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে কে. ডি ঘোষের সভাপতিত্বে লোকশিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। তিনি ছিলেন এর সম্পাদিকা। অনাথ দুঃস্থ শিশুদের উন্নয়নকল্পে 'সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড' গঠন করে সুধা রায়। ষাটের দশকে তিনি কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন গড়ে তোলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিশু ও মহিলাদের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন।

সুধা রায়ের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তার সততা, নিষ্ঠা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং কাজের প্রতি অনুরাগ। একজন প্রতিষ্ঠিত মহিলা ইউনিয়নের নেত্রী হিসেবে তিনি শ্রমিকদের অকুণ্ঠ আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। এই সব গুণের জন্য। তিনি কাখনও আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি, সংগ্রাম ও সুধা রায় এই দুটি কথা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল তার জীবন সত্তায়। ১৯৮৭ সালের ৭ জুন শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেত্রী, শিক্ষাব্রতী এবং সমাজসেবী সুধা রায় মৃত্যুবরণ করেন।

লেখক: মাহফুজা খানব ও তপন কুমার দে

তথ্যসূত্র:

১. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রাকশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, ঢাকা।

সুধী প্রধান

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রাণপুরুষ সুধী প্রধান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় অবহেলিত বিভিন্ন আঙ্গিককে বৃহত্তর সমাজের সামনে উপস্থাপন করার অন্যতম পথিকৃত। তিনি ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা সংক্ষেপে আই.পি.টি.এ (I.P.T.A)-কে সর্বভারতীয় সংগঠনে পরিণত করা হয়। এটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কায়ফি আজমী, শান্তি বর্ধন, প্রেমধাবন, বলরাজ সাহনী, শংকর, শৈলেন্দ্র, পৃথ্বিরাজ কাপুর, অমর শেখ প্রমুখ। আর বাংলার প্রাদেশিক কমিটিতে সুনীল চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুজাতা মুখার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে, বিনয় রায় প্রমুখ-এর সঙ্গে তিনিও মনোনীত হন। সে সময়ের প্রায় সকল প্রগতিশীল শিল্পীরাই এর সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হতে থাকেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, সুরপতি নন্দী, শচীন দেব বর্মণ, পংকজকুমার মল্লিক, কলিম শরাফী, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, উদয়শংকর, শম্ভু ভট্টাচার্যসহ শিল্পের সকল শাখার উজ্জ্বল মানুষগণ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নানাবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে নাটক ও মঞ্চের লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছিল যে, তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির পটভূমিকায় নাট্যের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, শোষণের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ। এ প্রসঙ্গে সুধী প্রধান উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'গণনাট্য সংঘের প্রথম বোম্বাই অধিবেশনে (১৯৪৩) গৃহীত ঘোষণাপত্রে আছে যে আমাদের লক্ষ্যগুলোকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গান, ব্যালাড, নাটক প্রভৃতির বিষয়বস্তু কেবল বাস্তব হলেই চলবে না, তাদের প্রযোজনাগুলো অবশ্যই যেন সরল ও প্রত্যক্ষ হয় যা জনসাধারণ বুঝতে পারে এবং সেগুলোর সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে লোক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, সমবেত সংগীত এবং মুক্তাঙ্গনে অভিনয় বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষিত।'

এসময় শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। মহামারী দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সর্বাত্মকভাবে কাজে নেমে পড়েছিল আইপিটিএ। কাকাবাবু মুজফ্ফর আহমেদের পরিকল্পনায় সুধী প্রধানের উপর নির্দেশ ছিল গণনাট্যের একটি দল করে দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষের সাহায্যের জন্য সর্বত্র অর্থসংগ্রহ করার। আর তিনি সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন সে সময়কার গণসংগীতশিল্পী বিনয় রায়ের উপর। তিনি এই দায়িত্ব পেয়ে কয়েকজন গায়ক-গায়িকা ও নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে একটি দল গড়ে তোলেন। দলটিকে স্কোয়াড বলা হত। বিনয় রায় ছাড়া এই স্কোয়াডে ছিলেন রেবা রায় (চৌধুরী), হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ঊষা দত্ত, প্রীতি ব্যানার্জি, ভূপতি নন্দী, নরেন ভট্টাচার্য, শোভা সেন, কালী ব্যানার্জি, সাধনা গুহ প্রমুখ এবং এই দলে নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শম্ভু ভট্টাচার্য এবং অনু দাশগুপ্তা। এই স্কোয়াড প্রথমে তৈরি করে 'ম্যায় ভুখা হু' নামে একটি নৃত্যনাট্য। সেটি ছিল একটি ঐতিহাসিক প্রযোজনা। নিরঞ্জন সেন মজুমদার, আশু সেন এবং নানা প্রদেশের বিশিষ্ট কর্মী প্রমুখ ছিলেন ধারাবাহিক এই গোটা আয়োজনের সংগঠক।

সুধী প্রধান ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র পরিচালিত গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটকে কুঞ্জর চরিত্রে অভিনেতা রূপে অবতীর্ণ হন। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গেও যুক্ত হন। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে লোকসংস্কৃতির চর্চা ও উজ্জীবনের জন্য তিনি আজীবন সংগঠকের অনন্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন। সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার ও সংগঠক হিসেবে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতির পদে ছিলেন আমৃত্যু। একজন সুলেখক ও গবেষক হিসেবে তিনি সমাদৃত ছিলেন। ইংরাজি ও বাংলায় সংস্কৃতি ও গবেষণামূলক বহু গ্রন্থ লিখেছেন। পত্র-পত্রিকায় তার বিপুল সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস', 'লোকসংস্কৃতির উপাদান', 'নীল দর্পণের ইংরাজি অনুবাদে সম্পাদন', 'মার্কসিস্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' (ইংরেজি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'মার্কসিস্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া কিছুটা বিতর্কিত হলেও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত একমাত্র প্রমাণ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান।

সুধী প্রধান একসময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। অত্যন্ত সরল সাদাসিধে জীবনযাবনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। পরিণত বয়স পর্যন্ত, মৃত্যুর পূর্বাবধিও সংস্কৃতি চর্চাই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। ১৯৯৭ সালের ৭ ডিসেম্বর সুধী প্রধানের জীবনাবসান হয়। ভারতের সংস্কৃতি আন্দোলনের কিংবদন্তি সংগঠন আই.পি.টি.এ-কে জনমানসে ছড়িয়ে দিতে সুধী প্রধানের নেতৃত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:
১. অগ্নিযুগের বিপ্লবী জন্মশতবর্ষ ২০১১– সম্পাদনা: শেখ রফিক, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৪ অক্টোবর ২০১১।

বীণা দাস



'আমিই সমাবর্তনের দিনে সিনেট ভবনে গভর্ণরকে গুলি করেছি'–বীণা দাস।

আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে অগ্নিস্পর্শে স্পর্ধিত একুশ বছরের এক অকুতোভয় তরুণী আদালতে দাঁড়িয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে এই সাহসী উক্তিটি করেন। সেই তরুণীর নাম বীণা দাস। এ বছর (২০১১খ্রিঃ) এই মহান বিপ্লবীর জন্মশতবার্ষিকী। অথচ, আমরা ক'জনই বা মনে রেখেছি অগ্নিযুগের এই অগ্নিকন্যার কথা? এদেশে, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামের অগ্নিগর্ভ হতে উঠে আসা বিপ্লবীদের আমরা তরুণ প্রজন্মের কাছে খুব একটা পরিচিত করে তুলতে পারি নি– তাঁদেরকে অনুপ্রেরণার উৎসমূল হিসেবে প্রোথিত করতে পারি নি আমাদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে, চিন্তন-মননে। তারপরও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কিংবা কল্পনা দত্তের নাম যতটুকু শোনা যায়, বীণা দাস সে তুলনায় একরকম অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে। আমার জানাশোনার পরিধিতে বীণা দাসকে নিয়ে যতটুকু তথ্য জোগাড় করতে পেরেছি তা বীণা দাসের রাজনৈতিক মানস, সমাজ-দর্শন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য নিতান্তই অপ্রতুল বলা যায়। তাই এ রচনায় আমি শুধু বীণা দাসের জীবনের গল্পটি সহজ-সরল ভাষায় তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

আজ থেকে প্রায় দেড়শত বছর আগে ১৮৬৬ সালের ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামের শেওরাতলী গ্রামের কৃষ্ণ চন্দ্র দাস-এর ঘরে জন্ম নেয় একটি পুত্র সন্তান, যার নাম রাখা হয় বেণী মাধব দাস। বেণী মাধব দাস বেড়ে ওঠেন পরাধীন ভারতে, দর্শন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে। তিনি চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলকাতা, কটক, কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন স্কুল কলেজে শিক্ষকতার মহান ব্রত পালন করেন, কখনো কলেজের প্রভাষক, কখনো স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে। একজন সৎ নীতিনিষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন ঋষিতুল্য। নেতাজী সুভাস বোস স্কুলজীবনে বেণী মাধব দাসের ছাত্র ছিলেন। সুভাষ বোস তার 'ভারত পথিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন- বেণী মাধব দাসকে, যিনি কিশোর সুভাষের মনে একটি স্থায়ী আসন গড়ে নিতে পেরেছিলেন। এমনকী, স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ভারত ত্যাগ করার পূর্বে সুভাষ বোস, বেণী মাধবের আশীর্বাদ নিতে তার সঙ্গে দেখা করেন। বেণীমাধব তাকে আশীর্বাদ করেন হৃদয়-উৎসারিত শুভকামনায়। কেশব চন্দ্র সেনের অনুপ্রেরণায় বেণী মাধব ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন। বেণী মাধব ১৯২৩ সালে অন্ধ্র

প্রদেশের কাকিনাদায় 'অল ইন্ডিয়া থিইস্টিক কনফারেন্স'-এ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সেই সমাবেশে তার বক্তব্য পরবর্তীতে 'মডার্ণ থিইস্টিক মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' নামে বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তার লেখা 'পিলগ্রিমেজ থ্রু প্রেয়ারস' বইটিও বেশ সমাদৃত হয়।

বেণী মাধব বিয়ে করেন তৎকালীন কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদকের কন্যা সরলা দেবীকে। সরলা দেবীও সমাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি অসহায় ও দুস্থ নারীদের সহায়তায় 'সরলা পুন্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। বেনী মাধব এবং সরলা দেবীর ঘরে জন্ম নেন অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী কল্যাণী দাস (১৯০৭-৮৩) ও বীণা দাস (১৯১১-৮৬)।

পরাধীন ভারতবর্ষে, অগ্নিযুগের বিপ্লবী লড়াই-সংগ্রাম ও আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই অসংখ্য নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে। অগ্নিযুগের প্রথম পর্বে অগ্রসর এবং সমাজমনস্ক নারী হিসেবে স্বর্ণ কুমারী দেবী, সরলা দেবী, আশালতা সেন, সরোজিনী নাইডু, ননী বালা, দুকড়ি বালা প্রমুখ বিভিন্নভাবে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পরবর্তীকালে তাদের দেখানো পথে ইন্দুমতি দেবী, (অনন্ত সিংহের দিদি) লীলা রায়, পটিয়া ধলঘাটের সাবিত্রী দেবী প্রমুখ দেশপ্রেমিক নারী সেই সংগ্রামের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। অনুশীলন, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, ছাত্রী সংঘ প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে বিভিন্ন ঘরের মা, বোন, মাসিমা, কাকিমা, দিদি, বৌদিরা যুক্ত ছিলেন। সেই উত্তাল সময়ে বেড়ে ওঠেন বেণী মাধব-সরলা দেবীর দুই বিপ্লবী সন্তান-কল্যাণী ও বীণা দাস। বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্নিচ্ছটা স্পর্শ করে তাঁদের, অনুরণিত করে তাঁদের স্বাধীনতাকামী সংবেদনশীল কিশোরী মনকে।

বীণা দাসের চার বছরের বড় বোন কল্যাণী দাস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতা ছাত্রী সংঘের একজন নিষ্ঠাবান সংগঠক। বিপ্লবীদের বিভিন্ন গোপন সভায় তিনি যোগ দিতেন। এমনই এক গোপন সভার লিফলেট বহন করার দায়ে ব্রিটিশদের আদালত তাকে কারাদণ্ড প্রদান করে। উচ্চশিক্ষিত কল্যাণী দাস অনার্স গ্রাজুয়েট হওয়া স্বত্ত্বেও তাঁকে কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর কাতারে রাখা হয়। এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়ে সেই কারাবাসের অবর্ণনীয় কষ্ট খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেন কল্যাণী দাসের ছোট বোন বীণা দাস। বোনের এই আত্মত্যাগ তাঁকে চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় শাণিত করে, অনুপ্রাণিত করে উপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তার কয়েক বছর পরে যখন আমরা বীণা দাসকে দেখি গভর্ণরকে গুলি করার পর, আদালতে নির্ভীকচিত্তে তার জবানবন্দী দিতে-তখনও বীণা দাস উল্লেখ করেন বোনের আত্মত্যাগ থেকে তার অনুপ্রেরণা নেবার কথা–

'I attended the Court proceedings during the trial of my sister Kalyani. She was punished to serve a term of rigorous imprisonment for having allegedly attended a meeting which could not be held and for being a member of an unlawful society only on the basis of the evidence of her having a proscribed leaflet in her possession. This was to my mind grossly unjust. Though she is an Honours Graduate who had earlier lived in all the comforts of a middle-class family, yet ignominy was hurled on her during her prison-life. The jail-dress and jail-diet of ordinary convicts classified as third class prisoners, and the sleepless nights

amongst such criminals, militated against my whole being. I saw all these with my own eyes and also witnessed the bitter tears welling out of the eyes of my dearest parents.' (STATEMENT BEFORE THE SPECIAL TRIBUNAL OF CALCUTTA HIGH COURT-Bina Das)

বীণা দাস আজ থেকে শতবর্ষ আগে, ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার দেশপ্রেম, আদর্শবাদ, দৃঢ় সংকল্প, উদার চিন্তাভাবনা তার পরিবার এবং সমসাময়িক উত্তাল ঘটনাপ্রবাহ থেকেই লাভ করেছিলেন-তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। সংবেদনশীল কবি ও দার্শনিক মনের অধিকারী বীণা দাস সময়ের অগ্নিস্পর্শে পরিণত হন অগ্নিকন্যায়, দীক্ষিত হন বিপ্লবী মন্ত্রে।

বেথুন ও ডায়সেশন কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করা বীণা স্নাতক হন ১৯৩১ সালে। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল বীণা তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী। তিনি অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সায়মন কমিশন বয়কট করেন ও বেথুন কলেজে পিকেটিং করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ওই বছরই কলকাতা কংগ্রেসের এক অধিবেশনে তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন এবং ধীরে ধীরে তিনি গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন-শোষণের উপর ক্রমশ জমে ওঠা প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে গান্ধীজির অহিংস মতবাদ থেকে সরে এসে শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক পন্থাকেই বেছে নেন তিনি।

১৯৩২ সালে বীণা দাস তার জীবনের সবচাইতে দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য মনস্থির করে ফেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন বাংলার ব্রিটিশ গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যা করার। স্ট্যানলি জ্যাকসন ছিলেন একসময়ের ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের অধিনায়ক, যিনি ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেন এবং ৫টিতে অধিনায়কত্ব করেন। পরবর্তীতে কনজারভেটিভ পার্টির হয়ে নির্বাচন করে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। জ্যাকসনকে হত্যার এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনের কারণ বীণা দাস তার জবানবন্দীতে এভাবে ব্যাখ্যা করেন-

'I have no sort of personal feelings against Sir Stanley Jackson, the man and Lady Jackson, the woman. But the governor of Bengal represents the system of repression which has kept enslaved 300 millions of my countrymen and countrywomen.'

এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বীণা দাস সাহায্য নেন তার বোন কল্যাণীর বান্ধবী কমলা দাস গুপ্তের। কমলা দাসগুপ্ত 'যুগান্তর' দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। বীণা দাস যুগান্তরের সদস্য না হলেও তার সংকল্প এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট হয়ে কমলা দাসগুপ্ত বীণাকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। ২৮০ টাকা দামের একটি চোরাই রিভলবার সহযোদ্ধা সুধীর দত্তের কাছ থেকে জোগাড় করেন বীণা দাসের প্রিয় কমলাদি। কমলাদি শাড়ির ভেতর রিভলবারটি লুকিয়ে উত্তর কলকাতার 'রামমোহন রায়' গ্রন্থাগারে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি বীণাকে রিভলবার চালানোর কৌশল শেখান। কিন্তু স্থানাভাবে বীণা তখন আর টার্গেট প্রাকটিস করার সুযোগ পান নি। ইতিমধ্যে বীণা অবশ্য দিনেশ মজুমদারের কাছে শারীরিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি। গভর্ণর স্ট্যানলি যথাসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আসেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে চলে প্রায় ১ ঘন্টা। গভর্ণর যখন সমাবর্তন

অনুষ্ঠানে অভিভাষণ পাঠ শুরু করছেন তখন গাউন পরিহিত বীণা উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন এবং গুলি চালান জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে। আত্মরক্ষার্থে স্টানলি জ্যাকসন মাটিতে পড়ে যান। অল্পের জন্য বীণা দাসের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। গভর্ণর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। সেসময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর মামা কর্ণেল হাসান সোহরাওয়ার্দ্দী লাফ দিয়ে অনুষ্ঠান থেকে নেমে বীণা দাসের হাত থেকে রিভলবারটি কেড়ে নেন। ততক্ষণে বীণার রিভলবার থেকে ৫টি গুলি বেরিয়ে গেছে।

বীণাকে গ্রেফতার করা হল। টানা ৪৮ ঘন্টা বিরতিহীনভাবে চলল জিজ্ঞাসাবাদ। রিভলবারের উৎস জানতে বীণার ওপর চালানো হল নির্যাতন। বীণা মুখ খুললেন না। বীণাকে মুখ খুলতে বলার জন্য তার বাবা বেণীমাধবকে বলা হল। বেণীমাধব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সেই প্রস্তাব। সে সময় বীণাকে সাহস যোগাতে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের প্রতিবাদে তিনি রাতজেগে লেখেন ২৫ পৃষ্ঠার একটি বিবৃতি। উজ্জীবিত বীণা দাস আদালতে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে গভর্ণরের উপর হামলার সকল দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জবানবন্দী দিলেন। ইংরেজির ছাত্রী বীণা স্পষ্ট ইংরেজিতে শুরু করলেন এভাবে– 'I confess that I fired at the Governor on the last Convocation Day at the Senate House' (আমিই সমাবর্তনের দিনে সিনেট ভবনে গভর্ণরকে গুলি করেছি)। এরপর সংক্ষিপ্ত অথচ ভীষণভাবে সম্পূর্ণ এক বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের কথা, ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি গভর্ণরকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুবরণ করা এবং যদি আমাকে মরতে হত, আমি চেয়েছিলাম মহান মৃত্যু.. এই ভারতবর্ষে এই পরিমাণ অন্যায়, অত্যাচার এবং বিদেশি শোষণের মধ্যে গুমরে কাঁদার চাইতে সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়ে প্রতিবাদ করে জীবন বিসর্জন দেওয়া কী অধিকতর ভালো নয়?'

১৫ ফেব্রুয়ারি একতরফা বিচারে বীণা দাসের ৯ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত। এসময় আদালতে বীণা দাসের শিক্ষিকা সিস্টার ডারোথি কাঁদতে কাঁদতে বীণাকে বলেন, 'Bina, I love you so much. How could you do this?' বিপ্লবী বীণা দাসের তৎক্ষণাৎ প্রতিউত্তর ছিল..'Sister, I love you no less. But, I love my country more.' কারাভোগের সময়টুকুতে তাঁকে একেক সময় একেক কারাগারে, একেক স্থানে নিয়ে যাওয়া হত। কিছুদিন কুমিল্লার কিশোরী বিপ্লবী শান্তি সুনীতি'র সাথে তিনি এক কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত হয়ে থাকার পর গান্ধীজির প্রচেষ্টায় অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে বীণাও মুক্তি পান। সাত বছর জেলে কাটিয়ে ১৯৩৯-এ তিনি মুক্তি লাভ করেন।

জেল থেকে মুক্তির পর বীণা থেমে থাকেন নি। সে সময় বিপ্লবীদের অনেকে, বিশেষত তরুণেরা, গোপন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথ বেছে নেন।

ছাত্র ইউনিয়নের মুখপাত্র জয়ধ্বনির সম্পাদক থাকাকালে অগ্নিযুগের আরেক বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নেয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। এ সময়কাল সম্পর্কে বিনোদবিহারী চৌধুরী আমাদের বলেছিলেন, 'মাস্টারদা মারা যাওয়ার পর আমাদের বিভিন্ন জেলার কর্মীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম গোপন বিপ্লবী দলের আর দরকার নেই। কারণ মহাত্মা গান্ধী যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন করছিলেন, তখন সারা দেশে তা বিপুল সাড়া পায়। আমাদেরও তা স্পর্শ করে। পরবর্তীতে বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হল তখন গান্ধীজি বললেন ব্রিটিশদের এক পয়সাও দেব না। 'Not a pie, not a man'। তুমুল সংগ্রাম শুরু হল।

দেশের স্বাধীনতার জন্য তখন তুমুল গণজাগরণ তৈরি হল, তাই আমাদের বিপ্লবী দলের আর দরকার হল না। আমরা তখন বলেছিলাম, 'We believe in revolution, but we don't want violence. আমরা গান্ধীজির কথা মানবো।' আমরা ১৯৩৯ সালে ন্যাশনাল প্রেস-এ এই কথা প্রচার করলাম। '

সে সময়েই আরো অনেকের মত বীণা দাসও কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকাও ছিলেন। টালিগঞ্জের চালকল বস্তিতে গিয়ে বস্তিবাসী দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশে তাদের চরম দুর্গতিতে পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি সেসময় বীণা দাসের সাহিত্য প্রতিভা ও দেশাত্মবোধক চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায় কমলা দাস গুপ্ত সম্পাদিত 'মন্দিরা' পত্রিকায়।

এই সময়কালের আরো কিছু আলোচনা এ প্রসঙ্গে করা প্রয়োজন। বীণা দাস তার পিতার প্রিয় ছাত্র সুভাস বোস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, একথা সত্য। এম এন রায়ের মেধা ও বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিও বীণা দাসের এক ধরণের মুগ্ধতা ছিল। কংগ্রেসে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এম এন রায় উৎসাহী ছিলেন। এম এন রায় ও সুভাস বোস দুজনেই গান্ধীর 'অহিংস নীতি'র বিরোধী ছিলেন এবং স্বাধীনতার জন্য আরো কঠোর কর্মসূচির কথা ভাবছিলেন। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সুভাস বোস ফ্যাসিস্ট জার্মানীর সাথে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ তাড়ানোর পরিকল্পনা করছিলেন। এম এন রায়ের বক্তব্য ছিল ভিন্ন। তিনি বলেছিলেন, 'হিটলারের পৃথিবী হবে পরাধীন পৃথিবী, পরাধীন পৃথিবীতে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব নয়।' এদিকে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষ, বিশেষত বাংলায় এক নতুন মতাদর্শিক ঢেউ এসে লাগে। আন্দামানে নির্বাসিত ও কারাবন্দী তরুণ কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা দেশে ফিরে আসেন। কমিউনিস্টরা এই বিশ্বযুদ্ধকে প্রথমে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' বললেও হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত আগ্রাসনের পর তারা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণযুদ্ধের ডাক দেয়। কংগ্রেস প্রথমদিকে যুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে কোন অবস্থান নেয়া থেকে বিরত থাকে। তবে পরবর্তীতে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কংগ্রেসকে দিশা দেখায় এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে তা ধারণ করতে পারে। একদিকে যখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছিল, অন্যদিকে সুভাস বোস ব্রিটিশ রাজকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে উৎখাত করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন, আবার প্রগতিশীল বামপন্থীরা তখন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণযুদ্ধ চালাতে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। এ টালটামাল পরিস্থিতিতে সংবেদনশীল বীণা দাস খানিকটা বিভ্রান্ত ও দোদুল্যমান হয়ে পড়েন।

১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হলে বীণা দাস দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভা ডাকলেন হাজরা পার্কে। সভাকে বেআইনি ঘোষণা করা হল। সেখানে একজন সহকর্মীকে সার্জেন্ট ব্যাটন দিয়ে প্রহার শুরু করতেই বীণা তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। পুলিশ আবারো বীণাকে গ্রেফতার করে। এবারে তিনি রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে প্রেসিডেন্সি জেলে তিন বছর আটক থাকেন। এ দফায় ১৯৪৫-এ তিনি মুক্তি লাভ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন করে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার প্রভাব বীণা দাসকে ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। বীণা দাসের স্বামী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ যতীশ ভৌমিক। স্বামীর মৃত্যুর পর বীণা দাস আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যান রাজনীতি থেকে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান।

কখন যে তিনি হরিদ্বার চলে গিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না। ঊনবিংশ শতকের নবম দশক। ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর। হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে এক অজ্ঞাতপরিচয় বয়স্কা মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। সংবাদপত্রেও খবরটি উঠেছিল। পরে অজ্ঞাতনামা নারীর পরিচয় জানা গিয়েছিল। সেই নারীই ছিলেন বীণা দাস। ইংরেজদের ত্রাস অগ্নিকন্যার প্রস্থাণ হল অজ্ঞাতে-নিভৃতে।

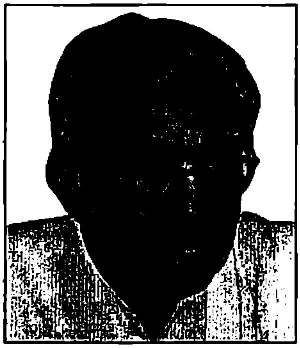
বীণা দাসের জীবনের গল্পের সমাপ্তি এখানেই। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপ্লবীরা-যারা বিনির্মাণ করবেন আগামীর ইতিহাস, রচনা করবেন আরো অনেক বীরত্বগাঁথা- তারা বীণা দাসকে গ্রহণ করতে পারেন প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎসধারা হিসেবে। প্রেরণার সেই উৎসমূল হিসেবে বীণা দাস অমর-অক্ষয় হয়ে থাকুক মহাকালের শিলালিপিতে।

লেখক: অভিনু কিবরিয়া ইসলাম

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের বিপ্লবী জন্মশতবর্ষ ২০১১– সম্পাদনা: শেখ রফিক, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৪ অক্টোবর ২০১১।

বিনোদবিহারী চৌধুরী



সেদিন ছিল আমাবস্যার রাত। চট্টগ্রামের অভয় মিত্র শ্মশানঘাট ভীষণ ভীতসঙ্কুল জায়গা হিসেবে পরিচিত। দিনের বেলায় যেতেও লোকজন ভয় পায়। অথচ বিনোদবিহারী চৌধুরীকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল এমনই একটি জায়গায় মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সবার সঙ্গে তিনি দেখা করেন না। তার সঙ্গে দেখা হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। সুতরাং বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত ১৯ বছরের টগবগে বিনোদবিহারী হাজির হলেন অভয়মিত্র শ্মশানঘাটে।

বহু দিনের সংস্কার ছিল শ্মশানে নাকি নানা রকম ভূত-প্রেতের আনাগোনা থাকে। তাই শ্মশানে এসে কিছুটা ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। এদিক ওদিক হাঁটছিলেন, হঠাৎ করেই পিঠে হাতের স্পর্শ পেয়ে ভীষণ চমকে গেলেন, ফিরে তাকিয়ে দেখলেন এক ভদ্রলোক, দেখতে কিছুটা খাটো, সাদা ধুতির ওপর সাদা পাঞ্জাবি অন্ধকারে ফুটে উঠেছে। তখন রাত ৮টার মতো বাজে। তিনি মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, ইনিই হলেন বিখ্যাত বিপ্লবী সূর্যসেন, সবাই যাকে মাষ্টারদা বলে ডাকে। সামনাসামনি তার সঙ্গে এটাই তার প্রথম সাক্ষাৎ। মাষ্টারদা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কিরে ভয় পেয়েছিস? তিনি ভয়ের কথা স্বীকার করলেন। সত্যিই তিনি ভয় পেয়েছিলেন। তারপর মাষ্টারদা তাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। তিনি কেন বিপ্লবী দলে আসতে চান। বিপ্লবী দলে না আসার জন্য নানাভাবে তাকে বোঝাতেও লাগলেন। কিন্তু তিনি তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যেকোনো প্রকারেই হোক তিনি বিপ্লবী দলে ঢুকবেন। সুতরাং এক সময় বললেন, আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে বিপ্লবী দলে ঢুকে ইংরেজদের অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে নিরুৎসাহী করবেন না। শুনে সূর্যসেন স্মিত হাসলেন।

পরবর্তী সাক্ষাতেও মাষ্টারদা বিনোদবিহারীকে বিপ্লবী দলে নেবেন না বলে জানিয়ে দেন। একপর্যায়ে তিনি মাষ্টারদার সঙ্গে রেগে যেয়ে বললেন, আপনিই কী ভারতীয় উপমহাদেশের একমাত্র বিপ্লবী? অন্য দলও তো আছে। আপনি আমাকে না নিলে আমি অন্যদের দলে যোগ দেব। এরপরই মাষ্টারদা তাকে জড়িয়ে ধরে দলে নিয়েছিলেন।

এভাবেই সেদিনকার সেই একাগ্র দেশপ্রেমিক ও সাহসী যুবকটি বিপ্লবীদের দলে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন। শুধু নাম লেখানো নয়, নিরীহ ভারতীয়দের হত্যা ও দেশ দখলকারী

ব্রিটিশদের মনে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়ার জন্য মাষ্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে তিনি জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন।

এই বিপ্লবী নেতা শ্রী বিনোদবিহারী চৌধুরী ১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালি থানায় জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার রাঙামাটি বোর্ড স্কুলে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালখালির পি. সি. সেন সারোয়ারতলি উচ্চ বিদ্যালয়, চিটাগাং কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য যান। ১৯২৯ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ রাজের রাজপুটনার ডিউলি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় থাকার সময় তিনি প্রথম শ্রেণিতে আই. এ. এবং বি. এ. পাস করেন।

বাবা কামিনী কুমার চৌধুরী ছিলেন পেশায় উকিল। মা রামা চৌধুরী ছিলেন গৃহিনী। শৈশবেই বিনোদবিহারী চৌধুরী তার বাবা কামিনী কুমার চৌধুরীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিপ্লবী চেতনা। '২১-'২২ সালে যখন তিনি ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পরেন। তখন কামিনী কুমার চৌধুরী তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন ছেলে ১১ বছরের বিনোদবিহারীকে। তখন থেকেই বিনোদবিহারী দেখে এসেছেন কামিনী কুমারকে বিলেতি কাপড় ছেড়ে খদ্দরের কাপড় পরতে। শুধু যে নিজে পরতেন তা-ই নয়, ছেলেমেয়েদেরও খদ্দরের কাপড় কিনে দিতেন। মূলত বাবাকে দেখেই তার মধ্যে স্বদেশ প্রেম জেগে ওঠে।

বিপ্লবীদের দলে নাম লেখানোর অল্প দিনের মধ্যেই বিনোদবিহারী চৌধুরী মাষ্টারদা সূর্যসেনের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে বিনোদবিহারী চৌধুরী তাই হতে পেরেছিলেন সূর্যসেনের অন্যতম তরুণ সহযোগী। বিপ্লবী দলের সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা ১৮ এপ্রিলকে চারটি অ্যাকশন পর্বে ভাগ করেছিলেন। প্রথম দলের দায়িত্বে ছিল ফৌজি অস্ত্রাগার আক্রমণ, দ্বিতীয় দলের ছিল পুলিশ অস্ত্রাগার দখল, তৃতীয় দলের ছিল টেলিগ্রাফ ভবন দখল, চতুর্থ দলের ছিল রেললাইন উৎপাটন। বিনোদবিহারী চৌধুরী ছিলেন পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করার গ্রুপে। সেদিন মাষ্টারদা সবাইকে ডেকে যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে ছড়িয়ে পড়তে বললেন। বিনোদবিহারীসহ আরো জন-দশেকের দায়িত্ব ছিল দামপাড়া পুলিশ লাইনের আশপাশে রাত ১০ টার মধ্যে উপস্থিত থাকা। তারা যথাসময়ে মিলিটারি পোশাক পরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে ছিল আলমারি ভাঙার জন্য দুখানা শাবল। কথা ছিল রাত ১০টায় আরেক গ্রুপ পাহাড়ে উঠে প্রহরীদের আটক করবে এবং 'বন্দে মাতরম' বলে চিৎকার করবে। এই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যারা জঙ্গলের চারদিকে থাকবে তারাও একযোগে 'বন্দে মাতরম' বলে চিৎকার করে পাহাড়ে পৌঁছাবে। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছেন তারা। তখনো তারা জানেন না তাদের মিশন কতটুকু সফল হবে। জীবনের প্রথম এ ধরনের একটি অপারেশন করছেন। এমন সময় হঠাৎ করে ওপর থেকে 'বন্দে মাতরম' চিৎকার শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারাও জঙ্গল থেকে একযোগে 'বন্দে মাতরম' চিৎকার দিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে পড়লেন। শত্রুরা তাদের চিৎকার শুনে ভাবল, তারা হয়তো সংখ্যায় অনেক। তারা ভয়ে পালাল। এরপর বিনোদবিহারীরা পুলিশ

লাইনের ভেতরে ঢুকে শাবল দিয়ে আলমারি ভেঙ্গে রাইফেল বারুদ নিয়ে নিলেন। আর যা প্রয়োজন হবে না তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। সে দিন তারা সবাই যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছিলেন বলেই পুলিশ লাইন আক্রমণ সফল হয়েছিল। তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এসেছিল, যা পরে জালালাবাদ যুদ্ধে কাজে লাগানো হয়।

১৮ এপ্রিল রাতে চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের মূল ঘাঁটিগুলোর পতন ঘটিয়ে মাষ্টারদার নেতৃত্বে শহর তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নেতা-কর্মীরা দামপাড়া পুলিশ লাইনে সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং মাষ্টারদাকে প্রেসিডেন্ট ইন কাউন্সিল, ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি চিটাগাং ব্রাঞ্চ বলে ঘোষণা করা হয় এবং রীতিমতো মিলিটারি কায়দায় কুচকাওয়াজ করে মাষ্টারদা সূর্যসেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তুমুল 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ও আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে এ অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

'৩০ সালের এ ঘটনার পর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন জঙ্গি রূপ ধারণ করে। সে দিনের এসব বিপ্লবীর দুঃসাহসিক কার্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়নি। চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ছিল চার দিন। এই কয়েক দিনে ব্রিটিশ সৈন্যরা শক্তি সঞ্চয় করে বিপ্লবী দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত বিনোদবিহারীরাও বীর বিক্রমে পরে জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

জালালাবাদ যুদ্ধ ছিল বিনোদবিহারী চৌধুরীর প্রথম সম্মুখযুদ্ধ। সে দিন তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন অসীম সাহসিকতায়। গলায় গুলিবিদ্ধ হয়েও লড়াই থামাননি বিনোদবিহারী চৌধুরী। চোখের সামনে দেখেছিলেন ১২ জন সহকর্মীর মৃত্যু। সে সময়ের এক ঘটনা বললেন তিনি, 'আমরা দলে ছিলাম ৫৪ জন, পাহাড়ে লুকিয়ে আছি, তিন দিন কারো পেটে ভাত পড়েনি। পাহাড়ি গাছের দু-একটি আম খেয়ে দিন পার করেছি। এ কারণে বিপ্লবীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এর মধ্যেই একদিন বিকেলে অম্বিকাদা কীভাবে যেন বড় এক হাঁড়ি খিচুড়ি নিয়ে হাজির হলেন। আমরা তো অবাক। ওইদিন সেই খিচুরি আমাদের কাছে মনে হয়েছিল অমৃত।'

এর আগে অস্ত্রাগারে আগুন লাগাতে গিয়ে হিমাংশু সেন বলে এক বিপ্লবী অগ্নিদগ্ধ হয়। তাকে নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য অনন্ত সিংহ ও গনেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল দামপাড়া ত্যাগ করে। এ ঘটনার পর তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সমুদ্র বন্দরের বিদেশি জাহাজ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে সৈন্য নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। কিন্তু লোকনাথ বলের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী তার যোগ্য জবাব দিয়েছিল। এদিকে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ হিমাংশুকে রেখে ফিরে না আসতে মাষ্টারদা অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে দামপাড়া ছেড়ে নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২১ এপ্রিল তারিখেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় শেষ রাতের দিকে পুনরায় শহর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বিনোদবিহারীরা ফতোয়াবাদ পাহাড় থেকে রওনা হলেন। মাষ্টারদা তাদের ডেকে বললেন, আমরা যেকোন প্রকারেই আমাদের কর্মসূচি পালন করব। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল ভোর রাতে চট্টগ্রাম শহর আক্রমণ করা হবে। বিনোদবিহারী চৌধুরীরা ফতেয়াবাদ পাহাড় থেকে সময়মতো শহরে পৌছাতে পারলেন না। ভোরের আলো ফোটার আগেই তাদের আশ্রয় নিতে হল জালালাবাদ পাহাড়ে। ঠিক করা হল রাতের বেলা এখান থেকেই শহরে ব্রিটিশ সৈন্যদের অন্যান্য ঘাঁটি

আক্রমণ করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গরু-বাছুরের খোঁজে আসা রাখালরা মিলিটারি পোশাক পরিহিত বিপ্লবীদের দেখে পুলিশে খবর দেয়। ওই রাখালদের দেখেই সূর্যসেন প্রমোদ গুনেছিলেন। তখনই তিনি ধারনা করেন শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তার আশংকা বাস্তব হল। মাষ্টারদা সূর্যসেন লোকনাথ বলকে আসন্ন যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন।

লোকনাথ বল যুদ্ধের একটি ছক তৈরি করলেন। বিনোদবিহারীসহ কয়েকজনকে ত্রিশাল আক্রমণের দায়িত্ব দিলেন। শত্রুপক্ষ যেন কোনক্রমে পাহাড়ে উঠে আসতে না পারে সেজন্য তাদের যুদ্ধকৌশল কী হবে তা বলে দিলেন তিনি। বেলা ৪টা নাগাদ পাহাড় থেকে তারা দেখলেন সৈন্যবোঝাই একটি ট্রেন জালালাবাদ পাহাড়ের পূর্ব দিকে থামল। ডাবল মার্চ করে ব্রিটিশ সৈন্যরা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে দু পক্ষের তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। শত্রুরা কিছুতেই পাহাড়ের ওপর উঠতে পারছিল না। শত্রুরা তাদের দিকে বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়ছিল। আর বিনোদবিহারীদের তেমন কোনো অস্ত্রও ছিল না। এ ছিল এক অসমান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রথম শহীদ হলেন হরিগোপাল বল নামে ১৫ বছরের এক বিপ্লবী। শহীদের রক্তে জালালাবাদ পাহাড় সিক্ত হল। কিছুক্ষণ পরেই তিনি দেখতে পেলেন আরেক বিপ্লবী বিধু গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। মারা যাওয়ার আগে বিধু বললেন, নরেশ আমার বুকেও হাদাইছে একখান গুলি। তোরা প্রতিশোধ নিতে ছাড়বি না। বিধু ছিলেন মেডিকেল স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্র। খুব রসিক। মারা যাওয়ার আগেও তার রসিকতা কমেনি। একে একে নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেনও শহীদ হলেন। হঠাৎ করে একটা গুলি এসে বিনোদবাহারীর গলার বাঁ দিকে ঢুকে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। দু হাতে গুলি ছুঁড়ছিলেন তিনি। এক সময় অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালেন। ঘণ্টাখানেক অচৈতন্য থাকার পর বিনোদবিহারী দেখলেন শত্রু-সৈন্যরা সব পালিয়ে গেছে। গলার মধ্যে তখন অসহ্য যন্ত্রনা। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। পরনের লুঙ্গিটা খুলে বিপ্লবীরা তার গলায় ব্যান্ডেজ করে দিলেন। মাষ্টারদা সিদ্ধান্ত নিলেন জালালাবাদ পাহাড় ছেড়ে অন্য পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে রাতের মতো আশ্রয় নেবেন। পরবর্তী কর্মসূচি হবে গেরিলা যুদ্ধ।

তার ধীরগতিতে চলার কারণেই একসময় মাষ্টারদার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন বিনোদবিহারী। তখন লোকনাথ বলের সাথে আলাপ করে সিদ্ধন্ত নেয়া হল শহরের আশপাশ থেকে গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করবেন সবাই। প্রায় গ্রামে তাদের দলের ছেলেরা রয়েছে। সেখানে গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। লোকনাথ বল তাদের নির্দেশ দিলেন, অপরাহ্ন পর্যন্ত ধানক্ষেতে লুকিয়ে থাকতে। বিকেল ৪টার দিকে ধানক্ষেত থেকে বের হয়ে আবার হাঁটা ধরলেন। গলায় প্রচণ্ড ব্যথা। ক্ষণে ক্ষণে রক্তপাত হচ্ছিল। এক সময় লোকনাথ বলকে তিনি বললেন-আমি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছি। আমার জন্য আপনাদের পথ চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমাকে রেখে আপনারা চলে যান। লোকনাথ বল বললেন, এই অবস্থায় তোমাকে কীভাবে ফেলে যাব। তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার ৪ মাইলের মধ্যেই কুমিরা। তখন ছোট কুমিরা গ্রামে তার খুড়তুত ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। জেঠাশ্বশুর ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। সেখানেই বিনোদবিহারী আশ্রয় নিলেন।

খুড়তুত ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে বিনোদবিহারীর চিকিৎসা চলে দীর্ঘদিন। তাদের আদর-যত্নে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। এরই মধ্যে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতের সর্বত্রই লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। কুমিরাতেও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের শিবির স্থাপিত হল। আন্দোলন দমনের জন্য গ্রামে পুলিশ বাহিনী ক্যাম্প করে। ফলে বিনোদবিহারীকে তার আশ্রয়স্থল হারাতে হল। গ্রামে পুলিশ বাহিনী ক্যাম্প করার ফলে শঙ্কিত হয়ে পড়েন আশ্রয়দাতারা। ঠিক করা হল, এখান থেকে তাকে সরিয়ে ফেলা হবে। কারণ তিনি এখানে ধরা পড়লে বাড়ির সবাইকে বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে জেলে পচতে হবে। সমস্যা হল কীভাবে পালাবেন তিনি। সে সময় তার বৌদি বাপের বাড়িতে এসেছেন। তাকে পাঠানো হবে চট্টগ্রামের চাকতাই। বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, তিনিও বউ সাজবেন। লাল পাড়ের শাড়ি হাতে শাঁখা ও চুড়ি পরে বউ সাজলেন বিনোদবিহারী। বিকেল নাগাদ তিনি পৌঁছে গেলেন চাকতাই। পথে দুবার সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ বেষ্টনী পার হয়ে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু এভাবে পালিয়ে বেশিদিন থাকতে পারলেন না তিনি। তাকে জীবিত বা মৃত ধরে দেওয়ার জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ সরকারের হাতে বিনোদবিহারী চৌধুরী গ্রেপ্তার হলেন। কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারলেও বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে বিনা বিচারে পাঁচ বছর কারারুদ্ধ রাখা হয় তাকে। এরপরও বিনোদবিহারী চৌধুরীকে আরো দু'বার বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে। '৪১ সালের মে মাসে গান্ধীজীর ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদানের প্রস্তুতিকালে গ্রেফতার হন তিনি এবং ছাড়া পান '৪৫ সালের শেষের দিকে। '৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান সরকার সিকিউরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী বিনোদবিহারী চৌধুরীকে বিনা বিচারে এক বছর কারাগারে আটকে রাখে।

১৯৩০ সালে মাষ্টারদা সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে ঢোকার আগে থেকেই যে দেশপ্রেম বিনোদবিহারীর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল তা দিন দিন বিস্তারিত হয়েছে। অবিরাম দেশের জন্য কাজ করে গেছেন তিনি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শেষ হওয়ার পর '৫২-র ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। '৫২-র ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন আইনসভার সদস্য। ২১ শে ফেব্রুয়ারির দিন বিনোদবিহারী ফরাশগঞ্জ থেকে ২টার সময় আইনসভায় যোগদানের জন্য রিকশা করে আসছিলেন। মেডিকেল কলেজের সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন ছেলে তাকে রিকশা থেকে নামিয়ে বলল, আপনাকে যেতে দেব না। দেখে যান কীভাবে আমাদের লোকজনদের হত্যা করা হয়েছে। ওরা একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বরকতের লাশ দেখাল। বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, আমরা তো তোমাদেরই লোক। মুসলিম লীগ দেশ চালাচ্ছে। আমাকে যদি আইনসভায় যেতে না দাও তাতে তো ওদেরই লাভ হবে। বরং সেখানে গিয়ে বললে সারা বিশ্ব শুনবে। তখন তারা বুঝল এবং তাকে ছেড়ে দিল। সে দিন তারা এই বর্বরতার বিরুদ্ধে আইনসভায় কঠোর মত ব্যক্ত করেছিলেন।

'৭১ সালে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে ভারতে গিয়ে তরুণ যোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ে পাঠিয়েছেন বিনোদবিহারী। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাইফেল হাতে নিতে পারেননি বটে কিন্তু ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

১৯৩০ সালে কংগ্রেস চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক, ১৯৪০-৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাহী কমিটির সদস্য, ৪৬ সালে কংগ্রেস চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বিনোদবিহারী। ১৯৪৭ সালে ৩৭ বছর বয়সে পশ্চিম পাকিস্তান কংগ্রেসের সদস্য হন তিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সব রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করলে রাজনীতি থেকে অবসর নেন তিনি। তার স্ত্রীর নাম বিভা চৌধুরী। ছেলের নাম বিবেকান্দ্র চৌধুরী।

মাঝে তিনি ১৯৩৯ সালে দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে তার কর্ম জীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম কোর্টের একজন আইনজীবি হিসাবে অনুশীলন শুরু করেন। কিন্তু অবশেষে তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় প্লাজা উদযাপন পরিষদ, সমাজসেবী হিসেবে, ১৯৮৮ সালে চট্টলা ইয়ুথ কেয়ার, দেশ সেবক হিসেবে, ১৯৯৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি পরিষদ কর্তৃক, ১৯৯৮ সালে দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, চট্টগ্রাম পরিষদ কলকাতা কর্তৃক সেবাকর্মী হিসেবে সম্মাননা পান। ২০০১ সালে বিনোদবিহারী চৌধুরীকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়।

লেখক: হিমেল চৌধুরী

তথ্যসূত্র:

১. বিনোদবিহারীর সরাসরি সাক্ষাৎকার নিয়ে জীবনীটি করা হয়েছে।

বারীণ দত্ত



আমরা আজ 'বিপ্লবী প্রজন্মের' এমন কয়েকজনের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য মিলিত হয়েছি যাদের সকলের জন্ম হয়েছিল এক শত বছর আগে। অর্থাৎ ১৯১১ সালের বিভিন্ন মাসে। আমার উপর তাঁদের মধ্যে যার সম্পর্কে আলোচনার দায়িত্ব বর্তিয়েছে তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের পরিচিত কমরেড আবদুস সালাম বা সালাম ভাই। যদিও এটি তার আসল নাম নয়। তার পিতৃপ্রদত্ত নাম হচ্ছে 'বারীন্দ্রকুমার দত্ত'। 'সালাম' ভাই তার পার্টি প্রদত্ত ছদ্ম নাম। কমরেড বারীণ দত্ত ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপরে আমৃত্যু ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য পদে থেকে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ১৯১১ থেকে ১৯৯৩ এই সুদীর্ঘ ৮২ বছরের পথ পরিক্রমায় বিপ্লবী বারীণ দত্তের জীবনের প্রধান কয়েকটি পর্বের খুবই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমি এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এক্ষেত্রে আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক স্মৃতির সম্বল নেই বললেই চলে। শুধু দূর থেকে তাঁকে কয়েকবার দেখেছি মাত্র। তার পুত্র কিশোর দত্ত, ঢাকা কলেজে আমার সিনিয়র সহপাঠী ছিলেন এবং ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। সেই সুবাদে এবং আরেক সহ শিক্ষার্থী কমরেড বেনু মৃধার সুবাদে তাদের বাড়ি কমিউনিস্ট কমিউন বেলাল কলোনীতে দু-একবার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এখন যে সব স্মৃতি ধুসর ও বিলীন প্রায়। তবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজক শেখ রফিক আমাকে বিপ্লবী বারীণ দত্তর উপর লেখাটি তৈরীর জন্য একটি চার পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বারীণ দত্তের মৃত্যুর দুই বছর আগে অর্থাৎ ১৯৯১ সালে প্রকাশিত বারীণ দত্তের অত্যন্ত মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য একটি স্মৃতিকথা 'সংগ্রাম মুখর দিনগুলি' সরবরাহ করেছেন। মূলতঃ এই দুটি লেখাকে সম্বল করেই আমার আজকের আলোচনা উপস্থাপন করছি।

বারীণ দত্তের বিপ্লবে হাতে খড়ি:

কমারেড বারীণ দত্তের শৈশব কেটেছে সিলেটের এক অবস্থাপন্ন বনেদী পরিবারের মাঝে। তার পিতা ছিলেন রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র দত্ত। রাজভক্ত উকিল ছিলেন তিনি। তবে ওকালতির পাশাপাশি সমাজ কর্মে তার বিশেষ সুনাম ছিল। বিপ্লবী বা কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার ওঠা-বসা থাকলেও তিনি তাদের সমর্থক ছিলেন না। বারীণ দত্তের মাতা যদিত্ত ছিলেন

জমিদার নন্দিনী কিন্তু তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়া স্বদেশি ভক্ত নারী। কমিউনিস্ট পুত্র কন্যাদের প্রতি তার ছিল অসীম মমতা ও সস্নেহ প্রশ্রয়। এই দম্পতিরই তৃতীয় সন্তান হচ্ছেন কমরেড বারীণ দত্ত। বারীণ দত্তরা ছিলেন সাত ভাই-বোনের এক বৃহৎ পরিবার। সমগ্র পরিবারের সকল ভাই-বোনই ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনে। সবচেয়ে বড় ভাই শচীন্দ্র দত্ত অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। সন্ন্যাস ব্রতের পাশাপাশি তিনি অনেক বিপ্লবী বই পত্র সংগ্রহ ও পাঠ করতেন। তার এসব বই পত্র ছোট বেলাতেই অন্যান্য ভাই বোনেরাও পাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান কসুম কুমারী দত্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং তার পুত্র কন্যারাও তাই। তৃতীয় সন্তান বারীণ দত্তেরও জীবন কমিউনিস্ট জীবন। পরবর্তী ছোট ভাই রবীন্দ্র কুমার দত্ত, বারীণ দত্তের মতই প্রথমে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদান করেন এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি অবশ্য পরবর্তীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের চীনপন্থী ধারা তথা সি. পি. আই (এম)-এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। বারীণ দত্তের পঞ্চম ভ্রাতা সত্যব্রত দত্তও চীনপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। তার এক পুত্র বাম আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন। ষষ্ঠ ভ্রাতা দেবব্রত ছিলেন সিলেট গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সপ্তম এবং সবচেয়ে ছোটবোন হচ্ছেন স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নারীনেত্রী কমরেড হেনা দাস। তার বাড়তি পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র।

সুতরাং সবদিক দিয়েই বারীণ দত্ত ছিলেন এক ঝাঁক বিপ্লবী ভাই-বোনের মাঝে মধ্যমণি স্বরূপ। বারীণ দত্ত মেধাবী ছিলেন। ১৯১৯ সালে সিলেটের মুরারী চাঁদ মহাবিদ্যালয় থেকে তিনি দুইটি লেটারসহ মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। তবে এর আগেই বিপ্লবী দীক্ষা তার হয়েছিল স্কুলে থাকতে থাকতেই। প্রথমে তিনি সন্ত্রাসবাদী অনুশীলনী দলের সদস্য হয়েছিলেন। তখন বাংলার প্রায় সকল দেশপ্রেমিক তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঘাত হানার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। বারীণ দত্তও তাই স্বাভাবিকভাবে প্রথমে অনুশীলনী দলে পরে দলাদলির কারণে সেটা ছেড়ে দিয়ে যুগান্তরে নাম লিখিয়েছিলেন। তার এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদানের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার আত্মজীবনী 'সংগ্রাম মুখর দিনগুলিতে'। তিনি লিখিছেন, '১৯২৭ সাল। আমরা তখন অষ্টম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করে নবম শ্রেণীতে উঠেছি। ওই সময় অণুশীলন দলের উত্তর বঙ্গের (জলপাইগুড়ি) অন্যতম নেতা বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের সাথে সিলেটে দেখা হয়। পার্টির কাজ কর্ম সম্পর্কে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হয় আমার। সন্ত্রাসবাদী দলে লোক রিক্রুট করার সুবিধার জন্য আমরা তখন তরুণ সংঘ নামে একটি যুব সংগঠনের জন্য দেই। ' (বারীণ দত্ত, 'সংগ্রামমুখর দিনগুলি' জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃঃ ১৬)।

পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতার রিপন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় যুগান্তরের সদস্য হিসাবে গ্রেফতার হয়ে যান। তাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে অল্প কয়েক মাস রাখার পর ১৯৩৪ সালে হিজলী বন্দী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই বন্দী শিবিরে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত থাকেন অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মাত্র ২১ বছর বয়সে বারীণ দত্তের বিপ্লবী কারাজীবন এর সূচনা হয়েছিল এবং তা তিন-চার বছর স্থায়ী হয়। এই ভাবে অল্প বয়সেই বিপ্লববাদে দীক্ষা, জেলে গমন এবং জেলে এক অভূতপূর্ব অধ্যয়নচক্র বা পড়াশুনার মধ্যে সময় কাটিয়ে শেষ হয় তার শৈশব ও কৈশোর। এরপর শুরু হয় তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদ উত্তরণের পর্ব।

সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদ কমরেড বারীণ দত্তের উত্তরণ:

প্রেসিডেন্সি জেলে থাকা কালেই বারীণ দত্ত কমরেড গোপাল হালদার এবং কমরেড সত্যেন সেনের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাদের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হন। পরবর্তীতে হিজলী বন্দী শিবির এবং সন্দ্বীপে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তার সুযোগ হয় গভীরভাবে মার্কসবাদী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের। এই সময় সারা বাংলার সন্ত্রাসবাদী যুবক-যুবতীরা বন্দীদের অধিকারের দাবিতে জেলখানার ভিতরে অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে বই-পত্র পড়ার সুযোগ ও অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন। জেলখানায় এক গভীর আত্মসমালোচনামূলক অধ্যয়ন প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন তারা এবং দলে দলে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশরাজ সেই অনুমতি তখন দিয়েছিল কারণ তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাময়িক সমঝোতা স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিপ্লবীদের অসীম দেশপ্রেম পরিণত হয়েছিল দেশের সাধারণ দরিদ্র জনগণ কৃষক-শ্রমিক-ক্ষেতমজুরদের প্রতি অসীম ভালবাসায় ও অঙ্গীকারে। তাঁদের অল্প বয়সের টগবগে অসীম সাহস ও ত্যাগ পরিণত হয়েছিল শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠিত করে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের বদলে গণবিপ্লবের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জনগণের আর্থ-সামাজিক মুক্তি আদায়ের স্বপ্নে। এই তারুণ্যদীপ্ত স্বপ্নই পরবর্তীতে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রদান করেছিল এক অমিত সম্ভাবনাময় শক্তি। বিশেষ করে বাংলার উত্তাল চল্লিশ দশকের কৃষক বিদ্রোহগুলো প্রত্যক্ষভাবে গড়ে উঠেছিল এইসব অন্তরীণে আবদ্ধ সদ্য কারামুক্ত গ্রামীণ তরুণ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও তাগিদের মাধ্যমে। কমরেড বারীণ দত্ত এই সাধারণ ধারারই একজন কৃতী প্রতিনিধি ছিলেন। তার স্মৃতিকথায় তিনি নিজেই লিখেছেন, 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সূত্রপাত হয় আমার বন্দীজীবনে। এখানেই আমি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা ও চর্চা করার সুযোগ পাই এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি। বন্দী জীবনই ছিল আমার জীবনকে নতুনভাবে গড়ার সূচনা। তাই বন্দী-জীবনের স্মৃতি আমার নিকট খুবই স্মরণীয়। বন্দী অবস্থায় যখন জানতে পারলাম সিলেটে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। তখন আনন্দে মন নেচে উঠেছিল। এ আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। ১৯৩৫ সালেই সিলেট জেলা পার্টি গঠিত হয়।' (বারীণ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯)

জেলজীবন শেষ করে সন্দ্বীপে অন্তরীণাবস্থা অবসানের পর সিলেট ফিরে গেলেন কমরেড বারীণ দত্ত। ১৯৩৮ সালে গ্রহণ করলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে ১৯৪২ সালেই গ্রহণ করলেন সমগ্র সিলেট জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব। তাঁকে জেলা পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হোল। এই সময় সিলেটে তার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় বিরাট বিরাট শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কমরেড বারীণ দত্তের পরবর্তী জীবনে আমরা দেখতে পাই যে তিনি যুক্ত হয়েছেন কৃষক আন্দোলনের সংগে। পরবর্তীতে তিনি কমরেড হাতেম আলীর মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক ফ্রন্ট কৃষক সমিতির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং আজীবন এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কমিউনিস্ট নেতা কমরেড বারীণ দত্ত:

১৯৫১ সালেই তাকে পার্টি সিলেট থেকে ঢাকায় নিয়ে আসে এবং তিনি পূর্ব পাকিস্তান তথা কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হিসাবে কেন্দ্রে থেকে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। অবশ্য

১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ যখন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় তখন থেকেই এর মোট বিশ জন প্রাদেশিক কমিটির সদস্যর মধ্যে একজন সদস্য হিসাবে তিনি অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। (দেখুন খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক, বর্তমান সময়, ২০১০, পৃ: ৫৫)। পাকিস্তানি আমলে বেশির ভাগটা জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ছিল এবং বে-আইনী অবস্থাতেই গোপনে পার্টি 'ডেনে' পার্টি নেতারা কাজ করে যেতেন। এমনকি বুড়িগঙ্গার নদীর উপরে নৌকায় তাদের অনেক গোপন সভা সে সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে! রাতের বেলাতেই অধিকাংশ সময় নিশাচরের মত তাঁদেরকে কাজ কর্ম চালাতে হতো। কমরেড 'আবদুস সালাম' নাম গ্রহণ করে বছরের পর বছর কমরেড বারীণ দত্তও কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টির মূল নেতৃত্বে থেকে কাজ করেছেন। এই ভাবে তার মোট আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২৯ বছর। তার বিয়েও হয়েছে ১৯৫০ সালে কমরেড শান্তি ভট্টাচার্যের সঙ্গে গোপন অবস্থায় আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালে। তার স্ত্রীও কমরেড ছিলেন। স্ত্রী সম্পর্কে তিনি তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'জেল থেকে বের হওয়ার পর আমরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তখন ছিল ১৯৫০ সাল। ওই বছর শান্তি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করে। আমরা উভয়ে পরিবারের সম্মতি নিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমাদের দাম্পত্য জীবন হয়েছিল অত্যন্ত সুখের। আমরা একে অন্যকে চিনেছি প্রকৃত কমরেড হিসেবে।' (বারীণ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭)

১৯৬৮ সালে পূর্ব পকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম অফিসিয়াল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেই কংগ্রেসেই কমরেড বারীণ দত্তকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। এর আগে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন কমরেড মণি সিংহ। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন কালে তাঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছে। এখানে আমি বিশেষ গুরুত্বের বিবেচনায় দুটি ঘটনার উল্লেখ করবো। একটি বঙ্গবন্ধুর সংগে কমিউনিস্টদের বিখ্যাত বৈঠকের ঘটনা, অপরটি ষাট-দশকে চীন-মস্কো বিরোধকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গনের ঘটনা। দুটো ঘটনাই কোন টীকা ছাড়াই তুলে ধরছি তার নিজস্ব জবানবন্দীতে কারণ তার নিজস্ব এই জবানবন্দীর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারী করেন। তখন আইয়ুবের বিরুদ্ধে তথা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় কমিউনিস্ট পার্টি। সে উদ্দেশ্যে ঠিক হয় আওয়ামী লীগের তদান্তীন্তন নেতৃবৃন্দ বিশেষত: শেখ মুজিব ও মানিক মিয়ার সঙ্গে পার্টি নেতৃত্ব গোপনে যোগাযোগ করবেন। এ বৈঠক সম্পর্কে কমরেড বারীণ দত্তের বিবরণ নিম্নরূপ:

'বিশিষ্ট সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরীর সাহায্যে আমরা শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাত করি। এ বৈঠকে ছিলেন বড় ভাই ও খোকা রায়। শেখ মুজিব তুললেন স্বাধীন বাংলার কথা। আমরাও এর পক্ষে ছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে প্রকাশ্যে এ শ্লোগান আনা কঠিন হতো। কারণ, আমরা তখন চাইছিলাম সারা পাকিস্তানভিত্তিক ঐক্য। মুজিব চাইলেন সেই মুহূর্তেই স্বাধীন বাংলার দাবি উত্থাপন করতে। তাই, সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলাপ করে আমাদেরকে জানাবেন বলে বৈঠক শেষ হয়। পরে জানালেন সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব আমাদের মতটাই গ্রহণ করেছেন'। (বারীণ দত্ত, প্রাগুক্ত পৃ:৭০)

এই বক্তব্যের সমর্থন কমরেড খোকা রায়ের গ্রন্থ 'সংগ্রামের তিন দশক' বইয়েও পাওয়া যায়। খোকা রায় নিজেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "বৈঠকে শেখ মুজিব আমাদের জানিয়ে ছিলেন, 'ভাই এবার আপনাদের কথা মেনে নিলাম। আমাদের নেতাও (অর্থাৎ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব) আপনাদের বক্তব্য সমর্থন করেন। তাই এখনকার মত সেটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কথাটা থাকলো।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহ্‌মান ১৯৬১ সন থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন।" (খোকা রায়, সংগ্রামের তিনি দশক, বর্তমান সময়, ২০১০ পৃ: ১৩২)

দ্বিতীয় ঘটনাটি অর্থাৎ মস্কোপন্থীদের সঙ্গে চীনপন্থীদের যে দুঃখজনক বিরোধ ঘটেছিল তার শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক মিমাংসা হলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস দেশে দেশে ভিন্ন ভাবে রচিত হতো। চীন-রাশিয়ার মতাদর্শগত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে অগণতান্ত্রিক ও যান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যে ভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে তা খুবই ক্ষতিকর হয়েছে। আমাদের দেশে এই বিভাজনের পর কমরেড বারীণ দত্ত ছিলেন 'মস্কোপন্থী' পার্টি শিবিরে। কিন্তু বিভাজনের আগে পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ পার্টির মধ্যে যে আন্তঃপার্টি বির্তক হয়েছিল, যে মতপার্থক্যগুলি দেখা দিয়েছিল তার সম্পর্কে তার একটি চমৎকার শিক্ষণীয় মূল্যায়ন এখানে তুলে ধরছি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই দ্বন্দ্বের সমাধানের একটি সম্ভাবনা কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তার একটি ঐতিহাসিক বিবরণ এই উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়:

'১৯৬১-৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পার্টির মতবিরোধ দেখা দেয়। আমাদের দেশেও এর প্রতিক্রিয়া পড়তে থাকে। পার্টিতে চীন ও সোভিয়েতের লাইন নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদাররা একটি দলিল হাজির করেন। এ দলিলে চীনা পার্টির লাইনকেই সঠিক বলে চিহ্নিত করা হয়। জবাবে সোভিয়েত পার্টির সমর্থনে আরো একটি দলিল কেন্দ্রীয় কমিটিতে হাজির করা হয়। দ্বিতীয় দলিল রচনায় ছিলাম আমরা। তবে, মূলত দলিলটি রচনা করেছেন অনিল মুখার্জী। উভয় দলিল নিয়েই কেন্দ্রীয় কমিটিতে ব্যাপক আলোচনা হয়। কথা হয় উভয় দলিলের দুজন করে সমর্থক মিলে যাবে প্রত্যেক জেলায়। উভয়ের মতামত ব্যক্ত করবে। সম্মেলন করে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কাউকে বহিষ্কার করা হবে না। তোয়াহা তা মানেন নি। প্রথমে তাদের লাইনের সমর্থক ছিল বেশি কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধের প্রশ্নে আইয়ুব খাঁনকে সমর্থন দান, মওলানা ভাসানীকে দিয়ে আইয়ুবের সাথে সাক্ষাৎ করানো এবং আব্দুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আসহাব উদ্দিনের গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করানোর ফলে পার্টিতে তাদের সমর্থন কমে যায়। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করলে তারা এর বিরোধীতা করে। সেটাও তাদের জনসমর্থন কমার আর একটি কারণ। প্রথমে তাদের সাথে তিন-চতুর্থাংশ পার্টি সদস্য থাকলেও পরে যখন পার্টির শৃংখলা ভঙ্গ করে তারা বেরিয়ে যান তখন তাদের সাথে ছিল মাত্র এক চতুর্থাংশ। তবু পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতির কথা স্বীকার করেছেন তোয়াহা সাহেব পরবর্তীতে। (বারীণ দত্ত, প্রাগুক্ত পৃ: ৭১)

যাই হোক পরবর্তীতে মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট ধারার সঙ্গে যুক্ত থেকে কমারেড বারীণ দত্ত সমগ্র পার্টিকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর কাল পর্বে কমরেড আব্দুস সালাম পার্টিতে মূল্যবান অবদান রাখেন। পরবর্তীতে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি কৃষক গণফ্রন্টে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন আমৃত্যু কমিউনিস্ট।

যে সব কমরেডরা পার্টিতে তার সঙ্গে কাজ করেছেন তাদের মতে কমরেড আব্দুস সালাম ছিলেন খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কখনো তিনি উত্তেজিত হতেন না। তার মত পরমতসহিষ্ণু, সহৃদয়, গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব সব পার্টিতেই বিরল।

আমার কথা ফুরিয়ে এসেছে। এরপর মাত্র দুটি কথা। কমারেড বারীণ দত্ত তার মৃত্যুর দু' বছর আগে যে আত্মজীবনী লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন 'সংগ্রাম মুখর দিনগুলি' আর সেই গ্রন্থটিকে তিনি উৎসর্গ করেছেন 'নানকার আন্দোলন এবং মুক্তি সংগ্রামের জানা-অজানা শহীদদের উদ্দেশ্যে'। এই নামকরণ ও উৎসর্গলিপি থেকে তার সংগ্রামী সহৃদয় চরিত্রের পরিচয় আমরা পাই। নানকার আন্দোলন ও চা-বাগানের শ্রমিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা সত্ত্বেও কৃষক ও শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত শ্রেণী স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। তাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগ কিছুটা অক্ষুন্ন রেখেই কমিটিনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। কমিউনিস্টদের দায়িত্ব হচ্ছে ধৈর্য্যের সঙ্গে মেহনতি পশ্চৎপদ জনগণের মধ্যে পড়ে থেকে কাজ করা। এই কাজ করতে গিয়ে নানকার আন্দোলনের একজন কমিউনিস্ট কৃষক কর্মীর চেতনার যে বিবর্তন তিনি কাছে থেকে লক্ষ্য করেছেন তা বর্ণনা করে কমরেড বারীণ দত্ত নিজেই লিখেছেন– 'তখন মোল্লা ছিলেন একজন খুবই গরীব নানকার কৃষক। তিনি ছিলেন মসজিদের ইমাম এবং খুবই ধর্মপ্রাণ কৃষক। নানকার কৃষকদের অসহনীয় জীবন ও দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজ পরিবর্তনের ধারা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অন্যদের যেমন উপলব্ধি ঘটে এবং অনেকেই রাজনৈতিক ভাবে শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠেন তেমনি তিনিও রাজনৈতিক ভাবে শ্রেণীসচেতন হন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন।' (বারীণ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪)

কেউ কেউ বলেন যে, বিপ্লবী প্রজন্মের বিপ্লবীরা ব্যর্থ হয়েছেন। সন্ত্রাসীবাদী বিপ্লবীরা ব্যর্থ কারণ সন্ত্রাসবাদের পথে ভারত স্বাধীন হয় নি। কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ব্যর্থ কারণ পৃথিবীতে কোথাও 'সাম্যবাদী স্বপ্ন' বাস্তবায়িত হয় নি। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যে বড় একটি ভুল রয়ে গেছে। মানব ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ পাঠ থেকে জানা যায় যে, 'মহৎ স্বপ্নের' উদ্দেশ্যে মানবাযাত্রা কখনোই থেমে থাকে না। যদিও সেই যাত্রায় অনেক চড়াই-উৎরাই থাকে। থাকে ব্যর্থতাও। কিন্তু ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত চরম সত্য নয়। প্রতিটি মহৎ ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে নতুন সংগ্রাম ও নতুন সাফল্যের ভিত্তি বা সোপান হিসাবে কাজ করে। এটাই ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির নিয়ম। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিপ্লবী চে-গুয়েভারার অমর উক্তি: "We dreamt the impossible, therefore we are realist." ('আমরা অসম্ভবের স্বপ্ন দেখি, সে জন্যই আমরা বাস্তববাদী')

লেখক: এম.এম.আকাশ

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের বিপ্লবী জন্মশতবর্ষ ২০১১– সম্পাদনা: শেখ রফিক, বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা, প্রকাশকাল ১৪ অক্টোবর ২০১১।

মাতঙ্গিনী হাজরা



আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি–
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী,
সব দিতে হবে।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেই বাংলা পরাধীনতার শৃঙ্খল পরেছিল। ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষকেও পরতে হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ। কিন্তু এই বাংলাদেশই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বলাবাহুল্য, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল এই বাংলাই। নারী-পুরুষ সমবেতভাবেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল। সন্ত্রাসের নায়িকাদের মধ্যে যেমন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীণা দাশ ও উজ্জ্বলা মজুমদার প্রভৃতির নাম অমর হয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি সন্ত্রাসবাদ পরিহার করেও যেসব বীরাঙ্গনারা জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে গেছেন মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে অন্যতমা। আর একটি দিক থেকেও এঁদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তা হল এই যে ওইসব নায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তখনকার নিরিখে শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা ও আধুনিকা। কিন্তু মাতঙ্গিনী ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরা রমণী। তবে নিরক্ষর হলেও তিনি ছিলেন ভারতের নারীদের মুকুটমণি স্বরূপা– 'The Joan of Arc of India.' বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল– 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' (করো, না হয় মরো)। স্বীকার করতেই হয় যে মাতঙ্গিনী জীবন বিসর্জন দিয়ে এই মন্ত্রের আরাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ছোট্ট গ্রাম হোগলা। মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার এলাকাধীন। ওই গ্রামে অতি গরিব এক চাষি পরিবারে জন্মেছিলেন মাতঙ্গিনী। তখনকার দিনে অনেক ভদ্র পরিবারের মধ্যেও জন্মতারিখ রাখা হত না। আর মাতঙ্গিনীর জন্ম তো গরিব ও নিরক্ষর এক চাষি পরিবারে। তবুও ঐতিহাসিকরা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে বার করেছেন তাঁর জন্মের সালটি। সেটি হল ইংরাজির ১৮৭০ সাল। তবে সঠিক তারিখটি আজও জানা যায়নি। তাঁর বাবার নাম ছিল ঠাকুরদাস মাইতি। চাষবাস করে তিনি কোনরকমে সংসার চালাতেন। মায়ের নাম ছিল ভগবতী মাইতি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ও মায়ের নামের সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল।

গরিব চাষির ঘর। তার ওপর আবার কন্যা সন্তান। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের মধ্যেই লেখাপড়ার তেমন চল ছিল না। সুতরাং মাতঙ্গিনীরও লেখাপড়া হয়নি

একেবারেই। এগারো বছর বয়স হতে না হতেই বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। পাশেই আলিনান গ্রাম। পাত্র ওই গ্রামেরই ত্রিলোচন হাজরা। কিন্তু মাতঙ্গিনীর বিবাহিত জীবন বেশিদিন স্থায়ী হল না। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই স্বামীকে হারালেন তিনি। ছেলে-মেয়েও কিছু হয়নি। সাত বছরেই সংসার-জীবন শেষ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীক্ষা নিয়ে নিলেন। ভাবলেন ধর্ম-কর্ম করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন।

ওই সময়ের কিছু আগে-পরে স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন– 'এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হবেন– জননী-জন্মভূমি। তাঁর পূজো করো সকলে।' স্বামীজির কথাটা মাতঙ্গিনীকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলেন দেশকে বিদেশির শাসনমুক্ত করে দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর চেয়ে বড়ো ধর্ম আর কিছুই থাকতে পারে না। তাই সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সে সুযোগ সত্যিই এল যখন গান্ধীজি পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০-৩৪) ঢেউ মেদিনীপুরেও আছড়ে পড়ল। এদিকে বিপ্লবতীর্থ মেদিনীপুরের শাসনব্যবস্থা তখন প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে সন্ত্রাসবাদীদের দাপটে। তিন-তিনজন জাঁদরেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট–পেডি, গডলাস ও বার্জ প্রাণ হারিয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। এক কথায় বলা যায় শাসককুল মেদিনীপুরের নাম শুনলেই বিশেষভাবে আতঙ্কিত ও দিশেহারা হয়ে পড়তেন।

১৯৩০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে শুরু হল লবণ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন। দেশবাসীর পক্ষে সমুদ্র-জল থেকে লবণ সংগ্রহ করা তখন বেআইনি ছিল। দেশের যে যে জায়গায় লবণ তৈরির সুযোগ ছিল সত্যাগ্রহীরা সেইসব জায়গায় লবণ তৈরি করে আইন-অমান্য করতে লাগলেন। মেদিনীপুরের কাঁথিতেই প্রথম লবণ তৈরি শুরু হল। খবর পেয়েই পুলিশ গ্রামে ঢুকল। ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল। নানান অত্যাচার শুরু করে দিল। তবুও মেদেনীপুর শায়েস্তা হল না। শাসককুল চাইল লবণ তৈরির একচেটিয়া অধিকার তাদের হাতে থাকুক। কিন্তু দেশের মানুষ চাইল লবণ তৈরির ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা।

আইন অমান্য আন্দোলনে মাতঙ্গিনীও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আলিনান গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। খবর পেয়েই পুলিশ এল। মাতঙ্গিনী গ্রেপ্তার হলেন। সঙ্গে রইলেন অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরাও। তাঁরাও গ্রেপ্তার হলেন। এ দুর্ভোগ অবশ্য বেশিক্ষণ সইতে হয়নি। কিছুটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে মাতঙ্গিনীকে ছেড়ে দেওয়া হল।

পরবর্তী ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৪/৩৫ সালে। অবিভক্ত বাংলার লাটস্যাহেব মি. অ্যান্ডারসন গোঁ ধরেছেন তমলুকে দরবার করবেন। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। মেদিনীপুরের বরাবরই রয়েছে বৈপ্লবিক ঐতিহ্য। মেদিনীপুরবাসীরা তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লাটসাহেবকে এই দরবার তারা কিছুতেই করতে দেবে না। মেদিনীপুরবাসীরা দেখিয়ে দিতে চায় যে তারা আর কিছুতেই ইংরেজদের গোলামি করতে রাজি নয়। এদিকে ইংরেজ সরকারও তাদের সংকল্পে অটল। সুতরাং সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল।

লাটসাহেব এলেন জেদের বশে। তমলুকে দরবার তিনি করবেনই। দরবার বসার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। কে তোয়াক্কা করে কয়েকটা কালো নেটিভের প্রতিবাদের। পুলিশ ও প্রশাসনের মনোভাব অনেকটা একই রকমের। এমন সময় হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল– 'লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও– ফিরে যাও। তোমার কোন কথা আমরা শুনতে রাজি নই। ঢের হয়েছে। তোমাদের দাসত্ব আর আমরা সহ্য করতে পারছি না। আমরা চাই তোমাদের হাত থেকে মুক্তি। বন্ধ করো তোমাদের শোষণ ও লুণ্ঠন। বন্ধ করো তোমাদের পুলিশি জুলুম। লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও।' আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল, বন্দে মাতরম, ধ্বনিতে।

শোভাযাত্র এগিয়ে চলল দরবারের দিকে। শত শত পুলিশও হাজির। হাতে তাদের লাঠি ও বন্দুক। শোভাযাত্রীদের পথ আটকাল ওই পুলিশবাহিনী। পুরোভাগেই ছিলেন–মাতঙ্গিনী। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। এবার কিন্তু তাঁকে আর এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হল না। রীতিমতো বিচার হল। মাতঙ্গিনী দুমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিচারের রায় ঘোষণার পর হাসিমুখে বলেছিলেন তিনি–'দেশের জন্য, দেশকে ভালোবাসার জন্য দণ্ডভোগ করার চেয়ে বড়ো গৌরব আর কী আছে?'

মাতঙ্গিনীকে অমর করে রেখেছে ১৯৪২ সালের অগাস্ট বিপ্লব। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র–'ভারত ছাড়ো' বা কুইট ইন্ডিয়া (Quit India) এই ধ্বনি দিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে গান্ধীজিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেশ প্রস্তুত নয় অথবা আমার অন্তর থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছি না বলে গান্ধীজি চার বছর বৃথা দেরি করে ফেললেন। অবশেষে ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট তারিখে ওই আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মহাত্মাজি–'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হল জাতির জনকের আবেগ। হিংসা ও অহিংসা একসূত্রে গাঁথা হয়ে যাওয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা এক নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজেহাল ইংল্যান্ডকে ক্ষমতাচ্যুত করার একটা সুবর্ণসুযোগ দেখা দেয়। অবশ্য ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে দেরিতে শুরু করার জন্যই সাফল্যের সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর। অগাস্ট বিপ্লবের জোয়ার তখন মেদিনীপুরে আছড়ে পড়েছে। ঠিক হয়েছে এক সঙ্গে তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া হবে।

মাতঙ্গিনী স্বেচ্ছাসেবকদের বোঝালেন গাছ কেটে ফেলে রাস্তা-ঘাট সব বন্ধ করে দিতে হবে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। পাঁচদিক থেকে পাঁচটি শোভাযাত্রা নিয়ে গিয়ে তমলুক থানা এবং একই সঙ্গে সমস্ত সরকারি অফিসগুলি দখল করে নিতে হবে।

যেমন কথা তেমনি কাজ। ২৯ সেপ্টেম্বর পাঁচটি দিক থেকে পাঁচটি শোভাযাত্র এগিয়ে চলল তমলুক অধিকার করতে। হাজার হাজার মেদিনীপুরবাসী শামিল হয়েছিলেন ওই শোভাযাত্রায়। হাতে তাদের জাতীয় পতাকা। মুখে গর্জন ধ্বনি– 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো–করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে– বন্দে মাতরম্।'

পশ্চিমদিক থেকে এগিয়ে এল আট-দশ হাজার মানুষের এক বিরাট শোভাযাত্রা। গুর্খা ও ব্রিটিশ গোরা সৈন্যরা তৈরি হল অবস্থার মোকাবিলার জন্য। হাঁটু মুড়ে বসে গেল তারা। তারপরই তাদের বন্দুকগুলো গর্জে উঠল। মারা গেলেন পাঁচজন। আহত হলেন আরও বেশ কয়েকজন। আহত রামচন্দ্র বেরার দেহটা টানতে টানতে থানার সামনে এনে ফেলে রাখল কোন এক ব্রিটিশ জমি। জ্ঞান ফিরে আসতেই সবার অলক্ষ্যে রামচন্দ্র বেরা বুকে হেঁটে থানার দিকে এগিয়ে চলল। থানা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই উল্লাসে ফেটে পড়ে বলে উঠলেন– 'থানা দখল করেছি।' তারপরই তাঁর শরীর নিথর নিস্পন্দ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

উত্তর দিক থেকে আসছিল মাতঙ্গিনীর দলটি। তারা থানার কাছাকাছি আসতেই পুলিশ ও মিলিটারি অবিরাম গুলিবর্ষণ শুরু করে দিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন কিছুটা পিছু হঠে গিয়েছিল। তাদের সতর্ক করে দিয়ে মাতঙ্গিনী বললেন– 'থানা কোন্ দিকে? সামনে, না পেছনে? এগিয়ে চলো। হয় থানা দখল করো, নয়ত মরো। বলো– 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'–'বন্দে মাতরম্।'

বিপ্লবীদের সম্বিত ফিরে এল। তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হতে থাকল– 'এগিয়ে চল। ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।– বন্দে মাতরম্।' আবার এগিয়ে যেতে লাগল তারা জলপ্রপাতের বেগে। ওদিকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল বৃষ্টির মতো।

উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসা দলটির পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী। বয়স বাহাত্তর কি তিয়াত্তর। তবুও ছুটে চলেছেন উল্কার বেগে। বাঁ-হাতে বিজয় শঙ্খ–ডান হাতে জাতীয় পতাকা। আর মুখে ধ্বনি– 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো–করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে–বন্দে মাতরম্।'

একটি বুলেট পায়ে লাগতেই হাতের শাঁখটি মাটিতে পড়ে গেল। দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে বাঁ-হাতটা নুয়ে পড়ল। কিন্তু ওই অবস্থাতেও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বলে চলেছেন– 'ব্রিটিশের গোলামি ছেড়ে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করো– তোমরা সব আমাদের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে হাত মেলাও।' প্রত্যুত্তরে উপহার পেয়েছিলেন কপালবিদ্ধ করা তৃতীয় বুলেটটি। প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতীয় পতাকাটি তখনও তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা ছিল।



এইভাবে কত স্নেহময়ী জননী ও মমতাময়ী ভগিনী যে দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন তার সঠিক ইতিহাস হয়তো কোনদিনও লেখা হবে না। তাই বিদ্রোহী কবি নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়–

কোন কালে একা, হয়নি কো জয়ী,
পুরুষের তরবারি–
শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে,
বিজয়লক্ষ্মী নারী।
কোন্ রণে কত খুন দিলো নর–
লেখা আছে ইতিহাসে,–
কত নারী দিলো সিঁথির সিঁদূর,
লেখা নাই তার পাশে।

লেখক: আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

তথ্যসূত্র:

১. ইতিহাসের পাতা থেকে (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ– জানুয়ারি, ২০০৮, মিত্রম্ প্রকাশনি, কলকাতা।

বঙ্কিম মুখার্জি



জন্ম: ৫ মে ১৮৯৭। হাওড়া জেলার বেলুড়ে মামাবাড়িতে। বাবা: যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মা: বিভাবতী দেবী। পৈত্রিক বাড়ি বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থানার কচুয়া গ্রামে।

মামাবাড়িতেই তার বাল্য ও শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। ছাত্র জীবনের প্রথম ভাগ কাটে শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে। পরে হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এস সি এবং বি এস সি পাশ করেন। বি এস সি-তে অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক পান। রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে এম এস সি-তে ভর্তি হলেও উচ্চ শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই ১৯২০ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বাল্যবন্ধু রাধারমণ মিত্রের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। সেখানে তিনি পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। পরিচিত হন মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরুর সাথে। মতিলাল নেহেরুর পরামর্শে ১৯২৫ সালে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯২৫-২৬ সালে কিশোরীলাল ঘোষ ও রাধারমণ মিত্রের সাথে হাওড়ার চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়ায় চটকল শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯২৭ সালে চেঙ্গাইল লাডলো জুট মিলের ১০ হাজার শ্রমিকের ইউনিয়নের সম্পাদক হন। বজবজের ৭টা চটকলের শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠিত করেন। ১০ পয়সা বেতন বৃদ্ধির চুক্তিতে এই ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। ১৯২৮ সালে তারই নেতৃত্বে চটকলে ১৬ জুলাই শুরু হয়ে লাগাতার ছয় মাস ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয়। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৯-৩০ সালে ছিলেন এ আই সি সি'র সদস্য। ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধরপাকড় শুরু হলে আত্মগোপনে যান। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন।

১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনের প্রস্তাবের বিরোধিতায় বর্ধমান জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের সময় অনুষ্ঠিত সমাজবাদী যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা করেন। ওই বছরেই কলকাতা অধিবেশনে এ আই টি ইউ সি দু'ভাগ হয়ে গেলে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অপরজন ছিলেন এস ভি দেশপাণ্ডে।

১৯৩৪ সালে গান্ধিজীর আপস নীতির বিরুদ্ধে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৬-এ সারা ভারত কিষাণ কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মেলন থেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে অর্জন করেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। অন্তর্ভুক্ত হন পার্টির প্রাদেশিক কমিটিতে। ১৯৬১-র বিজয়ওয়াদা কংগ্রেস থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য হন।

১৯৩৭ সালে কোলিয়ারি শ্রমিক কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে হাওড়া শ্রমিক আসনে লড়াই করে পরাজিত হন। ১৯৫২ এবং ১৯৫৭-র সাধারণ নির্বাচনে বজবজ কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৬১ সালের ১৫ নভেম্বর দুরারোগ্য কর্কট রোগে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার জীবনাবসান হয়।

এক অসাধারণ বক্তা এবং সংগঠনকও

জ্যোতি বসু

সদস্য, পলিটব্যুরো, সি পি আই (এম)

বঙ্কিম মুখার্জির মতো বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতার অবদানের কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের স্বার্থে। বঙ্কিম মুখার্জির সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বেশ কিছুদিন কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

১৯৪০ সালে আমি বিলেত থেকে ফিরে কলকাতায় এখানকার পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং পার্টির সংগঠন ও আন্দোলনের কাজে যুক্ত হই। এইভাবে আমার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে। এই পরিচয় ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তার ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করেছিল এবং আমাদের দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ নিবিড় হয়। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের এই সখ্যতার সম্পর্ক অটুট ছিল। কিন্তু আমরা এতো কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গোটা কর্মজীবনের সমস্ত দিকের উপর আলোকপাত করে তাঁর একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথা যে আমি তুলে ধরতে পারব এমন ভরসা করি না। কেননা আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অন্তত ১৯/২০ বছর আগে বঙ্কিমবাবুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল। সে-সব দিনের কথা জানতে গেলে অন্য অনেক সূত্র থেকে তথ্য ঘেঁটে বার করতে হয়। আসলে বঙ্কিম মুখার্জির জীবন ও সমকালীন রাজনীতি বিষয়ে হয়তো অনায়াসেই একটা রিসার্চ পেপার তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে যাঁরা অধ্যাপনা করেন তাঁরা এ ব্যাপারটি ভেবে দেখলে হয়তো ভাল হয়। বঙ্কিমবাবু যুক্তবঙ্গের আইনসভার একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি লেবার সিটে জয়ী হয়ে আইনসভায় আসন গ্রহণ করেন। এম এল এ হিসাবে তিনি আইনসভার নানা বিতর্কে যখন অংশ নিতেন তখন সেইসব বিবৃতি নিশ্চয় আইন সভার প্রসিডিংস ভল্যুমগুলিতে ছাপা হত। কোনো গবেষক যদি এগুলি দেখেন তা হলে অনেকরকম তথ্য খুঁজে বার করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া ইংরেজ আমলের এবং এমনকি স্বাধীন ভারতের পুলিশ ফাইলগুলিতেও অনেক রকম তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

আমার পক্ষে বঙ্কিমবাবুর পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী রচনা করার অসুবিধা এই যে, ১৯৪০-এর আগেরকার সময়ে বঙ্কিম মুখার্জির রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা আমাকে অন্যের কথার ওপর নির্ভর করে লিখতে হবে। কাজেই এই সময়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার অবকাশে আমি হয়তো কোনো নতুন তথ্য পরিবেশন করতে পারব না। বঙ্কিম মুখার্জি প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি বি এস সি পরীক্ষায় অঙ্কে ভাল ফল করার জন্য মেডেল পেয়েছিলেন। এম এস সি ক্লাসে ভর্তিও হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তার আর কলেজ ইউনিভার্সিটির লেখাপড়া শেষ করা হয়ে ওঠেনি। কেননা তিনি ইতোমধ্যেই তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু রাধারমণ মিত্রের সংস্পর্শে এসে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতির কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের একেবারে প্রথম পর্বে তার কর্মক্ষেত্র ছিল এটোয়া। সেটা বোধ হয় ১৯১৯ কি ১৯২০ সাল। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তখন ধীরে ধীরে গান্ধী যুগের সূচনা হতে চলেছে। বঙ্কিমবাবু ও তার বন্ধু রাধারমণ মিত্র–দু'জনেই গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেসী রাজনীতির সক্রিয় কর্মী হিসাবে এরপর থেকেই বঙ্কিম মুখার্জির পরিচিতি বাড়তে থাকে। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে সে সময় তার সঙ্গে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরু প্রমুখের যোগাযোগ হয়। মতিলালই তাঁকে বাংলায় ফিরে এসে কংগ্রেস স্বরাজ্য পার্টির হয়ে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন। এইভাবে তিনি বাংলায় ফিরে এসে এখানকার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। সারা ভারত ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন বড় নেতা হিসাবে তিনি ধাপে ধাপে উঠতে থাকেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি হন এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত এ আই সি সি-রও সদস্য ছিলেন।

কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতিতে লিপ্ত থেকেও তার মধ্যে বোধ হয় একটা প্রতিবাদী চেতনা অর্থাৎ একটা আলাদা রকমের রাজনীতি করার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। আমি শুনেছি যে এটোয়াতে থাকার সময়েই তিনি মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন এবং মার্কসবাদী সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। পরে কলকাতায় এসে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হলে তাঁর মনের ভিতরকার এই মার্কসবাদী বিশ্বাস আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মার্কসবাদকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগের যুগে বঙ্কিম মুখার্জি যে-সব নানা ধরনের আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন বা যেগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার পূর্ণ তালিকা তৈরি করা সহজসাধ্য নয়। তবে এ কথা তো আজ সবারই জানা যে, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনেই তিনি সবচেয়ে বেশিরকম নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল ও বাউরিয়ার চটকল শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট ও চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করার কাজে তিনি উলেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আবার সারা ভারত কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। সারা ভারত কিষাণ সভার কুমিল্লা অধিবেশনে তিনি যুগ্ম সম্পাদক এবং বিহিটা (বিহার) অধিবেশনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আবার ১৯৪৩ সালে সারা ভারত কিষাণ সভার ভাকনা-কালান (লাহোর) অধিবেশনে তিনিই সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং সেই সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতিও নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে বর্ধমানে দামোদর ক্যানেলের জলকর নিয়ে কৃষক সভার নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়,

সেই আন্দোলনে এবং ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকায় খাস জমির আন্দোলনেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

আগেই বলেছি, স্বাধীনতার আগে কোলিয়ারি লেবার সিট থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন এবং ধীরে ধীরে পরিষদীয় বিতর্ক ও আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা, গরিব মানুষের প্রতি দরদ এবং বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতার জন্য সর্বসাধারনের মধ্যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি যে সময় আইনসভার সদস্য হন তখন ওই সভায় আরও অনেক নামকরা এবং বহু পরিচিত ব্যক্তি এম এল এ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন বাংলার গভর্ণর ছিলেন স্যার জন এন্ডার্সন এবং ফজলুল হক, নলিনী সরকারের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা ও বাগ্মী পুরুষেরা আইনসভার বিতর্ক মাতিয়ে রাখতেন। এই সব দিকপালদের মধ্যে বঙ্কিম মুখার্জির মতো একজন নবীন আগন্তুক যে কীভাবে অনবদ্ধ বাচনভঙ্গির জন্য অল্পদিনের মধ্যেই সকলের খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগে। আমি পরে শুনেছিলাম যে ১৯৩৭ সালের, সম্ভবত ৫ আগস্ট তারিখে নলিনী সরকারের বাজেটের উপর বিতর্কে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা শ্রোতাদের একেবারে মুগ্ধ করে রেখেছিল। এই বক্তৃতায় তিনি সরাসরি অর্থমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেছিলেন যে সংবিধান অনুযায়ী প্রদেশগুলিকে জেলা বোর্ডের বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয় নি এবং অর্থমন্ত্রী যতই ক্ষমতার বড়াই করুন না কেন, তার পক্ষে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বজায় রেখে কোনো বাজেট তৈরি করা সম্ভবই নয়। এই বক্তৃতাটি পড়লে তার বাগ্মিতা এবং ওজস্বিতা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন বলে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য তার কাছে ডাক আসত। তাঁর আর একটা সুবিধা ছিল এই যে, তিনি বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজি- এই চারটি ভাষাতেই অনর্গল বলতে পারতেন। এই জন্য অবাঙালি অর্থাৎ হিন্দি অথবা উর্দুভাষী অধ্যুষিত এলাকায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে পার্টির বিভিন্ন মহল থেকে প্রায়ই অনুরোধ যেত। বঙ্কিমবাবুর কণ্ঠস্বরও ছিল ভরাট। তখনকার দিনে মাইক্রোফোন ব্যবহারের বড় একটা চল ছিল না। কিন্তু তার জলদগম্ভীর স্বরে খালি গলার বক্তৃতাই বেশ কয়েক হাজার শ্রোতার কানে সহজেই পৌঁছে যেত। আমি শুনেছি যে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় তার বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতাকে তারিফ করে সে আমলে অনেকেই নাকি তাঁকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করত। Dictionary of National Biography-তে তাঁর জীবনী লেখক গোপাল হালদার বঙ্কিমবাবুকে বক্তা হিসাবে যে Big artillery বলে অভিহিত করা হত সে কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ কর্মীদের সারা ভারত ধর্মঘটের সমর্থনে গোটা বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়েছিল। স্বাধীনতার আগের যুগের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের ইতিহাসে হিন্দু-মুসালমান ও সকল শ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে এটি চিহ্নিত হয়ে আছে। ধর্মঘটের সমর্থনে ঐদিন কলকাতা ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে যে বিশাল জনসমাবেশ হয়েছিল সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি। তার সেদিনের বক্তৃতাও স্মরণীয় হয়ে আছে। বঙ্কিমবাবুর আর একদিনের বক্তৃতার কথাও এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। সেটা ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রায় সাড়ে ছয় বছর পরের ঘটনা। দক্ষিণ কলকাতার সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে তখন

কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সাধন গুপ্ত বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। এই জয় পার্টি মহলে এবং সাধারণ মানুসের মনে দারুণভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তখন প্রায় দু'হাজার কোটি টাকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছে। বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্টের কাজও চালু হয়ে গিয়েছে। এরই পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার ছবিটিও পরিষ্কারভাবে ফুটে বেরিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পরেও দেশের অর্থনীতিতে তখন অ্যাংলো-আমেরিকান বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর অখণ্ড আধিপত্য বজায় রয়েছে। কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের কাজে হাতই দেওয়া হয়নি এবং অধিকাংশ কৃষকই জমির অভাবে কিংবা সেচ, সার, হালের বলদ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জামের অভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন। এরই মধ্যে বিভেদকামী শক্তির উসকানিতে দেশের পূর্বাঞ্চলে আসামে প্রবাসী বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে হামলা চালানো হচ্ছিল। ভাষা নিয়েও বিরোধ ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের অবস্থা তখন রোজই উত্তরোত্তর সঙ্গীন আকার ধারণ করছে। কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলন তখন তুঙ্গে উঠেছে। ওদিকে অন্ধ্র, মাদ্রাজ এবং কোচিনেও কম-বেশি অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালে নভেম্বর মাসের শেষদিকে আসামের গৌহাটিতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে কলকাতা থেকে পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি হিসাবে ড. রণেন সেন এবং বঙ্কিম মুখার্জি উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে বঙ্কিমবাবুর বক্তৃতায় ভারতীয় রাজনীতির পটভূমিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের দুর্বলতা এবং দেশীয় জমিদার ও পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও ইঙ্গ-আমেরিকান বৃহৎ শিল্পপতি ও মালিকানা গোষ্ঠীর সাথে সেই সরকারের আপসপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল। কলকাতা স্টেট আর্কাইভসের ডিরেক্ট ড. লাডলীমোহন রায়চৌধুরী আমাকে জানিয়েছেন যে এই কনফারেন্সে বঙ্কিমবাবুর দেওয়া দীর্ঘ ভাষণটির একটি সংক্ষিপ্তসার নাকি পুলিসের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একটি ফাইলে সংরক্ষিত আছে। এই ফাইলটির নম্বর ১৪২/১৯২৮ এবং এটি আর্কাইভসে গবেষকদের কাজের জন্য রেখে দেওয়া আছে। এটি পড়লে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার আগে বঙ্কিমবাবু কিরকম নিষ্ঠা নিয়ে আগে থেকেই পড়াশোনা করে যেতেন। তা না হলে বক্তৃতায় ঐরকমভাবে তথ্য হাজির করা বা যুক্তিজাল বিস্তার করা কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। আসল কথা, বঙ্কিমবাবু ভাল বক্তা হলেও তিনি কখনও মেঠো বক্তৃতা দিয়ে লোকের মন জয় করার চেষ্টা করতেন না। তাঁর ভাষণের সারবত্তাই তাঁকে বক্তা হিসাবে বিশিষ্ট করে তুলেছিল।

গৌহাটির ওই প্রাদেশিক সম্মেলনে বঙ্কিম মুখার্জি তার বক্তৃতায় কয়েকটি বিশেষ জরুরি বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের বিচারে আসাম ভারতের একটি সচ্ছল রাজ্য। কিন্তু তবুও সেখানে জমির দখল নিয়ে অসমবাসী এবং বাঙালিদের মধ্যে নিত্য বিরোধ লেগেই আছে। তার কারণ আসামে যে বিপুল পরিমাণ অনাবাদীজমি পড়ে রয়েছে সেগুলি সরকার নিজের দখলেই রেখে দিয়েছে। আসামের চা বাগানগুলিও ইউরোপীয় মালিকদের দখলেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে, সরকার যদি এগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার কবল থেকে ছাড়িয়ে এনে মানুষের মধ্যে বিলি করে দিতে পারে এবং সেই সঙ্গে কৃষির উন্নতির জন্য চাষীর দিকে

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তা হলে আসামের আর্থিক অবস্থা অনেকটাই বদলে যেতে পারে। অথচ কংগ্রেস সরকারের এদিকে মন নেই। বঙ্কিমবাবু বলেছিলেন যে পরাধীন আমলে কংগ্রেস বারেবারেই স্বরাজ স্থাপন করার জন্য মানুষকে একজোট হতে বলেছিল। অথচ স্বাধীনতার প্রায় সাত বছর পরেও সেই বহু ঘোষিত স্বরাজ ও স্বদেশির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদেশের বাণিজ্য, শিল্প, কয়লা ও তেল, খনি, চা বাগিচা প্রভৃতি সব কিছুর উপরেই বিদেশীদের মালিকানা অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় টাকাকে আজ স্টার্লিং ব্যালান্স বা ডলার ও পাউন্ডের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রাখা হয়েছে। দেশের এই করুণ হাল। অথচ জনগণকে প্রতিনিয়ত বোঝানো হচ্ছে যে তারা অলস ও শ্রমবিমুখ এবং এই কারণে দেশের উৎপাদন এবং সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করা যাচ্ছে না। কমিউনিস্ট পার্টি এই বিভ্রান্তিকর প্রচারের অসারতা জনগণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। পার্টি বলতে চায় যে, আসলে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিরাই এ-দেশের প্রকৃত ভাগ্য নিয়ন্তা হিসাবে কাজ করে চলেছে। আর কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার তাদেরই স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী। এদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই কোথাও চিনি, কাপড়, লোহা, চা, পাট প্রভৃতি শিল্পে মন্দা দেখা দিচ্ছে বলে ধুয়ো তুলে মজুরদের বেতন কমিয়ে দিচ্ছে, আবার কোথাও বা সরাসরি ছাঁটাই করে সাধারণ মানুষের রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করে দিতে উদ্যত হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে ইংল্যান্ড বা আমেরিকা আমাদের চা এবং পাট কেনা বন্ধ করে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও চীন এবং রাশিয়ার মতো সমাজতন্ত্রী দেশগুলি ওই একই জিনিস আরও বেশি দামে কিনতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু ভারত সরকার একচেটিয়া পুঁজবাদী শক্তির চাপের মুখে পড়ে সেগুলি চীন ও রাশিয়ার কাছে বিক্রি করতে অস্বীকার করেছে। এই পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারের কাছে বারেবারেই সোচ্চার দাবি জানিয়ে এসেছে। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের পক্ষেও এখন আর সেই নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়ে উঠছে না। বঙ্কিম মুখার্জি এরপর শ্রোতাদের সরাসরি সম্বোধন করে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের চতুর্দিকে এই যে অসহনীয় অবস্থা, এরই জন্য কি ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, কুশল কোঁয়ার বা ভগৎ সিং-এর মতো অগণিত মানুষ শহীদ হয়েছিলেন? তিনি বলেন, স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষে এক দল সাদা চামড়ার পুলিস, ম্যাটিস্ট্রেট, ভাইসরয়ের বদলে কালো চামড়ার লোকেদের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। কংগ্রেস তার সাবেকী স্বদেশী ও স্বরাজের আদর্শ থেকে আজ সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। বক্তৃতার শেষে বঙ্কিম মুখার্জি ভাষা বিরোধের প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যেহেতু ভারত একটি বহু ভাষাভাষী লোকের দেশ, সেই কারণে এখানে প্রতিটি রাজ্যের ভাষাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে, সেখানে উজবেক, লিবিয়ান, সিরিয়ান, ইউক্রেইন প্রভৃতি অনেক ভাষাই চালু আছে। সেখানে ১৬ জন অনুবাদকের সাহায্যে ১৬টি ভাষায় সরকারী কাজ ও নির্দেশনামা ইত্যাদি প্রচার করা হয়। সেখানকার রেডিওতেও ১৬টি ভাষায় বেতার সম্প্রচার করার ব্যবস্থা আছে। কাজেই রাশিয়াতে যে কাজটি সম্ভব করা গিয়েছে, তা ভারতে করতে না পারার কোনো কারণ নেই। আর অসমীয়া স্থানীয় বাসিন্দা ও বাঙালিদের বিরোধের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই বিরোধ আসলে অসম অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তিনি গভীর

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, আসামের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ রাজ্যপাট চালানোর জন্য রাজ্যের অধিবাসীদের অর্থাৎ অসমীয়া জনসাধারণেরই অগ্রগণ্য অধিকার নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভিন রাজ্যের লোকেরা যাঁরা এখানে বসত করেছেন তাঁদের এখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এটা করা যায় না, উচিতও নয়। আর আসামের যে বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য তা ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে শুধু অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে এমন একটা হীন কাজ করার বোধহয় প্রয়োজনও পড়ে না। তিনি বলেন, আসামের অধিবাসীরা তাঁদের অতিথি বৎসলতার জন্য বিখ্যাত। সেখানকার খেটে-খাওয়া গরিব সাধারণ মানুষ অপরের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তবে কিছু স্বার্থান্ধ, একচেটিয়া ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এইরকম হীন ষড়যন্ত্রে প্রতিনিয়ত উসকানি দিয়ে চলেছেন। এদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য বঙ্কিম মুখার্জি সকলকে আহ্বান জানিয়ে সেদিনের সেই দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ ভাষণ শেষ করেছিলেন।

বিধানসভাতে অনেক আলোচনাতেই আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে যোগ দিতাম। তাঁর সঙ্গে দূর-দূরান্তে পার্টি এবং সংগঠনের কাজেও অনেক সময় আমাকে সঙ্গী হতে হত। সে সব কথায় পরে আসছি। তাঁর সঙ্গে সহযাত্রী হওয়ার সুবাদে অনেক রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল। এখানে প্রথমে একটা ঘটনার কথা বলছি। এটি আমি 'শ্রমিক আন্দোলন' পত্রিকার বঙ্কিম মুখার্জি স্মরণ সংখ্যাতেও উল্লেখ করেছিলাম। ঘটনাটি ছিল খুবই মর্মান্তিক। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশের ঢাকায় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির আহ্বানে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্কিমবাবু, স্নেহাংশু (আচার্য) ও আমি যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সভাস্থলে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখি অনেক মানুষ ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে পরিত্রাহি করে ছুটোছুটি করেছেন। সেই সময় তখনকার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখক ও প্রগতি আন্দোলনের তরুণ সংগঠক সোমেন চন্দ শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। এমন সময় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ভাড়াটে গুণ্ডারা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে খুন করে যায়। এই খবর শুনে আমরা স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে পড়ি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সংকল্পে দৃঢ় হয়ে সভার মঞ্চে উপস্থিত হই। আমি ও স্নেহাংশু সেই সভাতে কিছুক্ষণের জন্য বক্তৃতা দিয়েছিলাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবু সেই সভায় বলতে উঠে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটি বলিষ্ঠ ভাষণ দেন। সেদিনের সেই সমাবেশের প্রেস কভারেজ কোথাও যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলে বঙ্কিমবাবুর আর একটি অনবদ্য বক্তৃতার বয়ান সম্পর্কে আজকের যুগের মানুষরা অবহিত হতে পারবেন। আমার আজও মনে আছে যে তাঁর সেদিনের ভাষণ আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। পরের দিন পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী স্নেহাংশু ও আমি মুন্সিগঞ্জের সভায় গিয়েছিলাম। বঙ্কিমবাবুরও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওঁর আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ঢাকার কর্মসূচির জন্য তিনি সেখানেই থেকে গেলেন। স্নেহাংশু এবং বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার প্রায় ১২ বছর পরে আরও একবার দেখা-সাক্ষাতের ঘটনা এখন মনে পড়ছে। সেটা বোধহয় ১৯৫৪ সালের কথা। সম্ভবত ৭ ফেব্রুয়ারি। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল কলকাতায় এসেছিল। দলটি সকালের দিকে ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট হয়ে পরে বেলুড়ে গিয়েছিল। ঐদিনই সন্ধ্যার সময় সোভিয়েত প্রতিনিধিদলকে বিধানসভার হলে রিসেপশন দেওয়া হয়েছিল। সেই সভায় ইজিপসিয়ান কনসাল মি. জাকি উপস্থিত ছিলেন। আর আমাদের মধ্যে ভূপেশ গুপ্ত, মণিকুন্তলা সেন, রেণু

চক্রবর্তী, আবদুল হালিম এবং স্নেহাংশু এবং আমিও হাজির ছিলাম। বঙ্কিমবাবুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। উদয়শঙ্কর এবং অমলাশঙ্করও সেদিনের সভায় নিমন্ত্রিত ছিলেন। এর কয়েকদিন পরে স্নেহাংশুর ২৭ নং বেকার রোডের বাড়িতে সোভিয়েত দলটিকে স্নেহাংশু একটি লাঞ্চ পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ওই ভোজসভায় মুজফ্ফর আহ্‌মদ, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমবাবু সেখানে ছিলেন কি না সে-কথা আমার স্পষ্ট মনে নেই। ১৯৫৩ সালের শেষ দিকের আর একটি ঘটনাও এখন আমার মনে পড়ছে। ২০ ডিসেম্বর সি পি জি বি-এর স্বনামধন্য হ্যারি পলিট কলকাতা এসেছিলেন। তাঁকে দমদম বিমানবন্দরে স্বাগত জানানোর জন্য রণের সেন, গণেশ ঘোষ, মুজফ্ফর আহ্‌মদ প্রমুখের সঙ্গে বঙ্কিমবাবু এবং আমিও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম।

১৯৫৩/৫৪ সালের আরও অনেকদিনের কথা মনে পড়ছে। '৫৩ সালের আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে ১৫০ নং চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ-তে পোদ্দার ছাত্র নিবাসে এ আই টি ইউ সি-এর একটি মিটিং হয়। প্রথমে স্থির হয়েছিল যে মিটিংটি বৌবাজার স্ট্রিটের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু পরে জায়গা বদল হয়েছিল। সভাটি বেলা ৩টে থেকে প্রায় ঘন্টাচারেক পর্যন্ত চলেছিল। পার্টির সেই সময়কার অনেক বড় বড় নেতা ও বক্তা সেই সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ডাঙ্গে এবং মিরাজকরও সেদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বঙ্কিমবাবুও সেদিনকার মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। তবে সভায় তিনি বক্তৃতা করেছিলেন কিনা সে কথা আজ আমি সঠিক মনে করতে পারছি না। এর কিছুদিন পরে ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) তারিখে ৬ নং নেতাজী সুভাষ রোড অর্থাৎ আগেকার ক্লাইভ স্ট্রিটে ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসের সামনে প্রায় ৮/১০ হাজার চটকল শ্রমিকের এক বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। শ্রমিকরা তিন মাসের পূজা বোনাস আদায় করার জন্য সংগঠিত হয়েছিল। প্রধানত আমাদের পার্টিই এই সমাবেশে নেতৃত্ব দিলেও বিনয় চ্যাটার্জির (আর সি পি আই-বিদ্রোহী গোষ্ঠী) মতো পার্টির বাইরের কিছু লোকও এখানে হাজির হয়েছিলেন। আর আমাদের পার্টির ৪ জন বিধায়ক (বঙ্কিম মুখার্জি, গণেশ ঘোষ, ডাঃ রণেন সেন এবং আমি) সহ প্রায় জনা ২০ শীর্ষস্থানীয় নেতা মিছিলটি সংগঠিত করার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। আমার বেশ মনে পড়ে যে সেদিনকার জমায়েতে রণেন সেন এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত উভয়েই ভাষণ দিয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে ওজস্বী বক্তৃতা দিয়েছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি। তার বলিষ্ঠ, সুপুরুষ চেহারা, ভরাট কণ্ঠস্বর, যুক্তি বিন্যাস এবং চিত্ত-চমৎকারী ভাষা দশ হাজার লোকের সেই বিশাল সমাবেশকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

আরও অনেক টুকরো ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজের মাদুরাইয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় তৃতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অধিবেশন চলেছিল ২৭ ডিসেম্বর ('৫৩) থেকে ৩ জানুয়ারি '৫৪ পর্যন্ত। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে জনা পঁচিশ প্রতিনিধি এবং আরও অনেক লোক মাদ্রাজ মেলের দু'টি থার্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করে হাওড়া স্টেশন থেকে ২৩ ডিসেম্বর তারিখে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করি। আসামের অচিন্ত্য ভট্টাচার্য এবং ফণী বোরাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৫৩/১৯৫৪ সালে বছরভর আমি, বঙ্কিমবাবু এবং পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দলের কাজে নানাদিকে ছুটে বেড়িয়েছি। ১৯৫৫ সালেও ছোটাছুটির কোনো কামাই ছিল না। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখে মনুমেন্টের তলায় যে বিশাল কৃষক সমাবেশ হয়েছিল সেই ঘটনার কথা

সহজে ভোলার নয়। এই সমাবেশে হেমন্ত ঘোষাল, প্রভাস রায়, সরোজ মুখার্জি, বঙ্কিমবাবু এবং আমি ও আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমবাবু ছিলেন কিষান সভার নেতা। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই তার বক্তৃতাটি খুব মনোগ্রাহী হয়েছিল। আমার খুব মনে আছে যে, এই সমাবেশে আমরা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য অন্তত দশটি দাবি উত্থাপন করেছিলাম। বঙ্কিমবাবু আমাদের দাবির প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তার বক্তব্য পেশ করেছিলেন। আসলে কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বলার ব্যাপারে বঙ্কিমবাবুর একটা অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি ছিলেন কৃষক ফ্রন্টের একজন সর্বজন পরিচিত নেতা। ভূমিসংস্কার বিষয়ে তাঁর এতটাই গভীর জ্ঞান ছিল যে ভূমিসংস্কার সংশ্লিষ্ট কমিটিতে বঙ্কিমবাবুকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ বিল বিধানসভার সিলেক্ট কমিটিতে যায়। বঙ্কিমবাবু এই কমিটির সদস্য ছিলেন। উনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিনয় চৌধুরীও এই সিলেক্ট কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাও সুবিদিত। একটা কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার বলে মনে করি। কথাটা হল যে, বঙ্কিম মুখার্জিকে আমরা প্রধানত কৃষকসভা এবং শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের নেতা বলেই জানি। কিন্তু এছাড়া আরও কত ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে যে তিনি যুক্ত ছিলেন তা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। একই মানুষ কিষাণ সভা আন্দোলনের নেতা, আবার চটকল মজদুর ইউনিয়নেরও প্রধান পুরুষ। তিনি এ বি টি এ অর্থাৎ শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। আবার ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘট সফল করার কাজেও বিশেষভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন। মেটিয়াবুরুজের দর্জিদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য তিনি যেমন সচেষ্ট, তেমনি পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনেও তিনি অন্যতম পথ প্রদর্শক। হুগলিতে কিষাণ সভা আয়োজিত সমাবেশে তিনি দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার সমালোচনা করার অবকাশে কীভাবে জেলার পরিবেশজনিত ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে সে কথা যেমন নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেন, তেমনি বর্ধমানের চাষীদের কাছ থেকে সরকারের নয়া ফরমান অনুযায়ী বাড়তি সেচকর আদায়ের পরিকল্পনা যে কতদূর অমানবিক সে কথাটিও বুঝিয়ে বলতে অসুবিধা বোধ করেন না। আমার মনে হয় খুব ভালরকম পড়াশোনা না থাকলে এইরকম বিভিন্ন বিষয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত করা যায় না। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে রাজনীতি ও সংগঠনের নেতাদের ভাল রকম গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করাটা একান্তই জরুরি। এই গ্রাউন্ড ওয়ার্কের মধ্যে মানুষের কাছে গিয়ে, তাদের সঙ্গে থেকে যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, তেমনি আবার রীতিমতো লেখাপড়া করে সেই অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধও করতে হয়। বঙ্কিমবাবুর মধ্যে এই দুটো ব্যাপারই সম পরিমাণে ছিল। তিনি মানুষের কাছে থাকতেন। সংগঠনের কাজে অসাধারণ পরিশ্রম করতেন। আবার নিজে ভাল ছাত্র ছিলেন বলে তার পক্ষে পড়াশুনা করে যে কোনো বিষয়ে চট করে ভাবনা-চিন্তা করা বা একটা grip খুঁজে পাওয়া সহজেই সম্ভব হত। রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠক হিসাবে এই জন্যই তিনি এতটা সফল হতে পেরেছিলেন।

পার্টির কাজে দিবারাত্র পরিশ্রম করার জন্যই হোক বা শরীরের ভেতর অজানিত রোগ পুষে রাখার জন্যই হোক বঙ্কিমবাবুর স্বাস্থ্যটা কিন্তু পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই একেবারে ভেঙে পড়েছিল। এই সময়টাতেই তাঁর সঙ্গে আমার পার্টির কাজে ঘন ঘন যোগাযোগ হত। এ সব কথা তো আগেই বলেছি। এই সান্নিধ্যের ফলে বঙ্কিমবাবু তার

ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমাকে মাঝে মাঝে জানাতেন। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ তিনি পুণাতে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। তখন তাঁর শরীরের অবস্থা খুবই শোচনীয়, হার্পিস জাতীয় একটা রোগে তিনি শয্যাশায়ী। সেই রোগের অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। তার উপরে তাঁর বেনারস প্রবাসী মা ও ছেলের মতো প্রায় একই রোগে ক্রমাগত ভুগে চলেছেন। এই রকম সাত-পাঁচ করণে বঙ্কিমবাবুর মনেও কেমন যেন একটা হতাশা দেখা দিয়েছিল। ঠিক এই সময়ে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ পুণার ৫১৭ নম্বর নারায়ণ পীঠ থেকে ৩০ জুলাই ১৯৫৪ তারিখে আমার উদ্দেশ্যে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন। এ সব কথা এখন আমার আর স্পষ্ট মনে নেই। তবে চিঠিখানি গোয়েন্দা পুলিশ পার্ট স্ট্রিট পোস্ট অফিস থেকে হস্তগত অর্থাৎ intercept করে। তারপর সেটা আদৌ আমাকে পরে আর দেওয়া হয়েছিল কিনা তা মনে নেই। তবে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একটি ফাইলে এই চিঠিখানির একটি কপি সংরক্ষিত করা ছিল– যদিও আমার মনে হয় পুলিশের সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টর ভদ্রলোকটি তাড়াহুড়ো করে কপি করতে গিয়ে অনেক জায়গায় ভুলচুক করে ফেলেছিলেন। এখন আমাদের আর্কাইভসের ডিরেক্টর লাডলীমোহনবাবু আমাকে একদিন সেই চিঠিখানির কথা বললেন। আমার খুব কৌতূহল হওয়ায় আমি তার কাছ থেকে চিঠিখানির একটি নকল চেয়ে পাঠাই। চিটিখানি ইংরাজিতে লেখা। সেটির একটি মোটামুটি চলনসই অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।

প্রিয় কমরেড জ্যোতি বসু,

আমি দু'মাস হল এখানে এসেছি। কলকাতা ছাড়ার সময় আমি এখানকার ঠিকানা আপনাকে লিখে দিয়ে এসেছিলাম। আশা করি আমার ব্যাপারে গুরুতর কোনো ঘটনার খবর জানানোর থাকলে আপনি আমাকে জানাতেন। আমার এখন চিঠিপত্র লিখতে বড়ই কষ্ট হয়। সারাটা দিনই আমার পিঠে পুলটিশ আর মলম লাগাতেই কেটে যায়। কিন্তু আমি এখনও সুস্থ হতে পারিনি। শরীরের ক্ষতগুলি যেন চামড়ার সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে আবার চুলকানিও শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে পায়ু এলাকার যেখান থেকে শরীরের সমস্ত নিম্নাঙ্গে এটা ছেয়ে গেছে তার অবস্থাই খুব খারাপ। আমার খুব হতাশ লাগে। মলম আর ইঞ্জেক্‌শনে তো কিছুই হল না। অবশ্য আগের মতো যন্ত্রণার ভাব আর নেই। কিন্তু তবু আমি তো বসতে পারি না। আর ক্ষতস্থানে যদি ঠিকমতো প্রলেপ দেওয়ার কাজে অবহেলা করি তাহলে একদিনের মধ্যেই অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। আসলে চিকিৎসা করেও কিছু উপশম হচ্ছে না।

আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি। মনে হয় অ্যাসেমব্লির অধিবেশন সম্ভবত আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ শুরু হবে। কিন্তু পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বৈঠক যে কবে শুরু হবে সে ব্যাপারে আমি এখনও কোন নোটিশ পাইনি। এটা তাড়াতাড়ি শুরু হয় কি না একটু খোঁজ করে দেখুন এবং তা কবে শুরু হবে আমাকে জানাবেন। অ্যাসেমব্লির অধিবেশনও কবে শুরু হবে আমাকে জানাবেন। আমার মা বেনারসে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। তিনি জনস্টন হার্পিস-এর মতো একটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক রোগে ভুগছেন– (এর রোগে স্নায়ুমণ্ডলীর যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ হয়)। এটা আমি যে রোগে ভুগছি অনেকটা তারই মত। আমি এখনও অবধি তাঁকে দেখতে যেতে পারিনি। আমি নিজে একটা সুস্থ হয়ে উঠলেই কলকাতাতেই ফিরব এবং তারপরে কোন এক সময়ে তাঁকে দেখতে যাব। কাজেই আমি

যদি পুণা থেকে বেনারসেই যাই তাহলে কলকাতায় ফিরতে আমার এক পক্ষকাল সময় লাগতে পারে। সুতরাং আমার কলকাতায় ঠিক কখন পৌঁছানো দরকার তা লিখে জানাবেন।

আশা করি আপনারা সকলেই ভাল আছেন। আমি কেমন যেন সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এমনকি আমাদের নিজেদের কাগজগুলোও হাতে পাই না। আর যেহেতু বাড়ির বাইরে যেতে পারি না সেই কারণে স্থানীয় কমরেডদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারি না। আমি বিগত ১২ বছর ধরে ভুগছি। কে জানে বাকি জীবনটা পঙ্গু হয়ে থাকব কিনা? কলকাতার ডাক্তাররা তো আমাকে সব রকমের দুশ্চিন্তা– এমন কি রাজনীতিও ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সে কারণে আমি তো আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি।

আপনি ও অন্যান্য কমরেডরা আমার শুভেচ্ছা জানবেন।

অভিনন্দন সহ
বঙ্কিম মুখার্জি

আগেই বলেছি যে এই ১৯৫৪ সালের ৩০ জুলাই লেখা হয়েছিল। চিঠির ভাষায় একটা হতাশার সুর প্রকট হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেটা নিতান্তই সাময়িক। আসলে বঙ্কিমবাবু শারীরিক কারণে রাজনীতি ছাড়তে হতে পারে এই চিন্তাতেই খুব বেশি হতাশ বোধ করেছিলেন। কিন্তু রাজনীতি তাঁকে ছাড়তে হয় নি। বঙ্কিমবাবুর চিঠিতে বারো বছর ধরে তাঁর রোগভোগের কথা জানিয়েছেন। বারো বছর কিনা আমার জানা নেই। তবে ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পর তিনি যখন বছরাধিক দমদম জেলে বন্দী থাকার পর মুক্তি লাভ করেন তখনই তাঁর পাইলস, ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগের কথা জানা যায়। পাইলসের যন্ত্রণাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি কাবু করে রেখেছিল। তবু তাই নিয়েই তো তিনি সারাক্ষণ সংগঠনের কাজে মেতে থাকতেন। ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় তাঁকে পার্টির নির্দেশে সোভিয়েত রাশিয়াতে চিকিৎসা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হতে না পারায় তিনি ফের দেশে ফিরে আসেন।

চিঠিতে ক্ষণিকের আবেগে তিনি যা-ই লিখুন না কেন, আমরা বঙ্কিমবাবুর অনমনীয় মনোবল লক্ষ করে আশ্চর্য বোধ করতাম। পারিবারিক জীবনে তাঁর ঝামেলার অবধি ছিল না। মা-এর অসুখ, স্ত্রী চিররুগ্ন এবং অকাল প্রয়াত। নিজের রোগের জ্বালায় অতিষ্ঠ। তবু সে সব উপেক্ষা করে পার্টির কাজে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। পরে তাঁর সম্ভবত ক্যানসার রোগ যখন ধরা পড়ে তখনও তার কাজের উদ্যমে ভাঁটা পড়েনি। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময়ে তিনি রাজনৈতিক কাজের জন্য জীবনে শেষবারের মত কারাবরণ করেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে আবারও সেই রাজনীতির সদা ব্যস্ত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেন। আর তারপর সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা। একদিন মিটিং থেকে ফিরে এসে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতারে ভর্তিও করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু লাভ হয়নি। কয়েকদিন বাদে ১৯৬১ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে প্রায় ৬৫ বছর বয়সে তিনি চলে যান।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

আবদুল হালিম



জন্ম: ৬ ডিসেম্বর ১৯০১। বীরভূম জেলার নানুর থানার শরডাঙ্গা গ্রামে মামার বাড়িতে। বাবা: আবুল হোসেন। অল্প বয়সেই প্রথমে মা এবং পরে বাবাকে হারান।
শিবচন্দ্র হাইস্কুরে নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় চলে আসেন। জাহাজে কাজে যুক্ত হলেও ১৯২১ সালে সেই কাজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন মুজফ্ফর আহ্মদ-এর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে। পার্টি গঠন-এর সময় তার অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা মুজফ্ফর আহ্মদ এবং সরোজ মুখার্জির লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে। কমিউনিস্ট সাংবাদিকতাতেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৩৮ সালে ৪৭ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে চন্দননগরে গোপনে অনুষ্ঠিত রাজ্য দ্বিতীয় সম্মেলন থেকে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পর্টির রাজ্য কমিটির সদস্য হন। পরে ১৯৬৪-তে পার্টি ভাগ হলে তিনি সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য হন।
১৯৬৬ সালের ২৯ এপ্রিল ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইলিয়ট রোডের বাসভবনে তার জীবনাবসান হয়।

আবদুল হালিম–আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের সাথী

মুজফ্ফর আহ্মদ

'কাল বলেছিলে প্রিয়
আমার বিদায় দিবে,
আজ নিলে আপনি বিদায়।'

২৮শে এপ্রিল (১৯৬৬) রাত্রিবেলা আমি দমদম সেন্ট্রাল জেলে পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অফিস হতে সেন্সর হয়ে আসা একখানা পত্র পাই। ২৩ শে এপ্রিল তারিখের এই পত্রখানা ছিল আমাকে লেখা আবদুল হালিমের শেষ পত্র। তাতে সে আমায় জানিয়েছিল যে ১৮ই এপ্রিল রাত্রিবেলা সে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেল হতে মুক্তি পেয়ে বাসায় ফিরেছে এবং "আমরা প্রত্যেক দিনই আপনাদের মুক্তির প্রতীক্ষা করছি।" ২৯শে এপ্রিল (১৯৬৬) সকাল বেলা চা খাওয়ার পরে আমরা দৈনিক খবরের কাগজ পড়া শেষ করেছি, আমাদের কোনো কোনো সহবন্দী স্নান করতে গেছেন, – এমন সময়ে জেল অফিস হতে হঠাৎ বজ্রাঘাতের

মতো দুঃসংবাদ এলো যে আবদুল হালিম আর নেই। সেদিন ভোরে আকস্মিকভাবে তার হৃদয়ের স্পন্দন থেমে গেছে। শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে আবদুল হালিম– আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের কাজের সাথী। আর সে জেগে উঠবে না। আমার মনের অবস্থা কী রকম যে হয়ে গেল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ-অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে। যদিও আমি মুখ খুলে কাউকে কোনো কথা বলিনি তবুও কমরেডরা আমার অবস্থা বুঝলেন। দেখলাম আমাদের তরুণ কমরেড মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন না। সব সময়ে আমার কাছে কাছে থাকছেন। আমার চেয়ে কমপক্ষে বারো বছরের ছোট আবদুল হালিমের মৃত্যু-সংবাদ যে আমায় শুনতে হবে এমন কথা স্বপ্নেও আগে কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি। আমি মরে গেলে আমাকে সমাহিত করার ব্যবস্থা তো হালিমেরই করার কথা ছিল।

জেল কর্তৃপক্ষ আরও খবর দিলেন যে হালিমের মৃতদেহকে শেষ সম্মান জানাতে যাওয়ার জন্যে গর্ভমেন্ট কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ও আমাকে পুলিস হিফাজতে এত ঘণ্টার ছুটি মঞ্জুর করেছেন। বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত পুলিসরা এলেন একখানা ভাঙা গাড়ি নিয়ে। এই গাড়িতে আমরা কোনোরকমে ৩২০-জি, ইলিয়ট রোডে হালিমের বাসা পর্যন্ত গেলাম বটে, কিন্তু গাড়িখানা আর কিছুতেই চলতে রাজি নয়, অথচ বাড়ির গেটে আমাদের অপেক্ষায় থাকা পুলিস অফিসাররা আমাদের জানালেন যে মৃতদেহ ৩৩ নম্বর আলিমুদ্দিন স্ট্রিট কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা যখন আমাদের গার্ডদের বললাম যে অন্তত ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে আমাদের আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে নিয়ে চলুন তখন সাদা পোশাক পরা একজন পুলিশ অফিসার তার প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এলেন, এবং আমাদের তাঁর গাড়িতে যেতে বললেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই আমাদের আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পৌঁছিয়ে দিলেন।

সেই বাড়িটি তখন লোকারণ্য। দোতলায় উঠতে আমার কষ্ট হয়। আমাকে একরকম শূন্যে তুলে ধরেই সকলে দোতলায় নিয়ে গেলেন। হলঘরে হালিমের মৃতুদেহ রাখা হয়েছিল। আমার মনে হল গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মৃত্যুর কোনো চিহ্ন নেই তার চেহারায়। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাঁদের মৃত্যু হয় তাঁদের এই রকমই দেখায়।

আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। মনে হচ্ছিল খানিকটা কেঁদে নিতে পারলে আমার বুকটা কিছু হালকা হতো। এই সময়ে হালিমের মেয়ে তানিয়া ও ছেলে বিপ্লব এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার কান্নার বেগ আমি অতি কষ্টে সংবরণ করলাম। মনে হলো এই হতভাগ্য ছেলে-মেয়ে দু'টির যে অপরিমেয় শোক, তার সঙ্গে কি আর কারুর শোকের তুলনা হয়? কোন্ শৈশবে তারা মাকে হারিয়েছে। তার কথা তাদের ভালো করে মনেও নেই। আবদুল হালিমই ছিল একাধারে তাদের মা ও বাবা দু-ই। কী অনাথই না হল তাদের দু'টিতে সেদিন!

এত দুঃসহ শোকের মধ্যেও আমি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেয়েছিলাম মনে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তাঁদের কর্তব্য সঙ্গে সঙ্গেই স্থির ক'রে ফেলেছিলেন। গত পঁয়তালিশ বছর ধরে আবদুল হালিম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়েছে। তাঁর স্ত্রী অশ্রুকণাও পার্টির সব সময়ের কর্মী ছিলেন। পার্টি নেতৃত্ব এটাই স্থির করেছেন, অশ্রু ও হালিমের ছেলে-মেয়েকে পার্টি একথাই বুঝতে দিবে যে তারা অনাথ নয়। তাদের মা-বাবা যখন পার্টির সর্বক্ষণের

কর্মী ছিলেন তখন ধরতে গেলে পার্টির কোলেই তো তারা মানুষ হয়েছে। অনাথ কেন হতে যাবে তারা?

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পৌঁছে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের ২৯ শে এপ্রিলের ছুটি দু'ঘন্টার – এক ঘন্টার নয়। তা'ছাড়া ৩০ শে এপ্রিল তারিখেও পুলিস হিফাজতে আমাদের আরও তিন ঘণ্টার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। সেদিন হালিমের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হবে।

বীরভূম জেলার কির্নাহারের নিকটবর্তী শরডাঙ্গা গ্রাম আবদুল হালিমের জন্মস্থান। থানার নাম নানুর। চেষ্টা করে হালিমের সঠিক জন্মদিবস পাওয়া গেছে। শরডাঙ্গা গ্রামের জিল্লুর রহমান সাহেব যেদিন জন্মেছিলেন সেদিন আবদুল হালিমও জন্মেছিল। জিল্লুর রহমান সাহেবদের পরিবারে জন্ম-মৃত্যুর পারিবারিক রেজিস্টার রক্ষিত আছে। তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ২০ শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার অপরাহ্ন ২টার সময় জিল্লুর রহমান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তার চার ঘন্টা পরে ওই দিনই ভূমিষ্ট হয়েছিল আবদুল হালিমও। খ্রীষ্টীয় সনের হিসাবে এই তারিখটি ছিল ১৯০১ সালের ৬ই ডিসেম্বর। কাজেই ১৯০৫ সালে হালিমের জন্মাবার কথা যে কাগজে ছাপা হয়েছে তা ভুল।

হালিমদের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জিলার কাটোয়া মহাকুমার অধীন কেউবুড়ি গ্রামে। হালিমের পিতামহ মুন্সী আবদুল বাসেত সেকালের কলকাতা পুলিসের সার্কল ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি স্টিমারে কলকাতা হতে কাটোয়া পর্যন্ত এসে (তখনও রেলপথ হয়নি) ঘোড়ায় চড়ে নিজের গ্রামে যাওয়ার পথে ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে মারা যান। হালিমের পিতা আবুল হুসয়ন সাহেব কেউবুড়ি থাকার সময়েই প্রথম বিয়ে করেন। তাঁর সেই স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে তিনি শরডাঙ্গা গ্রামে ঘরজামাই হয়ে আসেন। হালিমের সব ভাই-বোন এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত। আবুল হুসয়ন সাহেব কির্নাহারের সরকার জমিদারদের ইস্টেটে চাকরি করতেন। হালিমের খুব ছোট বয়সে তার মা মারা যান। তার বাবা যখন মারা গেলেন তখনও তার বয়স বেশি হয়নি।

মাতৃপিতৃহীন আবদুল হালিম ও তার ছোট ভাই আবুল কাসিমের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার পড়েছিল তাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর শামসুদ্দিন হুসয়নের উপরে। তিনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে তিনি বৃত্তি পেয়েছিলেন। আমি সঠিক খবর জানিনা, শুনেছি আই এ পরীক্ষা পাসের পরেও তিনি বৃত্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু ভালো ছাত্র হয়েও তিনি কেন যে বি এ পাস করলেন না তা জানিনে। কেউ কেউ বলেন, ধর্মাবমাননার অপরাধে কলেজ হতে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল। শামসুদ্দিন সাহেব একদিন আমাদের কয়েকজনকে কথায় কথায় বলেছিলেন যে অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট কলেজে তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন। তখনকার দিনের একজন বৃত্তি পাওয়া মুসলিম ছাত্রের প্রেসিডেন্সি কলেজেই তো পড়ার কথা।

শামসুদ্দিন সাহেব টাকি গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে, রামপুরহাট হাই স্কুলে ও কির্নাহারের শিবচন্দ্র হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। শেষোক্ত দু'টি স্কুলে আবদুল হালিমও তাঁর কাছে পড়াশুনা করেছে। শামসুদ্দিন সাহেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও শিক্ষকতা করেছেন। আরও অনেক, অনেক কাজ করেছেন তিনি।

আবদুল হালিমের পাঠ্যজীবনে শিবচন্দ্র হাই স্কুলই শেষ স্কুল। এই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা পাস করে সে নবম শ্রেণীতে সবে উঠেছিল, এই সময়ে জ্যেষ্ঠ সহোদর মামসুদ্দিন হুসয়ন সাহেবের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। পরিবারে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা

তো ছিলই, অন্য কোনো আকষর্ণও ছিল না তার। তাই, জীবিকার সন্ধানে ঘরের বা'র হয়ে সে কলকাতায় এলো। আবদুল হালিম পরে বাঙলা ও ইংরেজি লিখতে শিখেছিল সেটা ছিল অখণ্ড মনোযোগ সহকারে নিজে নিজে তার পুঁথি-পুস্তক অধ্যয়নের ফল। এই অধ্যয়ন ছিল তার নেশার মতো। তার পুস্তক-সংগ্রহ দেখলে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কলকাতায় এসে (এটা ১৯১৮-১৯ সালের কথা) আবদুর হালিম প্রথমে হ্যারিসন লাইনের জাহাজে একটি অস্থায়ী টালি ক্লার্কের কাজ পায়। তার অল্প দিন পরেই অস্থায়ী টালী ক্লার্কেরই কাজ পেল সে এর্লাম্যান সিটিলাইনের জাহাজ কোম্পানিতে। তখন কলকাতার মেসার্স গ্লাডস্টোন ওয়েলি কোম্পানি ছিল এই লাইনের এজেন্ট। এই কোম্পানির অধীনেই ছিল হালিমের চাকরি। সে দু'বছর একাজ করেছিল। কী পরিশ্রমের কাজ যে ছিল এই পুস্তকে মুদ্রিত তার লেখা পড়লেই সকলে তা উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু একই কাজে টাকা রোজগার ভালোই ছিল। চাকরির দু'বছরে হালিম নানা লোককে নানারূপে সাহায্য করেছে। শামসুদ্দিন সাহেবের পরবর্তী তার বড় ভাই আখতার হুসয়নের টেলরিং শপ (দর্জির দোকান) ছিল। ঘর ছেড়ে কলকাতায় আসার সময়ে তিনি তাকে ক'টি টাকা দিয়েছিলেন। চাকরির সময়ে তাঁকেও হালিম কিছু টাকা পাঠিয়েছিল।

দেশে মজুর আন্দোলন আর খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন তুমুল হয়ে উঠেছিল। হালিম ক্রমে ক্রমে এই শেষোক্ত আন্দোলনের দ্বারা এত বেশি আকৃষ্ট হলো যে, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে ভলান্টিয়ারের খাতায় নাম লিখিয়ে আসল। ১০ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন দাশ যখন গ্রেপ্তার হলেন তখন হালিমেরাও বহু সংখ্যক ভলান্টিয়ার ধরা পড়লেন। হালিম ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরার ঘটনার (থানা জ্বালিয়ে পুলিসকে পুড়িয়ে মারার) পরে আন্দোলনের একচ্ছত্র নেতা গান্ধীজী আন্দোলন তুলে নিলেন। ১৯২২ সালের বসন্তকালে জেল হতে মুক্তি পেয়ে অন্য শত শত ভলান্টিয়ারের মতো হাতকাটা শার্ট গায়ে দিয়ে হালিমও ঘুড়ে বেড়াতে লাগল।

কলকাতা, বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রিটের বাড়ির দোতলায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস ছিল আমার একটি আড্ডা। প্রতিদিন আমি ওখানে যেতামই। আবদুল হালিম এখানে সাহিত্য সমিতির পাঠাগারে প্রায় রোজই পড়তে আসত। এখানেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এটা ১৯২২ সালের জুন-জুলাই মাসের কথা। অপরকে নিজের রাজনীতিতে আনার কাজে আমি তখনও তেমন অভিজ্ঞ হইনি। তাছাড়া, টানবো তো তাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথে। তাতেও আমি তখন দড় হয়ে উঠিনি। তবুও আলাপ করছি তার সঙ্গে। এই সময়ে একদিন আমি আমহার্স্ট স্ট্রিট আর মির্জাপুর স্ট্রিটের (এখনকার সূর্যসেন স্ট্রিটের) সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে আবদুর রাজ্জাক খানের সঙ্গে কথা বলছিলাম। হালিম তখন ওইপথে হ্যারিসন রোডের (এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোডের) দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় সে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে গেল। খান সাহেব বললেন, "আমি এই ছেলেটির সঙ্গে খিদিরপুর ক্যাম্প জেলে ছিলাম। ভালোই মনে হয়েছিল ছেলেটিকে। আপনি তার সঙ্গে রাজনীতিক আলোচনা করুন।" আমি খান সাহেবকে জানালাম যে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির পাঠাগারে। যাক, এই পরিচয়ের ভিতর দিয়ে হালিম এলো আমাদের পথে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচারকে, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজকে জীবনের মহান কাজ ব'লে সে গ্রহণ করে নিল। আর কোনোদিন সে

পেছনের দিকে ফিরে তাকায়নি। বিপদ ও কারাবরণ তাকে আপন বিপ্লবী কর্তব্য হতে কোনো দিন তো দূরে সরিয়ে নিতে পারেইনি, অনশন-অর্ধাশনও তাকে দমাতে পারেনি। এখানে অনশন-অর্ধাশন কথার প্রয়োগ শুধু ভাষার উচ্ছ্বাস নয়, সত্য সত্যই আমাদের সেই প্রথম যুগের বহু কর্মীকে অনাহারেও দিন কাটাতে হয়েছে। যাঁরা রটিয়ে বেড়াতেন যে আমরা বলশেভিকদের নিকট হতে সোনা পাচ্ছি তারা যদি একবারটি আমাদের উপোস করা দেখতেন।

আবদুল হালিমের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার আগেও অনেকে আমাদের সঙ্গে আমাদের পথে কাজ করতে এসেছিলেন। পুরো ১৯২২ সাল ও ১৯২৩ সালেরও কয়েক মাস আমরা একত্র থেকেছি, যদিও বিপদের ঝুঁকি বরাবর আমিই নিয়েছি। তাঁদের কথা আমি অন্য জায়গায় বলবো। এখানে আমি শুধু এতটুকু বলবো যে পরে তাঁরা তাঁদের পুরনো পথে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবদুল হালিম যে একবার মার্কসবাদ-লেলিনবাদের পথে এসেছিল সে-পথ সে কোনো দিন ছেড়ে দিয়ে পেছনে ফিরে যায়নি। এটা হচ্ছে আবদুল হালিমের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা।

এক এক সময় প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে আবদুল হালিমের মাথার ওপর দিয়ে। দৃঢ়তার সহিত সে সেই ঝড়ের প্রতিরোধ করেছে। ১৯২২ সাল হতেই পুলিসের নজড় পড়েছিল আমাদের ওপরে। বিদেশ হতে চিঠিপত্র ও নানারকম কাগজ ইত্যাদি আসত ডাকযোগে। নানান পোস্ট অফিস হতে সে সবের অনেকই পুলিশ নিয়ে যেতো। ১৯২৩ সালের মার্চ মাস হতে পুলিস খোলাখুলিভাবে আমায় অনুসরণ করতে লাগল। অনুসরণকারীরা শুধু ওয়াচার কনস্টেবল নয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর নয়, কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব ইন্সপেক্টররাও (যেমন মুরশিদ সাহেব প্রভৃতি) থাকতে লাগলেন ওয়াচারদের সঙ্গে। আমার সব যোগাযোগ সকলের সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। আমি সারাদিন ৭ নম্বর মৌলবী লেনে বন্ধু কুত্বউদ্দিন আহ্মদের বাড়িতে বসে থাকি। এ সময়েও বিপদ অগ্রাহ্য করে হালিম কিছু কিছু যোগাযোগ ঘটিয়ে দিত, কিছু কিছু ডাকও সংগ্রহ ক'রে আনত।

১৯২৩ সালের মে মাসের টিক কত তারিখ ছিল আমার তা' মনে নেই, সম্ভবত ১৭ই মে হবে, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার কীড্ এসে কুত্বদ্দিন সাহেবের বাড়ি হতে আমায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পরে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন (The Bengal State Prisoners Act of 1818) অনুসারে আমি স্টেট প্রিজনার হলাম। আমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, কি করে হালিম দিন কাটাবে? পারবে কি সে টিকে থাকতে তার কাজে?

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কানপুরে আমাদের ক'জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা (কানপুর 'বলশেভিক' ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, ১৯২৪) চালু হলো। হালিম কানপুরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলো এবং মোকদ্দমার কিছু কিছু তদবীরও করলো। আমার মন ধন্য ধন্য করে উঠল। নিদারুণ দুঃখ কষ্টের ভিতরে থেকেও ভেঙ্গে পড়েনি আবদুল হালিম। পার্টির পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে সে।

আমার অনুপস্থিতির সময়ে শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের ও তাঁর দলের লোকেদের সহিত হালিমের পরিচয় হয়েছিল। শুনেছি সান্ন্যাল মশায় টেররিজম ও কমিউনিজমের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একখানা লাল ইশ্তেহার প্রচার করেছিলেন। এর জন্য বন্ধু কুত্বুদ্দিন সাহেব তাকে কিছু আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন। শ্রীসান্ন্যাল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া হালিমের পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তার মার্কসীয় সাহিত্যের অধ্যয়ন তাকে

বাঁচিয়েছে। ইতোমধ্যে সে বেশকিছু মার্কসীয় সাহিত্য পড়ে ফেলেছিল। কলেজ স্কোয়ারের বুক কোম্পানি অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মার্কসীয় সাহিত্যেরও আমদানি করতেন। কুতবদ্দিন সাহেব সেই দোকান থেকে মার্কসীয় সাহিত্য কিনতেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, হালিমের মৃত্যুর পরে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল যে হালিম তার জ্যেষ্ঠ সহোদর শামসুদ্দিন হুসয়ন সাহেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিল। ওপরে হালিমের সঙ্গে আমার পরিচয় ও তার পার্টিতে আসা সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি তা থেকে সকলেই বুঝতে পারবেন যে এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। হালিমের পরিবারে হালিমই প্রথম রাজনীতিতে এসেছিল এবং অসহযোগ আন্দোলনে জেল খেটেছিল। শামসুদ্দিন সাহেব অন্য ধরনের লোক ছিলেন। কংগ্রেসীরা যাকে গঠনমূলক কাজ বলে সেইরকম কাজের দিকেই তার ঝোঁক ছিল। এই জন্যে তিনি কো-অপারেটিভ আন্দোলনের অনারারি প্রচারক হয়েছিলেন। সোস্যাল সার্ভিস লিগেও কাজ নিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে যে তিনি আমাদের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হলেন সেটা ছোট ভাই আবদুল হালিমের প্রভাবে। ১৯২৩ সালে আমার জেলে যাওয়ার আগে এটা ঘটেছিল। ১৯২৫ সালে 'লেবার স্বরাজ পার্টি অফ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' (The Labour Swaraj Par:y of the Indian National congress) নামক পার্টি গঠনের প্রধান উদ্যোক্তাদের একজন ছিলেন শামসুদ্দিন সাহেব। এই পার্টি হতেই কাজী নজরুল ইসলামের পরিচালনায় 'লাঙল' নামক বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকা বা'র হয়েছিল এবং এই পার্টিরই নাম পরিবর্তিত হয়ে পরে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি (Workers and Peasants Party of Bengal) হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ২৯ শে অক্টোবর তারিখে শামসুদ্দিন সাহেব মারা গেছেন। মরবার আগে কমিউনিস্ট মতবাদ তিনি নিশ্চয় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তিনি হননি। বেঁচে থাকলে কমিউনিস্ট পার্টির নিয়মিত সভ্যও যে তিনি হতেন তাতে সন্দেহ নেই।

আবদুল হালিমের সম্বন্ধে ও উনিশ শ'ত্রিশের দশকের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে হলে একচল্লিশ নম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটের কথা উল্লেখ করতেই হবে। ১৯৩১ সালে হালিম বড় শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। খাওয়া জুটুক আর না টুজুক রাত্রিবেলা শোয়ার জন্য খানিকটা স্থানের তো দরকার। হালিম আর তার কয়েকজন সহকর্মীর সেই স্থানই ছিল না। তাঁদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ারো ফুটপাথে রাত্রিবাসের মতো। পার্টির ক'জন মোক্ষক কর্মীর এইরকম দুরবস্থার ফলে পার্টির অস্তিত্বই প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়ল। এই সময়ে তিনজন ছাত্র সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাঁদের দু'জন ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের, আর একজন ছিলেন ইউনিভার্সিটি ল'কলেজের। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র দু'জনের নাম ছিল নূর মুহম্মদ ও অতুলচন্দ্র চন্দ। ল'কলেজের ছাত্রের নাম ছিল হাতিম আলি খান।

৪১ নম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটের (বাড়ির নাম ঢাকা হাউস) সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে ডান পাশের তিনখানা ঘর এই ছাত্ররা ভাড়া নিয়েছিলেন। তার মাঝের কামরাখানা (২৫ নম্বর রুম) তারা হালিমদের ছেড়ে দিলেন। নূর মুহম্মদ ছিলেন শান্তিপুরের এক ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। অতুলচন্দ্র চন্দ বাকেরগঞ্জ জিলার লোক হলেও তার বাবা ছিলেন দিল্লিতে ভারত গবর্নমেন্ট প্রেসের সুপারিন্টেডেন্ট। হাতিম আলি খানও ময়মনসিংহ জেলার এক সম্পন্ন পরিবারের ছেলে ছিলেন। এই তিনজন ছাত্রই মার্কবসাদ-লেনিনবাদ পড়েছিলেন। তার মধ্যে নূর মুহম্মদ ও অতুলচন্দ্র চন্দ বেশি। তারা শুধু হালিমদের ঘরই ছেড়ে দেননি, তাঁদের আর্থিক সাহায্যও করেছেন। মেডিক্যাল ছাত্ররা সাধারণত বাড়ী থেকে বেশি টাকা

পেতেন। নূর মুহম্মদ ও অতুল চন্দ পার্টির অন্য কাজও করতেন। এই ছাত্রদের টাকাতেই হালিমেরা 'মজুর-চাষী' নাম দিয়ে সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করেছিল। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মেনেনজাইটিস রোগে নূর মুহম্মদ মারা যান। তার আগে হাতিম আলি খান পার্টির নিকট হতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তার কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি আর। আজ শুধু ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ডাক্তার অতুলচন্দ্র চন্দ বেঁচে আছেন – মেডিক্যাল কলেজের ডেন্টাল ডিপার্টমেন্টে ভিজিটিং সার্জন। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের অনেকেই ডাক্তার চন্দকে দিয়ে তাঁদের দাঁত পরীক্ষা করিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ভিতরে কম কমরেডই জানেন কিভাবে একসময় ডাক্তার চন্দ ও নূর মুহম্মদ কমিউনিস্ট পার্টিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। একচলিশ নম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটের পঁচিশ নম্বর রুম একসময়ে শুধু আবদুল হালিম প্রভৃতি কমরেডের অবস্থান ছিল না, তা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির অ-বিজ্ঞাপিত অফিসও। আবার হালিমের গণশক্তি পাবলিশিং হাউসের অফিসরূপেও এই পঁচিশ নম্বর কামরাখানা ছিল দেশে-বিদেশে পরিচিত।

কোনো কোনো সংবাদপত্র লিখেছেন যে, বাংলা দেশে আবদুল হালিম কমিউনিস্ট সাংবদিকতার পথিকৃৎ ছিল। আমার মনে হয় তারা ভুল লেখেননি। উনিশ শ' বিশের দশকে 'মজদুর' নাম দিয়ে কুতৃবুদ্দিন আহ্মদ সাহেবের সম্পাদনা ও পরিচালনায় একখানা উর্দু সাপ্তাহিকের কয়েক সংখ্যা মাত্র বার হয়েছিল। ১৯২৫ সারের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বাংলা সাপ্তাহিক 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। খুব বেশি হয়তো নয়, তবুও হালিমের তাতে সহযোগিতা ছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালের মে মাসে আমি যে জেলে গিয়েছিলাম তারপরে তখনও আমি কলকাতায় ফিরে আসিনি। আমি ফিরেছিলাম ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসের ২রা তারিখে। আমার ফেরার পরে 'লাঙলে'র সম্পাদনা ও পরিচালনা ধীরে ধীরে আমার হাতে চলে আসে। তারপরে 'লাঙলে'র নাম বদলে যখন 'গণবাণী' হল তখনও আমি তার সম্পাদনা করি। এই উভয় ক্ষেত্রেই হালিম ছিল আমার নিকটতম সহযোগী। কিন্তু কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার প্রকৃত প্রচেষ্টা চলেছিল উনিশ শ' ত্রিশের দশকে। এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল আবদুল হালিমের। আর কাগজ একখানা তো নয়, অনেকগুলি। 'মজুর-চাষী', 'মার্কসবাদী', 'মার্কসপন্থী' ও 'গণশক্তি' প্রভৃতি কত কি নাম। উনিশ শ' ত্রিশের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কি চেষ্টাই না করেছে আবদুল হালিম।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠকরূপে আবদুল হালিম বারে বারে কারাবরণ করেছে। আদালতে দণ্ডিত হয়ে সে যেমন জেলে গেছে, আবার বিনা বিচারের বন্দীরূপেও তাকে জেলে যেতে হয়েছে। বিচারাধীন ও দন্ডিত বন্দীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত হওয়ার পরেও আবদুল হালিম ও আরও অনেক কমিউনিস্ট তৃতীয় শ্রেণীর দণ্ডিত বন্দীরূপে কয়েদ খেটেছেন। উনিশ শ' ত্রিশের দশকের শেষাশেষিতে হালিম বিনা বিচারের বন্দী থেকেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও সে বিনা বিচারে বন্দী হয়েছে। তখন প্রেসিডেন্সি জেলে অনশন ধর্মঘট করে সে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতারে ট্রান্সফার করায় তার জীবন রক্ষা পায়। তারপরে তাকে হিজলি ডিটেনশন জেলে পাঠানো হয়। ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চের দিন গভীর রাত্রে পুলিশ ৭৪/১ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডের বিরাট বাড়ির চার দিক ঘিরে ফেলে। আমরা অনেকেই তখন সে বাড়িতে থাকতাম। একমাত্র আবদুল হালিমই সেদিন পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে পেছনের দেওয়াল ডিঙিয়ে সরে পড়তে পেরেছিল। ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসেও আবদুল হালিম ডেটেনিউ

(বিনা বিচারে বন্দী) হয়েছিল। আবার ১৯৬৫ সালের ২৯ শে জুলাই তারিখেও ট্রামওয়ে আন্দোলনের কিছু আগে তাকে ডেটেনিউ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। মৃত্যুর দশ দিন আগে মাত্র তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

উনিশ শ' ত্রিশের দশকের শুরু হতেই বিভিন্ন জেলের ও ডিটেনশন ক্যাম্পের সন্ত্রাসবাদী বন্দীরা (দণ্ডিত ও বিনা বিচারে বন্দী উভয়েই) নূতন করে চিন্তা করা আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্য হতে ধার্মিক ভাবটা কমে যায়। তাঁরা মার্কসবাদ-লেলিনবাদের পড়াশুনা আরম্ভ করে দেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার বন্দীদের বিবৃতির প্রভাব যে তাঁদের ওপরে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আবদুল হালিম ও সরোজ মুখার্জি প্রভৃতি কমরেডদেরও কিছু অবদান তাতে ছিল। তাঁরা বারে বারে জেলে গিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আবদুল হালিমের বিশেষ অবদান এই ছিল যে বন্দীশালায় পড়াশোনার ভিতর দিয়ে যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করবেন তাদের সে সংহতি (Communist Consolidattion) ও শৃঙ্খলার ভিতরে নিয়ে এল। বন্দীশালায় পার্টি সভ্যপদ দেওয়া হয়নি, পার্টি ব্রাঞ্চও সেখানে স্থাপন করা হলো না, কিন্তু কমিউনিস্ট সংহতিসমূহের গঠন সেই কাজই দিল। এটা শুধু যে দেশের ভিতরে করা হয়েছিল তা নয়, সাগরপারের আন্দামানেও এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল। বন্দীশালাসমূহের কমিউনিস্ট সংহতিগুলি আমাদের পার্টির সাংগঠনিক জীবনে কমরেড আবদুল হালিমের একটি মহান অবদান। এই অবদানের কথা কখনও ভুলবার নয়।

১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে ২/১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনের দোতলার একটি ফ্ল্যাট হতে ফিলিপ স্প্রাট, অযোধ্যাপ্রসাদ, শামসুল হুদা ও আমি মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে গ্রেপ্তার হই। এটা ছিল ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পেজান্টস পার্টির অফিস। আমরা চলে যাওয়ার পরে এই পার্টির অফিস ওই বাড়ি হতে তুলে নিয়ে যেতে হয়। অনেক কষ্টে হালিম চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত চৌধুরী বিল্ডিংসে (কেন্ডারডাইন লেনের জংশনে) অফিসের জন্য ঘর পেয়ে যায়। ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পেজান্টস পার্টির প্রেসিডেন্ট শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (হাইকোর্টের বিখ্যাত এ্যাডভোকেট) তাকে এই কাজে আর্থিক সাহায্য করেন। শ্রীগুপ্ত হালিমের কাজকে বরাবর প্রশংসার চোখে দেখেছেন। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি তাকে সব সময় সাহায্য করেছেন।

উনিশ শ' ত্রিশের দশকে জেলের বাইরে থাকলে হালিমকে বরাবর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং তাকে কাজ করতে হয়েছে নানান রকম প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও যাতায়াতের ভাড়ার যোগাড় হলেও সময় করতে পারলে সে মীরাটে ছুটে গেছে আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। একবার তো আমরা দু'মাসের বেশি সময় মীরাটে তাকে রেখেও দিয়েছিলাম। তখন আদালতে আমাদের বিবৃতি দেওয়া শুরু হয়েছিল। ইউনাইটের প্রেস তাঁদের রিপোর্টার তুলে নিয়েছিলেন। আর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টার যিনি ছিলেন রয়টারের ভারও তার ওপরে ছিল। তিনি পলিটিক্যাল রিপোর্টিং করতে পারতেন না। কোনো কোনো সময় আমাদের নিজেদের লোক রাখতে হয়েছিল। একাজে বোম্বের যে দু'জন কমরেড ছিলেন তারা যখন একে একে চলে গেলেন তখন হালিম ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের নিদর্শন পত্রধারী রিপোর্টার নিযুক্ত হয়ে এলো। মীরাট হতেই সে সোজাসুজি নানাদিকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিত। আমাদের তো জানা থাকত কোন দিন কি বিবৃতি হবে। তাই আগে হতেই আমরা জেলের ভিতরে বসে রিপোর্ট তৈরি

করে রাখতাম। আমাদের নিকটে টাইপ রাইটার ছিল। এই বিশেষ ব্যবস্থা আমরা আমাদের জেনারেল স্টেটমেন্টের (General Statement) ব্যাপারে করেছিলাম।

সেশন্‌স্ জজ্ মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রায় (Judgement) লেখার জন্য পাঁচ মাস সময় নিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে তিনি তার রায় শোনালেন। সে দিন নানাস্থান হতে আমাদের কিছু কিছু বন্ধু কোর্টে এসেছিলেন। হালিমও এসেছিল সেদিন কলকাতা হতে। সকলে যা ভেবেছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি সাজা আমাদের দিলেন জজ্। আমার হল চরম সাজা – যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তি পেলেন। তার সঙ্গে আমার কোনোদিন রাজনৈতিক মতৈক্য ছিল না। আমার চরম সাজায় তিনিও সেদিন খানিকটা বিচলিত হয়েছিলেন। নিকটে এসে আমাকে সালাম করলেন তিনি। হালিমের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার চরম সাজার জন্য তো বটেই একসঙ্গে তার এতসব সহকর্মীর লম্বা লম্বা সাজাও তখন তার নিকটে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তাই সে নিজেকে সামলাতে পারে নি।

এলাহাবাদেও সে আমাদের আপিলের সময়ে ছুটাছুটি করেছে।

এই আবদুল হালিম আর নেই। মাত্র চৌষট্টি বছর বয়সে সে আমাদের ছেড়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবি আমরা কতটা জেনেছিলেম তাকে। তার আকস্মিক মৃত্যুতে আমাদের পার্টি সভ্যরা শোকাভিভূত হয়েছিলেন। সম্মান জানিয়েছেন তাঁরা তার মৃতদেহকে। কিন্তু তাঁরাও কি হালিমকে পুরোপুরি চিনেছিলেন? গত পঁয়তালিশ বছর ধরে সে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য তিলে তিলে আত্মদান করে গেছে, পার্টির বাইরে সে যে নিজের কোনই অস্তিত্ব রাখেনি, – তার স্ত্রীকে সে পার্টিতে এনেছিল, তার সন্তানদেরও যে পার্টির বাইরে কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, এসব যদি আমাদের পার্টি সভ্যরা উপলব্ধি ক'রে থাকেন তবে অন্তত আমার মনে আর কোনো খেদ থাকবে না।

আবদুল হালিম কখনও আত্মপ্রচার করত না। তা সত্ত্বেও একজন ত্যাগী রাজনীতিক কর্মীরূপে পার্টির বাইরের লোকেরাও তাকে জেনেছিলেন ও ভালোবেসেছিলেন। শত শত লোক এসে যে নীরবে তার মৃতদেহের প্রতি সম্মান জানিয়ে গেলেন, তার শববাহী মিছিলে যে আরও বেশি লোক যোগ দিলেন তা থেকে বোঝা গেছে যে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নন তারাও ভালোবাসতেন হালিমকে।

[১৯৬৬ সালের ৫ জুলাই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এই লেখাটি লেখেন য প্রথমে গণশক্তিতে ও পরে বিভিন্ন পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে। এই লেখাটির ক্ষেত্রে বানান অপরিবর্তিত রাখা হল। –সম্পাদক (তন্ময় ভট্টাচার্য)]

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল



জন্ম: ১০ জুন, ১৯০৩। বর্ধমান জেলার মেমারি থানার সলদা গ্রামে মামাবাড়িতে। বাবা: আবদুল কাদের, মা: সুফিয়া খাতুন। পৈত্রিক বাড়ি ছিল মেমারি থানার কেজা গ্রামে।

স্কুল শিক্ষা মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে। স্কুল শিক্ষা শেষ হওয়ার পরেই তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। সত্যাগ্রহী হিসাবে তিনি ১৯২১-২৩ সালে বর্ধমান জেলা খিলাফৎ কমিটির সম্পাদক হিসাবে তিনি কাজ করেন। ১৯২২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তিনি সদস্য হন। রাজ্য খিলাফৎ কমিটিরও কর্ম পরিষদে ছিলেন। ওই বছর উত্তরবঙ্গে আত্রেয়ী নদীর বন্যায় দুর্গতদের সাহায্য করতে তিনি ত্রাণকর্মী হিসাবে যান।

ঐশ্লামিক ইতিহাস, কমপারেটিভ রিলিজিয়ন ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করতে ১৯২৬-২৯ কাল তিনি কাটান লাহোরে। সেখানে তিনি সামাজিক ধর্মীয় ইংরাজি সাপ্তাহিক 'দি লাইট' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কলকাতায় ফিরে বাংলা সাপ্তাহিক 'খাদেম' ইংরাজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান'-এ কাজ করেন। 'দি মুসলমান' পরে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার তিনি কলকাতার সংবাদদাতা ছিলেন। এই সময়ে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনেও অংশ নেন এবং ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার হন। তিনি এবং তার কয়েক বন্ধু মিলে প্রকাশ করেন ইংরাজি সাপ্তাহিক দি কমরেড (১৯৩৭-৩৯)। এটি ছিল বামপন্থী জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। মার্কসবাদী-ভাবাদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এ বছর থেকেই তিনি সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে পার্টি জীবন শুরু করেন। কৃষকদের মধ্যে কাজ করাকেই তিনি প্রধান কাজ হিসাবে বেছে নেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁকে কো-অপ্ট করা হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদশিক কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। যুদ্ধের সময় (১৯৪০-৪১) তিনি সারা ভারত কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক হন। রাজ্য ও কেন্দ্রে কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করার অসুবিধা বলে তিনি ১৯৪১ সালের অক্টোবরে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

পার্টি যখন নিষিদ্ধ ছিল, তখন ১৯৪০-৪২ সালে দু'বছর কমরেড আবদুল্লাহ্ রসুল আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহাত হলে তিনি কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে ময়মনসিংহে পার্টির

বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪০ সাল থেকে বোম্বাই সরকার তার ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। তারই ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। একমাস পর তিনি ময়মনসিংহ্ জেল থেকে মুক্তি পান।

১৯৪৬-৪৭ সালে কৃষকসভার পরিচালিত তেভাগা আন্দোলনে সহায়তা করতে তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সফর করেন।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর তিনি বার্মার কৃষক সম্মেলনে যোগ দিতে রেঙ্গুন যান। তিনি যখন বার্মায়, তখন পশ্চিববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয় (১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ)। তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। বার্মার কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভার বিরুদ্ধে বার্মা সরকার তখন ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। ফলে কলকাতায় আসতে না পেরে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রাম চলে যান। সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ফলে সেখানে তিনি আত্মগোপনে চলে যান এবং গোপনে কলকাতায় এসে আত্মগোপনে কাজ শুরু করেন।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ২৪ পরগনার সুন্দরবনে যান, সেখানে কৃষক আন্দোলন গড়ার কাজ করেন।

১৯৫১ সালে আত্মগোপন অবস্থায় গ্রেপ্তার হন ভারতরক্ষা আইনে। ১৯৫২-র মে মাসে মুক্তি পান।

১৯৫৯-এ খাদ্য আন্দোলনের সময় আবার গ্রেপ্তার হন। কিছুদিন পর মুক্তি পান। ১৯৬৪-তে পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের পর প্রমোদ দাশগুপ্ত জেলে থাকার সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গ কমিটির কার্যকরী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।

১৯৬০ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পরিবহনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে বিধান পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর ১৯৭০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ওই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। এরপর কৃষকসভার কাজে আত্মনিয়োগ করতে মন্ত্রিসভা ছেড়ে দেন।

১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে বিজয়ওয়াদাতে পার্টির একাদশ কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। অসুস্থার জন্য ত্রিবান্দ্রম কংগ্রেস থেকে অব্যাহতি নেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'কৃষকসভার ইতিহাস', 'কমিউনিজম কাহাকে বলে', 'মার্কসীয় অর্থবিজ্ঞান', 'সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী', 'নীল বিদ্রোহের অমর কাহিনী', 'সংস্কৃতির কথা'। তাছাড়া আছে উপন্যাস 'আবাদ' এবং 'শহর থেকে গ্রামে'।

১৯৯১ সালের ২১ নভেম্বর তার জীবনাবসান হয়।

কমিউনিস্ট আচার আচরনের আদর্শ দৃষ্টান্ত

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি, সি পি আই (এম)

বর্ধমান জেলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিগত শতাব্দীতে যে চেতনার আলোড়ন জেগেছিল তারই মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতে কে মল্লিক (মুনশী আহম্মদ কাসেম), খেলাধূলায় সাদাম খাঁ এবং রাজনীতি-সমাজনীতিতে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্ব।

বাল্য ও কৈশোরে বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো ধর্মচর্চা, রোজা-নামাজ ও ধর্মশিক্ষা, দেশপ্রেমের টানে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ, নিজে ও নিজেদের জানার আকণ্ঠ পিপাসায় সুদূর লাহোরে পাড়ি দিয়ে ইসলামিক ইতিহাস ও ধর্মশিক্ষা নিয়ে মৌলানা পাস ও মুসলিম আহমদী গোষ্ঠীর পত্রিকা সম্পাদনা, সমাজনীতি-সংস্কৃতি-ইতিহাস-সাহিত্য-রাজনীতি সম্বন্ধে বই-পুস্তক পাঠ, নিয়মিত লেখার অভ্যাস এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যুক্তিবাদী বিশ্লেষণে ধর্মের আঙ্গিনা পার হয়ে আবদুল্লাহ্ রসুল বস্তুবাদী দর্শনের পথ বেছে নিয়ে হয়েছিলেন একজন কমিউনিস্ট এবং নেতা – বিশেষভাবে কৃষক আন্দোলনের নেতা। স্বাধীনতার পূর্ব ভারত ও যুক্ত বাংলা এবং পরবর্তীকালের পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের কৃষক আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক। কৃষকসভার জন্মকাল থেকে শুরু করে সারাটা জীবন তিনি কৃষক আন্দোলন ও কৃষকদের মধ্যে কাজ করে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে সারা ভারত কৃষকসভা এবং যুক্ত বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে কৃষক আন্দোলনকে পুষ্ট করেছেন। সংগ্রাম, সংগঠন, সংস্কৃতি, নির্বাচন এবং সর্বোপরি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ– আত্মশিক্ষা ও প্রয়োগ এ দু'য়ের সমন্বয় করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদের মৌলিক শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত পার্টি এবং কৃষক আন্দোলনই ছিল আবদুল্লাহ্ রসুলের সারা জীবনের ধ্যানজ্ঞান। সেইসঙ্গে এক সাংস্কৃতিক জগত।

ছোটবেলা ও বাল্যকাল

মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুলের জন্ম হয়েছির বর্ধমান জেলার মেমারি থানার সলদা গ্রামে নিজের মাতুলালয়ে – পৈত্রিক বাড়ি এই থানারই আর এক গ্রাম কেজা। ছোট মামা মৌলানা ওসমান গনি সাহেবের কাছেই প্রথম ধর্মশিক্ষা। ওসমান গনি ছিলেন ধার্মিক ব্যক্তি, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ১৯০৩ সালের ১০ জুন তাঁর জন্ম। পিতা আবদুল কাদের ও মা সুফিয়া খাতুন। মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত স্কুলপাঠ্য শেষ করেন। তারপর মেমারির দেবীপুরের কাছে শোভনা গ্রামে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার সময়েই কলকাতায় এ জি বেঙ্গলের অফিসে সরকারি চাকরিতে ঢোকেন। এ চাকরি অবশ্য তাঁর বেশিদিন করা হয় নি।

ছোটবেলা থেকেই মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুলের ছিল লেখার অভ্যাস। তখনকার সুপরিচিত বাংলা পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'-র ১৩৩১ সনের মাঘ (১৯২৪) সংখ্যায় 'পরলোক প্রসঙ্গে ইসলাম' শিরোনামে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১ বছর। ধর্মচর্চা ও ধর্মশিক্ষায় কিশোর বয়সে নিষ্ঠা ও আগ্রহ থাকলেও কেজার পৈত্রিক বাড়িতে কখনোই একপেশে মনোভাব বা বাধ্যবাধকতা ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলনে আবদুল্লাহ রসুল

কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল অসহযোগ, পরাধীন ভারতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন। অসহযোগের প্রশ্নটি প্রথম উঠেছিল 'খিলাফত' কমিটি ও জমিয়তুল উলামা-ই-হিন্দ থেকে। দেরিতে হলেও জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগী আন্দোলনের কথা ঘোষণা করায় গোটা দেশে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয়। ১৯২১ সালের গোড়া থেকে প্রায় সারা বছর কংগ্রেস ও

খিলাফত কমিটির নেতৃত্বে ব্যাপক প্রচারের ফলে আন্দোলন ক্রমেই দানা বেঁধে ওঠে। গান্ধিজী ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা করতে আসেন। আবদুল্লাহ্ রসুলের অগ্রজ ওহাজুর রসুল প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। অন্য কিছু ছাত্রের সঙ্গে তিনিও আন্দোলনের ডাকে কলেজ বর্জন করে বেরিয়ে আসেন। রসুল সাহেব ও তার দাদা গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে গান্ধিজীর সভায় যোগ দেন। ক'মাস পরেই পান সরকারি চাকরি। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি ও তার অগ্রজ ওহাজুর রসুল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার বরণ করেন। তাঁদের এক মাসের কারাদণ্ড হয়।

জেল থেকে বেরিয়ে মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল বর্ধমানে গিয়ে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির জেলা অফিসে যোগাযোগ করেন। তখনো জেল ভরো আন্দোলন চলছে। কোথাও কোথাও ক্ষোভে-বিক্ষোভে জঙ্গী রূপ নেবার লক্ষণ।

উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরা থানার পুলিশ জমিদার-বিরোধী আন্দোলনের দায়ে কৃষকদের নানাভাবে হয়রান-উৎপীড়ন করত। কৃষক মিছিলের ওপর পুলিশ অযথা হামলা চালালে কৃষক জনগণের ক্ষোভ ও রোষ বিস্ফোরিত হয়। ক্ষিপ্ত কৃষক জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে দিলে কয়েকজন পুলিস কর্মীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়েই গান্ধিজী ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকে হিংসার অজুহাতে দেশের আইন-অমান্য আন্দোলনই বন্ধ করে দেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইমারত গড়ে উঠেছিল তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আবদুল্লাহ্ রসুল ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বর্ধমানে জেলা খিলাফত কমিটির কাজে যোগ দিয়ে সহকারি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও কয়েক মাস পরে তাঁকেই সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই বছরেই রসুল সাহেব বর্ধমান জেলা থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ধর্মাচরণ ও ধর্মশিক্ষার সাথে সাথে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তরবঙ্গের আত্রেই নদীতে বিধ্বংসী বন্যায় বগুড়া জেলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে বর্ধমান জেলা খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে অর্থ ও চাল সংগ্রহ করে রসুল সাহেব দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং সান্তাহারকে কেন্দ্র করে ত্রাণের কাজ পরিচালনা করেন।

জাতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার এবং খিলাফত আন্দোলনের বাস্তবতা না থাকায় তখন রাজনীতিতে এক ছত্রভঙ্গ অবস্থা। আবদুল্লাহ্ রাসুল বর্ধমান জেলা খিলাফত কমিটির সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়ে ছোট এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সেখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হত। বর্ধমান জেলায় লোকাল বোর্ড নির্বাচন হয় ১৯২৪ সালে। এই সময়েই স্বরাজ পার্টির হয়ে মেমারিতে তিনি নির্বাচনী সংগ্রামে অংশ নেন।

ধর্মশিক্ষার আগ্রহ

মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল তার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণায় বলেছেন, রাজনৈতিক প্রচারের কাজে বিধার জন্য ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে লাহোরের পথে যাত্রা করেন। এর থেকেই বোঝা যায়, ইতিমধ্যেই তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে ভবিষ্যতে তাঁর করণীয় ঠিক করে ফেলেছেন। সেখানে আহমদিয়া

আনজুমানে যোগ দেন। নিজের ভরণপোষণের ব্যয় ও একই সঙ্গে শিক্ষার জন্য লাহোরের আহমদিয়া মিশনের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'দি লাইট' পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ নেন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁর লাহোরে কাটে। সেখানে ইসলাম ধর্মের মূল নীতিগুলির গণ্ডীর মধ্যে যতটা সম্ভব উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদী আলোচনার সুযোগ পান। ক্লাসে শিক্ষালাভের জন্য আরবি ও উর্দু ভাষা আয়ত্ব করতে হয়। একই সঙ্গে নিজের আগ্রহে তুলনামূলক ধর্ম এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস পাঠ করেন। এখানেই প্রখ্যাত উর্দু কবি ইকবালের সঙ্গে তার পরিচয় হয়।

লাহোরে প্রাতঃভ্রমণের ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ভ্রমণে বার হতেন। আবদুল্লাহ্ রাসুল আহমদিয়া মিশনের প্রধান নেতা মওলানা মুহম্মদ আলির সঙ্গে ভোরের নামাজের পরেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতেন। পথে একে একে জড়ো হয়ে দল বেঁধে হাঁটতেন। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান ধর্মের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নানান আলোচনা শুনতেন। হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কথা সেখানে উঠলেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সুস্থ চিন্তার প্রকাশ ঘটত। বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জানার জন্য বই-পুস্তক সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতেন। এই সময়েই সোস্যালিজম ও কমিউনিজম সম্বন্ধে আলোচনার কিছু বই পাঠ করেন। লন্ডনের সাপ্তাহিক 'দি থিংকার'-এ লেনিনের মেটিরিয়ালিজম এ্যান্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত তার নজরে আসার পর নতুন ভাবনার অবকাশ আসে। লাহোরে আহমদিয়া মিশন থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসেন। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

ভিন্ন পরিবেশন

লাহোর থেকে কলকাতার পরিবেশ ছিল অনেকটাই ভিন্ন। এখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য ছিল। মার্কসবাদের চর্চা ইতিমধ্যেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল এবং ক্রমেই বেড়ে চলছিল। রসুল মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি এবং সর্বোপরি মার্কসবাদ।

কলকাতায় ফিরে প্রথমে জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেস সমর্থক সাপ্তাহিক 'খাদেম' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ নিলেন। লাহোর কংগ্রেসে (১৯৩০) পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এবং ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রস্তাব গ্রহণের পর কংগ্রেসের প্রতি দেশের জনগনের আস্থা বৃদ্ধি পায়। এদিকে, আর্থিক অনটনে 'খাদেম' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে কিছুদিন বেকার থাকার পর আবদুল্লাহ্ রসুল বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট ইংরেজি দৈনিক 'বম্বে ক্রনিকর' কাগজের কলকাতার সংবাদদাতার কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়েই মৌলানা মুহম্মদ আলির উর্দুতে লেখা হযরৎ মুহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী বাংলায় অনুবাদ করে 'মহানবী মুহম্মদ' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

বরিশালে জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩১ সালের মে মাসে। এই উপলক্ষে জেলার মুসলিম যুব সংগঠনে সভাপতিত্ব করার জন্য আবদুল্লাহ্ রসুল নিমন্ত্রিত হন। সভাপতি হিসাবে তার লিখিত অভিভাষনে রসুল সাহেব জাতীয় মুক্তির জন্য যুবকদের কর্তব্য ছাড়াও রুশ দেশের অক্টোবর বিপ্লব, স্টালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অশিক্ষা-অজ্ঞানতা-কুসংস্কার-পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি তুলে

ধরে সমাজ সংস্কারের আহ্বান জানান। উভয় সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে যে এর প্রভাব পড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লন্ডনে গান্ধী-আরউইন বৈঠকের ব্যর্থতার পর ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে দেশে আবার আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে আবদুল্লাহ্ রসুল এপ্রিল মাসে গ্রেপ্তার হয়ে ছ'মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেলে বসেই তিনি কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ড পাঠ করেন।

জেল থেকে বার হয়ে 'মুসলমান' পত্রিকায় যোগ দেন এবং 'বম্বে ক্রনিকল' কাগজের কলকাতার সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে সারা ভারত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক শাখার খসড়া প্রস্তাব রচনায় আবদুল্লাহ্ রসুল ছিলেন অন্যতম।

কমিউনিস্ট পার্টিতে

বর্ধমান জেলার সঙ্গে আবদুল্লাহ্ রসুলের যোগাযোগ চিরকালই ছিল। বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি গঠিত হলে তার প্রথম সম্পাদক হন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্। তিনি তখন কলকাতায় কলেজের ছাত্র, নানা বিষয়ে পড়াশুনা করতে অভ্যস্ত। বেশ কিছুকাল আবদুল্লাহ্ রসুল তার সঙ্গে একই বাসায় থাকতেন। শাহেদুল্লাহ্ সাহেব বার বার আবদুল্লাহ্ রসুলকে পার্টিতে আসার কথা বললেও ব্যবহারিক কারণে রসুল সাহেব পার্টি সভ্যপদ নিতে আপত্তি জানান। যদিও নীতিগত ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান এবং প্রধান কাজ হিসাবে কৃষক আন্দোলনে নিজেকে নিয়োগ করার কথা আগেই স্থির করে ফেলেছিলেন।

নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ ভোটের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি বছরখানেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। মুহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে নবপর্যায়ে মুসলিম লীগ দানা বেঁধে উঠছে। লীগের বাইরে কয়েকজন আধা-উদারপন্থী মুসলিম ব্যক্তিত্ব কলকাতায় 'মুসলিম মজলিস' নামে ছোট এক দল গঠন করে সাপ্তাহিক 'মুসলমান' পত্রিকাটিকে মুখপত্র করে মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুলকে তার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

ইতিমধ্যেই সারা ভারত কৃষকসভা এবং বাংলায় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠিত হলে বিভিন্ন জেলায় কৃষক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। আবদুল্লাহ্ রসুল চব্বিশ পরগনা জেলায় কৃষক সংগঠনের কাজে যোগদান করেন।

১৯৩৬ সালের শেষবাগে আবদুল্লাহ্ রসুল 'মুসলমান' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ সহ কয়েকজন মিলে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে 'কমরেড' নামে এক নতুন সাপ্তাহিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক হয়, এই পত্রিকার নীতি হবে বাম কংগ্রেসী, তবে মার্কসবাদের পক্ষেও কিছু কিছু প্রচার করা হবে। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সাপ্তাহিক 'কমরেড' কংগ্রেস সমর্থক হলেও এই মন্ত্রিসভার জনমুখী ব্যবস্থাগুলির প্রতি সমর্থন জানায় এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে যায়। সেই সময়ে ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' সাপ্তাহিকের সঙ্গে আবদুল্লাহ্ রসুলদের 'কমরেড' পত্রিকার যোগাযোগ ও বিনিময় ছিল।

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে চলছিল। ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলায় বামপন্থী শক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটছিল। আত্মদানে নিবেদিত বাংলার অনেক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণী আন্দোলনকে যুক্ত করতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনে নিজেদের নিয়োগ করেছেন। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল ঠিক করলেন, সাপ্তাহিক 'কমরেড' থেকে ইস্তফা দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে হবে। পার্টিতে তার প্রধান কাজ হবে কৃষক আন্দোলন ও কৃষকসভা। মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল ১৯৩৮ সালের মে মাসে পার্টির বে-আইনি অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং সেই বছরই ডিসেম্বরে হুগলি জেলার বড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার দ্বিতীয় সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রথম সম্মেলনেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পর্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হয়েছিলেন ১৯৩৯ সালে। এরপর সারা জীবন তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল পার্টি ও কৃষক আন্দোলন।

কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনে

যুক্ত বাংলা এবং পরে পশ্চিমবাংলারই শুধু নয়, আবদুল্লাহ্ রসুল ক্রমেই হয়ে ওঠেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃত কৃষক নেতা। ১৯৪০-৪১ সালে তিনি সারাভারত কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাজ্য ও কেন্দ্রে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করার অসুবিধা হলে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন সারাভারত কৃষকসভার সহ-সভাপতি।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষকসভা ও সংগঠিত কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ্ রসুল যুক্ত বাংলার তেভাগা আন্দোলন, ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে জমির আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং সত্তরের দশকে খেতমজুর আন্দোলন গড়ে তোলায় তাঁর অবদান রেখে গেছেন। খেতমজুর আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নিদারুণ সমবেদনা ও সহানুভূতি নিয়ে তখনকার খেতমজুরদের জীবন সম্বন্ধে তিনি বলতেন– 'ওরা বেঁচে আছে, মরেনি বলেই'।

প্রাক্-স্বাধীনতা কালে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করতে ১৯৪৬-৪৭ সালে জেলায় জেলায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সফর করেন। তেভাগা আন্দোলনের 'শহীদ-তীর্থ' খাঁপুর। দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের গ্রাম খাঁপুর। ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নেতাদের গ্রেপ্তার করতে আসা পুলিশের গুলিতে খাঁপুরে ২২ জন কৃষক নরনারী শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে আবদুলাহ্ রসুল পিপ্‌লস রিলিফ কমিটির ডাক্তার বিজয় বসু এবং সাংবাদিক রমেন ব্যানার্জিকে সঙ্গে নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে খাঁপুর রওনা দেন। বালুরঘাট শহর থেকে পরদিন সকালে মোষের গাড়িতে খাঁপুর যাবার সময় পুলিস পথরোধ করে তাঁদের তিনজনকেই ৬০ দিনের জন্য জেলা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৫২ সালের মে-জুন মাসে চব্বিশ পরগনার ক্যানিং থানার কুমারশা গ্রামে। ছত্রভঙ্গ-প্রায় অবস্থায় আবদুল্লাহ্ রসুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং তখন থেকে একবছর বাদ দিয়ে ১৯৬০ সালের এপ্রিলে কাকদ্বীপ সম্মেলন পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক। ভাগচাষী উচ্ছেদ

বিরোধী সংগ্রাম, কৃষক জনগণের ছোট বড় সমস্যা, ত্রাণ এবং বছর বছর খাদ্য আন্দোলনের তিনি ছিলেন নেতা ও সংগঠন। ষাটের দশকের শেষভাগে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়কালে, বিশেষ করে ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে তীব্রতর হয়ে ওঠা জমির আন্দোলন চলাকালে গোটা সময়কাল জুড়ে রাজ্যের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার যখন কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চলেছেন, আপাত শান্ত, প্রচার-বিমুখ মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল প্রাদেশিক কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

যুদ্ধের সময় চলিশের দশকের শুরু থেকেই আবদুল্লাহ্ রসুল কৃষক আন্দোলনে ও কৃষকসভার সর্বভারতীয় নেতৃত্বে উঠে আসেন। ১৯৪৭ সালের মে মাসে সারাভারত কৃষকসভার দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলার সেকেন্দ্রারাও-এ। আবদুল্লাহ্ রসুল এই সম্মেলনে সারাভারত কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আবদুল্লাহ রসুল প্রয়াত হবার পর তৎকালীন রাজ্য কমিটির সম্পাদক শৈলেন দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, রসুল সাহেব সম্বন্ধে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বলতেন, 'ওঁর খড়মে চাকা লাগানো আছে। বসে থাকতে পারেন না, সারাক্ষণ এ জেলায়, ও জেলায় ঘুরে বেড়ান।'

কলকাতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের ক্লেদাক্ত দাঙ্গা জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। নোয়াখালির দাঙ্গা বীভৎস হয়ে উঠল, রামগঞ্জ থানায় ভয়ঙ্কর রূপ নিল। চারিদিকে বর্বর হত্যাকাণ্ড, লুট, অগ্নিসংযোগ এবং নারীত্বের নিকৃষ্ট লাঞ্ছনা। জেলার সীমান্ত পার হয়ে মাত্র ২ মাইল দূরে কুমিল্লার হাসনাবাদ গ্রাম। হাসনাবাদকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি বেশ কিছু গ্রাম ছিল কৃষকসভার শক্ত ঘাঁটি। হিন্দু-মুসলিম মিলিত সভায় কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এখানে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হতে দেওয়া হবে না। দাঙ্গায় আর্ত ছিন্নমূল মানুষদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য সৃষ্টি করল হাসনাবাদ। সারাভারত কৃষকসভার যুগ্ম-সম্পাদক তখন আবদুল্লাহ্ রসুল।

নোয়াখালির দাঙ্গার খবর পেয়েই ডাক্তার বিজয় বসুকে সঙ্গে নিয়ে রসুল সাহেব নোয়াখালি চলে গেলেন। সেখান থেকে হাসনাবাদ। কলকাতায় ফিরে আবার চিকিৎসকদের নিয়ে হাসনাবাদে গিয়ে দিনের পর দিন দাঙ্গাক্লিষ্ট আর্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ালেন।

প্রাদেশিক কৃষকসভা সিদ্ধান্ত নিল, ১৯৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহে শতবর্ষ পালন করতে হবে। বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন। ওই দিনই হবে কৃষক সমাবেশ। রসুল সাহেব বিদ্রোহের পটভূমিকা, কাহিনী ও তাৎপর্য তুলে ধরে পুস্তিকা লিখলেন 'সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী'। সাঁওতালী ভাষায় অনুবাদ করে পুস্তিকাটি প্রচার করা হল। সেইসঙ্গে বিদ্রোহের ঘটনাবলী আঁকিয়ে পোস্টার সেট। গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে হবে। হাটে হাটে চিত্র প্রদর্শনী। আবদুল্লাহ্ রসুল বীরভূম চলে গেলেন। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র ছিল বীরভূম। কেন্দ্রীয় নেতা হলেন হাটের প্রচারক।

বীরভূম থাকাকালেই ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুই আসনযুক্ত সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের একটি আসন ছিল তপশিলী উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। নির্বাচনী প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন আবদুল্লাহ্ রসুল। এই কেন্দ্রের সংরক্ষিত আসনটিতে জয়ী হলেন কমিউনিস্ট প্রার্থী টুরকু হাঁসদা। নির্বাচনী সংগ্রামে এটি ছিল তার অন্যতম অবদান।

পার্টির নেতৃত্বে

বেআইনী পার্টিতে ১৯৪০-৪১ সালে আবদুল্লাহ্ রসুল দু'বছর আত্মগোপনে থেকে কাজ করেন। পার্টির ওপর থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে ময়মনসিংহ জেলায় আবদুল্লাহ্ রসুল-কে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজে যেতে হল। সেখানে বোম্বাই সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক মাস পর তিনি ময়মনসিংহ জেল থেকে ছাড়া পান। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি করার সময় তিনি ছিলেন বার্মার রেঙ্গুনে। তার বিরুদ্ধের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলে গোপনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামে চলে যান। তারপর পশ্চিমবঙ্গে এসে সুন্দরবন এলাকায় আত্মগোপনে থেকে পার্টি সংগঠন ও আন্দোলনে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৫০ সালে কলকাতায় নতুন করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে ওপার বাংলার ঢাকা ও অন্যান্য এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি আবদুল্লাহ্ রসুলকে সেখানে পাঠানোর জরুরি বার্তা পাঠালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। অবস্থা শান্ত হলে ছ'মাস পর তিনি কলকাতায় ফেরেন। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের প্রাক্কালেও নিরাপত্তা আইনে তাঁকে জেলে আটক থাকতে হয়। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠিত হবার সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

স্বাধীনতার অব্যাবহিত পর কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তিনি যেমন অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চালিয়েছেন, পঞ্চাশের দশকে পার্টির সংশোধনবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে এবং ষাটের দশকে পুনরায় সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াদায় অনুষ্ঠিত পার্টির একাদশ কংগ্রেসে আব্দুলাহ্ রসুল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। শারীরিক কারণে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য পার্টির কাছে অনুরোধ জানালে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানিয়ে ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ কংগ্রেসে তার অনুরোধ রক্ষা করা হয়। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনেরও তিনি আহ্বায়ক ছিলেন।

কৃষকসভার প্রতিনিধি হিসাবে আবদুল্লাহ্ রসুল বার্মা, পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইরাক এবং পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে সিরিয়া যান। এছাড়া পারিবারিক কারণে তিনি লন্ডন পরিভ্রমণ করেন।

আবদুল্লাহ্ রসুল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে গেছেন। সংগটিত কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে মূল্যবান তথ্যের উৎস তারই রচিত 'হিস্ট্রি অব দ্য অল ইন্ডিয়া কিসান সভা' এবং বাংলায় 'কৃষকসভার ইতিহাস'। এছাড়াও তার রচিত পুস্ত কগুলির মধ্যে রয়েছে, 'কমিউনিজম কাহাকে বলে', 'মার্কসীয় অর্থবিজ্ঞান', 'সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী', 'নীল বিদ্রোহের অমর কাহিনী', 'সংস্কৃতির কথা', 'ছিটেফোঁটা'। তাছাড়া আছে কাহিনীমূলক উপন্যাস 'আবাদ', 'শহর থেকে গ্রামে' এবং সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা 'গ্রামে গ্রামান্তরে'।

পার্টিতে আসার পর থেকে সারা জীবনই আবদুল্লাহ রসুল ছিলেন সর্বক্ষণের পেশাদার বিপ্লবী। তবে পার্টি ওয়েজে থাকা তার শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাস থেকে। অধিকাংশ সময়েই পার্টি কমিউনে থেকেছেন। ১৯৯১ সালের ২১ নভেম্বর প্রয়াত হবার সময়

তিনি থাকতেন কলকাতায় ৯ নম্বর দিলখুসা স্ট্রিটের সুপরিচিত পার্টি কমিউনে। আবদুল্লাহ্ রসুল ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরিবহনমন্ত্রী হিসাবে ১৯৬৯ সালে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতির শিক্ষক

সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জগতে আবদুল্লাহ্ রসুল কোনো দিনই জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন বা ক্ষুণ্ন করেননি। নিজে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি বলতেন, আত্মসন্তুষ্টিই হল অধ্যয়নের বাধার পাঁচিল। ষাটের দশকে গণনাট্য সংঘ ও তার দৃষ্টিভঙ্গি নতুন করে মূল্যায়ন করার সময়ে ও তাকে সংগঠিত করতে তাঁর ছিল গভীর অবদান। এত বড়মাপের কৃষকনেতা হয়েও সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে ছিল প্রাণের যোগাযোগ। কৃষক আন্দোলনের নেতা আবার একইসঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনকে পরিচালনা করার অনন্য যোগ্যতা। গণনাট্য আন্দোলনের ছেঁড়া পালে হাওয়া লাগাবার মেরামতিটুকুই শেষ নয়, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অধ্যায়ে ছিলেন দক্ষ মাঝি। প্রগতিবাদী সাহিত্যসেবিদের 'লেখক-শিল্পী সংঘে'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল সরকারি আধা-ফ্যাসিস্ত আক্রমণের প্রতিকূল অবস্থায় ১৯৭২ সালে। যার অন্যতম স্থপতি আবদুল্লাহ্ রসুল।

শেষ কথা

রসবোধ ছিল প্রাণভরা। আত্মজীবনী লিখতে অতি নগন্য 'হারানেপরানে', 'কাঁচামাল' ইত্যাদি বিশেষণে আবদুল্লাহ্ রসুল হাজির করেছেন। ছিল বিনয়, বিলাস বর্জিত জীবন এবং আত্মপ্রচারে অনীহা। তিনি বলতেন, লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে এক পয়সা খরচ হয় না, লাভ হয় অনেক বেশি। পরনে পাজামা ও ঢোলা হাতের পাঞ্জাবি। বানানোর সময়েই পাঞ্জাবির কাঁধে পট্টি সেলাই করা – ঘামে যাতে সহজে ছিঁড়ে না যায়। সাক্ষাৎকারীদের শেষ কথাটি পর্যন্ত শোনেন। আর্ত দুর্গত মানুষদের সেবা পি আর সি-র সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বামপন্থী ও শ্রেণী ঐক্য সম্বন্ধে সদা সচেতন। সমস্যার ছোট-বড় সবেতেই সমান নজর – ছিলেন আত্মত্যাগী, মিষ্টভাষী, নিরহংকারী এক মানুষ – শ্রেণী চেতনায় দৃঢ়বদ্ধ কমিউনিস্ট।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল ধর্মচর্চা ও ধর্মশিক্ষা দিয়ে জীবন শুরু করে দেশপ্রেমের টানে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বুঝেছিলেন, কৃষককে সংগঠিত করতে না পারলে সমাজের পরিবর্তন আনা যাবে না। পাঁচ ভাইদের মধ্যে চারজনই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আর এক ভাই বসির রসূল মেমারি এলাকায় কমিউনিস্ট আন্দোলন তৈরির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কমিউনিস্ট আচার-আচরণে মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল এক আদর্শ দৃষ্টান্ত।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত



জন্ম ২৬ জুলাই ১৯০৩। অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানোরিপাড়া থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে। বাবা সর্বানন্দ সেনগুপ্ত, মা কাদম্বিনী সেনগুপ্ত।

কৈশোরে সাধু সংঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও পরবর্তীকালে বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর সান্নিধ্যে এসে ছাত্রদের নিয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার আত্মনিয়োগ করেন। যোগ দেন অনুশীলন সমিতিতে। ১৯২০ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

১৯২১ সালে রিপন কলেজে ছাত্র সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯২২ সালে গয়ায় সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন-এ প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৩ সালে আই এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই পরিবার থেকে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। স্ত্রী অমিয়া (রায়) সেনগুপ্ত।

ভর্তি হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। তিনিই এই কলেছে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সাধারণ সম্পাদক। এই কলেজ ল্যাবরেটরি থেকেই প্রথম গ্রেপ্তার হন ১৯২৫-এর ৭ ডিসেম্বর বেঙ্গল ক্রিমিন্যালস ল অ্যামেন্ডমেন্ট আইনে। ১৯২৯-এর ১৯ ডিসেম্বর মেছুয়াবাজার কলাবাগন বস্তি থেকে আবার গ্রেপ্তার হয়ে যান। ১৯৩৮-এর জুনে মুক্তি পান। ওই বছরেই পার্টি সদস্য পদ লাভ করেন।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন থেকে তিনি পার্টির রাজ্য কমিটিতে এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন। আমৃত্যু এই পদে ছিলেন।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। ১৯৫৪-র উপনির্বাচনেও পরাজিত হলেও ১৯৫৭ সালে বীজপুর থেকে এবং ১৯৬২, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে টালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। প্রথম এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে তিনি মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ রাত ৩.১৫ মিনিট-এ রামকৃষ্ণ সেবাসদন হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

মুক্তির অক্লান্ত যোদ্ধা

প্রশান্ত শূর
সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, সিপিআই (এম)

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা নিরঞ্জনদা, কমিউনিস্ট নিরঞ্জনদা, টালিগঞ্জের বিধায়ক নিরঞ্জনদা ছিলেন আমাদের সকলের একান্ত কাছের, সকলের শ্রদ্ধার এক অসাধারণ মানুষ। তাঁর অসাধারণত্বের সামান্য স্বীকৃতি হিসাবে কলকাতা পৌরসভা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড এবং রাজা এস সি মল্লিক রোড দুটির মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী দীর্ঘ দু' কিলোমিটার লম্বা লায়েলকা রোডটিকে 'নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সরণি' হিসাবে নামাঙ্কিত করেছে একই সঙ্গে এই রাস্তাটির শুরুতে রানীকুঠির মোড়ে বসেছে কমরেড নিরঞ্জন সেনগুপ্তর আবক্ষ মূর্তি।
শুরু করেছিলেন সেই কৈশোরে। বরিশালে স্কুলে পড়ার সময়। তখনই সংস্পর্শে এসেছিলেন সতীশ পাকড়াশীর, তৎকালীন বরিশালের বিপ্লববাদী আন্দোলনের প্রধান সংগঠনক ছিলেন সতীশদা। তাঁরই সান্নিধ্যে নিরঞ্জনদা ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ম্যাট্রিক পাশ পরে আই এস-সি পড়তে চলে আসেন কলকাতার রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। আর এই সময়েই তাঁর নেতৃত্বে রিপন কলেজে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের সূচনা। ১৯২৩-এ আই এস-সি পাশ করে তিনি অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বের নির্দেশে চলে যান বহরমপুরে। ভর্তি হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। একদিকে বি এস সি পড়া, অন্যদিকে অনুশীলন সমিতির সংগঠন গড়ে তোলা। অল্প কদিনের মধ্যেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে। আর নজরে পড়ে যান ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের। কৃষ্ণনাথ কলেজ ল্যাবরেটরি থেকেই গ্রেপ্তার হন ১৯২৫ সালে।

তাঁকে প্রথমে পাঠানো হয় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে তখন তাঁর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন বিপ্লববাদী আন্দোলনে তাঁর দীক্ষাগুরু সতীশ পাকড়াশী। গ্রেপ্তার হয়ে কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা তাঁকে বিদায় জানিয়েছিল ফুলের মালা দিয়ে। সেই মালাই তিনি হাতে করে নিয়ে এসে তুলে দিয়েছিলেন সতীশদার হাতে, বলেছিলেন 'এ মালা আপনারই প্রাপ্য'। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। স্বাধীনতার জন্য নিবেদিপ্রাণ দুই অসামান্য বিপ্লবীর মধ্যেকার এমন শ্রদ্ধা – ভালবাসা – আনুগত্যবোধ সমন্বিত সম্পর্ক প্রকৃতই অতুলনীয়। পারস্পরিক এমন উন্নত সম্পর্ক ছাড়া নতুন ইতিহাস সৃষ্টির জন্য লড়াই কি আদৌ সম্ভব? কখনোই না।

মেদেনীপুর থেকে নিরঞ্জনদাকে পাঠানো হয় বোম্বাই-এর রত্নগিরি জেলে। সেই দিন তাঁর সঙ্গে রত্নগিরিতে পাঠানো হয়েছিল বাংলার আর এক বীর সন্তানকে – তিনি সূর্যসেন, আমাদের মাস্টারদা। নিভৃত কারাজীবন এই দুই মহান বিপ্লবীর জন্য একান্তে মেশা আর অফুরন্ত আলোচনার সুযোগ এনে দিয়েছিল। স্থির হয়েছিল পরবর্তী দিনগুলিতে সমগ্র বাংলা জুড়ে ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করার পরিকল্পিত রূপরেখা। রত্নগিরি জেল থেকে তাঁকে চট্টগ্রামের একটি গ্রামে অন্তরীণ করা হয়। সেখান থেকে তিনি মুক্তি পান ১৯২৮-এর মধ্য ভাগে। মুক্তিলাভের পরই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঘাত হানার লক্ষ্যে। খানিক স্তিমিত হয়ে আসা বিপ্লববাদী আন্দোলনে নিরঞ্জনদা-সহ অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'রিভোল্ট গ্রুপ'।

এই সময়েই ১৯২৯-এর ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে টানা ৬৩ দিন অনশনের পর আত্মাহুতি দেন বিপ্লবী যতীন দাস। যতীন দাসের এই নির্মম মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার আহ্বান জানিয়ে একটি গোপন বেআইনি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছিল বাংলার তরুণদের উদ্দেশ্যে। তার শিরোনাম ছিল: 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা'। এর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিরঞ্জনদা ছিলেন অন্যতম। জেলায় জেলায় শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি ব্রিটিশ শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে। পুলিশের নজরদারিকে তোয়াক্কা না করেই এগিয়ে চলেছিল তার অভিযান। বিপদের গন্ধে তখন দারুণ তৎপর হয়ে উঠেছিল পুলিশ আর গোয়েন্দারা, ফলত আবার গ্রেপ্তার, এবার কলকাতার মেছুয়াবাজারের এক বস্তিবাড়ি থেকে তিনি, সতীশ পাকড়াশী এবং রমেন বিশ্বাস নামে একজন তরুণ গ্রেপ্তার হয়ে যান। অল্প কদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যান অন্যান্য সহযোগীরা। ১৯৩০-এ শুরু হল ঐতিহাসিক মেছুয়াবাজার বোমার মামলা। এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে তাঁর জেল হয় ১০ বছরের। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁর দণ্ডাদেশ কমে সাত বছর হয়েছিল।

বন্দী অবস্থায় তিনি প্রথমে আসেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। এখানেই তিনি কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হালিমের সংস্পর্শে আসেন। আলিপুর থেকে পাঠানো হয় মেদিনীপুর জেলে, সেখান থেকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বেলগাঁও জেলে। ১৯৩৩-এর গোড়ায় তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় আলিপুরে আর এপ্রিল, ১৯৩৩-এ তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কুখ্যাত আন্দামান সেলুলার জেলে। বন্দীজীবনের এই পর্বেই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী মতাদর্শের সংস্পর্শে আসেন। পরিবর্তন সূচিত হয় তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তায়। তাঁর উত্তরণ ঘটে সন্ত্রাসবাদী থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসাবে। এই সেলুলার জেলেই তিনি যোগ দেন ঐতিহাসিক 'কমিউনিস্ট কনসলিডেশন'-এ। আন্দামানের দণ্ডাদেশ শেষ হওয়ার পর মুক্তিলাভ করার মুহূর্তে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের গেট থেকে। এবার তাঁকে পাঠানো হয় দেউলির বন্দী শিবিরে। সেখানেই আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। সমাজের পরিবর্তনের পথেই যে ভারতীয় জনগণের মুক্তি – এই প্রত্যয় নিয়েই তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন ১৯৩৮-এ।

মুক্ত হয়েই কাজ শুরু করেছিলেন শিয়ালদহ রেল ইউনিয়নে কমরেড সরোজ মুখার্জির নেতৃত্বে। তখন কমরেড সরোজ মুখার্জিই ছিলেন পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক। রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজের মধ্য দিয়েই ১৯৩৮-এর শেষের দিকে তিনি পার্টি সভ্যপদ লাভ করেন। পার্টি সে সময় বেআইনি। খুবই কঠিন অবস্থা, আজকের মতো ব্যবস্থা তখন অকল্পনীয়। সেদিনের কমিউনিস্ট সংগঠকদের নিজের জীবিকার সংস্থান করেই সর্বক্ষণের কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হত। একদিকে দমন-পীড়ন, বেআইনি অবস্থা। অন্যদিকে নিদারুণ অর্থাভাব – তারই মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিকে। আর নিরঞ্জনদার মতো অসামান্য সংগঠকরা পালন করেছেন তার সুযোগ্য সারথির দায়িত্ব।

জীবিকা নির্বাহের জন্য শিক্ষানবিশের কাজ নিয়েছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকায়। কাজ করতেন সাব-এডিটরের। কিন্তু পুলিশের তাড়নায় তা বেশি দিন চালাতে পারেননি। ভারতরক্ষা আইনে তাঁকে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল থেকে বহিষ্কার করা হয়। চলে গেলেন বরিশাল, কাজ শুরু করলেন সেখানে এবং গ্রেপ্তার হলেন। বন্দী জীবন কাটল হিজলি বন্দী শিবিরে। মুক্ত হলেন ১৯৪২-এর দ্বিতীয়ার্ধে যখন পার্টির উপর থেকে প্রত্যাহৃত হল নিষেধাজ্ঞা। এবার তিনি যোগ দিলেন সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে। তখন 'জনযুদ্ধ'

পত্রিকার সম্পাদক কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি। এখানেও লেখক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন তিনি। লেখার কাজে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন আগেই, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকার সময়েই। 'জনযুদ্ধ'-এ কাজ করার সময়েই তাঁকে বন্দী মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাসহ আরও বহু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী তখনও ব্রিটিশ কারাগারে। তাদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেন নিরঞ্জনদা। ব্রিটিশরা বাধ্য হয়েছিল সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে, অবশ্যই তা প্রবল আন্দোলনের চাপে। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সংগ্রামেও তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি ছিলেন সম্মুখসারিতে। বিশেষত উদ্বাস্তু আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা এবং নেতৃত্ব অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতার পর আবার যখন আঘাত এলো পার্টির উপর, ১৯৪৮-এর মার্চে বেআইনি ঘোষিত হল পার্টি, নিরঞ্জনদা তখন আত্মগোপন করলেন। পুলিশের নাগাল এড়িয়ে দু'বছরের বেশি সময় তিনি আত্মগোপন করেই চালিয়ে যান পার্টির কাজ। অবশেষে ধরা পড়েন ১৯৫০-এ। মুক্তিলাভ করেন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে। এই নির্বাচনে তিনি পার্টির প্রার্থী হিসাবে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয়ী হতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি বিধানসভায় বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। এরই পরিণতিতে তিনি প্রথম এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং কারাদপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন।

মন্ত্রিত্বে থাকার সেই সংক্ষিপ্ত মেয়াদেই তিনি উদ্বাস্তু কলোনিগুলির উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার করেছিলেন। তিনিই বাতিল করেছিলেন অসম্মানজনক অর্পণ পত্রের ব্যবস্থা। উদ্বাস্তু কলোনিগুলির জন্য সরকারি উদ্যোগে পানীয় জলের ব্যবস্থা তাঁরই করা। তাঁর উদ্যোগেই প্রথম শুরু হয়েছিল কলোনি উন্নয়নের জন্য সরকারি পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। রাজ্যের উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী নিরঞ্জনদার প্রত্যক্ষ ভূমিকার মধ্য দিয়েই উদ্বাস্তু জনগণের তথা কলোনিগুলির উন্নয়নে ২৫০ কোটি টাকার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা তৎকালীন দিল্লির সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। উদ্বাস্তু আন্দোলনের পাশাপাশি মন্ত্রী নিরঞ্জনদার উদ্যোগ এ রাজ্যের উদ্বাস্তু জনগণের নতুন জীবন গড়ার সংগ্রামে দারুণ গতি সঞ্চার করেছিল।

আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, মন্ত্রী নিরঞ্জনদার কাছে হাজির হয়েছিলাম টালিগঞ্জের নেতাজীনগরে কলেজ গড়ার জমির দাবি নিয়ে। এক কথায়, ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ছয় বিঘা জমির। আর অঞ্চলের মানুষের অকৃপণ দানে দ্রুত সংগৃহীত হয়েছিল ষাট হাজারেরও বেশি টাকা। কলেজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের কাছে আবেদন করা হয়েছিল ২ জুন, ১৯৬৭। কিন্তু তৎকালীন সিন্ডিকেটের মনোভাব ছিল অত্যন্ত নেতিবাচক – প্রথম দিকে বিষয়টি গ্রাহ্যই করতে চায়নি। অবশেষে একদিন গোটা অঞ্চলের মানুষকে সমবেত করে ঘেরাও করতে হল সিন্ডিকেটকে। টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের – ডাক এলো উপাচার্যের। নজীরবিহীনভাবে নিজের বাড়িতে বসেই উপাচার্য অনুমাদন করলেন কলেজ গড়ার আবেদন। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় নিরঞ্জনদার ভরসা আর প্রয়াস ছিল আমাদের অনুপ্রেরণা।

মন্ত্রিত্বে কর্মরত অবস্থাতেই নিরঞ্জনদার জীবনাবসান ঘটে ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে। ১৯২৩ থেকে ১৯৬৯ – এই সুদীর্ঘ সময় জুড়ে তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন, দেশের

মুক্তির জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য। লক্ষ্যসাধনে তিনি অস্ত্র ধরেছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সেই হাতেই চালিয়ে গেছেন নিয়মিত লেখার কাজ। তিনি ছিলেন সুসংগঠক - সাংবাদিক এবং সুলেখক এক মহান বীর যোদ্ধা, এক নিরলস কমিউনিস্ট। নিরঞ্জনদা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা অর্জন করেছেন, তেমনই আতঙ্কিত করে তুলেছেন দেশী-বিদেশী শাসকদের। মানুষের স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ এই কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে শুধুমাত্র ব্রিটিশরাই কারাগারে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করত না, স্বাধীন ভারতে শাসক কংগ্রেসও যে-কোনো আন্দোলনের সময়েই এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীকে বিনা বিচারে আটক করে রেখেছে।

দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত একজন কমিউনিস্টের জীবনে এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কী আছে? মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এই অসাধারণ মানুষটি ছিলেন পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। সংসদীয় সংগ্রাম এবং সংসদ বহির্ভূত সংগ্রাম – এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয়ের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তার কাজে দেখা গেছে বারবার। সংসদীয় কাজের চাপ কখনোই তাঁর ধারাবাহিক মার্কসীয় তত্ত্বচর্চায় কোনো ছেদ ঘটাতে পারেনি। সংশোধনবাদ-সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সঠিক পথ খুঁজে নিতে তাঁর ভুল হয়নি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, রাজ্য মন্ত্রিসভার নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে পার্টির দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। এক মহান পূর্বসুরি কমিউনিস্টের উত্তরসুরি হিসাবেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। এতদ অঞ্চলের পার্টি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল নিরঞ্জনদার স্মৃতিরক্ষার্থে উপযুক্ত কিছু করা।

তারই ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে নিরঞ্জন সেন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। বিজয়গড়ে বহু পুরনো, পরিত্যক্ত একটি সেনাছাউনির জমিতে গড়ে উঠেছে নিরঞ্জন সদন যা অঞ্চলের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সংস্কৃতিবান মানুষের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। কে এম ডি এ, কলকাতা পৌরসভা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যেই নির্মিত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ। সেদিনের নেতাজীনগর কলেজ আজ আর একটি নেই, বিরাজ করছে তিন তিনটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত মহাবিদ্যালয়ের চেহারায়।

আলোকিত উদ্বাস্তু জীবন, নিরঞ্জন সদন, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সরণী নেতাজীনগরের তিনটি কলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী – পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সুদীর্ঘ অবস্থান – বিকশিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন – এই সবকিছুর মধ্যেই বেঁচে থাকবেন নিরঞ্জনদা, নিরঞ্জনদার মতো মানুষেরা। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত অমর রহে।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

মনিকুন্তলা সেন



জন্ম ১৯১০। অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশালে। বাবা বিলাস চন্দ্র সেন। মা ক্ষিরোদবালা দেবী।

বরিশালের বি এম কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। কর্মজীবনে ১৯৩৮ সাল থেকে দীর্ঘদিন মেট্রোপলিটন গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯৪১ সালে ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রচারে অংশ নিয়ে কমিউনিস্ট নেতাদের সংস্পর্শে আসেন।

১৯৪২ সালে মহিলা আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং মহিলা সমিতির জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। বঙ্গীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৩ সালে অর্জন করেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ।

১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালে তিনি কালীঘাট কেন্দ্র থেকে পরপর দু'বার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন এবং বিরোধী পক্ষের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি জেনিভাতে আন্তর্জাতিক মাদার্স কংগ্রেসে যোগ দেন।

১৯৫২ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন। তারপর তিনি রাজনীতি থেকে সরে যান।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কলকাতার কড়েয়া রোডের বাসভবনে তার জীবনাবাসান হয়।

এক নেত্রীর উত্তরণ ও বিদায়

কনক মুখার্জি

অবিভক্ত বাংলায় স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতা উত্তরযুগে দুইটি দশক পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির একজন পুরোধা নেত্রী হিসাবে মনিকুন্তলা সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেত্রী, নারী আন্দোলনের পুরোধা, পশ্চিমবাংলা বিধানসভার বিধায়ক এবং একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা ও সংবেদনশীর ব্যক্তিত্ব সকলকেই আকর্ষণ করত। বিধানসভার ভিতরে ও বাইরের জনসভাগুলিতে তার তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার জন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যে

জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বিগত শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের উত্তাল দিনগুলি জুড়ে ছিল মনিকুন্তলা সেনের বহুমুখী কর্মজীবন। শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত সর্বস্তরের জনগণের গণ আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে মনিকুন্তলা সেনের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছে মানুষের প্রত্যাশাও ছিল আরও অনেক বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তার কর্মজীবন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় চল্লিশের দশকের সূচনা থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ষাটের দশকের প্রথমেই তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নেন। তাঁর আশৈশব পালিত ধর্মীয় আবেগ, ভাবপ্রবণ মানবিকতা বোধ দলীয় রাজনীতিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রায় পঁচিশ বছর তিনি রাজনীতির বাইরে ছিলেন। মনিকুন্তলা সেনের মতো একজন প্রথম সারির নেত্রীকে মাঝপথে থেমে যেতে দেখা আমাদের সকলের পক্ষেই ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে তিনি কোনোদিন পার্টির বিরোধিতা করেননি। সি পি আই এম বা সি পি আই কোনো পার্টিতে যোগ না দিলেও তিনি নিজেকে একজন কমিউনিস্ট বলেই মনে করতেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদী তত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস ঘোষণা করে গেছেন।

মনিকুন্তলা সেনের মাতামহ রজনীকান্ত সেন ছিলেন বরিশালের কিংবদন্তী নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু, একমত ও এক পথের পথিক। সেই সূত্রে বাড়িতে ছিল একাধারে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশ। মনিকুন্তলার মা ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শিক্ষিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মায়ের কাছ থেকেই তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অশ্বিনীকুমার-জগদীশচন্দ্র-কালীশ চন্দ্র এই ত্রয়ীর প্রভাব তরুণদের আকৃষ্ট করত। ওদিকে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর শঙ্কর মঠের মধ্যে ছিল বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির আস্তানা। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঈশান স্কলার শান্তিসুধা ঘোষের মত প্রখ্যাত ব্যক্তিরা। আবার শহরের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবও ছিল। কবি জীবনানন্দ দাসের আত্মীয়া স্নেহলতা দাস ছিলেন মনিকুন্তলা সেনের স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। তার 'ব্রহ্মবাদী পত্রিকা' মারফৎ ধর্মচর্চা, জগদীশ আশ্রমে গিয়ে পূজা-অর্চনা, অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ' ইত্যাদির ধর্মীয় প্রভাব মনিকুন্তলার কৈশোর জীবনে বিশেষভাবে পড়েছিল। তদুপরি তার জামাইবাবু তাঁকে মঠের সন্ন্যানিসী জীবন বেছে নেওয়ার দিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মনিকুন্তলা নিজেকে ভবিষ্যতে গেরুয়া বস্ত্র পরিহিতা সন্ন্যাসিনী রূপে কল্পনা করতে থাকতেন। কিন্তু একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব, বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির কাজকর্ম, গান্ধিজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, আবার গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বরিশালের বিশিষ্ট নেতা অমিয় দাশগুপ্ত, অমৃত নাগ, প্রমথ সেন প্রমুখের মারফৎ যোগাযোগও ক্রমশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠল। অবশেষে মনিকুন্তলা বেছে নিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথ ও গ্রহণ করেছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ সর্বক্ষণের কর্মীর জীবন।

বরিশাল বি এম কলেজ থেকে বি এ পাশ করার পর মনিকুন্তলা কলকাতায় এসে বোডিং-এ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়েন। ১৯৩৮ সালে বাংলায় এম এ পাশ করেন এবং স্কুল শিক্ষিকার চাকরিতে যোগ দেন। ইতিমধ্যে তিনি বরিশালের অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে প্রথমে সৌম্যেন ঠাকুরের পার্টিতে যোগ দেন এবং পরে মুজফ্ফর আহ্মদ, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং ১৯৪৩ সালে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের মতো তিনি কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। বরিশালের ফুলরেণু গুহ, মনোরমা গুহ, মনোরমা বসু প্রমুখ-র সঙ্গে তিনি ছাত্র অবস্থা থেকেই কংগ্রেসের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

১৯৪১ সালে হিটলারবাহিনী দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হলে বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়। সেই সময় পার্টির প্রচার আন্দোলনে মনিকুন্তলা সেন যোগ দেন। ঘরোয়া বৈঠকে এবং মাঠে ময়দানে মনিকুন্তলা সেনের বক্তৃতা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্রমে শ্রমিক কৃষক ছাত্র ও মহিলাদের মধ্যে প্রচারের কাজে তিনি বিভিন্ন জেলায় যান। এই সময় শুরু হয় একদিক থেকে জাপানী বোমার আক্রমণ ও অন্যদিক থেকে পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০ বাংলা, ১৯৪৩ ইং)। ফ্যাসিবিরোধী প্রচার আন্দোলন, দেশরক্ষা ও রিলিফের কাজের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে জনরক্ষা সমিতি, আত্মরক্ষা সমিতি, পিপলস রিলিফ কমিটি, গণনাট্য সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফ্যাসিবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ প্রভৃতি গণসংগঠন। সর্বস্তরের মহিলাদের ব্যাপকতম দেশপ্রেমিক মঞ্চ হিসাবে রূপ নেয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ১৯৪৩ সালের ৭-৮ মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তারও পূর্বে ১৯৪২ সালের সূচনা থেকেই কলকাতা ও জেলায় জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে ওঠে। ১৯৪২ সালের ১৩ এপ্রিল কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা কর্মীদের উদ্যোগে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি হলে মহিলাদের একটি ফ্যাসিবিরোধী সভা ডাকা হয় এবং একটি সংগঠন সমিতি গঠিত হয়। এই সংগঠন সমিতির আহ্বায়িকা ছিলেন এলা রীড এবং অন্যান্য সদস্যাদের মধ্যে মনিকুন্তলা সেন অন্যতম ছিলেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে সারা প্রদেশে মহিলা আন্দোলন সংগঠনের জন্য একটি প্রাদেশিক মহিলা সেল গঠন করা হয়। তাঁর মধ্যে ছিলেন মনিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জী, যুঁইফুল রায় ও কনক মুখার্জী। এইভাবে প্রাদেশিক স্তরে ও জেলা স্তরেবহু মহিলা কমিউনিস্ট কর্মী সংগঠনের কাজে উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৪৩ সালে পার্টি সদস্য হওয়ার পরে মনিকুন্তলা সেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করেন। বরিশালের মনোরমা গুহ ও অন্যান্যদের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতায় পার্ট কমিউনে থাকতেন। ১৯৪৩ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হিসাবে মনিকুন্তলা সেন অন্যতম পুরোধা নেত্রীর ভূমিকায় ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো দিনই কোনো পদাধিকারী হতে চাননি। পার্টির মহিলা সেলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন মহিলা ফ্রন্টের অন্যতম পি সি ও। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ থেকে পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠনের কাজের জন্য তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রায় সব জেলাতেই ঘুরেছেন। অতি সাধারণ কৃষক নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মেয়েদের মধ্যে একেবারে মিলেমিশে যাওয়ার, তাদের মন কেড়ে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। মনিকুন্তলা সেন মিটিং-এ আসছেন শুনলে গ্রামের মেয়েরা ছুটে আসত। একনিষ্ঠ সংগঠক হিসাবে ও বক্তা হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ।

চল্লিশের দশকে এক সঙ্গেই জোয়ার এসেছিল গণ আন্দোলন ও গণ সংস্কৃতির। রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে অনেকেই যুক্ত হয়েছিলেন গণনাট্য সংঘের নৃত্য, গীত, অভিনয়ের সঙ্গে। মনিকুন্তলা সেন শুধু ভালো বক্তৃতা দিতেন না, ভালো অভিনয়ও করতে পারতেন। ১৯৪৩ সালে বিজন ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক নাটক 'নবান্ন'-তে গোপাল হালদার, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে মনিকুন্তলা সেনও অংশগ্রহণ করেছিলেন 'বেন্দার মা'য়ের ভূমিকায়। তাঁর ভূমিকা সকলকেই চমৎকৃত করেছিল। যুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা পিপলস্ রিলিফ কমিটি, বি এম আর সি সি, নারী সেবা সংঘ প্রভৃতি প্রতিটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত

ছিলেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যে তেভাগা আন্দোলন ও অন্যান্য গণ আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে তার মধ্যেও মনিকুন্তলা সেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে তেভাগা আন্দোলনের প্রচার ও সংগঠনের কাজ করেছেন। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির রিলিফ স্কোয়াডে পূর্ব বাংলার নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় জেলায় ঘুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার ও রিলিফের কাজ সংগঠিত করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের পর রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন হয়ে গেল।

একদিক থেকে কংগ্রেস সরকারের আক্রমণের মুখে চারিদিকে গণ আন্দোলন ফেটে পড়ল অন্য দিক থেকে পূর্ব বাংলা থেকে আসা লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার জীবন জীবিকা বাসস্থানের প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দিল। খণ্ডিত দেশের গণ সংগঠনগুলিও স্বভাবতই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ওপর এসে পড়ল নব পর্যায়ে নতুনভাবে নারী আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব। ১৯৪৮ সালে আবার কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে মনিকুন্তলা সেন প্রেসিডেন্সি জেলে দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময় বিনা বিচারে বন্দী থাকেন। এই সময় কারাগারের মধ্যেও বন্দীদের দাবি দাওয়ার লড়াই ও অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন।

১৯৫১ সালে কারামুক্তির পর ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কালীঘাট কেন্দ্রের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্র থেকেই তিনি ৫২ ও ৫৭ সালে বিধায়ক হন। ১৯৬২ সালেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কিন্তু জিততে পারেননি। বিধায়ক হিসাবেও মনিকুন্তলা সেনের দক্ষতা ও বাগ্মিতা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতি বসু ছিলেন বিরোধী পক্ষের লিডার এবং মনিকুন্তলা সেন ছিলেন ডেপুটি লিডার। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক জলি কাউলের সঙ্গে মনিকুন্তলার বিবাহ হয় এবং তাঁরা কলকাতায় কড়েয়া রোডে সরকারী ফ্ল্যাটে থাকা শুরু করেন।

১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বিশ্বনারী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় বিশ্বনারী সংঘের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে গঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশন (এন এফ আই ডব্লিউ)। মনিকুন্তলা সেন ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং সর্বভারতীয় কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার যুগ্ম সম্পাদিকা। ১৯৫৫ সালে তিনি সুইজারল্যান্ডের সুসান শহরে বিশ্বমাতৃ সম্মেলনের প্রতিনিধি ছিলেন। সেখান থেকে তিনি অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে আসেন। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট শিবিরে মতাদর্শগত মতবিরোধ। তার প্রভাব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও গণসংগঠনগুলির মধ্যেও পড়ে। পাঁচের দশকে এই বিরোধের মধ্যে মনিকুন্তলা সেন যদিও দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, কিন্তু তিনি দলের মধ্যে এই বিরোধকে মেনে নিতে পারেননি বলে খুবই বিব্রত বোধ করতেন।

অবশেষে ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সংঘর্ষের সময় যদিও তিনি দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে ভারত সরকারের পক্ষে চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু তখন থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসতে থাকেন। অবশেষে ১৯৬২ সালে তাঁর স্বামী জলি কাউলও

কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার সময় মনিকুন্তলা কোনো দিকে যোগ না দিয়েই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। বাকি জীবন তাঁদের জীবিকা অর্জনের জন্য কাজও করতে হয়। মনিকুন্তলা সেনও তাঁর বন্ধু অঞ্জলি মুখার্জীদের নার্সারি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষিকার কাজ করেন এবং গৃহশিক্ষিকার কাজও করেন। ১৯৮২ সালে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণামূলক আত্মজীবনী 'সেদিনের কথা' বইটি লেখেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর হারানো দিনের ধর্মীয় আবেগ আবার ফিরে আসে এবং তিনি রামকৃষ্ণ মঠের উপাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশ্বরানন্দ-র কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৮৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কড়েয়া রোডের বাস ভবনে তাঁর জীবনাবসান হয়।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী)– সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

মহম্মদ ইসমাইল



জন্ম ১৯১২। উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার রঞ্জিৎপুরা গ্রামের এক ভূমিহীন কৃষক পরিবারে। বাবা শেখ মহম্মদ।

মাত্র ছ'বছর বয়সে পিতৃহারা ইসমাইল ১১ বছর বয়সে চলে আসেন কলকাতায়। ছাত্র অবস্থাতেই কাজ নিতে হয় ইংরেজ মালিকের কারখানায়। মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে চেতনার উন্মেষ সেখানেই। এই চেতনাই তাঁকে সামিল করে দেয় শ্রমিক-রাজনৈতিক-স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চে। ম্যাট্রিক পাশের পরেই ইতি ঘটে যায় প্রতাগত শিক্ষার। খিলাফত আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করে মাত্র ১৮ বছর বয়সে কারারুদ্ধ হন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের পীঠস্থান কলকাতাই যে তাঁর ভবিষ্যত জীবন নির্ধারন করে দেবে– সে সিদ্ধান্তে ততদিনে উপনীত হয়ে গেছেন। জেলে বসে মাতৃভাসা উর্দু ছাড়াও খুব ভালোভাবে শেখেন বাংলা এবং হিন্দি ভাষা।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইসমাইল যুক্ত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের মতাদর্শের সাথে। থাকতেন ৪১ নং জাকারিয়া স্ট্রিটে। সেখানেই থাকতেন আব্দুল হালিম। ইসমাইল তাঁর সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট ভাবধারায় আকৃষ্ট হন এবং ওই বছরেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। পার্টির নির্দেশে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করা এবং কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতে থাকেন।

১৯৩৯ সালে তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে হরিপুরা কংগ্রেসে যোগ দেন। সেখান থেকে এ আই সি সি-র সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক 'রফীক' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মহম্মদ ইসমাইল ১৯৩৫ সালেই এ আই টি ইউ সি-র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ তে হন এ আই টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি। ১৯৭০ পর্যন্ত এই পদে থাকেন এবং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই পরিচালনা করে শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপদানে সচেষ্ট থাকেন। ১৯৭০-এ সি আই টি ইউ গঠিত হলে তিনি সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি এবং ১৯৭১-এ এই সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। আমৃত্যু তিনি এই পদে ছিলেন।

মহম্মদ ইসমাইল ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসাবে শ্রমিক কেন্দ্র থেকে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৬৭তে বারাকপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। পরে আরও দু'বার ওই কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হলেও ১৯৫৭-র বিধানসভা নির্বাচনে বউবাজার কেন্দ্রে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিদানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজও ইতিহাস হয়ে আছে। ওই নির্বাচনে তিনি মাত্র ৫৪০ ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে মহম্মদ ইসমাইল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০-এ তদানিন্তন বাংলা প্রাদেশিক কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি হলে তিনি তার সম্পাদক হন। ১৯৬৪ তে সি পি আই (এম) গঠিত হলে তিনি সি পি আই (এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য হন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন।

ট্রাম শ্রমিক, রেল শ্রমিক এবং চটকল শ্রকিদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে মহম্মদ ইসমাইল অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৩৮ থেকে আমৃত্যু তিনি ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘদিন ছিলেন বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি। ১৯৯০-এর ১৪ নভেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

শ্রমজীবী মানুষের একান্ত আপন

মহম্মদ আমিন

সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, সি পি আই (এম)

সদ্য সমাপ্ত বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকের গোড়ার কথা। সেই সময়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনে অতিষ্ঠ শত শত স্বাধীনতাকামী দেশবাসী শাসকশ্রেণীর গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছে। এমনি একটি দিনে কলকাতার টাউন হলে স্যার গজন্‌ভি নামে এক ব্রিটিশ ভক্ত জমিদারকে তার বিলেত যাওয়ার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ওই সভায় ঘোষণা করা হয় হয় যে স্যার গজন্‌ভি নাকি মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে বিলেত গিয়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ভিক্ষা করে নিয়ে আসবে। সভা ভর্তি ছিল ব্রিটিশ সমর্থকদের দল। তাই মুসলমান সমাজের প্রতি এই অপমানের জবাব দিতে সাহস করছিলেন না কেউই। এমনি সময় "নবীন আবেগ রুখিতে" না পেরে অসীম সাহস সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালেন ১৮-১৯ বছরের এক তরুণ। বীরদর্পে ঘোষণা করলেন আমার দেশের ভাইবোনকে যারা গুলি করে মারছে তাদের কাছে ভিক্ষা করতে কোনো সাচ্চা মুসলমান যায় না। যে যায় সে ব্রিটিশের গোলাম। মুসলিম সমাজ তাকে ঘৃণা করে। উদ্ধতশির এই তরুণটি আর কেউ নয়– তিনি হলেন শ্রমজীবী মানুষের একান্ত আপন – মুহম্মদ ইসমাইল। 'শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন' মুঠি নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। আবির্ভাব তাঁর সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মাঝে তাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

"দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে জীবনে মরণে"

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের শ্রমজীবী আন্দোলনে এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন মহম্মদ ইসমাইল। ১৯১২ সালে উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার রঞ্জিৎপুরা গ্রামের এক ভূমিহীন কৃষক পরিবারে মহঃ ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শেখ মহম্মদ প্রথম জীবনে ডাক রানারের কাজ করতেন। তাঁর চার ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে ইসমাইল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। পরে শেখ মহম্মদ কানপুরে এসে এক কাপড়ের কলে শ্রমিকের কাজে যোগ দেন। ইসমাইলের বড় এক ভাইও ওই কাপড় কলের শ্রমিক ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে পিতৃহারা হন ইসমাইল। ১৯২৩ সালে যখন তার বয়স মাত্র ১১ বছর তখন তিনি মেজদার সঙ্গে চলে আসেন কলকাতায়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে প্রথাগত শিক্ষার দিকে বেশি দূর এগোতে পারেন নি ইসমাইল। কলকাতায় আসার পর কিছু দিন এক ইংরেজ মালিকের কারকানায় কাজ করতেন তিনি। তবে কারখানায় কাজের চেয়ে রাজনীতির প্রতি আকর্ষণই ছিল তার বেশি।

মহঃ ইসমাইল খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সংগ্রামের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। সেই সময় তিনি বহু কংগ্রেস নেতারও সংস্পর্শে আসেন। খিলাফত আন্দোলন করতে গিয়ে মাত্র ১৮ বছর বয়সে কারারুদ্ধ হন তিনি। বস্তুত কারাগারে বসেই ইসমাইল তার মাতৃভাষা উর্দু ছাড়াও খুব ভালো করেই শেখেন হিন্দি এবং বাংলা ভাষা।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্য নিরস্ত্র হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের হত্যা করে নৃশংসভাবে। কিন্তু স্বাধীনতাকামী মানুষের লড়াই তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়নি। অথচ কলকাতায় ১৯৩০-৩১ সালে ব্রিটিশ গুণ্ডাদের আক্রমণের ভয়ে কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যায় নি যিনি মুসলিম সমাজকে জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি রোমন্থন করতে ডাক দেন। কিন্তু যার রক্তে থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেশা, অন্যায় সইতে না পারার নেশা তিনি নিজে পিছিয়ে থাকতে পারেননি – এই ব্যক্তির নাম মহম্মদ ইসমাইল। ইসমাইল তার পার্টির কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে মহম্মদ আলি পার্কে সভার ডাক দেন। তার কঠোর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মহাকবি ইকবারের সেই গান : "কসম উন্ গাজীয়োঁকি মৌতসে জো জং করতে হ্যায়" – মৃত্যুর সাথে যারা পাঞ্জা লড়ছে সেই বীরদের কসম ভাই।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইসমাইল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ আই সি সি ও বি পি সি সি'রও সদস্য হন তিনি। কংগ্রেসে থাকাকালীনই তিনি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পুরণচাঁদ যোশী প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতার সংস্পর্শে আসেন। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি। কমিউনিস্ট নেতারা তখন কঠোর সাজা পেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা দীর্ঘদিন জেলের কয়েদি হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ আপোসহীন সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর কমিউনিস্ট নেতারা। দেশের সব থেকে যারা গরিব সেই সমস্ত কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন ইসমাইল, চেয়েছেন সমস্ত মানুষকে এক করতে। ইসমাইল তখন থেকেই কংগ্রেস ছাড়ার কথা ভেবেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। সেটা ছিল ১৯৩৪ সালের একটি দিন। গড়ের মাঠে ট্রাম শ্রমিকদের একটি সভা হচ্ছিল। কোম্পানির এক মদ্যপ বড়সাহেব সভায় ঢুকে মাতলামি শুরু করে, শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে শুরু করে। অল্প কয়েকজন শ্রমিক তাঁকে বাধা দিতে সাহস করছিলেন না। পুলিশ শুধু নীরব দর্শকই ছিল না, বরং পুলিশ ঘোষণা করে দিল সাহেবের গায়ে কেউ হাত দিলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। ঋজু শরীরটা নিয়ে

এগিয়ে গেলেন ইসমাইল। মাতাল সাহেবকে ঘাড় ধরে সভার বাইরে তাড়িয়ে দেন তিনি। তাঁর এই সাহসী ভূমিকা অনুপ্রাণিত করে উপস্থিত অন্যান্য শ্রমিকদের। তাঁরাও রুখে দাঁড়ান, পুলিশও কিছু করতে পারে না।

১৯৩৫ সাল। তখন ৪১ নম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটে থাকতেন আব্দুল হালিম। তারই অনুপ্রেরণায় কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন ইসমাইল। বলাবাহুল্য জাকারিয়া স্ট্রিটে যাঁদের সাথে ইসমাইলের হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল তাঁরা হলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, সোমনাথ লাহিড়ী, সরোজ মুখার্জি, ডঃ রণেন সেন প্রমুখ নেতা। এই সময় থেকেই হালিমের অনুপ্রেরণায় এবং পার্টির নির্দেশে ইসমাইল সাহেব অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় এবং যে কোন দুঃখ কষ্টকে সামান্য মনে করে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে লেগে পড়েন।

মহম্মদ ইসমাইল এমন সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগদান করেন যখন ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা বলে কিছু ছিল না। দেশের বেশিরভাগ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার ও ভীতি প্রবল ছিল। সেই সময় ইসমাইর সাহেব বিড়ি শ্রমিক, বাস শ্রমিক, ট্রাম শ্রমিক, হাতে টানা রিক্সা শ্রমিক, ফল বিক্রেতা, ঠেলাগাড়ি টানা শ্রমিক এবং চটকল শ্রমিকদের মধ্যে নির্ভয়ে কাজ করেছেন।

ইসমাইলের প্রথম কাজ শুরু হয় বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি তখন ছিল অত্যন্ত কম। সারা কলকাতার সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের তিনি সংগঠিত করেন। ইসমাইলের নেতৃত্বে করা আন্দোলনে কিছুটা সাফল্যও আসে। পরে তিনি কলকাতার ফল বিক্রেতাদেরও সংগঠিত করেন। বাস শ্রমিক ও রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে একটি জঙ্গী সংগঠন গড়ে উঠেছিল – এর পুরোধা ছিলেন মহঃ ইসমাইল।

বিলাতি ট্রাম কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার মহম্মদ ইসমাইল। ১৯২৮ সালে ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ট্রাম শ্রমিকদের ওপর ইউনিয়নের তেমন কোনো প্রভাব ছিল না। ১৯৩৮ সালে রাজবন্দীদের সাথে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া নেতা ইসমাইল এবং সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে এবং কয়েকজন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কমরেডের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ধীরে ধীরে জঙ্গী সংগঠনে পরিণত হয় এবং গণ ইউনিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৪৫ সালে ট্রাম শ্রমিকরা নয় দিন ধর্মঘট করে এক অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। বলাবাহুল্য এই আন্দোলনই ইসমাইলকে ট্রাম শ্রমিকদের এক অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে ঘোষণা করে।

চল্লিশের দশক থেকেই ইসমাইল শ্রমজীবী মানুষের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অকৃত্রিম বন্ধু এবং প্রিয় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে দুটি আসনে কমিউনিস্ট প্রার্থীগণ জয়লাভ করেন। এদের একজন হলেন সোমনাথ লাহিড়ী এবং অন্যজনের নাম হল মহম্মদ ইসমাইল। ১৯৪৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘটে ৪৫ দফা দাবির সাথে এই দাবিগুলিও ছিল : সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি, কর্মচারিদের ওপর কোনো রকম শাস্তিমূলক আদেশ থাকলে তা প্রত্যাহার, শ্রমিকদের ছাঁটাই রদ ইত্যাদি। ১৯৪৫ সালের ২৩ নভেম্বর সকাল থেকে মাসিক ৩০০ টাকার কম উপার্জনকারী ২০,০০০ শ্রমিক কর্মচারী ধর্মঘট শুরু করেন। এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কংগ্রেস কাউন্সিলর শ্রী সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ২৬ নভেম্বর একতরফাভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কাউন্সিলর

নভেম্বর একতরফাভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কাউন্সিলর ইসমাইল এবং সোমনাথ লাহিড়ী ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১০০ টাকা মাসিক বেতনভোগী শ্রমিক কর্মচারীদের ৩ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা এবং বেতন পরিকাঠামো ঠিক করতে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ২৮ নভেম্বর থেকে কর্পোরেশনের সমস্ত কাজকর্ম শুরু হয়। কাউন্সিলর মহম্মদ ইসমাইল এবং সোমনাথ লাহিড়ীর অসামান্য কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন মেয়র নিজে। ইসমাইলের এই ভূমিকা দেখে বোঝা যায় যে একজন শ্রমিক নেতাকে শ্রমিকদের মানসিসকতার সাথে জড়িয়ে পড়তে হবে নইলে শ্রমিকদের স্বার্থ বিপন্ন হতে বাধ্য।

চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ইসমাইলের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৩৭ সালে সমস্ত চটকল শ্রমিকরা যখন এক বিশাল ধর্মঘটে সামিল হয় তখন পথে ঘাটে, স্টেশনে সমস্ত জায়গায় পুলিশ দাঁড়িয়ে নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। পরোয়ানা ছিল ইসসমাইরের নামেও।

তার পবিত্র অঙ্গে লাগল ধুলি...

চটকল মুজরের মতো খালি পায়ে, খালি গায়ে অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঠিক মজুরদের মতো হয়ে শ্রমিকদের মাঝে হাজির হতেন তাদের প্রিয় নেতা মহম্মদ ইসমাইল। দিনের বেলায় মজুরদের ঘরে লুকিয়ে থাকতেন আর অন্ধকার নেমে এলেই একেক দিন একেটা জায়গায় শ্রমিকদের উৎসাহ দিতে যেতেন এবং ধর্মঘট চালু রাখার সব ব্যবস্থা করতেন। এমনি করে রাতের পর রাত আলমবাজার থেকে বারাকপুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন ইসমাইল। শেষ পর্যন্ত শ্যামনগরে শ্রমিকদের সাথে বৈঠক করার সময় মালিকপক্ষের একজন দালাল ধরিয়ে দেয় তাঁকে। পঞ্চাশ জন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন মহম্মদ ইসমাইল। জেলে গিয়েও মজুরদের ভিতরে উৎসাহ জুগিয়েছেন তিনি। লড়াই করার ইজ্জত যে জেল খাটার বেইজ্জতির থেকেও অনেক বড় এটাই বুঝিয়েছেন তিনি জেলে থাকার সময়ে। তাইতো তিনি চটকল শ্রমিকদের পরম প্রিয় নেতা ইসসমাইল।

১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে মহম্মদ ইসমাইল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে পার্টির প্রাদেশিক কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠিত হলে তিনি নতুন কমিটির সম্পাদক হন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইসমাইল ছিলেন এ আই টি ইউ সি'র সহসভাপতি। ১৯৭০ সারে সি আই টি ইউ প্রতিষ্ঠার পর তিনি সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই পদেই আসীন ছিলেন।

একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভার বউবাজার কেন্দ্রে তদানীনন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী সবারই জানা। ওই কেন্দ্রে ডাঃ রায় পান ১৫,৫৫০টি ভোট এবং মহম্মদ ইসমাইল পান ১৫,০১০টি ভোট। হিন্দ মজদুর সভার মহেন্দ্রকুমার ঘোষ পান ৫০০টি ভোট। এই ফলাফল দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ওই সময়েও মহম্মদ ইসমাইলের কী অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর এই সংগ্রাম সারা ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। ১৯৬৭ সারে তিনি লোকসভার সি পি আই (এম)

প্রার্থী হিসাবে বারাকপুর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। পরে ১৯৭১ এবং ১৯৮০ সালে ওই একই কেন্দ্র থেকে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন।

মহম্মদ ইসমাইল অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হল কোনো অবস্থাতেই তিনি রাগ করতেন না, টেনশন বলে তাঁর কিছু ছিল না এবং অসংখ্য শ্রমিকের সাথে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তিনি অনেক দিন তার বড় ভাইয়ের পরিবারের সাথে বাস করতেন। শেষের দিকে তাঁর জীবন কাটে সি আই টি ইউ'র ৫৩ নং জগদীশ চন্দ্র দাশ বোসের রোডের অফিসে। প্রস্টেট অপারেশনের পরে শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও মনের জোর তাঁর অটুট ছিল। ১৯৯০ সালের ১৪ নভেম্বর সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে জীবনাবসান হয় এই চিরতরুণ শ্রমদরদী নেতার।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রান মহম্মদ ইসমাইল ছিলেন অকৃতদার। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম, শ্রমিক আন্দোলন এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা – এই তিনটি ধারার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল মহম্মদ ইসমাইলের মধ্যে। শ্রমিক আন্দোলনকে তিনি যেমন জাতীয় সংগ্রামের মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তেমনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিভেদের উর্ধ্বে উঠে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক শ্রমজীবী ঐক্য স্থাপন করেছিলেন। এইভাবে বামপন্থী আন্দোলনকে সুসমৃদ্ধ করেছিলেন মহম্মদ ইসমাইল।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা জ্যোতি বসু বলেছেন, "তাঁর কাছ থেকে আমি ট্রেড ইউনিয়নের অনেক কিছু শিখেছি।" তিনি আরও বলেন যে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার সংগ্রামে ইসমাইলের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও নীতিহীনতার বিরুদ্ধে এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে লড়াই সেই লড়াইয়ে মহম্মদ ইসমাইলের জীবন ও আদর্শ আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। শ্রমিকদের প্রতি ইসমাইলের এক অগাধ বিশ্বাস ছিল। যে কোনো অবস্থাতেই তাঁদের সাথে মিশে যেতে পারতেন তিনি। এই শ্রদ্ধেয় নেতাকে কবি জীবনানন্দ দাশের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই।

'তোমাকে দেখার মতো চোখ – তবু
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই – তুমি,
আজো পৃথিবীতে রয়ে গেছ...'

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী)– সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

হরেকৃষ্ণ কোঙার



জন্ম: ৫ আগস্ট ১৯১৫। বর্ধমান জেলার রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে। বাবার ব্যবসায়ের সূত্রে অল্প বয়সেই মেমারি থানার দক্ষিণ রাধাকান্তপুর গ্রামে চলে আসেন। বাবা : শরৎচন্দ্র কোঙার, মা : সত্যবালা দেবী। শৈশবেই কমরেড কোঙার রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

১৯৩০ সালে শুরু হয় দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন। কমরেড কোঙার তখন মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের নবম শ্রেণীর ছাত্র। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন। হাইস্কুলের ছাত্র। এর পরবর্তীকালে তিনি, বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখার্জি প্রমুখ আব্দুল হালিমের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং কমিউনিস্ট আদর্শের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। তিনি সরোজ মুখার্জি, বিনয় চৌধুরীর কাছ থেকে মার্কসবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে থাকেন। তখনও তিনি পুরোদমে বিপ্লববাদী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিপ্লববাদী কার্যকলাপের সময় তিনি ধরা পড়েন এবং ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত হন। ১৯৩৩ সালে আন্দামানে নির্বাসিত হন। আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী অবস্থায় তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে থাকেন। তিনি নারায়ণ রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে তিনি মুক্তি পান। ওই বছরই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে আন্দামান থেকে ফেরার পর প্রথমে তিনি কলকাতা ও হাওড়ায় পার্টির কাজকর্ম শুরু করেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে বর্ধমানে যে শক্তিশালী ক্যানেল আন্দোলন চলেছিল তিনি সেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন।

১৯৩৮ সালের ব্র্যাডলি থিসিস অনুযায়ী তখন কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই কাজ করতেন। কলকাতা, বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলির কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ভার ছিল তাঁর ওপরে। এই যোগাযোগ তাঁকে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বামপন্থী চিন্তার বিকাশ ঘটানোর যে সুযোগ এনে দিয়েছিল তিনি তার পূর্ণ ব্যবহার করেন।

১৯৫৩ সালের ১৭-২১ ডিসেম্বর কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য ষষ্ঠ সম্মেলন থেকে তিনি রাজ্য কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের ১৬-২১ জানুযারি ওই একই হলে অনুষ্ঠিত সপ্তম রাজ্য সম্মেলন থেকে রাজ্য

সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য হন। ১৯৫৮ সালে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত পার্টির পঞ্চম বিশেষ কংগ্রেস থেকে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হন। পার্টির অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিতর্কের সময় ১৯৬১ সালের এপ্রিলে বিজয়ওয়াদায় অনুষ্ঠিত অবিভক্ত পার্টির ষষ্ঠ তথা শেষ কংগ্রেসে জাতীয় পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের যে ১২ জন সদস্য নির্বাচিত হন তার অন্যতম ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। এই জাতীয় পরিষদ পরে ২৫ জন সদস্যের যে কেন্দ্রীয় কমিটির গঠন করে, তিনি সেই কমিটিরও সদস্য হন।

১৯৫৭ সালে হরেকৃষ্ণ কোঙার কালনা (দ্বি আসন) কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১ সালে তিনি কালনা কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় ভারত সরকার কমরেড কোঙারকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালেও তিনি একই কারণে গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৪ সালে সংশোধনবাদীদের পার্টি থেকে বিতাড়নের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সি পি আই (এম)-এর প্রতিষ্ঠার সময়ই তিনি পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত কোচিন কংগ্রেস এবং ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত মাদুরাই কংগ্রেস থেকে কমরেড কোঙার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন। তিনি সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতার সঙ্গে লড়াই করেন।

বর্ধমানের ক্যানেল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের কৃষক আন্দোলনের হাতেখড়ি। এরপর তিনি আজীবন ছিলেন সারা ভারতের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। সারা ভারত কৃষকসভার মোগা সম্মেলন থেকে সর্ব প্রথম তিনি সি কে সি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের ১৩-১৯ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের মোগাতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর অমৃতরস সম্মেলন, মায়াভরম সম্মেলন ও ত্রিচুর সম্মেলন থেকে সি কে সি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৬৮ সালে মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত হয় কৃষক সভার উনিশতম সম্মেলন। এই সময় তিনি আত্মগোপন করেন। মাদুরাই সম্মেলন থেকে তিনি সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। তখন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কোঙার সারা ভারত কৃষকসভার সম্পাদক ছিলেন। বরশুল সম্মেলন, পাঞ্জাবের রকা কালান সম্মেলন ও সবশেষে রাজস্থানের শিকার সম্মেলন থেকে কমরেড কোঙার এই পদে পুনর্নির্বাচিত হন।

২৩ জুলাই ১৯৭৪-এ মাত্র ৫৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

একজন কমিউনিস্ট একজন মানুষ, একজন নির্ভিক যোদ্ধা

শান্তিময় ঘোষ

ভারতের কমিইনস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র অন্যতম নেতা, মেহনতি মানুষের সংগ্রামী সাথী, সারা ভারতের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান, বিপ্লবী নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার আর আমাদের মধ্যে নেই।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভীক যোদ্ধা হিসাবে যে বিপ্লবী জীবনের শুরু, গতিশীল জীবনে দিনের পর দিন বিপ্লবী তত্ত্ব ও প্রয়োগধারায় তাকে সমৃদ্ধ করে সুনিপুণ সংগঠক, মেহনতি মানুষের নিজস্ব সম্পদ সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক হরেকৃষ্ণ কোঙারের বিপ্লবী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। এক বিশেষ বিপ্লবী উপাদানে গড়া স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য আত্মত্যাগে উৎসর্গিত কৃষক সাধারণ বিশেষত ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষীর অকৃত্রিম বন্ধু এবং নির্মম জমিদারি শোষণ ও তার নিষ্ঠুর বিষাক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে অবিচল নির্ভিক যোদ্ধা হিসাবে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতের মেহনতি মানুষ বিশেষত সংগ্রামী কৃষকের মহান নেতার মর্যাদা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করে গিয়েছেন। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব ও পার্টির ঐক্য রক্ষা করতে এবং শ্রমিক কৃষক মৈত্রীকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার দিকে তার লক্ষ্য ছিল অপরিসীম। সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তি আজ তাই হরেকৃষ্ণ কোঙারের জীবনাবসানে নিদারুণভাবে আহত ও শোকবিহ্বল।

বর্ধমান জেলার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসাবে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৫৩ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছরেরও অধিক প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক বা সভাপতি হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার দায়িত্ব পালনের পর তিনি সারা ভারত কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক ও দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে সীমাবদ্ধ ভূমিসংস্কারও যে একমাত্র কৃষক ও খেত মজুরদের নিজস্ব সক্রিয় উদ্যোগেই কার্যকরী রূপ পেতে সক্ষম তার দিকেই কৃষক সভা এবং জনসাধারনের দৃষ্টি নিবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছেন। হরেকৃষ্ণ গোঙারের সঙ্গে পরিচয় ও জানাশোনা থাকলেও তাঁর সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ২৪ পরগনা জেলা কেন্দ্রে কাজ করার সময় থেকে। সংশোধনবাদীদের বর্জন করে বিপ্লবী তত্ত্ব ও আদর্শে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তখন গঠিত হয়েছে। বনগাঁ ছেড়ে দায়িত্ব পড়েছে জেলা কেন্দ্রে কাজ করার। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, নিজের আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনসাধারণ বিশেষত কৃষক সাধারণের জীবন সংগ্রামের প্রতি গভীর সমবেদনা ও অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অগণিত কৃষকের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আদর্শ ও কর্তব্যে অবিচল হরেকৃষ্ণ দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়েও প্রাণোচ্ছ্বল উদ্দীপনা নিয়ে কৃষক সমাজের বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য ঘটনাবহুল জীবনের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেছেন। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও গণতান্ত্রিক মানুষ তাঁদের একজন সুযোগ্য ও মহান সেনাপতিকে হারাল।

ভারতের ভূমি ব্যবস্থা, কৃষি সংকট ও সমস্যা সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ কোঙারের অপরিসীম ব্যবহারিক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। সমগ্র কৃষক সমাজ এবং কৃষক আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠকদের সঙ্গে এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ বোধ করি খুব কম নেতার পক্ষেই গড়ে তোলা সম্ভব। কমরেডদের প্রতি অসীম দরদ ও মমত্ববোধ তাঁকে প্রতিটি কমরেডের অত্যন্ত কাছের মানুষ করে তুলেছে। প্রত্যেক কমরেডের কাছে তিনি ছিলেন সদালাপী সাথী, পরিবারের আপনজন ও দরদী নেতা। শ্রেণী শত্রুর নিষ্ঠুর আক্রমণ বা গুপ্ত ঘাতকের হাতে কমরেডদের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি বিচলিত ও মর্মাহত হয়েছেন নিদারুণভাবে, ঘৃণায় গুমরিয়েছেন কিন্তু তার প্রকাশ ছিল শান্ত, সংহত ও অচঞ্চল। নরপিশাচের হিংস আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত বর্ধমানের বাহাদুর কৃষক – তাই ছিল তাঁর বেদনার, তাঁর গর্বের বিষয়। সার্থক সেতাপতির ন্যায় তাই সৈনিকদের রক্তদান ও

আত্মত্যাগে মর্মান্তিকভাবে ব্যথিত হলেও আত্মসমর্পণ না করে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী মানুষের মাথা উঁচু করে লড়াই করার গৌরবে তিনি ছিলেন উদ্ভাসিত। প্রতিটি বক্তৃতা ও আলোচনায় তাই মহান ভিয়েতনামের আত্মত্যাগ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সমগ্র মেহনতি মানুষের আদর্শস্থানীয় হিসাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আদর্শ ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে নির্ভীক ও বিচক্ষণ হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতবাদের ওপর বিশ্বাস ছিল দৃঢ় ও প্রত্যয়যুক্ত এবং এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ছিলেন অবিচল শক্ত মানুষ। তথাপি অন্যের মতবাদ ও চিন্তাকে যথাযথ মূল্য দিয়ে গুরুত্ব সহকারে বোঝার চেষ্টা করা ও তাকে সম্মান দেওয়ার নমনীয় মানসিকতা নিয়ে প্রতিটি বিষয় তিনি আলোচনা করতেন।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বপদে থেকেও প্রাদেশিক কৃষকসভার কাজকর্মের ব্যাপারে আলোচনার সময়ে অন্য মত থাকলেও কখনও নিজের মত কে চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব তাঁর ছিল না।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হিসাবে কৃষক ফ্রন্টে পার্টির শ্লোগানকে কৃষক সভার মধ্য দিয়ে কার্যকরী করতে এবং যুক্তফ্রন্টের স্বল্পকালীন অবস্থানের সুযোগে কৃষকের ঐতিহাসিক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে এবং তাকে সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দিতে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে পাওয়ার পর অত্যাচার ও আক্রমণের কঠিন পরিস্থিতিতে এবং তৎপরবর্তীকালে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মধ্যে কৃষক আন্দোলনকে ধরে রাখতে ও তাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কৃষক আন্দোলনের সংগঠক কর্মীদের লৌহদৃঢ় ঐক্যকেই শাসক শ্রেণীর আক্রমণকে মোকাবিলা করার মূল ভিত্তি হিসাবে তিনি দেখতেন। কৃষকদের অর্জিত অধিকার রক্ষার প্রশ্নে কমরেডদের সংগ্রামী ঐক্যকেই একমাত্র গ্যারান্টি হিসাবে এই ঐক্যের ব্যাপারে সর্বাধিক জোর দিতে চেয়েছেন।

মেহনতি মানুষ ও কৃষক সাধারণের ওপর ছিল তাঁর অসীম বিশ্বাস ও আস্থা। পার্টির বক্তব্য যে সঠিক এবং এই সঠিক বক্তব্যই যে কৃষকের জীবনের জটিল সমস্যার সমাধানে সক্ষম তা তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন এবং এই বক্তব্য যে কৃষক সমাজ একান্তভাবেই গ্রহণ করবে এই গভীর বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থা নিয়ে তাকে কৃষকের গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ও অসাধারণ যোগ্যতায় সফলও হয়েছেন।

শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা ও জনসাধারণের ওপর অপরিসীম বিশ্বাস ও ভালোবাসা তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ও বক্তৃতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রেণী শত্রুর আক্রমণের মুখে তিনি ছিলেন স্থির নির্ভীক যোদ্ধা। '৭২ সালের পর প্রচণ্ডতম সন্ত্রাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে শাসকশ্রেণী ও তার ঘাতকবাহিনীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সমালোচনা করার সময় তাঁর প্রতিটি শব্দ ও বক্তব্যে কমরেডদের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। দুঃখ ও কান্নার দাবদাহের মধ্যেও তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি ছত্রে প্রচণ্ড সংকট ও দুর্গম চলার পথে অরাজকতা এবং প্রতিহিংসার কঠিন পরিস্থিতিতে সজাগ সতর্ক থেকে সমস্তরকম অবস্থার মোকাবিলা করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিটি বাঁক ও মোড়ের সম্মুখীন হয়ে নূতন চলার পথ আলোকিত করে এগিয়ে চলার সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন।

জীবনের শেষ বছরগুলিতে হরেকৃষ্ণ কোঙার কৃষক আন্দোলনের নতুন দিক এবং অতীতের কর্মধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও গভীর আত্ম জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে পুরনো দিনের আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ফাঁকগুলি উপলব্ধি করতে সজাগ হয়েছিলেন। কঠিন অধ্যবসায়, অনন্য সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান, অপরিসীম নিষ্ঠা এবং মার্কবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বের উপলব্ধিতে কৃষক আন্দোলনের নতুন তাৎপর্যকে জনসাধারণ ও কৃষকের সামনে স্বভাবজাত সহজ পদ্ধতিতে তুলে ধরে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন। তাই এই সময়ে বিশেষভাবে প্রতিটি কমরেডের সঙ্গে অসীম উৎসাহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে তিনি বুঝতে চাইছিলেন কমরেডরা কী ভাবছেন এবং সত্যিকারের সমস্যা কোথায়। তিনি জানতের সমস্যার মধ্য থেকেই তার সমাধান পথ খুঁজে নেবে। আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর প্রগাঢ়। আর এই অগাধ আত্মবিশ্বাসেই প্রতিটি সংকট মুহূর্তে বিভেধ বিভ্রান্তি ও হতাশা কাটিয়ে সাধারণ মানুষ ও সংগঠকদের অগাধ আস্থা ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকতে অসাধারণভাবে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

[১ আগস্ট, ১৯৭৪-এর গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত]

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

শরদীশ রায়



জন্ম: ১৪ (মতান্তর ১৫) জানুয়ারি ১৯১৭। বীরভূম জেলার নগরী গ্রামে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে জমিদারে পরিণত হওয়া সামন্ত পরিবারে। বাবা: কৃষ্ণ দাস রায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদপুষ্ট এই সামন্ত পরিবারের ওপর ব্রিটিশ প্রভাব ছিল যথেষ্ট। আবার একই সাথে ছিল আধুনিক চিন্তার আলোক চল। তাঁর ঠাকুরদা জমিদারী সামলানোর সাথে সাথে লেখাপড়া শিখে উকিল হয়েছিলেন। তাঁর ঠাকুরদার এক ভাই সেই যুগে ডাক্তারি পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন। ফেরেন নি। কলকাতায় বসবাস করতেন এবং সেখানে প্রবাসী বিপ্লবীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আর এক ভাই রায় সাহেব উপাধি পেয়ে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন এবং ১৯২১ সালে গঠিত প্রথম ইউনিয়ন বোর্ডের মনোনীন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

শিক্ষা, স্বচ্ছলতা এবং প্রতিষ্ঠার এই পারিবারিক পরিবেশে জন্ম নেওয়া শরদীশ রায়ের লেখাপড়া শুরু হয় বিহারের সাঁওতাল পরগনার আমজোড়া হাই স্কুলে। থাকতেন ছাত্রাবাসে। দেশে তখন বেজে উঠেছে আইন অমান্য আন্দোলনের ভেরী। সেই ভেরীর নিদান শুনে আইন অমান্য করে জেলে গিয়েছিলেন ১৪ বছরের কিশোর শরদীশ রায়। এই 'রাষ্ট্র বিরোধী' ছাত্রকে বহিষ্কার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। চলে আসেন সিউড়ি। ভর্তি হন বেণীমাধব ইনস্টিটিউশনে। এখানে স্কুল শিক্ষা শেষ করে বর্ধমান রাজ কলেজে ইন্টার মিডিয়েট পড়েন। এরপর বর্ধমান মেডিক্যাল স্কুল থেকে এল এম এফ কোর্স শেষ করে ডাক্তার হয়ে ফেরেন নিজের জেলা বীরভূমে।

বর্ধমানে পড়ার সময়েই রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দৃঢ় হয়। ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এলেও তখনকার দিনের আরও অনেকের মতো জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই কাজ করতেন। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সহ সম্পাদকও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শরদীশ রায় ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ অর্জন করেন। ১৯৬৪-তে পার্টি ভাগ হলে তিনি সি পি আই (এম) বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। রায় ১৯৩১, ১৯৪৯ এবং ১৯৬৫ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৮৫ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। সেই সময় তিনি রাজ্য কমিটিরও সদস্য ছিলেন।

১৯৬২ সালে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত কাটোয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি প্রথম লোকসভায় নির্বাচিত হন। বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী কংগ্রেস প্রার্থী অনিল কুমার চন্দ-কে পরাস্ত করে তাঁর সেই বিজয় বীরভূমে বামপন্থী রাজনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ পালন করে ছিল। পরবর্তীতে কেন্দ্র ভাঙাগড়া হয়ে বোলপুর কেন্দ্র হলে ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত তিনি বোলপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১৯৬৭ ছাড়া প্রতিবারেই নির্বাচিত হন। ১৯৮৪-তে অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি লোকসভায় সি পি আই (এম) সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন।

১৯৮৫-র ৫ মে দিল্লির একটি হাসপাতালে তার জীবনাবসান হয়।

আজীবন বিপ্লবী

দিলীপ গাঙ্গুলী

সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, সি পি আই (এম)

শরদীশ রায় বীরভূম জেলার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। ১৯১৭ সালের জানুয়ারিতে বীরভূম জেলার নগরীতে এক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারে ডাঃ শরদীশ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ওই এলাকায় তখন উচ্চশিক্ষার কোনো বিদ্যালয় না থাকার কারণে তাঁর মায়ের শিক্ষানুরাগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁকে ভর্তি করা হয় বিহারের সাঁওতাল পরগনায় বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আমজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। ওই বিদ্যালয়ের তখন সুনাম ছিল। পরবর্তীকালে শ্রদ্ধেয় শরদীশদা সিউড়ি বেনীমাধব ইনস্টিটিউশনে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হন। আই এস সি এবং ডাক্তারি পড়েন বর্ধমানে। বর্ধমানে তখন খুব শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন।

১৯৩০-৩২-এর পর কিশোর ও যুবকদের মধ্যে যেন নূতন এক জীবনের জোয়ার এসে পড়ে। এদিকে পাশাপাশি ক্যানেল আন্দোলন ও আসানসোলের নবজাগরিত শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনও বেশ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

এই সময় শরদীশদা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং আন্দোলনের যাঁরা শীর্ষে ছিলেন তাদের মধ্যে একজন বিবেচিত হন। এইভাবে বর্ধমানের জনজীবনে আজীবন নিরলস রাজনৈতিক কর্মী শরদীশ রায়ের প্রবেশ।

শরদীশ রায় শুধু ছাত্র কর্মী হিসাবে নয় একজন অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেও পরিচিত হন। পার্টি সার্কেলেও তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেন। শাহেদুল্লাহ্ সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় গোড়ার দিকে সরকারি নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের কারণে এক অতিসতর্কতা আমাদের পার্টির সম্প্রসারণের গতি মন্থর করে রেখেছিল। শুধু বর্ধমানেই নয়, সারা দেশেই ছিল। পরে আত্মসমালোচনায় তা বর্জিত হয়। এরকম না হলে শরদীশ রায় বহু আগেই পার্টি মেম্বার হতেন। কারণ প্রারম্ভেই তাঁকে পার্টি সদস্যের মতোই বিচার করা হত। এই আস্থা তিনি নিজগুণেই অর্জন করেছিলেন।

১৯৩৮ সালের বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাত্র আন্দোলনের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। শহীদ সুকুমার ব্যানার্জি ও তার সঙ্গী শরদীশ রায় প্রমুখের অবদানও ছিল প্রচুর। ফলে, কংগ্রেসের মধ্যে থাকা বামপন্থীদের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির শহরে খুব প্রভাব বাড়ল। গ্রাম এলাকায় ক্যানেল আন্দোলন, রায়নায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গণ আন্দোলন শুরু হল।

এদিকে শহরে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি সহ বিভিন্ন মঞ্চ ও গণসংগঠনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বামপন্থী ও কমিউনিস্ট শক্তিকে সদর মহকুমায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলল। এইসবের মধ্যেই শরদীশ রায় ছিলেন। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে কমিউনিস্টরা যখন সদর মহকুমা কংগ্রেসের নেতৃত্ব পায়, তখন শরদীশ রায় ছিলেন সদর মহকুমার অন্যতম সদস্য। পরবর্তীকালে তিনি জেলা কমিটির সদস্য ও সহ সম্পাদক হন। (হরেকৃষ্ণ কোঙার সদর মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন।)

১৯৪১-৪২ সাল থেকে জাপানি বোমা এবং যুদ্ধের নানান আঘাতের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য 'ফাস্ট এইড' চিকিৎসা এবং এ আর পি (এয়ার রোড প্রিকশন্) সম্পর্কে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্লাস শুরু হয়। শরদীশ রায়কে এর ভার নিতে হয়েছিল। তিনিই শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪২ সালে পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও আক্রমণ হতে থাকে। ছাত্র ফেডারেশন ছাত্রদের মধ্যে একে সফলভাবে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়। এরও প্রথম সারিতে ছিলেন শরদীশ রায়।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও রিলিফের কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বর্ধমানে তখন সরকারি সাহায্যের রিলিফের জন্য সস্তায় রেশনের দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল এবং আন্দোলনের ফলে বড় সংখ্যায় তা আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া রিলিপ কিচেন সেই সময় খোলাতে হয়। এরপর সমস্যা দাঁড়ায় অনশন মৃতপ্রায় (স্টারভেশন কেস) মানুষকে বাঁচানো এবং তাদের চলৎশক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব দিয়ে এর একটা বড় দায়িত্ব পালন করতে হয় শরদীশ রায়কে। ওই বছরেই দামোদরের বন্যায় নাদনঘাট প্লাবিত হলে শরদীশদাকে সেখানেও পাঠানো হয়েছিল।

তিনি বেশ উঁচুতে অবস্থিত ডাকবাংলোয় সেন্টার করে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে বেশ কিছুদিন রিলিফের কাজ করেছিলেন। তারপর তিনি বীরভূম জেলায় ফিরে এসে প্রয়াত সুরেন ব্যানার্জি, কেশব দাস, কালীপদ বশিষ্ঠ প্রমুখের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন দেন। শরদীশ রায় ১৯৪২ সালে বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

পার্টির দুর্দিনে শরদীশদা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তৎকালীন নেহেরু সরকার সুপরিকল্পিতভাবে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে আঘাত হানে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য কমিউনিস্ট পার্টির একটা অংশ কংগ্রেসের সাথে ঐক্য রক্ষা করে কংগ্রেসের কর্মধারায় যুক্ত হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে প্রধান দায়িত্ব পালন করেন এস এ ডাঙ্গে এবং তাঁর কিছু অনুগতরা। যাঁরা ঐক্যের বিরোধী ছিলেন তাঁদের নেহেরু সরকার দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে বিনা বিচারে জেলে আটক করে রাখে। এই রকম একটা প্রতিকূল অবস্থায় যাঁরা সংশোধনবাদীদের হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করার জন্য ও প্রকৃত মার্কসবাদী পার্টি গড়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তার মধ্যে জাতীয় পরিষদের ৩১ জন সভ্য জাতীয় পরিষদের সভা বয়কট করেন। তাঁদের সমর্থন জানানো হয় ২৪-২৫ এপ্রিল, ১৯৪৬ কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য পরিষদের সভা থেকে। রাজ্য পরিষদের সভা থেকে ডাঙ্গে চক্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য সমস্ত পার্টি সদস্যদের অনুরোধ জানানো হয়।

সংশোধনবাদ পার্টিকে কুরে কুরে খায়, শ্রেণী সংগ্রাম থেকে বিরত রাখে, সুবিধাবাদ সঙ্কীর্ণতাবাদ হঠকারিতা ও হতাশার জন্ম দেয়। ১৯৬১ সালে বর্ধমানে নবম রাজ্য সম্মেলনে

(১৭-২২ জানুয়ারি) সংশোধনবাদী গোষ্ঠীর বিবরণ দেওয়া হয়। সংশোধনবাদী ডাঙ্গে চক্র পার্টির ভাঙ্গন শুরু করে দেয়। এই রকম কঠিন অবস্থায় বীরভূম জেলা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চক্রান্ত শুরু হয়ে যায়। পার্টি অফিস (টিনবাজার, বর্তমানে সিউড়ি জোনাল অফিস) প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পুড়িয়ে দেয়। তৎকালীন জেলা সম্পাদক সুরেন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগ করে (রাজনগরে চীনের সমর্থনে এবং ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার) ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার করে। বিচারে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বেশিরভাগ জেলা কমিটির সদস্য আত্মগোপন করেন। শরদীশদা তখন সাংসদ। যে কয়েকজন পার্টিকে সংশোধনবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শরদীশ রায়।

১৯৬৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বেলা ২টায় নানুর থানার অন্তর্গত কীর্ণাহার গঞ্জে এক বাড়িতে জেলা কমিটির আহ্বানে একটা জি বি হয়। সভাপতিত্ব করেন চিত্ত রায়। রাজ্য পরিষদের পক্ষ থেকে ভবানী সেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি চীন-ভারত সীমান্ত সংগ্রাম প্রসঙ্গে জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের পক্ষে বক্তব্য উপস্থিত করেন এবং পার্টি বিরোধী প্রচার পুস্তিকার কথাও উল্লেখ করেন।

শরদীশ রায় ও টুরকু হাঁসদা দৃঢ়ভাবে জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত ভোট হয়। ভোটে ভবানীবাবু পরাজিত হন। সভা শেষ হয়। ভবানীবাবু রাগান্বিত হয়ে বিপক্ষে কারা কারা ভোট দিয়েছেন তাদের নামের তালিকা সংগ্রহ করতে বলেন। এই দিনই পার্টি মূলত ভাগ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে শরদীশ রায়, কেশব দাস, টুরকু হাঁসদাকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৬৪ সালে ২-৩ অক্টোবর জেলার ৭ম পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কীর্ণাহারে। প্রকাশ্য সমাবেশ হয় লক্ষীতলায়। ভাষণ দেন জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, আব্দুল হালিম, সত্যনারায়ণ চন্দ্র।

বীরভূম জেলায় কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিতরূপে এগিয়ে যায়। বাঁধা বিপত্তি উপস্থিত হলে জেলার অন্যান্য নেতৃত্বের মতো শরদীশদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সিউড়ি, দুবরাজপুর, ইলামবাজার, খয়রাশোল প্রভৃতি এলাকায় কৃষক আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন শরদীশ রায়।

৫০-এর দশকে দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত বিদাইপুর কলাইডাঙ্গা গ্রামে জোতদারদের উদ্বৃত্ত খাস জমির বর্গাদারীস্বত্বের দাবিতে আন্দোলনে একজন আদিবাসী কৃষক নিহত হন। শরদীশদা হেতমপুর থেকে সাইকেল করে প্রায় ১৫ কিমি দূরবর্তী গ্রাম বিদাইপুর কলাইডাঙ্গা গ্রামে পৌঁছে নির্যাতিত কৃষকদের কাছে যান। ওইদিন পুলিশের খারাপ ভূমিকা সম্পর্কে দুবরাজপুর থানায় ডেপুটেশন দেন।

১৯৫৯ সালে সাঁইথিয়ায় শরদীশ রায়কে কংগ্রেসীরা আক্রমণ করে। ১৯৬৯ সালে দুবরাজপুরে জমির আন্দোলনকে ভেস্তে দেবার উদ্দেশ্যে দুবরাজপুর শহরে জোতদার ও একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধলে—শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সংগঠিতভাবে কাজ করেন। পরিশেষে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

নিরময় চাঁটাই কর্মীদের আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ও পরবর্তীকালে সরকারি অধিগ্রহণের বিষয়ে তাঁর ও শৈল মুখার্জীর অবদান স্মরণীয়।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট খারিজ হলে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে পশ্চিমবাংলা–প্রফুল ঘোষের নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রিসভা গঠন করলে প্রতিবাদ সংগঠিত হয় বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। দুবরাজপুরে প্রফুল্ল ঘোষকে কালো পতাকা দেখানো হয়। বর্তমান পার্টির নেতা সেলিমদাদের এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করে দু'দিন থানা লক-আপে রেখে সিউড়ি চালান করে। শরদীদশা কোর্ট লক-আপে ও জেলখানায় পার্টি কর্মীদের সাহায্য করেন।

১৯৭৪ সালে সি পি আই (এম) আহুত যাত্রা গ্রামে (দুবরাজপুর থানা) জনসভায় প্রধান বক্তা শরদীশদা। কংগ্রেসের কর্মীরা লাঠি, টাঙ্গি নিয়ে সভা ভঙ্গ করে দেন। এর প্রতিবাদে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জনসভা করা হয়। শরদীশদা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সিউড়িতে জ্যোতি বসুর জনসভা ভঙ্গ করার চক্রান্ত করেছিল কংগ্রেস কর্মীরা। শরদীশ রায় এক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শরদীশ রায় ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত চিকিৎসক হিসাবে বর্ধমানে ছিলেন। এই সময় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তাকে চিকিৎসকের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ষাটের দশকে তিনি সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ৬২ সালে তিনি লোকসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। '৬৭ সালে তিনি হেরে যান। তারপর ১৯৭১ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বোলপুর লোকসভার সাংসদ ছিলেন। সাংসদ হিসাবে তিনি সফল। সংসদের পার্টির টিমের নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। সংসদীয় দলের হয়ে মস্কোয় প্রতিনিধিত্ব করেছেন। স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার সভায় উপস্থিত না থাকলে তিনি সভা পরিচালনার দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছিলেন। শরদীশ রায়, সুরেন ব্যানার্জির পর পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেই সময় তাকে রাজ্য কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়। এর আগেও তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিনি বীরভূম জেলা পার্টির মুখপত্র 'ধূসরমাটি' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৬১ সালের ২৭ নভেম্বর। তিনি ছিলেন সু-চিকিৎসক। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও সিউড়ি সদর হাসপাতালেও চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন অকৃতদার। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার ছিল নিবিড় যোগাযোগ। সকলকে এক পরিবারের মানুষ মনে করতেন। তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খবর রাখতেন। তাঁর সামাজিকতা বোধ গভীর ছিল। কোনো উন্নাসিকতা ও নির্লিপ্ততা লক্ষ করিনি। আজকের দিনে এটা অনেক সময় দেখা যায় না। কর্মীরা নিঃসংকোচে, সহজে তাঁর কাছে যেতে পারত। সমস্যা তুলে ধরত। আপাত গাম্ভীর্যের আড়ালে তাঁর মন ছিল শিশুর মত সরল। যে কোনো সমস্যায় হস্তক্ষেপ করতেন। এড়িয়ে যেতে দেখিনি। দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তিনি ছিলেন সাহসী, নির্ভীক ও অন্যায়ের প্রতি ক্ষমাহীন। দুর্জয় সাহস ও পরোপকারের জন্য কয়েকবার শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। তবুও থামেননি। সাইকেলে, পায়ে হেঁটে তিনি শহরের রাস্তায় ঘুরতেন। জনসংযোগ ছিল নিবিড়। মানুষের মাঝেই ছিল তাঁর অবস্থান। প্রকৃত কমিউনিস্ট কর্মীর মতোই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। পার্টি কর্মীদের বক্তব্য শুনতেন, গুরুত্ব দিতেন। ফলে কর্মীরা সন্তুষ্ট হত। কখনই নিজেদের অবাঞ্ছিত মনে করত না। তাই কর্মীদের চোখে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন শরদীশদা। কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে এই তার

সাফল্যের চাবিকাঠি। দেখেছি ডিসপেনসারি থেকে ১.৩০ টায় বেরিয়ে কীর্তি স্টোরে বসে গল্প করতেন।

সকলের সঙ্গে কথা বলতেন। আজকের দিনে অনেক মানুষ ভাবেন পার্টির নেতা ঘোরাটোপে বন্দী, সাধারণের থেকে আলাদা। তাঁর অধরা, আত্মকেন্দ্রিক। এ ধারণার ভিত্তিমূলে সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন তিনি।

তিনি ছিলে Informative। কমিউনিস্ট নেতার এই গুণ বাঞ্ছনীয়। মানুষের সঙ্গে মেশার ফলে খবর সংগ্রহ করতে পারতেন। অনেক সময় পার্টির সাধারণভাবে যা নজরে আসত না, সে খবর তিনি রাখতেন।

দিল্লি থেকে ফেরার পর সিউড়ি স্টেশন থেকে রিক্সায় আসার সময় রিক্সা চালকের কাছে খোঁজ খবর নিতেন। অনেক সময় যা তখন পার্টির নজরে আসেনি তা তিনি জেনে নিতেন। এসেই পার্টি অফিসে ব্যানার্জিদার সঙ্গে কথা বলতেন। জেলা কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগসাধনে কখনই শৈথিল্য ছিল না।

তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এলাকার উন্নয়নে তাঁর বাস্তব পরিকল্পনা ছিল। আজকের দিনে আমরা অনেক সময় যান্ত্রিকতায় ভুগি। সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি না। ফলে অনেক সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। শরদীশদা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। দেখেছি শত ব্যস্ততার মধ্যেও বিবাহ, শোক অনুষ্ঠানে, উৎসবের সময় সাধারণ মানুষের মাঝে গিয়েছেন। শারদোৎসবের শেষ দিনে নগরী গ্রামে কিছুক্ষণের জন্যেও গিয়ে সকলের কুশল সংবাদ নিতেন। ফলে, জনসংযোগশূন্য ঘেরাটোপের শিকার কখনই হননি। এতে তাঁর কমিউনিস্ট চরিত্র গঠনেও কোনো বাঁধা হয়নি। এ শিক্ষা আমাদের গ্রহণীয়। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অক্লান্ত পরিশ্রম করার মানসিকতা, কর্মীদের প্রতি সজাগ সতর্ক অভিভাবকত্ব তাঁকে সহজেই শিক্ষক, দক্ষ সংগঠকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

শৈলেন দাশগুপ্ত



জন্ম: ২৪ অক্টোবর, ১৯২০। বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ছাত্র অবস্থায় দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন এবং এক বছরের মধ্যে ১৯৩৬ সালে রাজনৈতিক ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৮ সালে উত্তীর্ণ হন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এবং ওই বছরেই কৃষকদের মধ্যে সংগঠন করার কাজ শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করে ১৯৩৯ সালে।

১৯৪৪ সালে ১১৭ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে আত্মগোপন করেন। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক দপ্তরের কাজে যোগদান করেন।

শৈলেন দাশগুপ্ত ১৯৫৮ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পার্টি ভাগ হলে যোগ দেন সি পি আই (এম)-এ এবং যুক্ত হন পার্টির কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর পরিচালনার কাজের সাথে। ১৯৬৫ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হন।

পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলে তিনি রাজ্য দপ্তর পরিচালনার কাজে সাথে যুক্ত হন। পার্টির কাজের ক্ষেত্রে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল নিখুঁতভাবে পার্টি দপ্তরের দৈনন্দিন কাজ, নির্বাচনী প্রস্তুতির খুঁটিনাটি কাজ, পার্টির টাকা-পয়সার হিসাবপত্র রাখার কাজ ইত্যাদি পরিচালনা করা। ১৯৭৮ সালে তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য হন।

১৯৮২ সালে তিনি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে হন পার্টির রাজ্য সম্পাদক, রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯৯১ সালে নির্বাচিত হন পলিটব্যুরোর সদস্য হিসাবে। মৃত্যুর সময় তিনি রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন।

১০ জুলাই ২০০১-এ তাঁর জীবনাবসান হয়।

বামফ্রন্ট পরিচালনায় সুদক্ষ ছিলেন

বিমান বসু

সদস্য, পলিটব্যুরো, সি পি আই (এম)

শৈলেন দাশগুপ্ত আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু শৈলেন দাশগুপ্ত আমাদের সামনে কমিউনিস্টদের চলার পথে সাহায্য করার জন্য কর্তব্য ও আদর্শনিষ্ঠার কিছু নজির রেখে গেছেন, যা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত বলে মনি করি। আমার নিজের মনে নেই ঠিক কোন্ বছর প্রথম শৈলেনদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছিল। তবে এটা আমার

পরিষ্কার মনে আছে ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে তৎকালীন রাজ্য পার্টি দপ্তরে সমর মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে গেলে শৈলেনদাই বাইরে একটা বেঞ্চিতে আমাকে বসতে বলেছিলেন। শৈলেনদাকে বলেছিলাম কেন আমি সমরদার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সমরদার সঙ্গে দেখা হলে স্বাধীনতা পত্রিকায় একটি বিবৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। সমরদা আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন এবং বুঝিয়েছিলেন কেন পার্টি ওই বক্তব্য বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে। সমরদার বক্তব্যে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। রাজ্য দপ্তর থেকে চলে আসার আগে শৈলেনদাকে জানিয়েছিলাম আমি সমরদার বক্তব্যে সন্তুষ্ট নই। উত্তরে শৈলেনদা জানিয়েছিলেন, ওটাই পার্টির সিদ্ধান্ত। আবার আমার মনে আছে ১৯৬৪ সালে শৈলেনদাকে বিধানসভা ভবনের এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখেছি, আর আমিও এদিক ওদিক দু'একজন চেনা এবং এম এল এ খোঁজ করছি। শৈলেনদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কেন এসেছি–আমি বলেছিলাম, বি পি এস এফের সম্মেলনের জন্য কিছু অর্থসংগ্রহ করতে অপেক্ষা করছি। শৈলেনদা বলেছিলেন, তিনি তো পার্টির তহবিলের জন্য এম এল এ-দের কাছে টাকা সংগ্রহ করতে প্রতি মাসেই আসেন। পরে জেনেছি পার্টি ফান্ডে অর্থসগ্রহ করতে প্রতি মাসহই শৈলেনদা একদিন বা দু'দিন বিধানসভা এলাকায় যেতেন। পার্টির স্বার্থে কর্তব্য পালনে শৈলেনদার কাজের এটি একটি নমুনা। মনে রাখতে হবে, ওই সময়ের অনেক আগেই শৈলেনদা কিন্তু পার্টির রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন এবং রাজ্য দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত ছিলেন।

১৯৬৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের পর ভারতের বুকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ অনুযায়ী কমিউনিস্ট আন্দোলন ও পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলাদাভাবে পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে ওঠে এবং কেন্দ্রীয় দপ্তর হয় মধ্য কলকাতার বৈঠকখানা রোডে যা পরে স্থানান্তরিত হয়ে দক্ষিণ কলকাতায় লেক প্লেসে চলে যায়। এই কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরেও শৈলেনদা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। পার্টি যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে দেখেছি শৈলেনদাকে। সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠনের কাজের প্রয়োজনে এবং কেন্দ্রীয় পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীর সুবাদে কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরে আমাকে প্রায়শই যেতে হত। অনেক সময়ে আমাকে নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে হত। ফলে শৈলেনদার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতাম। কোনো দিন শৈলেনদাকে কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিছি, বরং দেখেছি নীরবে নিভৃতে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গড়ে ওঠার এক বছরের মধ্যে পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর দিলিতে স্থানান্তরিত হয় এবং শৈলেনদা পুনরায় রাজ্য দপ্তরের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। বামফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠলে শৈলেনদাকে দেখেছি রাজ্য পার্টি ও বামফ্রন্টের কাজে প্রমোদ দাশগুপ্তকে সাহায্য করতে। আবার দেখেছি জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে। অর্থাৎ সরকার ও বামফ্রন্টের সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে শৈলেনদা প্রায় শুরু থেকেই দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তী সময়ে শৈলেনদা পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক হয়েছেন–বামফ্রন্ট কমিটির সভাপতি হয়েছেন এবং নিজের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিশ্রম করেছেন।

শৈলেনদা'র কমিউনিস্ট কার্যকলাপের ইতিহাস ছয় দশক উত্তীর্ণ। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচীত নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিদারুন দারিদ্রের মধ্যে দিনযাপন করেও রাজনৈতিক কর্তব্যে অবহেলা করেননি। শৈলেনদার কাছে শুনেছি নিজের ছোট বোন যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসার ঠিকঠাক ব্যবস্থা করতে না পারায় তার মৃত্যু হয়েছে। শৈলেনদা নিজেও যক্ষ্মা রোগে ভুগেছেন। ওই কষ্টের দিনগুলিতে শুনেছি শৈলেদার ব্যক্তিগত সাহায্যকারী হিসাবে বৌদির (শৈলেনদার স্ত্রী) ভূমিকা ছিল অনবদ্য। এই কষ্টের দিনে কলকাতার মানিকতলা এলাকায় শৈলেনদা

থাকতেন। সেই সময়ে পার্টির কলকাতা জেলার কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। ওই সময়ে ভগৎ অয়েল মিল ও মানিকতলা ফ্লাওয়ার মিলে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং এলাকায় পার্টির সংগঠনের কাজে নিজেকে ভীষণভাবে যুক্ত রেখেছিলেন বলে শুনেছি। সময়টা সম্ভবত ১৯৪৭-৪৮ সাল হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ওই সময়ে পার্টির কাজ দায়িত্বসহকারে করার জন্য প্রকাশ্যে বেশি মানুষ এগিয়ে আসতেন না বলেই জানি।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একবার শৈলেনদার লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনির বাড়িতে ছাদের টালি খুলে রাতে চোর ঢোকে এবং কিছু জিনিসপত্র চুরি করে। শৈলেনদা টালিগুলি আবার লাগিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রমোদদা বলেছিলেন, পার্টি সাহায্য করবে এবং তোমার বাড়ির ছাদ ঢালাই করে নিতে হবে, না হলে আমাদের পার্টির কাজে অসুবিধা হবে।

পার্টিতে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে শৈলেনদার যাই বক্তব্য থাকুক না কেন সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে তাকে কার্যকর করার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচেষ্টা চালাতেন। কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলাবোধ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এটা সকলেই জানেন। কিন্তু আজকালকার কমিউনিস্টদের অনেকে রয়েছে যাঁরা নিজেদের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত না হলে নিষ্ঠার সঙ্গে তা কার্যকর করার চেষ্টা করেন না। লোক দেখানো কাজ করেন যা শৈলেনদার কাজের ধারায় কখনো দেখিনি। আবার কোনো কমিটির সদস্য না হলে কেউ কেউ কাজে ঢিলেমি করেন বা কমিটি সদস্য হওয়ার জন্য লড়াই করেন। শৈলেনদা কোনো সময় কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য লড়াই করেননি। শৈলেনদা কোনো সময় কিমিট সদস্য ছিলেন, আবার কখনো ছিলেন না। কিন্তু তাতে শৈলেনদা পার্টির দায়িত্ব পালনে কোনো শিথিলতা দেখাননি।

গত কয়েক বছর শৈলেনদা মাঝে মাঝে অসুস্থ হতেন এবং অসুস্থ অবস্থাতেও কিছু না কিছু কাজ করতেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারে শৈলেনদা ছিলেন সরল ও সহজ এবং অমায়িক স্বভাবের মানুষ। শৈলেনদার সঙ্গে কোনো বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তর্ক হলে তা কখনো মনে রাখতেন না– তার পরেই আবার স্বাভাবিক ব্যবহার করতেন। শৈলেনদার এই ধরনের স্বভাবের জন্য অনায়াসে শৈলেনদাকে যে কোনো ব্যক্তিগত কথা বলা যেত আবার শৈলেনদা রসিকতাও করতেন এবং নানা ধরনের রসিকতা যা সকলকে সব অবস্থায় বলাও সম্ভব না। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও শৈলেনদা কখনো কখনো রসিকতা করেছেন যা সাধারণত অনেকেই করতে পারবেন না।

আবার ১৯৫২ সাল থেকে রাজ্যে নির্বাচন প্রস্তুতির কাজে মুজাফ্ফর আহ্মদকে সাহায্য করেছেন, পরবর্তী সময়ে জ্যোতিবসু–প্রমোদদা–সরোজদাকে সাহায্য করেছেন এবং নিজেও নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু নিজে নির্বাচিত হওয়ার জন্য কোনোদিন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এখন যে ব্যতিক্রমী কিছু চিন্তার প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ নির্বাচনে প্রার্থী না হলে পার্টির কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের মনে রাখা উচিত নিজে প্রার্থী না হলেও মনপ্রাণ দিয়ে পার্টি সংগঠন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এ রাজ্যে সমস্ত সাধারণ নির্বাচনে দপ্তরে থেকে শৈলেনদা কাজ করেছেন, কিন্তু নিজে প্রার্থী হননি। শৈলেনদা পার্টি সংগঠন ও রাজনৈতিক কাজ পচিালনা করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং নিজের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে চিন্তা না করে পার্টির স্বার্থে সারা জীবন যেভাবে কাজ করেছেন তা অনুকরণীয় বলে মনি করি। শৈলেনদা লাল সালাম।

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

অম্বিকা চক্রবর্তী



ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্যসেনের অন্যতম প্রধান সহযোদ্ধা অম্বিকা চক্রবর্তী ১৮৯২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) রাউজান থানার দেওয়ানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দনকুমার চক্রবর্তী। এই পরিবারের সাথে ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ ছিল। ১৯০৭ সালে অম্বিকা চক্রবর্তী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯১৩ সালে দামোদর বন্যায় তিনি রিলিফের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৬১৬ সালের শেষ দিকে অম্বিকা চক্রবর্তী বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত জেলে ছিলেন। ১৯১৮ সালে মুক্তির পর মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে অনুরূপ সেন অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখদের নিয়ে বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির গঠিত হয়।

১৯২১ সারে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে দু'টি ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয়। সেই ধর্মঘট দু'টিতে মাস্টারদা সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর নির্দেশে বিপ্লবীরা অংশগ্রহণ করেন। তিনি চা বাগানের কুলিদের দাবি নিয়ে লড়াই করেন।

১৯২২ সালে মাস্টারদা সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর উদ্যোগে চট্টগ্রামে বিপ্লবী কমিটির কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়। কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার পর বাংলাদেশের বিপ্লবীরা ১৯২৩ সালে চট্টগ্রামে মিলিত হন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

বিপ্লবের কাজে অর্থের প্রয়োজন তাই ১৯২৩ সালে সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ প্রমুখ চট্টগ্রাম শহরের 'সুলুকবাহার' নামক একটি বাড়িতে আত্মগোপনাবস্থায় ইংরেজ মালিকানাধীন আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানির কয়েক সহস্র টাকা লুঠ করেন এবং ওই রেলওয়ে ডাকাতির ১৮ হাজার টাকা নিয়ে অস্ত্র কেনার জন্য অম্বিকা চক্রবর্তী কলকাতায় আসেন, সন্ধান পেয়ে পুলিশ ঐ 'সুলুকবাহার' বাড়ি ঘিরে ফেলে। সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অনন্ত সিং, উপেন ভট্টাচার্য, দেবেন দে (খোকা) ও রাজেন দাস গুলি চালাতে চালাতে পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে নাগরখানা পাহাড়ে আশ্রয় নেন। পুলিশ বাহিনী ওই পাহাড় ঘিরে ফেলে। অন্যরা পালিয়ে যান, সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী আহত হয়ে পড়ে যান। তাঁরা রিভলবারসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে বিষপানে মৃত্যু শ্রেয় জ্ঞানে

পটাশিয়াম সায়নাইড খান ও উভয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যু হয় না। বিচারে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাঁরা মুক্তি পান। ওই সময় বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকার 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' চালু করে। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে এই অর্ডিন্যান্স চালু হওয়ার সাথে সাথে বাংলার বহু বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। ২৫ অক্টোবর অম্বিকা চক্রবর্তীও গ্রেপ্তার হন। বাংলার বিদ্রোহী যুবকদের যখন গ্রেপ্তার করা চলতে থাকে সেই সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনাতে। তিনি ওই খবর চেয়ে চিঠিতে লেখেন– 'ঘরের খবর পাইনে কিছুই/গুজব শুনি নাকি/কুলিশ পানি পুলিশ সেথায় লাগায় হানাহানি/শুনছি নাকি বাংলাদেশে গান হাসি সব ঠেলে/কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।'

অম্বিকা চক্রবর্তী বিভিন্ন জেলে ৪ বছর কাটান। ১৯২৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি ও সূর্যসেন মুক্তি পান। ওই কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের দু'দলের মধ্যে মারামারি হয় এবং সূর্যসেনের মাথায় আঘাত লাগে। ছাত্র নেতা সুখেন্দু দত্ত বিপক্ষ দলের ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে আনীত হওয়ার পর মারা যান। ঐ সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে সুভাষ বোস কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনকে ভোটে পরাস্ত করে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের এই কলকাতা সম্মেলনে সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তীরা সুভাষ বোসের নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। এ প্রস্তাব ভোটে পরাস্ত হয়।

ওই সময় বি পি সি সি-র পক্ষ থেকে বন্দবিলা সত্যাগ্রহ তদন্ত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন অম্বিকা চক্রবর্তী। তিনি ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামের যুব সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

কলকাতা কংগ্রেসের পর চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে অম্বিকা চক্রবর্তী সহ-সভাপতি ও সূর্যসেন সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এই সময় ভারতবর্ষের রাজনীতি খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট, হরতাল, পুলিশের লাঠি চার্জে গুরুতর আহত লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব, এবং ভারতব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার, তারপরই ১৯২৯ সালে দিল্লির কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বোমা বিস্ফোরণ ও ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি, বিদ্রোহী বাংলার যুব সমাজের রক্তে ঝড় তোলে।

১৯৩০ সালে এই পটভূমিতে সংগঠিত হয় চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাত ১০টা নাগাদ ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের নির্দেশে ফিল্ড মার্শাল গণেশ ঘোষ ও ক্যাপ্টেন অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুলিশ হেডকোয়ার্টার অস্ত্রাগার দখল করা হয়। ওই একই সময়ে জেনারেল লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগার দখল করে নেওয়া হয়। বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পাহাড়ের উপর অবস্থিত টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কেন্দ্র দখল করে ধ্বংস করা হয়। কাজ সম্পূর্ণ অম্বিকা চক্রবর্তীর দল পুলিশ অস্ত্রাগারে প্রধান বাহিনীর সাথে মিলিত হন।

পুলিশ অস্ত্রাগারে বৃটিশ পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামিয়ে ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাস্টারদা সূর্যসেন। স্বাধীন বিপ্লবী সরকার গঠনের ঘোষণার পর অস্ত্রাগারে আগুন লাগিয়ে অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনী পাহাড়ে চলে যান। পাহাড়ী অঞ্চল

তার নখদর্পনে থাকায় চারদিন তিনি পাহাড়ে বিপ্লবী বাহিনীকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। ২২ এপ্রিল ১৯৩০, জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অম্বিকা চক্রবর্তী গুরুতর আহত হন। তাঁর কপালে গুলি লাগে এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্যসেনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন 'অম্বিকাবাবু, অম্বিকাবাবু!' বনবিহারী দত্ত অম্বিকাদার শরীর স্পর্শ করে বলেন, 'অম্বিকাদা আপনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের কথা শুনছেন? কথা বলুন অম্বিকাদা। 'অম্বিকা চক্রবর্তী তাকাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শক্তিতে পেরে উঠছিলেন না। রক্তে তার দুচোখ বন্ধ হয়ে গেছে। সুবোধ রায় নিচু হয়ে বললেন, 'অম্বিকাদা' শত্রুর পরাজয় হয়েছে। তারা পালিয়েছে। জয় হয়েছে আমাদের। উঠতে চেষ্টা করুন। আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে চলুন। আমরা আপনাকে নিয়ে যাব।' অম্বিকা চক্রবর্তী তার সঙ্গে টাকাপয়সা ও কাগজপত্র যা ছিল অতিকষ্টে সূর্যসেনের হাতে দিয়ে বলেন, 'সময় নষ্ট না করে সবাইকে নিয়ে রওনা হন।' তারপর পুনরায় অজ্ঞান হয়ে যান। রাত তিনটে নাগাদ একপশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে জঙ্গলের মধ্যে তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলেন অদূরে তার সাথীদের মৃতদেহ পড়ে আছে। ওই জালালাবাদ যুদ্ধে বালক টেগরা বল সহ ১২ জন নিহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে ইংরেজ বাহিনীর ৮২ জন নিহত হয়। পাশে পড়ে থাকা রিভলবারটা অতি কষ্টে হাতে নিয়ে অম্বিকা চক্রবর্তী এগুতে থাকেন। হঠাৎ তিনি মৃতবৎ গুরুতর আহত আরেক বিপ্লবী অর্ধেন্দু দস্তিদারের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তার তলপেটে গুলি লেগেছিল। পরদিন ২৩ এপ্রিল সকালবেলা পুলিশ ও মিলিটারিরা জালালাবাদ পাহাড়ে আসে ও সারাদিন জীবিত বিপ্লবীদের ধরার জন্য তন্নতন্ন করে পাহাড়ের ঝোপঝাড়ে অনুসন্ধান চালায়। তারা মৃতদেহগুলিতে পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়। অম্বিকা চক্রবর্তী ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন বর্শা হাতে গ্রামের চৌকিদার এসে হাজির। সে অম্বিকা চক্রবর্তীকে দেখে চমকে ওঠে। অম্বিকা চক্রবর্তী রিভলবার তাক করেন। চৌকিদার বর্শা ফেলে হাত তুলে দাঁড়ায়। ওই গ্রাম্য মুসলিম চৌকিদারই অম্বিকা চক্রবর্তীকে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনেন। অম্বিকা চক্রবর্তী এখানে ওখানে ঘুরে অবশেষে আমজাদ আলির গৃহে আত্মগোপন করেন। ৬মে পর্যন্ত ১২দিন আমজাদ আলি তাঁকে লুকিয়ে রাখেন ও সেবাশুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলেন। সেই সময় গ্রামে গ্রামে মিলিটারি চৌকি বসেছে। জাঠ সৈন্য, নিজামের বাহিনী, গোর্খা সৈন্য ও টমিরা বাড়ি বাড়ি তল্লাসি চালাচ্ছে। যুবক দেখলেই তাদের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে লাল, নীল পরিচয়পত্র চালু হয়েছে। লাল পরিচয়পত্র ধারকরা হলেন সাংঘাতিক। তাদের রোজ সূর্যাস্তের পূর্বে থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হত। অম্বিকা চক্রবর্তী ও সহবিপ্লবীদের জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয় এবং সূর্যসেনের মাথার দাম দশ হাজার টাকা ঘোষিত হয়। আমজাদ আলি ও তার পরিবার ওই অর্থলোভে প্রলোভিত হননি। এরপরে তিনি কিছুদিন আশ্রয় নেন বৃদ্ধা বিধবা ফয়েজুন্নিসা বিবির বাড়িতে। ওই বাড়িতে থাকাকালীন ফয়েজুন্নিসার কিশোর ছেলে জালালাবাদ পাহাড়ে একটি রিভলবার কুড়িয়ে পায়। ওই রিভলবারটি অম্বিকা চক্রবর্তীকে দেয়। অম্বিকা চক্রবর্তী ওই বাবদ কিছু অর্থ দিতে চাইলে ফয়েজুন্নিসা বিবি বলেন ওই রিভলবার দেশের কাজে ব্যবহৃত হলে তিনি সুখী হবেন। তিনি টাকা নিতে অস্বীকার করেন। ওই আত্মগোপনাবস্থায় সূর্যসেনের সাথে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তিনি ওই শেলটার ছেড়ে অন্য শেলটারে চলে যান। অম্বিকা চক্রবর্তী ৯ অক্টোবর ১৯৩০

আত্মগোপনাবস্থায় গ্রেপ্তার হন। প্রায় তিন বছর বিচারাধীন থাকার পর ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ স্পেশাল ট্রাইবুনাল কোর্টের রায়ে তার ফাঁসির আদেশ হয়। পরে হাইকোর্ট ২ মে ১৯৩৩ ওই ফাঁসি রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

অম্বিকা চক্রবর্তী ধরা পড়ার আগে আত্মগোপনে থাকার সময় একবার দিনের বেলা পুলিশ তার গোপন আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলে। তিনি পাশের শ্যাওলাপচা পুকুরে সারাদিন ও সারারাত নাক উঁচু করে লুকিয়ে থাকেন। তার বুকে ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং গলা দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু হয়। তার ক্ষয়রোগ ধরা পড়ে। কিন্তু অম্বিকা চক্রবর্তী তা মানতে নারাজ। ওইসময় তাঁকে সেবাশুশ্রুষা করেন আরেক বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটু)। পরে তারকেশ্বর দস্তিদারের সূর্যসেনের সাথে ফাঁসি হয়। অম্বিকা চক্রবর্তী পটিয়ায় ধরা পড়েন। ধরা পড়ার পর তার থাইসিস রোগ নির্ণয় হয় এবং তাঁকে কিছুদিনের জন্য সিউড়ি জেলে রাখা হয়।

স্পেশাল ট্রাইবুনাল কোর্টের বিচারের পর ১৯৩০ সালে প্রথম ব্যাচে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখ এবং দ্বিতীয় ব্যাচে ১৯৩৩ সালে ডা. নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ আন্দামানের সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামীরূপে প্রেরিত হন। রত্নগিরি দুর্গ জেল থেকে ডাঃ নারায়ণ রায় ও নিরঞ্জন সেনকে আন্দামানে আনা হয়। আন্দামান জেলে ডাঃ নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন বিপ্লবীদের কমিউনিস্ট মতবাদে আকৃষ্ট করেন। রীতিমতো পড়াশুনা, ক্লাস ইত্যাদি নেওয়া হয়। আন্দামানে ১৯৩৫ সালে সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠিত হয়।

অম্বিকা চক্রবর্তী আলিপুর জেলে ছিলেন। ১৯৩৪ সালে ওই জেলে আবদুল হালিম ও ১৯৩৫ সালে সরোজ মুখার্জি বন্দী হয়ে আসেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মার্কসিস্ট লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। অম্বিকা চক্রবর্তী কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন। ১৯৩৬ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে ও দেউলি জেলে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালে স্থাপিত হয় সারাভারত ছাত্র ফেডারেশন ও প্রগতি লেখক সংঘ। ১৯৩৭ সালে আন্দামানে নির্বাসিত বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার আন্দোলন শুরু করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। ওই বৎসর মার্চ-এপ্রিল মাসে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্র ফেডারেশন, নিখিলবঙ্গ ছাত্র সংসদ, বঙ্গীয় ছাত্র কংগ্রেস, ছাত্র লীগ একত্রে আন্দোলন ও সভা করে। ১৯৩৭ সালে দেশে ফেরার জন্য সেলুলার জেলে বন্দীরা ৩৭ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। আন্দামানে বন্দীরা ১৯ আগস্ট গান্ধিজীর অনুরোধে অনশন প্রত্যাহার করেন। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আন্দামানের বন্দীদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে আনা শুরু হয়।

পুনরায় বন্দীরা ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে আলিপুর ও দমদম জেলের মধ্যে অনশন শুরু করেন। ডা. রাজেন্দ্রপ্রদাস ও মহাদেব দেশাই গান্ধিজীর দূত হিসাবে অনশনভঙ্গের অনুরোধ নিয়ে আসেন। বন্দীরা অনশনে অটুট থাকেন। বন্দীমুক্তির দাবিতে বাংলার স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিশাল বিশাল মিছিল হয়। পার্কে পার্কে বন্দীমুক্তির দাবিতে সভাসমিতি হতে থাকে।

বন্দীদের কাছে এবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, সুভাষ বোস, শরৎ বোস, মুজফ্ফর আহ্মদ ও সোমনাথ লাহিড়ীকে অনশনভঙ্গের অনুরোধ নিয়ে পাঠায়। ২৮ দিন পর বন্দীরা অনশন ভাঙ্গলেন। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের দোরগোড়ায় এসে পড়েছে। চট্টগ্রামে দিনদুপুরে ও রাত্রে জাপানি বোমা পড়ছে। তদুপতি ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরে বাংলায় ৫০ লক্ষাধিক

নরনারীর মৃত্যু ঘটেছে। এই মন্বন্তর মনুষ্যসৃষ্ট। দায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এইসব মন্ত্রণায় বন্দীরা অস্থির হয়ে ওঠেন। স্বদেশের এ বিপদে তারা কিছুই করতে পারছেন না। ১৯৪৬ সালে সূর্যসেনের বিপ্লবী সহকর্মী চট্টগ্রামের বীরকন্যা কল্পনা দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরূপে চট্টগ্রাম কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অম্বিকা চক্রবর্তী গণেশ ঘোষরা তাঁকে ভোটদানের জন্য জেল থেকে আবেদন জানান। ওই সময় বন্দীমুক্তির দাবিতে শৈলশিখর দার্জিলিং থেকে চট্টগ্রামের সমুদ্রতট পর্যন্ত বিশাল বিশাল সভা ও মিছিল হয়। বিপ্লবী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত আন্দামান জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন। বন্দীমুক্তি কমিটির সভাপতি কংগ্রেস নেতা জে সি গুপ্ত। বন্দীমুক্তি কমিটির সভায় জ্যোতি বসু, খোকা রায়, বিপ্লবী সাতকড়ি রায়, মুজফ্ফর আহ্‌মদ ও অনেকে বন্দীমুক্তির জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এই তীব্র বন্দীমুক্তির আন্দোলনের মুখে বাংলার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে সোহরাওয়ার্দি বলেন রাজবন্দীরা মুক্তি পাবে, কিন্তু দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করা হবে। বন্দীমুক্তি কমিটির এক বর্ধিত সভায় স্থির হয় যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে।

১৩মে ১৯৪৬ লাল মিঞা সাহেব ও জ্যোতি বসু আইনসভায় সকল এম এল এ-দের কাছে বন্দীমুক্তির দাবিতে প্রচারপত্র বিলি করেন। জ্যোতি বসু বন্দীমুক্তির ওপর একটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দেন। স্পিকার তা বাতিল করে দেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়। ওই দাঙ্গার ফলে বন্দীদের মুক্তি পিছিয়ে যায়। অবশেষে ১৯৪৬ সালের ৩১ আগস্ট সারাদিন প্রবল বর্ষণের মধ্যে আলিপুর জেল ও ঢাকা জেল থেকে বীর বন্দীরা মুক্তি পান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দাঙ্গা পরিস্থিতির মধ্যেও শত শত হিন্দু-মুসলমান আমজনতা জেল গেটে তাঁদের মুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। অপেক্ষমান জনতাকে সম্বোধন করে অম্বিকা চক্রবর্তী বলেন, 'হিন্দু-মুসলমান দেশবাসীর সম্মিলিত আঘাতেই সাম্রাজ্যবাদী কারাগারের দুয়ার খুলেছে, বন্দীরা মুক্তি পেয়ে দেশবাসীর মধ্যে ফিরে এসেছেন বিশ্রাম করতে নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রামের আয়োজন করতে।'... ওই একই দিনে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পান গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লালমোহন সেন, সুবোধ চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ বন্দীরা। মুক্তি পেয়েই লালমোহন সেন সন্দীপে ভাতৃঘাতী দাঙ্গা থামাতে গিয়ে নিহত হন।

মুক্তপ্রাপ্ত বন্দীরা কলকাতায় ৮ ডেকার্স লেনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক দপ্তরে চলে আসেন।

১৯৪৫-৪৬ সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য গণআন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। নৌ বিদ্রোহ, ২৯ জুলাইয়ের সাধারণ ধর্মঘট, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে ব্যারিকেড লড়াই, রসিদ আলি দিবস, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র-যুব-মহিলা আন্দোলন, গ্রামের কৃষকদের তেভাগার লড়াই ইত্যাদিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস ওঠে। নৌবিদ্রোহ ইত্যাদিতে কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নৌ বিদ্রোহে কংগ্রেসের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, লিগের ঝাণ্ডা ও কমিউনিস্ট পার্টির লালঝাণ্ডা একসাথে উত্তোলিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে পারে ভারতে তার শাসন টিকিয়ে রাখার ভিত্তি দেশী ফৌজ ও সেনাবাহিনী যখন লালঝাণ্ডার সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তখন অবিলম্বে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ কংগ্রেস ও লীগের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তি না করলে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এসে যাবে। তাই ১৯৪৬ সালে পরিকল্পিতভাবে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি করা হয়, এবং

১৯৪৭ সালে এই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করে। বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বি-খণ্ডিত করে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হল। কংগ্রেস, লীগ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগ করে নিল। লক্ষ লক্ষ লোক সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎপাটিত হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হল এবং স্রোতের মত এক দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৪৭.৪ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্র খরচ করে ৪৫৬ কোটি টাকা অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ৫২ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় করে মাত্র ৮৫ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের প্রতি সম্পূর্ণ বিমাতৃসুলভ ব্যবহার শুরু করে। এখনও তাই চলছে।
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল বিভক্ত দুই দেশ অর্থনীতিতে স্বাবলম্বী হতে পারবে না। তদুপরি নিজেরা অবিরাম মারামারি কাটাকাটি করবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। বর্তমান হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের বৈরিতা তাই প্রমাণ করে।
পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভুলে যান। পূর্ববঙ্গাগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু শিয়ালদহ, বনগাঁ ইত্যাদি স্টেশনে, পোড়ো পরিত্যক্ত বাড়িতে, ক্যাম্পে অমানুষের মতো পশুর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। কয়েক লক্ষ শিশু ও উদ্বাস্তুর মৃত্যু ঘটে। এইসব অসহায় উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষার জন্য, মানুষের মতো বাঁচার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলন শুরু করে এবং বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলিকে একত্রিত করে একটি মঞ্চ তৈরি করে সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সর্মসূচীরই ফলশ্রুতি হল ১৯৫০ সালের ১২ আগস্ট ইউ সি আর সি (ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল বা সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ) গঠন। অম্বিকা চক্রবর্তী হলেন এই ইউ সি আর সি-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তার নেতৃত্বে ছিন্নমূল বাস্তুহারাদের দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। উদ্বাস্তুদের কাছে তিনি কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত হন।
১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি হলে তিনি আবার আত্মগোপন করেন ও ১৯৩৯ সালে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ১৯৫১ পর্যন্ত জেলে ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনে তিনি টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন।
ব্রিটিশ আমলে, কংগ্রেস আমলে অম্বিকা চক্রবর্তীকে অনেকবার কারাগারে যেতে হয়। সবমিলিয়ে ২৬ বছর তার কারাজীবন।
১৯৬২ সালের ৬ মার্চ কলকাতার রাজপথে এক পথ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

লেখক: তুষার সিংহ
সম্পাদক, ইউ সি আর সি, কলকাতা জেলা কমিটি

তথ্যসূত্র:
১. আমাদের পূর্বসূরিরা (প্রয়াত নেতৃবৃন্দের জীবনী), সম্পাদক: তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

আব্দুল কাদের চৌধুরী

বিপ্লবী আব্দুল কাদের চৌধুরী জয়পুরহাট জেলার কালাই থানার কাটাহার (সমশিরা) গ্রামের এক ছোট জমিদার পরিবারে ১৯০১ সালের ১০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল কাদের চৌধুরীর বাবার নাম আব্দুল লতিফ চৌধুরী, মায়ের নাম রহিমা খাতুন। অন্যান্য জমিদার জোতদারের মতো তার বাবা-দাদার পরিবারও ইংরেজ সরকারের ভক্ত ছিল। তার পরিবারে রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তিনি শৈশবে তার নানার বাড়ি শিকারপুর গ্রামের কাছে নুনগোলা এম. ই. স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি এই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পরে তিনি বগুড়া শহরস্থ করোনেশন হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই হাইস্কুলে পড়াশোনার সময় তিনি এই স্কুলেরই শিক্ষক যতীন্দ্র মোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন। যতীন্দ্র মোহন রায় শিক্ষকতা ছাড়াও গোপনে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আব্দুল কাদের চৌধুরী তার কাছ থেকেই দেশের রাজনীতির খবর পেতেন। তিনি করোনেশন হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় দূরারোগ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। ফলে তার এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়া হল না। পরে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯২১ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং ১৫ দিন হাজতবাসের পর মুক্তি পান। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে তাঁকে জমিদারীর কাজকর্ম দেখার জন্য বলা হলে তিনি ওই দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান। ফলে পরিবার থেকে তার পড়াশোনার খরচ বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে মামাবাড়ি থেকেই বগুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ডাক্তারি (ন্যাশনাল) পাশ করেন এবং পাঁচবিবি থানা সদরে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে প্রাইভেট প্যাকটিস শুরু করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গবঙ্গ আন্দোলন, ১৯০৮ সালে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের সাহসী ঘটনা ও এর ফলে ফাঁসি, জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনা তার মনে গভীর রেখাপাত করে। এসব ঘটনার খবর আব্দুল কাদের চৌধুরী পেতেন শিক্ষক যতীন্দ্র মোহন রায়ের কাছে। তিনি ধীরে ধীরে কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী অনুশীলন পার্টিতে যোগ দেন। ওই সময় দেশের বহু বিপ্লবী জেলে, না হয় বিভিন্ন ক্যাম্পে বন্দী ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরাজ আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ঐসব মামলা চালানোর জন্যে অনেক টাকার প্রয়োজন পড়ে। অনুশীলন পার্টির নেতা মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ওই সময় (১৯৩৩ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসে) দিনাজপুর আসেন এবং আব্দুল কাদের, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীসহ কয়েকজনকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, কলকাতা হাইকোর্টে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা টাকার অভাবে চালানো যাচ্ছে না। তিনি কিছু টাকা সংগ্রহ করে দিতে বলেন। এই টাকা সংগ্রহের জন্যেই আব্দুল কাদের ও অন্যরা হিলি রেলস্টেশনে ডাক লুট করেন। এই সাড়া জাগানো ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৩ সালের ২৭ অক্টোবর দিনগত রাতে। ওই সময়ে হিলিতে ১৭টি বড় বড় চালের কল ছিল। এ কারণে এখানে প্রচুর টাকা আনা-নেয়া হতো। হিলি রেলস্টেশন থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে পাঁচবিবি। এই পাঁচবিবি সদরেই থাকতেন আব্দুল কাদের। তার বাড়িতে বসেই হিলি অভিযানের কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়।

এদিকে স্টেশন মাস্টার (হিলি স্টেশন) ডাক লুটের পুরো ঘটনার কথা দ্রুত সান্তাহার পার্বতীপুর রেলস্টেশন, পাঁচবিটি, জয়পুরহাট ও ফুলবাড়িয়া থানাকে জানিয়ে দেন। ডাক লুটের ঘটনা ভোর হওয়ার আগেই পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন এবং চতুর্দিকে পুলিশ ছড়িয়ে দেয়া হয়। সমঝিরা ফেরিঘাটে নৌকায় আত্রাই নদী পার হওয়ার সময় দলনেতা প্রাণকৃষ্ণসহ ৭ জন ধরা পড়েন। তাঁদেরকে জমিদারের কাচারির বাড়িতে আটক রাখা হয় এবং ২৯ অক্টোবর বালুরঘাট থানার দারোগা দিনাজপুর পুলিশের হাতে বন্দীদের তুলে দেয়। ১ নভেম্বর পুলিশ কাদের চৌধুরীর পাঁচবিবি বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। ১৪ নভেম্বর বগুড়াতে পুলিশ ডা. কাদেরকে গ্রেফতার করে। এভাবে ১৫ দিনের মধ্যে ১৩ জন স্বদেশি কর্মী পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। বিচারে ডা. আব্দুল কাদের চৌধুরীকে ৭ বছর কারাদণ্ড দিয়ে তার সহকর্মীদেরসহ ভয়ঙ্কর আন্দামান জেলে পাঠানো হয়। এখানে এসেই তার মার্কসবাদে হাতে খড়ি।

অখাদ্য-কুখাদ্য প্রদান ও তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে তখন বন্দীরা আন্দামান জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু করে। ফলে তাদের ওপর নির্যাতন আরো বেড়ে যায়। দীর্ঘ ৩৭ দিন এই অনশন ধর্মঘটে ডা. আব্দুল কাদের চৌধুরী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এই অনশন ধর্মঘটের খরব দেশে পৌঁছলে আন্দামান রাজবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে প্রবল আন্দোলনের চাপে অবশেষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত বন্দীরা ছাড়া সকলেই মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বগুড়ায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব দেন ডা. আব্দুল কাদেরকে। বগুড়ায় এসে তিনি নতুন উদ্যোমে পার্টি গড়ার কাজে নেমে পড়েন। শুধু বগুড়ায় নয়, বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী জুড়ে তিনি কাজ করে যান। তার নেতৃত্বে বগুড়া জেলায় তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি বগুড়া জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। দেশ ভাগের পর গঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির ২০ সদস্যের মধ্যেও তিনি অন্তর্ভূক্ত হন। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৫ সালে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬৭ সালে মুক্তি পান। ১৯৬৮ সালে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হওয়ার পর ১৯৭০ সালে ছাড়া পান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ভারতে আশ্রয় নেন এবং আকাশবাণী থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের কথা বিশ্ববাসীকে জানান।

বিলোপবাদী খপ্পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে রক্ষার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান সারা দেশের বিপ্লবী কর্মীদের মনে ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। বহু আন্দোলনের জননায়ক এই বিপ্লবী দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৯৬ সালের ২ নভেম্বর রাত পৌনে বারোটায় জয়পুরহাট সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লেখক: মাহফুজা খানব ও তপন কুমার দে

তথ্যসূত্র:

গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রাকশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, ঢাকা।

নীরেন্দ্রলাল চৌধুরী

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নীরেন্দ্রলাল চৌধুরী ২০০৩ সালের ২২মে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী নীরেন্দ্রলাল চৌধুরী চিরতরে পর্দার অন্তরালে চলে যান। তিনি আর কখনো ফিরবেন না, কিন্তু তার মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ড যুগ যুগ ধরে বিপ্লবী চেতনার প্রতীক হয়ে উজ্জীবিত করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। এই বিপ্লবীর জন্ম চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলা সদরের কাছাকাছি এক জমিদার পরিবারে। ৯০ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত রোগে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। আজীবন তিনি ছিলেন এক গৌরবদীপ্ত সংগ্রামী মানুষ। বিশাল সম্পত্তির কারণে ভোগের ভিতর ডুবে না থেকে কিশোর বয়স থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার অগ্রজ মাস্টারদা সূর্যসেন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও তার শিক্ষক– রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক কমরেড যামিনী সেন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনুশীলন দলে যোগ দেন।

১৯২৮ সালে সীতাকুণ্ড উচ্চবিদ্যালয় থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ জানা গেল লর্ড এন্ডারনস সীতাকুণ্ড আসবেন, অনুশীলন দলের নির্দেশে শারীরিক প্রশিক্ষণের জন্য গঠিত ক্লাবের ৬ সহকর্মী ও শারীরিক শিক্ষক গোপনে এন্ডারসনকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেন। কিন্তু এন্ডারসন আসার আগে পুলিশ ক্লাবের সদস্যদের অন্তরীণ করে রাখেন। সে কারণে তিনি উক্ত বছর এন্ট্রাস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেন নি। লর্ড এন্ডারসন সীতাকুণ্ড ঘুরে যাওয়ার পর ছাড়া পান। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর জালালবাদ যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ১৯২৯ সালে নীরেন্দ্রলাল চৌধুরীসহ কয়েকজন সংগ্রামী ফতেয়াবাদ গ্রামের পূর্ব দিকে এক গোপন আস্তানায় সংগঠিত হয়ে কিছু করার জন্য সমবেত হলে গুর্খা সৈন্যরা সমস্ত গ্রাম ঘিরে তল্লাশি চালিয়ে একুশ জনকে গ্রেফতার করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ ও অন্যান্য অপরাধে গ্রেফতারকৃত একুশজনকে মিলিটারি ট্রাইবুনালে ১৫ দিনের সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে ১৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। নীরেন্দ্রলাল চৌধুরীসহ ৩ জনের ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ৩ মাস চট্টগ্রাম জেলে রাখার পর কলকাতা আলিপুর জেলে ৭ মাস এরপর মেদিনিপুর জেলে ৫ মাস রেখে কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে কালাপানির দেশ নামে খ্যাত আন্দামান সেলুলার জেলে নেয়া হয়। আন্দামান নেয়ার পথে তাদের বহনকারী জাহাজ প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে। জাহাজের অধিকাংশ যাত্রী বমি করতে করতে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আন্দামান পৌঁছতে পৌঁছতে জাহাজের সকল যাত্রী এমনকি নাবিকরাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকলকে স্ট্রেচারে করে জাহাজ থেকে নামাতে হয়।

আন্দামান পৌঁছে প্রাথমিকভাবে তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু অগ্রজ সংগ্রামী যোদ্ধাদের সাহচর্যে পুনরায় দৃঢ় মনোবলে জেলের মধ্যে বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করতে থাকেন। এসব সংগ্রামের অন্যতম পন্থা ছিল অনশন পালন, এমনকি অনেকবার আমরণ অনশনের পথও ধরতে হয়। আন্দামান জেলে আটক বন্দীদের মনে একটি বিশ্বাস ছিল একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ থেকে বিতাড়িত হবেই। জেলে থেকে তারা বুঝতে পারেন বিচ্ছিন্ন ও সন্ত্রাসবাদী পন্থায় আন্দোলন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হওয়া যাবে না। জেলে অধিকাংশ সংগ্রামী যোদ্ধাদের মত তিনিও মার্কসবাদী দর্শনে দীক্ষিত হন। সেখানে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীসহ অনেকের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে।

সাজা শেষ হওয়ার পর ১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আন্দরকিল্লায় তার পৈত্রিক বইয়ের দোকানে বসতেন এবং সেখান থেকে উত্তর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু, মিরশ্বরাই, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতেন।

আজীবন মেহনতি মানুষের শোষণ মুক্তির লড়াইতে তিনি যুক্ত থেকে সংগ্রামকে বেগবান করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে ছিল তার অগ্রণী ভূমিকা। ১৯৫৭ সালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ন্যাপ গঠিত হলে তিনি ন্যাপের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। সত্তর ও আশির দশকে সীতাকুণ্ড থানা ন্যাপের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। তার দুই ছেলে নীলাদ্রি চৌধুরী ও উত্তম চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত পাঠান। তারা দুইজন ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়ন-কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনে তার বড় ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র নীলাদ্রি চৌধুরী আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হন এবং পরবর্তীতে আন্দোলন করার অভিযোগে কারাভোগ করেন।

তার মন ও মনন ছিল শিশুর মত সরল। তিনি উন্নত সাংস্কৃতিক মনের অধিকারী ছিলেন। বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভোগের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা কখনও ছিল না। তার বাড়িঘর ছিল সীতাকুণ্ড এলাকার শোষিত-বঞ্চিত-মেহনতি সংগ্রামী মানুষের স্থায়ী ঠিকানা। ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়ন-কমিউনিস্ট পার্টির কোন না কোনো কর্মীকে তার বাড়িতে পাওয়াই যেত। সেখান থেকেই পরিচারিত হতো এসব সংগঠনের কার্যক্রম।

নীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অবস্থা বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল খুবই ভাল। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যথাসাধ্য সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। '৯০-এর দশকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের পর আমাদের দেশের অনেক বামপন্থি নেতার মার্কসবাদী দর্শন ত্যাগের কারণে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন শোষণ থেকে মুক্তির লড়াই মানুষ আদিম সমাজ থেকেই চালিয়ে আসছে এবং এই সংগ্রাম চলবেই– একদিন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা হবেই।

তিনি আজ নেই। কিন্তু তার ত্যাগের দর্শন ও সমাজ বদলের লড়াইয়ে অবিচল থাকার দৃঢ়তা অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। আজ এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, অনেকের বর্তমান সর্বসত্বায় যদি কিছুমাত্র ত্যাগ করার মানসিকতা ও শোষণমুক্তির লড়াই চালিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক দর্শন থেকেও থাকে তা তারা এই মহান বিপ্লবীর কাছ থেকে পেয়েছে। তার কাছে অনেকেই ঋণী, এ ঋণ কখনও শোধ করতে পারার নয়। অনেককে তিনি পিতৃতুল্য স্নেহ-মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। নীরেন্দ্রলাল চৌধুরী চলে গেলেন মহাপ্রয়াণে যা চিরসত্য। সবাইকে এ সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। তবে তিনি দিয়েছেন অনেক কিছু, নিয়েছেন অনেক কম। সমাজ ও দেশ হারিয়েছে এক দৃপ্ত সংগ্রামী চেনতার বিপ্লবীকে। তিনি নব প্রজন্মের কাছে পথ প্রদর্শক আদর্শ বিপ্লবী হয়ে থাকবেন।

লেখক: মাহফুজা খানব ও তপন কুমার দে

তথ্যসূত্র:

গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রাকশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, ঢাকা।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বরিশালের নিজস্ব বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তিনি ছিলেন বরিশালের উজিরপুর গ্রামের অধিবাসী ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৪ সালের ১২ আগস্ট বরিশালের গলাচিপা গ্রামে। ষষ্ঠীবাবু তখন গলাচিপা থানার দারোগা ছিলেন। সতীশচন্দ্রের জেষ্ঠ্য ভ্রাত্রা ছিলেন ঢাকা কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়। সতীশচন্দ্র উজিরপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু লেখাপড়ায় মন ছিল না বলে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। তারপরে প্রথমে উজিরপুর স্কুলে, পরে বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হলেন।

সতীশচন্দ্র শিক্ষক হিসাবে নিবিড় সান্নিধ্যে এলেন তরুণবয়স্ক ছাত্রদের। বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে ছাত্রসমাজ তখন চঞ্চল। দেশনায়কগণের সঙ্গে তারাও গ্রহণ করেছে স্বদেশি মন্ত্র। 'বন্দেমাতরম্' তাদের প্রাণ মাতানো মন্ত্র। এ মন্ত্র এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছে ছোট বড় সকলকে। বরিশালে মাতৃপূজার পুরোধা ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। সতীশচন্দ্র প্রথমে শিক্ষক হিসাবে, পরে নানা কাজের ভিতর দিয়ে অশ্বিনীকুমারের সান্নিধ্যে এলেন। অশ্বিনীকুমারই তাঁকে টেনে নিলেন রাজনীতির ভিতরে। সতীশচন্দ্র কাজ শুরু করলেন স্বদেশবান্ধব সমিতির সহকারী সম্পাদক হিসাবে। এর পূর্বে স্বদেশবান্ধব সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন উকিল পূর্ণচন্দ্র দে ও উকিল শ্রীচরণ সেন। আর বরাবরই সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক।

১৯০৬ সালে ১৩ ও ১৪ এপ্রিল বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে গভর্নমেন্ট পুলিশের সাহায্যে জোর করে ভেঙ্গে দিল প্রকাশ্য অধিবেশন। শুরু হল গোপন প্রস্তুতি। অগ্নিযুগের সাড়া পৌঁছাল সেবকমণ্ডলীর হৃদয়ে হৃদয়ে। প্রাদেশিক সম্মেলনের সময়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এসেছিলেন বরিশালে। তার উদ্দেশ্য ছিল মফস্বলে মৃত্যুঞ্জয়ী দল গঠন। বরিশালের স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর পরিচালনার ভার ছিল যাঁদের উপর, সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বারীন্দ্রকুমার সতীশচন্দ্রকে একটা রিভলবার দিলেন। সতীশচন্দ্র তার জীবনের লক্ষ্য ও চলার পথ খুঁজে পেলেন।

কনফারেন্সের পরেই বরিশালে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। অশ্বিনীকুমার ভারতের সকল প্রদেশে সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন এবং আশাতীত ফল পেলেন। আশি হাজার টাকা সংগৃহীত হল। অন্ন বিতরণে সতীশচন্দ্রের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশবান্ধব সমিতির শতাধিক পল্লি কেন্দ্র জনসেবায় তৎপর হয়ে উঠেছিল।

১৯০৮ সালে নরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরী এলেন নোয়াখালি থেকে বরিশালে। নোয়াখালিতে নরেনবাবু একটা বিপ্লবী দল গড়েছিলেন। নরেনবাবু বরিশালে স্বদেশবান্ধব সমিতির আখড়ায় লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাদি শিক্ষা দেবার ভার পেয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র ছিলেন এই সমিতির সহকারী সম্পাদক।

সতীশচন্দ্রের সঙ্গে নরেন ঘোষচৌধুরীর অন্তরঙ্গতা আরও নিবিড় হয়ে উঠল। দল-গড়া সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হল। নরেনবাবু বললেন, 'মুক্তিসংগ্রামীদের দল-গড়া সম্বন্ধে নোয়াখালীর হেমচন্দ্র দাস ও কুমিল্লার বসন্তকুমার মজুমদারের সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা

হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আপনারও কথা বলা আবশ্যক।' সতীশচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে নরেনবাবু ও মনোমোহন ঘোষকে (পরে ভোলানন্দ গিরি আশ্রমের মোহান্ত মণ্ডলেশ্বর স্বরূপানন্দ স্বামী) সঙ্গে নিয়ে হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের চট্টগ্রামে অবস্থিত বাড়িতে গিয়ে হেমবাবু ও বসন্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেন।

চট্টগ্রামের একটি নগণ্য পল্লিগ্রামে বসে এই গুপ্ত পরামর্শের ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে সতীশচন্দ্রের সক্রিয় নেতৃত্বে এক গুপ্ত বিপ্লবীদল গড়ে তোলা হবে। সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে ও নরেন ঘোষচৌধুরীর কর্মকুশলতায় বিভিন্ন জেলায় এই দল গড়ে উঠতে থাকে। শ্রীহট্ট ন্যাশনাল স্কুলটিকে কেন্দ্র করে যে বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছিল, কিছুদিন পরে সেই দলও নরেনবাবুর চেষ্টায় এই দলে যোগ দিল। নরেনবাবু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রামে এবং বরিশালের বিভিন্ন শহর ও পল্লি অঞ্চলে গুপ্তসমিতির শাখা স্থাপন করলেন। নরেনবাবু বিভিন্ন শাখা থেকে কর্মী ডাকিয়ে এনে একসঙ্গে মিলে কাজ সম্পন্ন করতেন। অধিকাংশ ছিল তরুণ যুবক। একজন ছিলেন পুলিশ অফিসের কর্মচারী, নাম তার অনন্ত মিত্র– অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি ডাকাতিতেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। আর যোগেন্দ্রনাথ বসু, রমণীকান্ত গুপ্ত ও ত্রৈলোক্যনাথ বসুও প্রথম থেকেই বিপ্লবীদল গঠনের কাজে সতীশচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

১৯০৮ সালের শেষ ভাগ। সতীশচন্দ্র তখনও ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি হলেন ব্রহ্মচারী। পরিধেয় গ্রহণ করলেন ব্রহ্মচারীর। নূতন কুটির নির্মিত হল গোয়ালবাড়ির পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে। আশ্রমকুটির। কুটিরের ভিতরে দক্ষিণ দিকে তক্তপোশের উপরে কম্বলশয্যা। সাধারণ কম্বল। উত্তর দিকে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের মৃন্ময় বিগ্রহ। চন্দন গুলগুল আর ফুলের গন্ধে ঘরখানি সুরভিত। সন্ধ্যায় এই আশ্রম কুটির ঝংকৃত হত আরতির বন্দনা গানে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে গীত হত ভগবৎস্তোত্র। বিকচোম্মুখ তরুণের দল ভিড় জমাত আশেপাশে।

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ গভর্নমেন্টের সাহায্য লাভের বিনিময়ে যে শর্তে কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়েছিল, সতীশচন্দ্রের তা মনঃপূত হয়নি। প্রতিবাদস্বরূপ সতীশচন্দ্র শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে এই বিদ্যালয়ের সংস্রব ছিন্ন করেন।

সংস্কৃতে তার গভীর অনুরাগ ছিল। নবীন ব্রহ্মচারী এক সময়ে বেদ অধ্যয়নের জন্য চলে গেলেন কাশীতে। সেখানে গিয়ে তিনি নিজে বেদ অধ্যয়ন করতেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েকজনকেও পড়াতেন। মনোমোহন ঘোষকে (পরে মোহান্ত মণ্ডলের স্বামী স্বরূপানন্দ) এবং আরও ২/১টি যুবককে পড়াতেন। কাশী থেকে যখন তিনি বরিশালে ফিরে এলেন, তখন তিনি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়াধামে তিনি দীক্ষা নিয়েছেন স্বামী শঙ্করানন্দের কাছে। সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানানন্দের গৈরিক বসন, গৈরিক উত্তরীয়। হাতে দণ্ড কমণ্ডলু। ১৯১২ সালে বরিশালে জায়গা কিনে তিনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে আশ্রমের নাম রাখা হল 'শঙ্করমঠ'। তখন বাংলাদেশে আর কোথাও শঙ্করমঠ ছিল না।

১৯১৫ সালে স্বামীজি গ্রেপ্তার হন কাশীতে। তাঁতে তার স্বগ্রাম বরিশালের উজিরপুরে অন্তরীণের আদেশ দেওয়া হয়। সন্ন্যাসী তিন রাত্রির বেশি পূর্বাশ্রমের গ্রামে বাস করে না বলে তিনি আপত্তি জানালেন। তার ফলে গভর্নমেন্ট সে আদেশ প্রত্যাহার করে গলাচিপায় অন্তরীণের আদেশ দেয়। কিছুদিন পরে ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে তাঁকে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে স্থানান্তরিত করা হল। মহিষাদলেই স্বামীজি বেশিদিন আবদ্ধ ছিলেন। এখানে

সতীশচন্দ্র সামন্ত (পরে এম. পি.) ও মহিষাদলের হেডমাস্টার হরিপদ ঘোষাল স্বামীজির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু এই বন্দী সন্ন্যাসীকে ঘিরে জুটত আরও অনেক তরুণের দল। স্বামীজির জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে বড়-ছোট সকলেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই সেখানকার যুবকদের মধ্যে যাঁরা স্বামীজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন, তাঁদের নিয়ে একটি বিপ্লবীদল গড়ে উঠল। এই মহিষাদলেই সেখানকার স্কুলের হেডমাস্টার হরিপদ ঘোষালের (পরে উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ) বিশেষ অনুরোধে ও তাগিদে স্বামীজি 'বেদান্ত দর্শন'-এর মতো বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ 'কর্ম্মতত্ত্ব'ও তিনি এখানে বসেই লিখেছিলেন। 'রাজনীতি', 'সবলতা ও দুর্বলতা' ও 'রাজা-প্রজা' পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও স্বামীজির এখানে থাকাকালেই লিখিত হয়।

১৯১৯ সালে স্বামীজি অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে বরিশালে আসেন। বরিশাল শঙ্করমঠের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাতে স্বামীজির নিজের পরিবারের কোনো লোক দাবি না করতে পারে, সেই জন্য তিনি এই সময়ে আইনসংগতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। ১৯২০ সালে স্বামীজি আবার মহিষাদলে চলে গেলেন। দলের বিশিষ্ট কর্মীরা তখনও নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়ে আসেননি। তিনি তাঁদের অপেক্ষাতেই মহিষাদলে থাকতে চেয়েছিলেন বলে আবার সেখানে চলে গিয়েছিলেন। মনোরঞ্জন গুপ্ত নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়ে ১৯২০ সালের শেষের দিকে মহিষাদলে গিয়ে স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। স্বামীজি মনোরঞ্জন বাবুকে বিপ্লবী সংগঠন অক্ষুণ্ন রেখে কর্মধারা পূর্বের মতোই অনুসরণ করে যেতে আদেশ করলেন। নূতন কর্মধারা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'প্রথমে ভারতের বইরে বিদেশে বহু যুবককে পাঠাতে চাই। বিদেশে অনেক কিছু করবার আছে। সেই জন্যই বিদেশে লোক পাঠানো দরকার। এ কাজের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হবে। সে অর্থ আমিই সংগ্রহ করে দেব– তোমাদের ডাকাতি করে সংগ্রহ করতে হবে না।'

স্বামীজির এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি স্থির করেছিলেন যে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কানাইলাল গাঙ্গুলিকে প্রথম পাঠাতে হবে জার্মানিতে। কিন্তু স্বামীজি বেঁচে থাকতে কানাইলাল গাঙ্গুলিকে বিদেশে পাঠানো সম্ভবপর হয়নি। স্বামীজির মহাপ্রয়াণের পরে তাঁকে জার্মানিতে পাঠানো হয়েছিল।

স্বামীজি মনোরঞ্জনবাবুর কাছে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানির সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও স্বামীজি ভগ্নমনোরথ হননি– বোঝা যায় নূতন পরিকল্পনা নিয়ে নূতন উৎসাহে বিপ্লবপন্থায় দেশোদ্ধারের কাজে এগিয়ে যেতে তিনি কতটা উদগ্রীব ছিলেন।

মহিষাদল থেকে স্বামীজি গেলেন মধুপুরে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য। এই সময়ে স্বামীজির স্বাস্থ্য ভালো ছিল না– তিনি হাঁপানিতে ভুগছিলেন। এই সময়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্ররা হরতাল ঘোষণা করে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। স্বামীজির প্রিয় শিষ্য মহিষাদলের সতীশচন্দ্র সামন্ত ছিলেন এই সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য স্বামীজির অনুমতি নিতে মধুপুরে আসেন এবং অনুমতি নিয়ে কলকাতায় ফিরে যান। তারপরে স্বামীজিও গান্ধিজি প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা এসেই তিনি তার প্রিয় শিষ্য হিরণ্যকুমার মিত্রের অনুরোধে তার কর্মস্থল মধ্যপ্রদেশের বরদুয়ার গমন করেন। হিরণ্যকুমার বিপ্লবীদলের সদস্য ছিলেন এবং প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি বহুদিন অন্তরীণে ছিলেন। মুক্তি লাভ করে তিনি বরিশাল শঙ্করমঠে যোগ দেন। লাইমস্টোন উত্তোলনকার্যে তদারক হয়ে তিনি চাকুরি নিয়ে মধ্যপ্রদেশের বরদুয়ারে যান।

হিরণ্যবাবু তার সাধ্য অনুসারে স্বামীজির সেবাযত্ন করতে কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু দারুণ শীতের শেষরাত্রে নিয়মিত স্নানাদি তার দুর্বল শরীর সহ্য করতে পালন না। স্বামীজি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। হিরণ্যবাবু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কলকাতায় যোগেশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট তার করে দিলেন এবং রিজার্ভ গাড়িতে স্বামীজিকে রওনা করে দিলেন। যোগেশবাবু স্বামীজিকে নিয়ে আসেন তার তাঁতিবাগান লেনের বাসায়। চিকিৎসা ও শুশ্রুষা যথাসাধ্য করা হল, কিন্তু স্বামীজির জীবনরক্ষা হল না। ১৯২১ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি তার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হল।

শ্রীমৎস্বামী বোলানন্দ গিরি মহারাজ তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন। খরব পেয়ে তিনি তাঁতিবাগান লেনে ছুটে এলেন এবং অন্তিমকালে প্রজ্ঞানানন্দের সন্ন্যাসোচিত কার্যাদি সম্পন্ন করে বরিশাল শঙ্করমঠে স্বামীজির পূত দেহ সমাধিস্থ করার উপদেশ দিলেন। ভোলানন্দ গিরি মহারাজের উপদেশে বরিশাল শঙ্করমঠে স্বামীজির পূত দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

পূর্বেই স্বামীজির পরলোকগমন এবং তার ত্যক্ত দেহ বরিশাল শঙ্করমঠে সমাধি ব্যবস্থার সংবাদ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। শহরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা ৭ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা বরিশাল স্টিমারঘাটে সমবেত হল। ওই দিন শহরের স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেদিন শহরবাসী অরন্ধন পালন করে উপবাসী রইলেন। বিকাল চার ঘটিকায় মিছিল মঠে পৌঁছালে জানা গেল স্বামীজির জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতাজি সরোজিনী দেবী কাশী থেকে কলকাতা এসে জরুরি তার পাঠিয়েছেন তার জন্য অপেক্ষা করতে।

পরদিন প্রাতঃকাল থেকেই ফুল ও মালা নিয়ে অগণিত জনগণ তাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মঠে সমবেত হল। শবাধার আবরণমুক্ত করা হলে মাতাজি আবেগমথির সুললিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীতাপাঠ করলেন এবং সাতবার শবাধার প্রদক্ষিণ করে ফুল-চন্দন দিয়ে প্রিয় অনুজকে শেষ বিদায় জানালেন।

লেখক: হীরালাল দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রকাশকাল মে ১৯৭২।

নরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরী

নরেন্দ্রমোহন ঘোষচৌধুরী নোয়াখালির লক্ষ্মীপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়তেন। একদিন তার ভাই সুরেন আঘাত করেছিল বরিশালের মোতাহের আলি শিকদারকে। এই অপরাধে ওয়ারেন্ট বের হল নরেনবাবুর নামে। নরেনবাবু তখন পরীক্ষার হলে ইতিহাসের পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। খবর পেয়েই নরেনবাবু পালালেন। বরিশালের গঙ্গাপ্রসন্ন গুহ ছিলেন দারোগা। তিনি নরেনবাবুকে নিজের ঘোড়া দিলেন পালিয়ে যেতে।

লক্ষ্মীপুর ছেড়ে তিনি পালিয়ে রইলেন তার দিদির বাড়িতে– কলিহাটিতে। সঙ্গে ছিলেন অনন্ত মিত্র। দু মাস পরে নরেনবাবুর পিতার চেষ্টায় মোতাহের আলি মোকদ্দমা তুলে নেয়। নরেনবাবু আবার এলেন লক্ষ্মীপুরে। কিন্তু মোতাহের ছেড়ে দিলেও অলিউল্লা মৌলবি তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। অলিউল্লার দৌরাত্ম্যের জন্য গঙ্গাবাবু দারোগা তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়ালেন। নরেনবাবুও ওখানে আর না থেকে চলে এলেন বরিশালে এবং ভর্তি হলেন ব্রজমোহন স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে। থাকতেন ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্রাবাসে।

লক্ষ্মীপুরে নরেনবাবুর ছিল উচ্ছৃঙ্খল জীবন, লেখাপড়ার ধার ধারতেন না, যা তা করে বেড়াতেন। কিন্তু বরিশালে এসে তাঁর আরম্ভ হল নূতন জীবন। সংস্পর্শে এসেছেন অশ্বিনীকুমার দত্তের, আচার্য জগদীশের– ছোঁয়া লেগেছে পরশমণির। সর্বোপরি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিনি পেয়ে গেলেন জীবনের আদর্শ ও পথ। আত্মার অবিনশ্বরত্ব তাঁর মরণভয় দূর করে দিল। তাঁর ভিতরের মানুষটি দুর্জয় হয়ে উঠল বিপ্লবীরূপে। ক্লাসের পড়ায় মন নেই। পড়ছেন বীরের কাহিনী, রাজস্থানের বীরত্বগাথা, দেশের জন্য রানা প্রতাপের আত্মত্যাগ, শিবাজির শৌর্য বীর্য, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনকথা, ইটালির স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা, আয়ারল্যান্ড ও রুশিয়ার বিপ্লবী ইতিহাস।

সতীশচন্দ্র একখানি তৈরি অস্ত্র পেলেন। একে ধারালো করে নিতে হবে। সতীশচন্দ্র তখনও ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক। ওই স্কুলের আরও দুজন শিক্ষক অবনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ষষ্ঠীচরণ ঘোষ সতীশচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী কাজে। নরেনবাবুর অসীম সাহসিকতা তাঁদেরও আকৃষ্ট করল। তারা বলতেন, 'নরেন, দিনে আমরা তোমার গুরু, রাত্রে তুমি আমাদের গুরু।' তাই হল। অর্থ সংগ্রহের জন্য বরিশালের অদূরে একটি ডাকাতি হল। সে কাজে অবনী বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় ছিলেন। নেতৃত্ব করেছিলেন নরেনবাবু (১৯০৮ ডিসেম্বর)।

এই ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই মায়ার সাহেবের বাড়ি থেকে চারটি ব্রিচলোডার গান, আর একটি উইনচেস্টার রাইফেল চুরি করে আনা হয়েছিল। এই কাজে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্মতি ছিল। নরেনবাবুর সঙ্গে ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ বসু, অনন্ত মিত্র (তখন পুলিশ অফিসের চাকুরিয়া), মানপাশার দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতীন চক্রবর্তী। এই কাজে যাবার আগে একদিন নরেনবাবু কুঠির দারোয়ানকে আটআনা বখশিশ দিয়ে কুটির কামরাগুলো ও বন্দুক রাখার ঘর দেখে এসেছিলেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নরেনবাবু ১০৯ ধারা মতে উজিরপুরে গ্রেপ্তার হন। তিনজনের ব্যক্তিগত জামিনে ও নগদ এক হাজার টাকা জমা দিয়ে মুক্তিলাভ করেন। ১৯১১ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত এক বছর তিনি নোয়াখালিতে একটা মাইনর স্কুলে মাস্টারি করেন।

১৯১৩ সালে নরেনবাবুর জামানতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই তিনি গ্রামের মাস্টারি ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। এই সময়ে নানা কারণে দলের প্রধান কর্মকেন্দ্রও বরিশাল থেকে কলকাতায় সরিয়ে নেওয়া হয়।

কলকাতায় বৈপ্লবিক কার্যে বরিশাল দলের প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয় বিপিন গাঙ্গুলি, অনুকূল মুখার্জি, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র শিকদার, প্রভাসচন্দ্র দে প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত আত্মোন্নতি সমিতির সঙ্গে। বিপিনবাবুদের দলের সঙ্গে বরিশাল দলের সহযোগিতায় রডা কোম্পানির জন্য আনীত ৫০টি মজার পিস্তল ও ৫০,০০০ কার্তুজ অপহৃত হয় ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট। এই কাজে নরেনবাবুর উপর ভার ছিল প্রয়োজন হলে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে কার্যোদ্ধার করা। যে গুলি-ভরা বাক্সগুলি নরেনবাবু ও সুরেশবাবু এনেছিলেন, সেগুলি যাতে পুলিশেত হাতে না পড়ে, তার নিরাপত্তার জন্য (for safe custody) মনোরঞ্জন গুপ্ত চন্দননগরের মতিলাল রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯১৫ সালে হেদুয়া দীঘির ধারে সকালবেলা পুলিশ কর্মচারী সুরেশ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়। সঙ্গে ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, শচীন দত্ত প্রভৃতি।

নরেন সরকার নরেন ঘোষচৌধুরীকে নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামের একটা বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। নরেন সরকারের বিশ্বাস ছিল যে সে বাড়ি থেকে প্রচুর অর্থ পাওয়া যাবে। নরেন ঘোষচৌধুরী বাড়ি, পথঘাট দেখে এসে পরিকল্পনা রচনা করলেন এবং তদনুসারে কাজও সম্পন্ন হল। কিন্তু কাজ শেষ হতে হতে রাতের অন্ধকার থাকল না, দিনের আলো দেখা দিল। গ্রামের লোকেরা প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করল। মাঝে মাঝে লড়াই হতে লাগল কখনো গ্রামের লোকদের সঙ্গে, কখনো পুলিশের সঙ্গে। এই ব্যাপারে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

সত্যরঞ্জন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নিখিলরঞ্জন গুহরায়, হরেন ভট্টাচার্য ব্যাকরণতীর্থ, শচীন দত্ত, সুধীর দাশগুপ্ত, সতীন্দ্রনাথ সেন, রাধিকা গাঙ্গুলি, বিজয় মিত্র, ভূপেন ঘোষ, সানুকূল চ্যাটার্জি, প্রফুল্ল মজুমদার, ক্ষিতীশ চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ বসু, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ত্রিবেণী সুর, নগেন চক্রবর্তী।

নরেন ঘোষচৌধুরী ছিলেন সর্বাধিনায়ক। ফেরার পথে এঁদের মধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে যান।

এই ডাকাতিতে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাদের নিয়ে যে মামলা হয় তাতে দশ বছর দ্বীপান্তরবাসের সাজা হয়েছিল হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ব্যাকরণতীর্থের। সতীন সেন, বিজয় মিত্র ও রাধিকা গাঙ্গুলি বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন। আর নরেন ঘোষচৌধুরী, সত্যরঞ্জন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নিখিলরঞ্জন গুহরায়, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, ভুপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সানুকূল চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু– এই আটজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের সাজা হয়। মনোরঞ্জন গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল মজুমদার প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও এই উপলক্ষে গ্রেপ্তার হননি বলে তাঁরা এই মামলার আসামি শ্রেণীভুক্ত হননি। এই সময়টায় তাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কেউ ভারতরক্ষা আইনে, কেউ বা ১৮১৮ সালের ৩ নং আইনে।

১৯২৭ সালে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে নরেন ঘোষচৌধুরীকেও আন্দামান থেকে কলকাতার জেলে নিয়ে আসা হয়। বাংলা গভর্নমেন্টের তৎকালীন সেক্রেটারি মি. স্টিফেনসন জেলে নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সঙ্গে ছিল চার্লস টেগার্ট। উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়, তা নিম্নে দেওয়া হল। এ বিষয়ে নরেনবাবু নিজে যা বলেছেন, তাই লিপিবদ্ধ করা হল। আন্দামানে বহু বছর নির্যাতন সহ্য করার পরে এই কথোপকথন নরেনবাবুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

স্টিফেনসন– আপনি যদি ছাড়া পান, তাহলে ধর্মসংক্রান্ত কাজ করবেন? আর রাজনৈতিক কাজ ছেড়ে দেবেন?
নরেন ঘোষচৌধুরী– কোন কাজকে ধর্মসংক্রান্ত কাজ মনে করেন আপনি?
স্টিফেনসন– কত সাধুসন্ত আছেন এ দেশে, তাঁদের কাছে যান।
নরেনবাবু– স্বর্গ বা মুক্তিতে আমার কোনো আকর্ষণ নেই।
স্টিফেনসন– তবে কী চান আপনি? রাজনৈতিক ডাকাতি আর খুন?
নরেনবাবু– আপনারা তো নিজেদের সভ্য জাতের মানুষ বলে দাবি করেন কিন্তু আপনারা জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার লোককে খুন করেছেন, এমনকী মেয়েদের, শিশুদেরও রেহাই দেননি।
স্টিফেনসন– স্যার চার্লর্স টেগার্ট বলছেন, আপনি আঠারোটি রাজনৈতিক হত্যা ও বত্রিশটি ডাকাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
নরেনবাবু– যদি তাই সত্য হয়, তবে আমাকে আঠারোবার ফাঁসিকাষ্ঠে লটকে দিন, আর বত্রিশবার দ্বীপান্তরে পাঠান। টেগার্ট! ওই নচ্ছার দুর্বৃত্ত যা খুশি তাই বলতে পারে। ও একটা জঘন্য মিথ্যাবাদী। আমার গ্রেপ্তারের সময়ে আমার উপরে যে অত্যাচার হয়েছিল সেকথা বলতে গিয়ে এই লোকটা আদালতের সম্মুখে বাইবেল চুম্বন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।
স্টিফেনসন– স্যার চার্লস টেগার্ট না বলে শুধু টেগার্ট বলছেন কেন?
নরেনবাবু– লোকটা স্যার না ম্যাডাম আমি জানি না। আমি জানি সে একটা দুর্জন। তিনবার তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রতিবার সে আমাকে নরেন বলে সম্বোধন করেছে! শূয়োর-শূয়ারকা বাচ্চা বলে গাল দিয়েছে! আমিও তার উপযুক্ত ভাষায়ই জবাব দিয়েছি।
স্টিফেন– বহুৎ আচ্ছা। আর আপনার সঙ্গে বথা বলব না।
নরেনবাবু– আপনি ভুলবেন না যে আমি আপনার দর্শনার্থী হয়ে নিজে থেকে আসিনি। আপনিই স্বেচ্চায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।
স্টিফেনসন– আপনার পিতা অতি বৃদ্ধ, প্রায় অন্ধ। আমি তার জন্যই এসেছিলাম।

প্রথম জার্মান যুদ্ধের সময়ে ১৯১৫ সালে একই সময়ে সমগ্র ভারতে একটা বিদ্রোহী অভ্যুত্থানের আয়োজন হয়েছিল। এই আয়োজনে নরেনবাবুর একটি বাহিনীর প্রধান হিসেবে অংশ গ্রহণ করার কথা ছিল। পূর্ববঙ্গ জয় করে বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে কলকাতায় এসে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয়ে তার অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। কথা ছিল জার্মানি থেকে অস্ত্র আসবে এবং সেই অস্ত্র নিয়ে কাজ শুরু করা হবে। কিন্তু ইংরেজের তৎপরতায় জার্মানির অস্ত্র এ দেশে পৌঁছাতে পারেনি।

শিবপুর ডাকাতির মামলায় নরেনবাবু যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত হন। বছর দশেক আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন ভোগ করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সেই মুক্তির পরে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে নরেনবাবুর বিচিত্র বিপৎসংকুল জীবনের অতি সামান্যই এখানে বলা গেল। পূর্ববঙ্গের ভয়লেশহীন দামাল ছেলের মৃত্যু পুলিশের গুলিতে বা ফাঁসিতে হল না– কারাবাস থেকে মুক্ত হয়ে তার মৃত্যু ঘটল জীবন সংগ্রামে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে!

লেখক: হীরালাল দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রকাশকাল মে ১৯৭২।

সত্যরঞ্জন নন্দী

সত্যরঞ্জন নন্দী বরিশাল জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহিমচন্দ্র নন্দী। বিপ্লবী আন্দোলনের শুরু থেকেই গোবিন্দপুর গ্রামে একটা বৈপ্লবিক কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে সত্যরঞ্জনের মনে স্বাধীনতা লাভের জন্য কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে স্কুল-কলেজ বর্জনের ঢেউ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গোবিন্দপুর গ্রামের স্কুল থেকে একমাত্র সত্যরঞ্জনই 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং নিজের গ্রামের নলিনীকান্ত করচৌধুরী, অখিলচন্দ্র দে, ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হন। এই সময়ে তাঁর অগ্রজ মনোরঞ্জন নন্দী ঝালকাঠি সংগ্রেস অফিসে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাতে সত্যরঞ্জন আরও উৎসাহিত হন।

এই বছর গান্ধিজি বরিশালে আসেন। বরিশালে অবলাকান্ত করচৌধুরীর মাধ্যমে সত্যরঞ্জন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সতীন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর সঙ্গে পটুয়াখালি চলে যান। সেখানে তিনি কংগ্রেস অফিসে থেকে নানা রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হন। এই সময়ে কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে তিনি ধৃত হয়ে পটুয়াখালি সাব-জেলে কয়েকদিন আটক থাকেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল গঠিত হওয়ায় অসহযোগ আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। অন্য আরও অনেকের মতো সত্যরঞ্জনও দেশে ফিরে এসে স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন। দুবছর পরে ১৯২৬ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে বরিশাল শঙ্করমঠের সংস্পর্শে এসে তিনি বিপ্লবীদলভুক্ত হন। তখন হিমাংশুভূষণ বসুরায়ের (কালাদা) পরিচালনায় বরিশালে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। ব্রজমোহন কলেজে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পড়ার সময়ে সত্যরঞ্জন বি. পি. এস. এ. ছাত্র-সংগঠনের বরিশাল শাখার সভাপতি হন।

এই সময়ে শচীন করগুপ্ত, মুকুল সেন প্রভৃতি নূতন করে একটা আলাদা বিপ্লবীদল গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এই সংগঠনের অধিকাংশ কর্মীই মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে যান। মামলার সংস্রবে ধৃত জনৈক কর্মীর কাছে প্রাপ্ত জেলা সংগঠনের তালিকায় সত্যরঞ্জনের নাম পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই কারণে পুলিশ ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বরিশাল জেলে নিয়ে যায়। কিছুদিন বাদে পুলিশ সেখান থেকে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে।

তখন তিনি জেল-পলাতক নলিনী দাস, ফণী দাশগুপ্ত, শচীন করগুপ্ত ও অন্যান্য কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে গুপ্তভাবে বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত থাকেন এবং গ্রামে গ্রামে ব্যায়ামাগার ও সমিতি স্থাপন করে গুপ্ত সমিতির সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। মাখন দত্তরায়, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, কুলভূষণ নন্দী, অনন্ত দাস, অমূল্য মজুমদার, শশাঙ্ক রায়চৌধুরী,

ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সুখেন্দু দাস, যোগেশচন্দ্র দে প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই সময়ে বিপ্লবীদলভুক্ত হন।

এসব কারণে সত্যরঞ্জন ১৯৩২ সালে আবার গ্রেপ্তার হন ২৬ অক্টোবর তারিখে এবং বরিশাল জেল, ফরিদপুর জেল, প্রেসিডেন্সি জেল ও বহরমপুর ক্যাম্প জেলে কালাতিপাত করেন। বন্দী অবস্থায় বহরমপুর ক্যাম্প জেল থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন। তারপর বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ ও মালদহ জেলার গাজল থানায় কিছুদিন অন্তরীণ থাকার পরে ১৯৩৭ সালের ১১ নভেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর তিনি কিছুদিন চন্দননগরে শিক্ষকতা করেন এবং পরে কলকাতার মার্টিন বার্ন কোম্পানিতে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। তার দুই পুত্র– দীপঙ্কর নন্দী ও তীর্থঙ্কর নন্দী।

লেখক: হীরালাল দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র:

স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রকাশকাল মে ১৯৭২।

জিতেন্দ্রনাথ কুশারী

১৯১৩ সালে বরিশালে একটি স্বতন্ত্র বিপ্লবী সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতির নেতা ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ কুশারী– ব্রজমোহন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। জিতেনবাবু স্কুলের পড়াশুনা করেছেন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী স্কুলে। কিন্তু তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বাহেরক গ্রামে। জিতেনবাবু যখন টাঙ্গাইলে পড়াশুনা করেন, তখন সেখানে ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির একটি শাখা ছিল। প্রায় দুইশত কিশোর যুবক সেখানে লাঠি ও ছোরা খেলা শিখত। জিতেনবাবু ছিলেন সেই কিশোরদের অন্যতম। ১৯০৯ সালে জিতেনবাবু বিন্দুবাসিনী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯১২ সালে বরিশালে এসে ব্রজমোহন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন।

টাঙ্গাইলে সুহৃদ সমিতিতে যোগ দেওয়ার প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি সহপাঠী ধীরেন্দ্রমোহন ঘটকের কাছ থেকে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত সুহৃদ সমিতি বেআইনি ঘোষিত হলে জিতেনবাবু 'যুগান্তর' গুপ্ত সমিতিতে ভর্তি হন। এই দলটির চালক ছিলেন জিতেনবাবুর স্বগ্রাম বাহেরকের অধিবাসী অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। এই দলটি ছিল ময়মনসিংহ যুগান্তর দলের শাখা।

১৯২০ সালে জিতেনবাবু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু তার দলের আর সবাই বরিশাল শঙ্করমঠের দলে যোগ দেয়।

শঙ্করমঠের যারা সভ্য, তারা যুগান্তর দলভুক্ত ছিল। কিন্তু জিতেনবাবুরা সেই দিনে আপন দলগত বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলতেন। ঢাকার অনুশীলন সমিতিও তখন বরিশালে দল গঠন করতে আরম্ভ করেছিল।

জিতেনবাবুর দলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হিমাংশু বসুরায়, সরলকুমার দত্ত, শৈলেন দাশগুপ্ত, রাখালচন্দ্র দাস, সন্তোষকুমার দে, সুধীর রায়চৌধুরী, বেণীমাধব ঘোষাল, প্রিয়কুমার গোস্বামী, শিকারপুরের অনন্ত পূতত্নুন্ড (ভোলা), মাহিলাড়ার হিমাংশু সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন বসু, মতি চট্টোপাধ্যায়, শচীন করগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জিতেনবাবু লিখেছেন– 'আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে আমরা বিশ্বাস করিতাম। দলের সভ্যগণকে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে প্রার্থনা করিতে হইত। নৈতিক জীবনের উপরে জোর দেওয়া হইত সর্বাপেক্ষা বেশি। কর্মী চরিত্রবান না হইলে কর্ম ফলপ্রসূ হয় না– ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে সংযম অভ্যাসের চেষ্টা করা হইত। সর্বপ্রথমে দল গঠন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি সভ্যকে আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করা ছিল প্রথম কাজ।' সেদিনকার বরিশালের ছাত্রজগতে এই ছিল সাধারণ নিয়ম। জিতেনবাবু এবং তার মতো ব্যক্তিবর্গের জন্য বরিশালের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল।

জিতেনবাবু লিখেছেন:

'১৯১৫ সালে যখন সর্বভারতীয় বিপ্লব-প্রয়াসের আয়োজন হইয়াছিল, তখন বরিশাল জিলায় বিপ্লব ঘটাইবার জন্য আমরা ভাব গ্রহণ করি। এই সময়ে বরিশাল শঙ্করমঠের সহিত আমাদের ঐক্য সাধিত হয় এবং মঠের নির্দেশেই আমাদের দল কাজ আরম্ভ করে। বিপ্লবের নির্দিষ্ট দিনে আমরা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সরকারি কোষাগার, অস্ত্রাগার, পুলিশ লাইন, থানা প্রভৃতি দখল করিয়া লইব– ইহাই ছিল আমাদের প্রতি নির্দেশ। এইজন্য আমরা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করি। প্রতি সভ্যকে নিম্নলিখিত শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত:

(১) মজার পিস্তল ও অন্যান্য বন্দুক চালনা, (২) সাধারণ ড্রিল, (৩) অন্যূন ৫ মাইল ডবল মার্চ, (৪) ফ্লাগ সিগনালিং, (৫) সাইকেল চড়া, (৬) সাঁতার, (৭) ঘোড়ায় চড়া।

'সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জেলা ও শহরের সর্ববিধ সরকারি কেন্দ্রের সংবাদাদি বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত হইতে লাগিল। কোথায় কীভাবে প্রথম আঘাত হানিতে হইবে, তাহাও আলোচিত ও স্থিরীকৃত হইল।

'ইতিমধ্যে বালেশ্বরের ঘটনায় সব পরিকল্পনা ধরা পড়িয়া যায়। বিপ্লবের তারিখের পূর্বেই সর্বত্র গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িয়া যায়। সুতরাং আমাদের কাজকর্মও অচল হইয়া পড়ে। সশস্ত্র বিপ্লবই আমাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেই উহা গেরিলা যুদ্ধের আকার ধারণ করিল।

'আমাদের কর্মীসংখ্যা ছিল ২৫০। প্রধান কর্মক্ষেত্র বরিশাল শহর। শহরটি পাঁচ-ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। পিরোজপুর ও রহমতপুরের দল বেশি শক্তিশালী ছিল।

'অন্যান্য দলের সঙ্গে আমাদের কর্মপন্থার বিশেষ স্বাতন্ত্র ছিল এই যে নিজের শেষ কড়িটি নিঃশেষে দান না করিয়া পরের সম্পদ কাড়িয়া লইব না। ইহার ফলে আমরা ডাকাতি করি নাই। দলের কর্মীরা একাদশী পূর্ণিমা অমাবস্যায় উপবাস করিয়া ওই সকল দিনের খাদ্যের পয়সা সমিতির তহবিলে দান করিত। কাপড়, জুতা, জামা, ছাতা প্রভৃতি কিনিতে অভিভাবকগণ যে পয়সা দিতেন, তাহা বাঁচাইয়া দলের তহবিলে দিতাম। ইহাতে প্রচুর অর্থাগম হইত। ইহা ছাড়া শারীরিক শ্রমেও আমরা অর্থোপার্জন করিতাম। পিতামাতার নিকট হইতে চাহিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতাম। এই অর্থ দ্বারা রিভলবার ক্রয় করা, পুস্তিকাদি ক্রয় করা, পরিদর্শকের যাতায়াতের ব্যয় নির্বাহ করা হইত। দুখানি মোজার কল কিনিয়া কলকাতায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলাম।

'আমাদের আরও সংকল্প ছিল যে বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বে কোনো স্বদেশি লোককে হত্যা করিব না।'

জিতেনবাবু বলেন– এইসকল সংকল্পের জন্য তাঁদের নিগ্রহ ভোগ অপর দলের তুলনায় খুব কমই হয়েছে। কিন্তু ১৯১৫-১৬ সালে যখন দেশব্যাপী দরপাকড় শুরু হল, তখন এই দলেরও অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। তিন-চারজন কারাগারেও প্রেরিত হলেন। জিতেনবাবু নিজেও গ্রেপ্তার হয়ে বহুদিন কারাগারে কাটিয়েছেন।

এই দল প্রথম দিকে আপন স্বাতন্ত্র বজায় রাখলেও পরবর্তী সময়ে শঙ্করমঠের সঙ্গে সহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ক্রমে উভয় দল এক দলই হয়ে গিয়েছিল।

জিতেনবাবু অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে রসরঞ্জন সেনকে স্মরণ করেছেন। ১৯১৩ সালে জিতেনবাবু বরিশালে আসেন। ওই বছরই মেথরপল্লিতে একটি সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন রসরঞ্জনবাবু। জিতেনবাবু ওই কার্যে কর্মী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। রসরঞ্জনবাবু সুরাপানে মত্ত মেথরগণের মধ্য থেকে কোলে করে স্কুলে নিয়ে আসতেন মেথরদের ছেলেদের। একদিকে পণ্ডিত কালীশচন্দ্র, অন্যদিকে রসরঞ্জন– তাঁদের অফুরন্ত স্নেহধারা জিতেনবাবুকে এবং তার মতো আরও অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিরভিমান রসরঞ্জনের লোকসেবা, পণ্ডিত মহাশয়ের শিশুর মতো ছাত্রদের সঙ্গে খেলা, গাছে চড়া, আবার শ্মশানঘাটে ভগবৎমহিমা কীর্তনে আত্মহারা হয়ে যাওয়া সকলকেই আকৃষ্ট করত।

জিতেনবাবু গান গাইতে জানতেন। এই উপলক্ষেই কালীশচন্দ্রের সঙ্গে তার পরিচয়। শীতকালের ভোরে করতাল নিয়ে এসে মহাশয় জনালার ভিতর হাত ঢুকিয়ে কান ধরে তাঁকে তুলতেন। 'হরে মুরারে' গান গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতেন। গান শুনে অশ্বিনীকুমারও বেরিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

জিতেনবাবু লিখেছেন:

'অশ্বিনীকুমারকে আমরা শ্রদ্ধাও করিতাম, ভয়ও করিতাম। একটু ঘনিষ্ঠ হইলেই বুঝিতে পারা যাইত, কী গভীর তাঁর স্নেহ, কী উদার তাঁর অন্তর। লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করাই ছিল তাঁর ব্রত ও সাধনা। তদানীন্তন বরিশালের আকাশ-বাতাস যেন তাঁহারই এক বিশেষ সৃষ্টি।

'আচার্য জগদীশকে দেখিয়া আমরা দূর হইতে ভক্তিতে অবনত হইতাম, ক্ষুদ্র মানব যেমন করিয়া সীমাহীন সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া নির্বাক হইয়া যায়। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে রবিবার দিন তিনি গীতা পাঠ করিতেন। আমরা গীতার ভাষ্যই শুনিতাম, না মহাপুরুষের তেজ-উদ্ভাসিত মূর্তিই দেখিতাম, তাহার আজও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

'এইভাবে প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা, হাতাই হইল। আদর্শ জীবন গঠন আমাদের সকলের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।... প্রচলিত সহিংস পদ্ধতি– যথা ডাকাতি, খুন ইত্যাদি আমাদিগকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।'

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জিতেনবাবু টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পারিবারিক অসচ্ছলতার দরুন তিনি গোয়ালন্দ ঘাটে স্টিমার কোম্পানিতে কেরানিগিরির চাকুরি নিতে বাধ্য হন। সেখান থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বরিশালে এসে ব্রজমোহন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এক বছর বরিশালের স্থানীয় 'লিটল ব্রাদার্স অব দি পুয়র' নামক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভান্তে তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনার রাজীবপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে নেত্রকোনা মহকুমা শহরে আঞ্জুমান উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেওয়ার পরে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হওয়ার পর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালি জেলার দত্তপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে এখান থেকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তিনি খুলনা জেলার রামপাল থানায় অন্তরিন থাকেন। ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সময়ে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'সারভ্যান্ট' নামক ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তিনি এই পত্রিকার ছাপাখানায় সহকরী পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মহাত্মাজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হলে জিতেন্দ্রনাথ এ কাজ ছেড়ে দিয়ে মহাত্মাজির আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে স্বগ্রাম বাহেরকে ফিরে এসে 'সিদ্ধেশ্বরী জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপন করে তিনি তার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে বিক্রমপুরের হাটবালিগাঁও গ্রামের গোপাল চক্রবর্তীর কন্যা কিরণবালা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। অসহযোগ আন্দোলনে কিরণবালাদেবী স্বামীকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন, নিজেও কারারুদ্ধ হয়েছেন।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুর কর্মী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই বছরই 'বাহেরক সত্যাশ্রম' নামে বাহেরক গ্রামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তিনি বরাবর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রতি

বছর সত্যাশ্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময়ে তিনি বিক্রমপুর জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মাজির বঙ্গদেশ পরিক্রমার সময়ে জিতেন্দ্রনাথ মহাত্মাজিকে সত্যাশ্রমে আনয়ন করেছিলেন।

জিতেনবাবুর আগ্রহে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বাহেরকে আহূত হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ইনসিয়োর‍্যান্স অ্যান্ড রিয়াল প্রপারটি কোম্পানির অর্গানাইজার নিযুক্ত হয়ে তিনি উত্তরবঙ্গের রংপুরে চলে যান। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে বিক্রমপুর চলে আসেন। এই আন্দোলনে তাঁর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি দুই বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন অংশীদার নিয়ে তিনি ন্যাশনাল কমার্শিয়াল সিন্ডিকেট নামক একটি অর্থোপার্জনের প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত ছাড়ো' সংগ্রামের সময় তিনি ভারত রক্ষা আইনে নিরাপত্তা বন্দীরূপে আটক থাকেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি পুনরায় গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে গঠনমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কিন্তু মতদ্বৈততা হওয়ায় তা বানচাল হয়ে যায়। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান থেকে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতন ও সেবাগ্রামে বিশ্ব শান্তিবাদী সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে আসেন। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান। কিন্তু ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গার পরে তিনি দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। পশ্চিমবঙ্গে এসে কিছুদিন তিনি নলিনীরঞ্জন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদকের কাজ করেন। কিছুদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহে বাস্তুত্যাগীদের আবাসস্থল ধুবুলিয়া ক্যাম্পের কম্যান্ড্যান্টের কাজ করেন। অতঃপর কোন্নগর নবগ্রামে বসতি স্থাপন করেন ও স্থানীয় ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

জীবন সায়াহ্নে তিনি কিছুকাল গান্ধি-স্মারকনিধির বেতনভোগী তত্ত্বপ্রচারকরূপে কাজ করে অসুস্থতাবশত অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি তার দেহবসান হয়। তিনি সুবক্তা ও সুগায়ক ছিলেন। কংগ্রেসের বাণী প্রচারার্থে তিনি 'ঝান্ডা উচা রহে হামারা', 'চরকার ঘর্ঘর পড়শির ঘর ঘর' পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'পথের সন্ধানে' এবং 'গান্ধিজি স্মরণে' নামক দুখানা বইও প্রণয়ন করেছেন। তা ছাড়া 'দেশ', 'উজ্জ্বল ভারত', 'সোনার বাংলা', 'জনমত', 'স্বদেশ ও শিল্প', 'নবগ্রাম' প্রভৃতি প্রত্রিকায়ও তিনি প্রবন্ধাদি লিখতেন।

তাঁর স্ত্রী কিরণবালা দেবী (১৯০৫-১৯৯৬) ত্রিশের দশকে মুন্সিগঞ্জ কোর্টে জাতীয় পতাকা তোলার অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

লেখক: হীরালাল দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রকাশকাল মে ১৯৭২।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের অন্যতম সহকর্মী ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্তের পৌত্র, সরলহৃদয় মনোরঞ্জন গুপ্তের পুত্র এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অনুগত দেশকর্মী রমণীরঞ্জন গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্রনাথ শৈশবেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

নগেনবাবু বিশেষ প্রেরণার উৎস স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও জ্বলন্ত বাণী এবং তার স্কুলের হেডমাস্টার রসরঞ্জন সেন মহাশয়ের তেজোদৃপ্ত বাক্যাবলি।

বাড়িতে খানাতল্লাশি লেগেই ছিল। একদিন তার কাকা রমণী গুপ্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিশ। অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে ধৃত রাখাল দাস জেলে বেত্রাহত হয়েছিলেন। এইসব ঘটনা নগেনবাবুকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অনুগতকর্মীদের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

নীচের লেখা সবটাই নগেন গুপ্তের নিজের লেখা থেকে উদ্ধৃত:

'১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯২৬ সালে বিপ্লবী দলে, ১৯২৮/২৯ সালে কলকাতা ছাত্র আন্দোলনে এবং ১৯৩০ সাল থেকে কংগ্রেস ও বিপ্লবী দলে যোগ দিয়াছিলাম কর্মী হিসাবে। আমাদের দলের সকলেই জেল খাটিয়াছে কিংবা অন্তরীণ হইয়া রহিয়াছেন– নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন অনেকে।

'১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধি বরিশালে আসেন। তখন অমৃতলাল দাশগুপ্ত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি গান্ধিজিকে বাতাস করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি নিজেকে নিতান্ত ভাগ্যবান মনে করিয়াছিলাম।

'১৯৩০ সালের আন্দোলনে সবাই যখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, আমাদের দলের রামকান্ত চক্রবর্তী এবং স্বামী কেশবানন্দ তখন শঙ্করমঠে থাকিতেন। আমি তখন শঙ্করমঠের লাইব্রেরিয়ান এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসংঘের বরিশাল শাখার সভাপতি ছিলাম।

'১৯৩১ সালে পুলিশের নির্মম অত্যাচারে কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে আকাশ-বাতাস থমথম করিতেছিল। সেই সময়ে শঙ্করমঠ দলের অশ্বিনী গাঙ্গুলি মহাশয় বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতাম। সহসা খবর আসিল– হিজলি জেলে পুলিশের গুলিতে গৈলা নিবাসী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও কলিকাতার সন্তোষকুমার মিত্র নিহত হইয়াছেন ও অন্যান্য অনেক রাজবন্দী আহত হইয়াছেন। যাঁহারা আহত, তাঁহাদিগকে খড়গপুর রেল হাসপাতালে সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত স্থানে পাঠানো হইয়াছে।

'পরাধীনতার গ্লানি সুভাষবাবুকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। হিজলি জেলে পুলিশের নির্মম অত্যাচার তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। গভর্নমেন্ট অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত করিল। একদিন আমি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি অশ্বিনী গাঙ্গুলি প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসে বসিয়া আছি। এমন সময়ে সুভাষবাবুর কতকগুলি জরুরি বার্তা লইয়া হরিকুমার চক্রবর্তী উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে ডাকিয়া সেই বার্তা লইয়া খড়গপুর রেল হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বলিলেন। আমি তখনই প্রস্তুত হইয়া হাওড়া স্টেশনে গেলাম এবং তিনি আমাকে বম্বে মেইল গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। ইহার পূর্বে খড়গপুর কখনো যাই নাই। তাহার উপর সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত খড়গপুর রেল-হাসপাতাল। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'– এই কথা মনে করিয়া রেল-হাসপাতালে গিয়া আহত রাজবন্দীদের কাছে

সুভাষবাবুর বার্তা পৌঁছাইয়া দিলাম। রাত দশটায় অনুসন্ধান কমিটি এবং সুভাষবাবু খড়গপুর পৌঁছিলেন। সেই রাত্রেই সুভাষবাবুর সাথে দেখা করিয়া বার্তা পৌঁছাইয়া দিবার কথা তাঁহাকে বলিলাম। রাত্রে সুভাষবাবু এবং আমি স্থানীয় নেতা গডবেলের আতিথ্য লইয়াছিলাম। আহারান্তে রাজবন্দীদের দিবার জন্য অন্য কতকগুলি বিষয় লিখিয়া সুভাষবাবু আমাকে দিলেন। এই সময়ে আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন যে, এ লেখা ধরা পড়িলেও ইহা তাঁহার হাতের লেখা বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। সেপ্টেম্বরের রাত– একটু শীত পড়িতেছিল। দুপুর-রাত্রে দেখি কে যেন আমাকে একখানা চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। ইনি সুভাষচন্দ্র! ভোর-রাত্রে সুভাষবাবু আমাকে তুলিয়া দিলেন। আমি আহত রাজবন্দীদের নিকট সুভাষবাবুর বার্তা পৌঁছাইয়া দিলাম। এবারেও দেখিলাম রাজবন্দীরা সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত। ভাগ্যে ধরা পড়ি নাই। আমি আমার কাজ সুসম্পন্ন করিয়া সুভাষবাবুর নিকট বিদায় নিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। আমাদের বরিশালের কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আহতদের মধ্যে একজন ছিলেন।

'সুভাষচন্দ্র বুস তারকেশ্বরের চিতাভস্ম নিয়া গৈলা গ্রামে আসিলেন। সেখান থেকে সদলবলে বরিশাল আসিলেন। আমাদের দলের কেহই তখন বরিশালে ছিলেন না। তাই সকল দায়িত্ব আমার উপর পড়িল। আমি সুভাষবাবুকে ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে বরিশালের শঙ্করমঠেই তুলিলাম এবং সেইখানেই আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম।

'ইহার পর গান্ধি-আরইউন প্যাক্ট ভাঙিয়া যায়। আমি ও অশ্বিনী গাঙ্গুলি মহাশয় একদিন কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়িতে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে অশ্বিনীদাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। আমি সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া কিরণশঙ্কর রায়কে ও কালীপদ মুখার্জিকে অশ্বিনীদার গ্রেপ্তারের খবর দিয়া আসিলাম।

'আমি কলিকাতায় ক্রিক রোতে আমার কাকা ডাক্তার নিত্যলাল গুপ্তের ওখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম। একদিন ভোর-রাত্রে পুলিশ আসিয়া আমাদের বাড়ি ঘেরাও করিল। একটু বেলা হইলে পুলিশ আমাদের বাড়ির সবাইকে তল্লাশি করিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে লইয়া গেল। সেখান হইতে আমাকে মেদিনীপুরের গোবিন্দবল্লভপুর গ্রামে অন্তরীণ করিয়া রাখিল। আবার আমাকে মেদিনীপুর জেলে লইয়া গেল। এই জেলে আমার নামে গভর্নমেন্ট একটা মামলা রুজু করিল। এই মামলা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। মেদিনীপুরের উকিল মন্মথনাথ দাস আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া ও যথেষ্ট খাটিয়া আমাকে মুক্ত করিয়াছিলেন।

'১৯৩৩ সালে পুলিশ আবার গ্রেপ্তার করিয়া গলাচিপা থানায় আটক করিয়া রাখিল। কিছুদিন পরে সেখান হইতে আমাকে বরিশাল জেলে লইয়া আসিল। কিছুদিন বরিশাল জেলে রাখার পরে আমাকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হইল। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ-এর হত্যার পরে মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দীদের উপরে জেলারের নির্মম অত্যাচার চলিতে থাকে। মেদিনীপুরের বহু যুবককে জেলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। এই যুবকরা আমাকে খুবই ভালবাসিত– তাহারা আমাকে অগ্রভাগে রাখিয়া সকল কাজ করিত। এই জেলে মহিলা ওয়ার্ডে তখন বীণা দাস, শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ছিলেন। জেলারের অমানুষিক অত্যাচারে মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মহিলা ওয়ার্ডে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলেন। পুরুষদের ওয়ার্ডে আমরা যাহারা ছিলাম, সকলেই এই বিক্ষোভে যোগ দিয়াছিলাম। এই সময়ে সূর্যসেনের ফাঁসির খবর আমাদের

কাছে পৌঁছাইল। এইসব কারণে মেদিনীপুর জেলে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। রাজবন্দীরা আমাকে পুরোভাগে রাখিয়া এই আন্দোলন শুরু করিল। সেন্ট্রাল আই. বি. থেকে মন্মথ সেন আসিল অনুসন্ধান করিতে। সে বলিল– 'নগেন গুপ্তই সব নষ্টামির গোড়া (Nagen Gupta is the root of all evil)'। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে শান্তি ঘোষ, রবি মিত্র ও আমাকে জেলের আইন ভাঙ্গার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইল। জেলের ভিতরেই আমাদের বিচার হইল। আমরা এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। অম্বিকা চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের হইয়া এই দণ্ডাদেশের বিবুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। তখন মেদিনীপুরে জেলা জজ ছিলেন আর. গুপ্ত। তিনি আমাদের আপিল বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিলেন। পরে জজ ওয়েট সাহেব আমাদের মুক্তি দিলেন। ওয়েট সাহেবের অনুমতি লইয়া অম্বিকাবাবু আমাদের মামলায় সওয়াল-জবাব করিয়াছিলেন। এই ওয়েট সাহেবই অম্বিকাবাবুর ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন।

'মেদেনীপুর জেল হইতে আমাকে বাঁকুড়া জেলার শালতোড়াতে অন্তরীণ করিল। অতীন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ কুশারী ও সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও তখন সেখানে ছিলেন অন্তরীণ অবস্থায়। ওই স্থান হইতে আমাকে ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে ধুলিয়ানে অন্তরীণ করিল। তারপরে আমাকে ভগবানগোলায় লইয়া গেল এবং সেখানে অন্তরীণ করিয়া রাখিল। তারপরে আবার বহরমপুর জেলে। সেখানে আমার নামে এক মামলা দায়ের করা হইল এবং বিচারে আমার এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। সেখানকার উকিল শশাঙ্কশেখর সান্যাল এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করিয়া আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার পরে ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার আদেশ প্রাপ্ত হই। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে পূর্ণ মুক্তির আদেশ পাইলাম।

'১৯৩৮ সালে বিপ্লবী দল ভাঙ্গিয়া দিয়া কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরে আমি আমার নিজ ব্যবসা আরম্ভ করিলাম।'

লেখক: হীরালাল দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রকাশকাল মে ১৯৭২।

ক্ষীরোদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কয়েকজন বাঙালি বিপ্লবীর দুর্লভ বীরত্বে চট্টগ্রামের বিখ্যাত অস্ত্রাগার অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ক্ষীরোদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও রক্তাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তার আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার কাশীপুর গ্রামে। পিতা চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রেলে চাকুরি করতেন– কর্মোপলক্ষে চট্টগ্রামেই থাকতেন তিনি। চট্টগ্রাম শহরেই ক্ষীরোদরঞ্জনের জন্ম হয় ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে।

ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সৈনিক ক্ষীরোদরঞ্জন মাস্টারদার নায়কত্বে গঠিত বিপ্লবী বাহিনীর বিশ্বস্ত অনুচর। চট্টলের পাহাড়সংকুল দুর্গম অরণ্যে চলছিল অস্ত্রের মহড়া। কিশোর ক্ষীরোদরঞ্জন রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যেতেন সেই গোপন মহড়ায়। কৌশলী কিশোরদের দুর্জয় অভিসারের কথা বাড়ির অন্যান্য পরিজনের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

স্কুলজীবনে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। আত্মীয়স্বজন সবাই এই মেধাবী তরুণটির সম্বন্ধে অনেক উচ্চ আশা পোষণ করতেন। খুব অল্প বয়সে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রামেই কলেজে ভর্তি হলেন তিনি।

তারপর এল ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখের ঐতিহাসিক রাত। চট্টলের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কেড়ে নিয়েছিল ইংরেজের সুরক্ষিত অস্ত্রাগার সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বজ্রবাহু থেকে। মাস্টারদার নিজের হাতে গড়া দুর্জয় যুবশক্তির হাতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল ব্রিটিশ সিংহ। ক্ষীরোদরঞ্জনের মতো শত শত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। সমগ্র চট্টগ্রাম শহর বিপ্লবীদের করায়ত্ত হল। এই অসামান্য বিদ্রোহী দলকে শায়েস্তা করার জন্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ব্রিটিশ সিংহের সমস্ত শক্তি। কিশোর রক্তে লাল হয়েছিল চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে জালালাবাদ পাহাড়ের কঠিন মৃত্তিকা। খাদ্যহীন অস্ত্রহীন ক্লান্ত যুবকদল গোরা সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত অধ্যায় সৃষ্টি করলেন। সেই যুবকদলের অনেকেই জালালাবাদের মাটিতে ইংরেজের বুলেটে প্রাণত্যাগ করে শহীদ হলেন। কেউ কেউ ধরাও পড়লেন। কিন্তু ব্রিটিশরাজের সুচতুর পুলিশবাহিনী ধরতে পারেনি ক্ষীরোদরঞ্জনকে। দলীয় নির্দেশে আত্মগোপন করে রইলেন তিনি।

এই আত্মগোপনের দিনগুলি অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রসাধন আর আত্মত্যাগের সমুজ্জ্বল ইতিহাস। সেদিনের বিদেশি শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট পুলিশের কৌশলী নজর থেকে আত্মগোপন করে থাকা যে কত কষ্টকর, তা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। তাঁর আত্মগোপনের দীর্ঘ সাত বছরে তিনি বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন– কখনো মজুর, কখনো মাঝি, কখনো স্কুলের মাস্টার ইত্যাদি। তাঁর বৈপ্লবিক কীর্তিকলাপের প্রতিশোধ নিয়েছে ইংরেজ সরকার। তাঁর পিতাকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে আর বড় ভাই প্রমোদরঞ্জনকে রেলের চাকুরি থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। এই বড় ভাই-ই ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি। অবশেষে ধরা পড়লেন তিনি দক্ষিণবঙ্গের ক্যানিশ্বর শহরে। পরিচিত একজন পুলিশ কনস্টেবল ওঁকে চিনতে পারে– তার ফলেই গ্রেপ্তার।

সাড়ে তিন বছর কারাবাসের পর ছাড়া পেলেন তিনি। আত্মগোপনের দীর্ঘ সাত বছরের কৃচ্ছ্রসাধন, আর কারাবাসের সাড়ে তিন বছরের একঘেয়ে কঠিন কায়িক পরিশ্রম তার শরীরকে ভেঙ্গে দিয়েছে। তবু ঘরে ফিরে নূতন করে জীবন গড়ে তোলার আশায় তিনি স্বগ্রামে ফিরে এলেন। বিয়েও করলেন এবং এক পুত্র ও এক কন্যার জনকও হলেন। কিন্তু ভেঙ্গে যাওয়া শরীরকে আর বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি।

১৯৪৮ সালের ২০ মার্চ তারিখে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে রাজযক্ষ্মা রোগে তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল।

লেখক: হীরালাল দাশগুপ্ত

তথ্যসূত্র:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রকাশকাল মে ১৯৭২।

সরলা বালা দেব

সিলেটের নারী আন্দোলন ও নারী জাগরণে প্রাণ সঞ্চারকারী সরলা বালা দেবের জন্ম ১৮৯২ স্যালে সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণের রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দেব চৌধুরী বংশে। অল্পবয়সে তাঁর বিয়ে হয় রমনমণি দেবের সাথে। রমনমণি দেব সিলেটের গহরপুর সংলগ্ন লবিতপুর গ্রামের ছেলে ছিলেন। ১৯১১ সালে ১৭ বছর বয়সে সরলা দেব বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে সমাজ সেবা ও রাজনীতির সাথে যুক্ত করেন। ১৯২৬ সালে সিলেটে প্রতিষ্ঠিত নারী-শিল্প ভবনে তিনি যোগ দেন।

১৯৩০ সালের ৮ এপ্রিল 'বিদ্যাশ্রমের' পৃষ্ঠপোষকতায় সিলেটে 'মহিলা সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংঘ প্রতিষ্ঠার পর তাঁকে সংঘের সম্পাদিকা নিযুক্ত করা হয়। শহর ও গ্রামে এ সংঘের উদ্যোগে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও চরকা আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সরলা বালার নেতৃত্বে সিলেট শহরে বহু বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা হয়। হীরা প্রভা চৌধুরী, কনকলতা নাগ, শশীপ্রভা দেব, নরেশনন্দিনী দত্ত, সুহাসিনী দাস প্রমুখ এসব কাজে তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

তিনি ১৯৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি একটি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ও পুলিশী নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৩১ সালের ৯ মে তাঁর নেতৃত্বে সিলেট শহরে সুরমা উপত্যকা নারী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এ সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী। সভার উদ্বোধক ছিলেন শান্তি দাশ (শান্তি কবির), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন উর্মিলা দেবী ও ঢাকার আশালতা সেন সহ অনেকে এ সম্মেলনে যোগ দেন। এ সম্মেলনই ছিল সিলেটের নারীদের পরিচালিত প্রথম একটি বড় অনুষ্ঠান। এ সম্মেলনে নেতাজী সুভাষ বসুও যোগ দেন।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সরলাদেব অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণ করার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। পরে আবার ১৯৩৪ সালে 'ভানুবিল প্রজা সত্যাগ্রহে' যোগ দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে কারাবরণ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং পুনরায় করারুদ্ধ হন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি সিলেট জেলার পরিচালক নির্বাচিত হন। ওই সময় স্কুল, কলেজ, আইন, আদালত ইত্যাদি বর্জনের এক বিরাট কর্মসূচী ছিল। এ কর্মসূচীটি সফল পরিচালনার ভার ছিল তাঁর উপর। সে কারণে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর তাঁকে কারাগারে থাকতে হয়।

কারামুক্তির পর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর নারী সম্মেলনে তিনি সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন। ওই সভায় তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সিলেট শহরের শেখঘাটে মহিলা সংঘকে কেন্দ্র করে সারা জেলার বিস্তৃত বহু শাখা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরলা বালা নারী উন্নয়নমূলক সেবাকাজ পরিচালনা করেন। জওহর লাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষ সহ অভিভক্ত ভারত বর্ষের বহু রাজনৈতিক দিকপাল সরলা দেবের মহিলা সংঘ পরিদর্শন করেন এবং তার কর্মকুশলতা, দক্ষতা ও প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। ভারত বিভাগের পর তিনি সিলেট ত্যাগ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার তাঁকে 'তাম্র পত্র' দান করেন।

লেখক: ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ

তথ্যসূত্র:

১. মুক্তি মঞ্চে নারী– ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, রচনা কাল: ১৯৯৪–১৯৯৭, প্রকাশকাল ১৯৯৯, প্রকাশক: প্রিপ ট্রাস্ট, ৫৯ এ সাত মসজিদ রোড, ঢাকা।

জ্যোতি চক্রবর্তী



জ্যোতি চক্রবর্তী একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। কর্মবলে তিনি হন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নারী আন্দোলনের নেত্রী। রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও নারী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি একটি বিশেষ স্থান অলংকৃত করেন। জ্যোতি চক্রবর্তী একাধারে ছিলেন সংগঠক, সুবক্তা ও সুলেখক। এ মহীয়সী নারী বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলীয় জেলা নোয়াখালীর মাইজদী গ্রামে ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। (মূল নোয়াখালী শহর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়াতে মাইজদী এখন জেলা শহর।) জ্যোতি চক্রবর্তীর পিতার নাম হরনাথ চক্রবর্তী, মা গঙ্গা সুন্দরী দেবী। জ্যোতি চক্রবর্তীরা আট ভাইবোন।

মাইজদী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন এবং বৃত্তি লাভ করেন। মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থার কারণে তাঁর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ঘটেনি। সে যুগে মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত ছিলনা। তৎকালীন হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহের গুরুত্ব বেশি থাকার কারণে মাত্র বারো বছর বয়সে নববধু সেজে তাঁকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। ১৯১২ সালে তাঁর বিয়ে হয় নোয়াখালী জেলার তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা এবং আইনবিদ প্রসন্ন মোহন চক্রবর্তীর সাথে।

বিয়ের পর মূলতঃ স্বামীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। ফলে রাজনীতিতে তার আগ্রহ জন্মে। স্বামীর উৎসাহ, প্রেরণা এবং প্রভাবে তিনি একসময় রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অবশেষে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে (অমৃতসর) ইংরেজ সৈন্যরা নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে বহু লোককে হত্যা করে। নৃশংস এ হত্যাকাণ্ড ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে নারীদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

জ্যোতি চক্রবর্তী তখন কংগ্রেস কর্মী। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ক্ষোভ নিয়ে তিনি তাঁর সহকর্মী সুশীলা মিত্র, কমলারাণী ঘোষ, কিরণ প্রভা চৌধুরী, মালতী চৌধুরী, রেণুকণা গুহ ও অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে একটি মহিলা কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির কাজ ছিল সদস্য সংগ্রহ, ইংরেজদের দমননীতির প্রতিবাদে প্রচার, হরতাল, পিকেটিং সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ। এ কমিটি গঠিত হওয়ার ফলে জ্যোতি চক্রবর্তীর কর্ম পরিধি

বেড়ে যায়। কমিটির সুনির্দিষ্ট কাজ ছাড়াও তিনি সে সময় কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদে তাঁরা আলাদা একটি বড় ঘর ভাড়া নেন। সে ঘরে দুপুরে মেয়েদের জন্য সূতাকাটা ও পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা হয়। কংগ্রেস থেকে চরকা, তকলী ও তুলো সরবরাহ করা হয়। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় মেয়েদের জন্য। মহিলা সংগঠনকে একটি স্থায়ীরূপ দেবার জন্য 'সেবা সমিতি' নাম দিয়ে তিনি একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থাও করেন। ক্রমশঃ এ সমিতি বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। সেবা সমিতি মেয়েদের প্রাথমিক চিকিৎসা, ধাত্রী বিদ্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এ প্রশিক্ষণের ফলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সমিতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯২০ সালে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'তিলক স্বরাজ তহবিল' এবং জাতীয় সংগঠন আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ২০ লক্ষ চরকা ব্যবহারের কর্মসূচী গৃহিত হয়। শুরু হয় বিদেশী বস্ত্র বর্জন অভিযান। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত হয় নিলিখ ভারত সূতাকাটা সমিতি। কংগ্রেস কর্মী হিসেবে জ্যোতি চক্রবর্তী ও সুশীলা মিত্র বিলেতি দ্রব্য বর্জন কর্মসূচীকে জোরদার করার কাজে নারীদের মধ্যে গ্রামে গঞ্জে প্রচার কাজ চালান।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা ভারত বর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন। কিন্তু গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের দোদুল্যমানতায় সে দাবি পাশ হতে সময় লাগে দু'বছর।

১৯২৯ সালে কংগ্রেস হাইকমান্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সংকল্প ঘোষণা করে।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাষ্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে গোপন বিপ্লবী দলের উদ্যোগে চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম দেশের মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং ব্যাপক আলোড়ন জাগায়। ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকার সারা ভারতের অল্প বয়স্ক তরুণ-তরুণীদের গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে কারাগারে এবং কালাপানি পারে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাঠাতে শুরু করে। সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় বীভৎস উৎপীড়ন। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে লবণ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে 'সেবা সমিতি'ও এর সাথে শরীক হয়। নোয়াখালি জেলায় এ লবণ আইন ভঙ্গ কর্মসূচী সাফল্যের সাথে চলে। এ সময় জ্যোতি চক্রবর্তীর স্বামী প্রসন্ন মোহন চক্রবর্তী গেপ্তার হন। দুই বছর তাঁকে কারাভোগ করতে হয়। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারী কর্মীরা সত্যাগ্রহীদের ঘিরে রাখেন যাতে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের ওপর কোনভাবেই লাঠিচার্জের সুযোগ না পায়। পুলিশী অভিযান এবং দমননীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে এর বিরুদ্ধে দেশের মানুষ হরতাল বা বনধ-এ অংশ নেন। রাজনীতিতে হরতাল শব্দটির উৎপত্তি সেই থেকে। জ্যোতি চক্রবর্তী ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা সকলেই হরতাল চলাকালে পিকেটিং এ অংশ নেন। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি আইন অমান্য করে শিশু সন্তান কোলে নিয়ে তিনি কারাবরণ করেন।

১৯৪০ সালে গান্ধীজীর গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার পূর্বে বন্দীমুক্তির দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের পক্ষ থকে দাবি তোলা হয় বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি না দিলে গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করা হোক। বন্দীমুক্তির প্রশ্নে অহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলনের বন্দীদের সম্পর্কে বৈষম্যের মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করায় 'সেবা সমিতির' সাথে কংগ্রেসের মতদ্বৈততা ঘটে।

কংগ্রেসের শর্ত ছিল লবণ আইন অমান্যকারী সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিয়ে মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন। কিন্তু বামপন্থী কংগ্রেসীদের দাবি ছিল বিনা বিচারে আটক সব রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। গান্ধীজী বামপন্থী কংগ্রেসীদের দাবির প্রতি একমত হননি। জ্যোতি চক্রবর্তী কংগ্রেসের বামপন্থী লবীর সদস্য ছিলেন। তিনি এবং কংগ্রেস সাব কমিটির সব সদস্যরা একযোগে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও বরিশাল জেলার নারী কর্মীরা কংগ্রেস হাই কমান্ডের এ সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হন। তখন তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে একটি কনভেনশন করবেন বলে ঠিক করেন। সেই কনভেনশন থেকে রাজবন্দী মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণসংযোগ ও আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তাঁরা ঠিক করেন। জ্যোতি চক্রবর্তী ও সুশিলা মিত্র কুমিল্লার বিভাগীয় কনভেনশনে যোগ দেন এবং ফিরে এসে নিজ জেলায় বন্দীমুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। এ মতদ্বৈততার কারণে কংগ্রেসের সাথে জ্যোতি চক্রবর্তীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং এক সময় যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

বাড়িতে লবণ তৈরি করার অপরাধে তাঁর স্বামীর দুই বছর জেল ও ১৫০০ টাকা জরিমানা হয়। জ্যোতি চক্রবর্তীর ওপর শহর ত্যাগ না করার হুকুম প্রশাসন থেকে জারী হয়। প্রতি সপ্তাহে থানার লোক এসে তাঁর হাজিরা নিয়ে যেত।

এ সময়ে গোপনে 'রেড ইস্তাহার' নামক একটি ইস্তাহার তাঁর কাছে নিয়মিত আসত। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে ইস্তাহারটি পড়তেন। এতে থাকতো নানা রকম খবর। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হলে এ যুদ্ধের পরিণতি হবে ভয়াবহ এবং ভারতও রেহাই পাবেনা। ইস্তাহারের ভাষ্য পড়ে যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি নিজে যেমন সচেতন হন ঠিক তেমনি অন্যদেরও সচেতন করে তোলেন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তাদের সমিতিতে ফার্স্ট এইড ট্রেনিং এবং ধাত্রী শিক্ষা প্রশিক্ষণে প্রথম হয়ে পৌরসভা থেকে একটি ইনস্ট্রুমেন্ট বকস প্রাইজ পান। হাতে কলমে কাজ শুরু করার সাথে সাথে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সকলে তাকে লেডি ডাক্তার বলত। এ জনপ্রিয়তা নারী সমিতি বিস্তারে সহায়ক হয়।

১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত জ্যোতি চক্রবর্তীর নিজ জেলার বন্দীরা ক্রমান্বয়ে ছাড়া পেতে থাকেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। তাদের সকলের সাথে জ্যোতি চক্রবর্তী আলাপ আলোচনা শুরু করেন। ব্যাপক গণজাগরণের উদ্দেশ্যে নারী সমিতিকে জেলাময় বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সমিতির শাখা কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়। জ্যোতি চক্রবর্তী ও সুশীলা মিত্র দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ৬ মাসের মধ্যে ১০/১২টি থানায় প্রাথমিক কমিটি গঠিত হয়। সাধারণ সদস্যা সংগ্রহের পাশাপাশি একটি নারী সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় সে সময়। হাজারখানেক গ্রাম্য চাষী মেয়েদের নিয়ে শহরে শোভাযাত্রা করে কুমিল্লা সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। শহরে মেয়েদের শোভাযাত্রা ও সম্মেলন প্রথম বলে শহরময় সাড়া পড়ে যায়। জ্যোতি চক্রবর্তী জেলা কমিটির সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের দামামা বাজার সাথে সাথে শুরু হয় বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য। যুদ্ধ, নিত্য নতুন মারণাস্ত্রের ব্যবহার, দুর্ভিক্ষ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির গগনচুম্বী মূল্য মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে। দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে দেশব্যাপী ব্যাপক ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার, আত্মরক্ষার শিক্ষাদান, ফার্স্ট এইড ট্রেনিং ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে নারী সমিতি ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে

দাঁড়ায়। হিটলার বাহিনীর সোভিয়েত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসী বিরোধী প্রচারও প্রাধান্য পায়। আন্দামান ফেরত যুবকরা এ যুদ্ধের অনেক ভয়াবহ তথ্য সরবরাহ করে নারী সমিতিতে সহায়তা করেন। জ্যোতি চক্রবর্তী সহ 'নারী সমিতির' কর্মীরা শহরের যুবকর্মীদের সহযোগিতায় খাদ্য সংগ্রহ এবং অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা তৈরি করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকেন। সে সাথে সংগৃহীত খাদ্য বিতরণের কাজ চালাতে থাকেন। খাদ্যবিলি, জেলা প্রশাসকের দপ্তরে মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রেরণ, খাদ্যের দাবিতে মিছিল মিটিং ইত্যাদি কাজে জ্যোতি চক্রবর্তীর বিরাট ভূমিকা ছিল। জেলা শাসকের দপ্তর থেকে সংগৃহীত ত্রাণ সুষ্ঠু বিলি বন্টন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসহায় মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে প্রশাসনের কাছে রিটার্ণও দাখিল করেন।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া স্তিমিত হতে না হতে শুরু হয় ব্যাপক নারী নির্যাতন। 'নারী সমিতি' দুর্বৃত্তের কবল হতে একশত হিন্দু মুসলিম যুবতী মেয়েকে উদ্ধার করে। জ্যোতি চক্রবর্তী ও তার সহযোগীরা মিলে এসব উদ্ধারকৃত মেয়েদের জন্য একটি হোম প্রতিষ্ঠা করেন। হোম চালানোর জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম অর্থ সাহায্য আসে কোলকাতার 'নারী সেবা সংঘ' থেকে।

১৯৪১ সালে জ্যোতি চক্রবর্তী অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। পার্টি তখনো নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া সহ মিত্র শক্তি গঠন পর্বে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালে কলকাতার বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলনে জ্যোতি চক্রবর্তী ও সুশীলা মিত্র উভয়ই যোগ দেন। এ সময় মহিলাদের আন্দোলনের ফলে রেশন ব্যবস্থা চালু হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সমস্ত শক্তি নিয়ে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট হঠাৎ করে কলকাতায় শুরু হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এ সময় জ্যোতি চক্রবর্তীকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। এ দাঙ্গা সাবেক পূর্ব বাংলার নোয়াখালী জেলায় ছড়িয়ে পড়ে মারাত্মক রূপ ধারণ করে। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে দূর্গপূজার প্রথম দিনে নোয়াখালীর তথারখালিতে জ্যোতি চক্রবর্তীর স্বামী প্রসন্ন মোহন চক্রবর্তীর বাড়ি দাঙ্গাবাজরা আক্রমণ করে। সে সময় প্রসন্ন মোহন চক্রবর্তী বাড়ি ছিলেন না।

দাঙ্গাবাজরা তাঁকে না পেয়ে বাড়ির সহায় সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়। কমিউনিস্ট কর্মী ও স্থানীয় প্রশাসনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় দাঙ্গার সময় নির্যাতীত যুবতীদের জন্য একটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। জ্যোতি চক্রবর্তী আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে এ আশ্রয় কেন্দ্রের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারত বর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ভারতে কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পেয়ে সরকার গঠন করে। ১৯৪৮ সালে জ্যোতি চক্রবর্তী নোয়াখালী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। পরবর্তীতে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। জ্যোতি চক্রবর্তীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশী না থাকলেও তিনি আত্মশিক্ষায় শিক্ষিত ও জ্ঞানী ছিলেন। সমকালীন প্রগতিশীল সাহিত্য সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, মার্কসবাদ লেলিনবাদ সম্পর্কে তাঁর প্রখর জ্ঞান ছিল। সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা থেকে মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন করা ছিল তার নিত্যকার অভ্যাস। যে কোন বিষয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের গভীরে তিনি সচরাচর প্রবেশ করতে পারতেন। ভারতবর্ষে 'মুসলিম মহিলা বিল' পাশ হবার পর তিনি 'কোরান শরীফ' পড়ে নিজের মনের জিজ্ঞাসা মিটিয়েছেন। শাসক

শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেছেন। লেখিকা হিসেবে তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন। এছাড়া তিনি ছিলেন সুবক্তা। সাধারণ মা বোনদের কাছে প্রাঞ্জল ও সাবলিল ভাষায় যে কোন বক্তব্যই সহজে পৌঁছে দিতে পারতেন।

জ্যোতি চক্রবর্তী তার রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মানসিক দৃঢ়তা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু মনোবল হারাননি। প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের নেতার স্ত্রী হিসেবে তাঁকে অর্থাভাবে দিন কাটাতে হয়েছে। রাজনৈতিক জীবন শুরু হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তাঁকে চলতে হয়েছে। গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে গিয়ে অনাহারে থাকতে হয়েছে। দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক কারণে ক্ষয়ক্ষতিতে কোন সময় বিচলিত হন নি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সাথে পারিবারিক জীবনের এক চমৎকার বোঝাপড়া ছিল। পরম মমতা দিয়ে তিনি তাঁর পুত্র কন্যাদের মানুষ করেছেন। তিনি চার পুত্র ও দুই কন্যার জননী ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা বনানী বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির অন্যতম নেত্রী। জ্যোতি চক্রবর্তী বৈপ্লবিক নিষ্ঠা নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত নিপীড়িত নারী সমাজের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। 'রচনা সংগ্রহ' নামে তার একটি প্রবন্ধ সংকলনও রয়েছে। ১৯৮৬ সালের ২২ জুলাই তাঁর কর্মময় জীবনের যবনিকাপাত ঘটে।

লেখক: ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ

তথ্যসূত্র:
১. মুক্তি মঞ্চে নারী: ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, রচনা কাল: ১৯৯৪-১৯৯৭, প্রকাশকাল ১৯৯৯, প্রকাশক: প্রিপ ট্রাস্ট, ৫৯ এ সাত মসজিদ রোড, ঢাকা।

লতিকা সেন



লতিকা সেনের জন্ম ১৯১৩ সালের ২৮ মে (বাংলা ১৩১৯ সাল, ১৪ জ্যৈষ্ঠ) ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার পাইকপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নিবারণ চন্দ্র দাশ এবং মা কিরণ বালা দাশ। পিতা নিবারণ চন্দ্র দাশ সে সময় রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন। তাঁর পিতামহ প্রসন্নকুমার দাশ একজন আইনজীবী ছিলেন। মাতামহ নিখিলনাথ রায় সে সময় বাংলা সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পিতার বদলির চাকরি হেতু শৈশবকাল তাঁর কেটেছে মায়ের সঙ্গে মামা বাড়িতে।

১৯১৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে ঢাকায় থাকেন। ঢাকায় আসার অল্পদিন পর বড়ভাই অনিলকুমার জড়িয়ে পড়েন অনিল রায়ের 'শ্রীসংঘের' সাথে। সেই সূত্র ধরে লতিকাও জড়িয়ে যান লীলা রায়ের দীপালি সংঘের সাথে।

লতিকার স্কুল জীবন শুরু হয় লীলা রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা মন্দিরে। বড়ভাই অনিল রায়ের সহায়তায় লতিকা এসে ওই স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হন। এ স্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্কুলের ওপরের ক্লাশে পড়ার সময় তিনি দীপালি সংঘের সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত হন।

স্কুলের শিক্ষা শেষে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন। কলেজে ভর্তি হবার পর তাঁর মেয়েদের মধ্যে কাজ করার পরিধি ও সুযোগ বেড়ে যায়। ফলে শ্রীসংঘের পরিধিতে বিপ্লবী মেয়েদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। অচিরেই তিনি তাদের সঙ্গী হয়ে ওঠেন। গোপন সংবাদ সরবরাহ, অস্ত্রের তদারকি করা, একঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া, সংগঠনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি বিষয়ক দায়িত্ব পালনে লতিকা বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

আত্মত্যাগ, সেবা ও লাঞ্ছনা বরণের শিক্ষার সাথে সাথে সুখভোগের প্রতি নির্লিপ্ততা ও অনাসক্তি তাঁর সহজাত গুণ হিসেবে প্রকাশ পায়।

১৯৩২ সালের জুন মাসে বড় ভাই অনিল দাশ হঠাৎ করে ধরা পড়ে যান পুলিশের হাতে। গ্রেপ্তারের পর ১১ দিন ধরে তাঁর ওপর চলে বর্বর পুলিশী নির্যাতন। এ নির্যাতনের ফলে

কারাগারে তাঁর মৃত্যু ঘটে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর অল্পদিন পর পুলিশের হাতে কনিষ্ঠভাত্রা পরিমলেরও শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। পরপর দুই ভ্রাতার অকাল প্রয়াণ ও অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুনীল দাশের গ্রেপ্তার এবং দীর্ঘ বন্দীত্ব লতিকাকে এক চরম অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি করে। মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও মূল্যবোধে আস্থাশীল হয়ে সাংগঠনিক কাজকর্মও চালিয়ে যান তিনি।

১৯৩৫ সালে ঢাকায় পুলিশি তৎপরতা বেড়ে গেলে পর লতিকা তাঁর মায়ের সাথে কোলকাতায় চলে যান। ঢাকার বন্ধু সুধা রায়ের সহায়তায় কোলকাতায় বেঙ্গল লেবার পার্টির সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। তিনি এ পার্টির সাথে যুক্ত হন।

১৯৩৬ সালে বেঙ্গল লেবার পার্টির সাথে মতদ্বৈততার কারণে তিনি ভারতের কমিউস্টি পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। লকিতা সেনই অবিভক্ত ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলাদেশের প্রথম নারী সদস্য।

পার্টিতে যোগদানের অল্প দিনের মধ্যে পার্টির কাজে তিনি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কাজকর্মে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা বলে অল্প সময়ের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একনিষ্ঠতা, সরলতা, দৃঢ়তা ও সততার ফলে পার্টির ভিতর ও বাইরে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

১৯৩৮ সালে বন্দী মুক্তির পর কমলা দাশগুপ্তা, কমলা মুখার্জী ও তাঁর সহযাত্রী মুক্ত বন্দীরা মিলে 'মন্দিরা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ওই পত্রিকায় তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও সে সময় লেখেন। কমিউনিস্ট পার্টির গোপন ক্রিয়াকলাপের সাথে লতিকার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। বেআইনী পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, প্রচার ও বিতরণে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সেলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৯৩৯ সালের ২০ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রণেন সেনের সাথে তাঁর পরিণয় ঘটে।

১৯৪০ সালে পুলিশের রিপোর্টের কারণে তিনি ভবানীপুর বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদটি হারান। চাকরিচ্যুত হওয়ার ফলে তিনি বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হন।

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে তিনি এক পুত্র সন্তানের জননী হন।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় দূর্গত মানুষের সেবায় নিজকে নিয়োজিত করেন। সে সময় কনক মুখার্জী, মণিকুন্তলা সেন, কমলা মুখার্জী, রেণু চক্রবর্তীসহ তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন। এ সমিতির শাখা ক্রমশঃ চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ওই সময় তিনি নারী সেবা সংঘ নামক মহিলাদের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের একজন সম্পাদিকা মনোনীত হন।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নোয়াখালিতে যান। সেখানে তিনি মাসাধিককাল পার্টির পক্ষে ত্রাণকাজ চালান।

১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ সরকারের পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সে সময় তিনি গভীর নিষ্ঠার সাথে তাঁর কর্তব্য কর্ম করে যান। তিনি কখনও আদর্শচ্যুত হননি।

১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্টদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। কয়েক হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বন্দী মুক্তির জন্য ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে কোলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটে 'ভারত সভা হলে' একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে মহিলাদের একটি শোভাযাত্রাও বের হয়। সহযোগী যোদ্ধা প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয় দত্ত ও গীতা সরকারকে নিয়ে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে লতিকা সেন ছিলেন। ভারতের কংগ্রেস সরকারের পুলিশ বাহিনী বিনা উস্কানীতে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে নেতৃত্বদানকারী লতিকা সেন ও তার সহযোগী চারজন মহিলা শহীদ হন। ব্রিটিশ বিতাড়িত ভারতবর্ষে আবারো শহীদের খাতায় নারীদের নাম লেখা হয়। জীবন বিসর্জন দিয়ে লতিকা সেন ও তার সাথীরা প্রমাণ করেন স্বাধীন ভারতবর্ষে নারীদেরও রাজনীতি করার অধিকার আছে। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তাঁরাও নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতে সমর্থ।

লেখক: ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ

তথ্যসূত্র:

১. মুক্তি মঞ্চে নারী– ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, রচনা কাল: ১৯৯৪–১৯৯৭, প্রকাশকাল ১৯৯৯, প্রকাশক: প্রিপ ট্রাস্ট, ৫৯ এ সাত মসজিদ রোড, ঢাকা।

সুহাসিনী দাস



অপ্রকাশের পর্দা টেনে যে সব মহীয়সী নারী বাংলার পথ প্রান্তরে, আনাচে-কানাচে এবং অন্তরাল থেকে জীবন ব্যাপ্ত রেখেছেন সমাজ সেবায়, তাঁদেরই একজন সিলেটের সুহাসিনী দাস। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। নারী উন্নয়নের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সুহাসিনী দাস সিলেট জেলার কুলাউড়াস্থ রঙিলকুল গঠনমূলক কর্মী সংঘের পরিচালিকা এবং সিলেট শহরের উমেশচন্দ্র নির্মলাবালা ছাত্রাবাসের বর্তমান ট্রাস্টির পরিচালিকা হিসেবে কর্মরত আছেন।

সুহাসিনী দাসের জন্ম ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে (১লা ভাদ্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ)। তাঁর পিতা প্যারিমোহন রায় এবং মা শোভা রায় ছিলেন জগন্নাথপুর নিবাসী। তিনি তার পিতামাতার প্রথম সন্তান।

গ্রামের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের পর ১৯৩০ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় সিলেট শহরের জামতলাস্থিত কোটিচাঁদ প্রেসের মালিক কুমুদ চন্দ্র দাসের সাথে। কুমুদ চন্দ্র সিলেটের এ প্রাচীনতম প্রেসের মালিক ছিলেন। কোটিচাঁদ প্রেস ও কোটিচাঁদ লাইব্রেরী সিলেটের দ্বিতীয় প্রেস এবং লাইব্রেরীটি ছিল প্রথম। সে হিসেবে এর পরিচিতি ছিল ব্যাপক। তার শ্বশুর কোটি চাঁদের মৃত্যুর পর এ প্রেসের কর্ণধার ছিলেন তাঁর স্বামী।

কুমুদ চন্দ্ররা চারভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় ভ্রাতৃবধূ। এদের পরিবারে সকলেই ছিলেন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাঁর দেবর ফনীন্দ্র দাস একাধারে চারণ কবি, গায়ক, বংশীবাদক ও খেলোয়াড় হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

১৯৩৫ সালে (১৩৩৭ বাংলা) তাঁর চার বছরের সুখী গৃহী জীবনের ছন্দপতন ঘটে। তাঁর স্বামী আকস্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করেন। মাত্র ১৯ বছর ৫ মাস বয়সে তাঁর জীবনে নেমে আসে অকাল বৈধব্য। দেড় বছরের কন্যা নীলিমাকে নিয়ে তিনি পড়েন বিপাকে। এসময় তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন তাঁর দেবর ফনীন্দ্র চন্দ্র দাস। মূলতঃ ফনীন্দ্র দাসের চেষ্টায় সুহাসিনী স্বামী হারানোর শোক অনেকটা কাটিয়ে ধীতস্থ হন। লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। একে একে কোটি চাঁদ লাইব্রেরীর যাবতীয় বই তাঁর পড়া হয়ে যায়। অন্যান্য স্থান থেকেও ফনীন্দ্র চন্দ্র দাস তার বিধবা ভ্রাতৃবধুর জন্য ধর্মীয় বই জোগাড় করে

দিতেন। এভাবেই তাঁর সাত্ত্বিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। স্বদেশী যুগের হাওয়া লাগা পত্রিকা হরিজন ও অন্যান্য পত্র পত্রিকার সুবাদে বাইরের জগতের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয় সুদৃঢ়। সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার টানাপোড়েন ক্ষতবিক্ষত জীবনের ধারা আস্তে আস্তে বদলে দেন মহিলা সংঘের কর্মী নরেশনন্দিনী দত্ত, সরলা দেব এবং দেবর ফনীবাবু। ১৯৩৯ সালে সিলেট কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত সারদা হলে। এ সম্মেলনে সভানেত্রী ছিলেন ঢাকার আশালতা সেন। সম্মেলনের তৃতীয় দিনের সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় সকাল বেলা। সমাপ্তি অধিবেশনে যোগদানকারী পাড়ার মহিলাদের মধ্য থেকে মাধুরী দাস তাঁকে অনেক বলে কয়ে সাথে নিয়ে যান। অধিবেশন শেষে সুহাসিনী অবাক হয়ে দেখেন অনেক মহিলা সূতা কাটছেন বাক্স চরকা দিয়ে। এ চরকা কাটার ঘটনা তার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। অকাল বৈধব্য জীবনের দুঃসহ দুঃখ জয় করে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় তাঁর সামনে।
সারাদিন বাড়ি বসে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে গান্ধীজীর এ মহৎ কাজটা ঘরে বসে করা শ্রেয় মনে করেন।
সম্মেলন শেষে বাড়ি ফিরে এসে 'বিদ্যাশ্রমের' দোকান থেকে একটি বাক্স চরকা ও তুলার পাঁজ আনার জন্য বাড়ির কর্মচারী বলাই দাসকে নির্দেশ দেন। সুহাসিনী দাসদের পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র কেনা হতো কোটিচাঁদ লাইব্রেরীর তহবিল থেকে। চারটাকা দিয়ে একটি বাক্স চরকা ও দু'টাকা দামের তুলার পাঁজ আসে তাঁর জন্যে।
বাক্স চরকা ও সূতা আনার পর সমস্যা দেখা দিল সূতা কাটবেন কি করে? সম্মেলনের ঠিক দুদিন পর জামতলা দিয়ে মহিলা সংঘের কর্মী নরেশ নন্দিনী দত্তকে যেতে দেখে ডেকে আনলেন ঘরে। বস্তুতঃ নরেশ নন্দিনী দত্তের সহযোগিতায় চরকা কাটা শিখেন সুহাসিনী। প্রতিদিন নিয়মিত সূতা কাটার চর্চা অব্যাহত রাখেন। ক্রমে তাঁর দেখাদেখি তাঁরই সমবয়সী পাড়ার সাতটি মেয়ে তাঁর সাথে সূতা কাটায় যোগ দেয়। তারা তাঁর ঘরে একসাথে বসে সূতা কাটতেন, পত্রিকা পড়তেন ও নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তারা তাদের কাটা সূতা 'বিদ্যাশ্রম' দোকানে পাঠাতেন। বিনিময়ে সূতার পরিবর্তে থান কাপড় আসতো। এ কাপড় দিয়ে সুহাসিনী দেবীরা সবাই পর্দা, চাদর ইত্যাদি তৈরি করতেন।
বিদ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ধীরেন দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের পুরোধা। দোকানে বসা অবস্থায় একদিন কোটচাঁদ লাইব্রেরীর কর্মচারী বলাই দাসের হাত দিয়ে সুহাসিনী দেবী সাড়ে পাঁচ সের সূতো পাঠান দোকানে। সূতো এবং সূতোর পরিমাণ দেখে তিনি অবাক হয়ে তার কর্মচারী সতীশ বাবুকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ সূতো কাটে কে?
সতীশ বাবু বললেন ঃ 'জামতলার একটি বউ এবং তার সাথী কয়েকটি মেয়ে। বউটিকে আমি দেখিনি এবং মেয়েগুলোর সাথে আমার পরিচয় নেই।'
ধীরেন বাবু বলাই দাসের কাছ থেকে সুহাসিনী দাসের বাড়ির পরিচয় জেনে নেন। তারপর ফনীবাবুকে খবর পাঠান যে তিনি তাদের বাড়ি আসতে চান। ফনীবাবু সানন্দে তাঁকে বাড়ি আসার ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য মেয়েরাও সে সময় চরকা কাটছিল। ধীরেন বাবুর সাথে এভাবেই সুহাসিনী দাসের পরিচয় হয়। ধীরেন বাবু যখন জানতে পারলেন যে সূতা কাটায় অভিজ্ঞ সব মেয়েরাই সুহাসিনী দাসের সাথে একত্রে সূতা কাটে, তখন তিনি খুব খুশী হন। সূতা কেটে স্বাবলম্বী হতে গেলে যা যা করা প্রয়োজন তিনি পরবর্তীতে তার সমুদয় ব্যবস্থা

করে দেন। ফলে আর্থিকায়নের একটি পথ তাঁদের সামনে খুলে যায়। সিলেট জামতলায় নিজ বাড়িতে স্থাপিত চরকা কেন্দ্রে তিনি সহ আরো ১৪টি মেয়ে নিয়মিত সূতা কাটত। এ কেন্দ্র পরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। ঘরের বউ বলে বাইরে যাবার তেমন কোন সুযোগ সে সময় সুহাসিনী দাসের ছিল না। তাঁর পরিচয়ের গণ্ডীও ছিল সীমিত। মহিলা সংঘের গুটি কয়েক কর্মী ছিলেন তাঁর পরিচিত। ১৯৩৯ সালে একদিন তারা এসে ফনীবাবুর স্ত্রী মায়া ও সুহাসিনী দাসকে পঁচিশ পয়সা চাঁদার বিনিময়ে কংগ্রেসের সদস্য করে নেন। সিলেট শহরের মধ্যেই তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়। সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া, সদস্য বাড়ানো, সংগঠন সৃষ্টি ও সূতা কাটা শেখানোই তাঁর দায়িত্ব হয়ে পড়ে। এভাবে তিনি কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় আসেন। নরেশ নন্দিনী দত্তের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় ঘটে পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত, সরোজ দাস, অবলাকান্ত গুপ্ত, নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী, সরলা বালা দেবের সাথে। ১৯৪০ সালের ২৬ জানুয়ারি সিলেট শহরের শেখঘাটস্থিত মহিলা সংঘের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংঘের নিয়মিত সভায় নরেশ নন্দিনী দত্ত তাঁকে নিয়ে যান। সে সভার সভানেত্রী ছিলেন সরলা দেব। সভার প্রস্তাব অনুযায়ী সুহাসিনী আজীবন খদ্দর পরার সংকল্প গ্রহণ করেন। সেদিন থেকে ১৯৯৭ সাল অবধি তিনি খদ্দর পরে দিন কাটাচ্ছেন। মিলের কোন কাপড় ব্যবহার করেন না। ১৯৪০ সালের ২৬ জানুয়ারি রাতের বেলা বিদ্যাশ্রমের দোকান থেকে সূতোর বিনিময়ে একজোড়া খদ্দরের কাপড় আনান এবং সেদিন থেকে খদ্দের পড়া শুরু করেন।

১৯৪১ সালে সুহাসিনী দাস মহিলা সংঘের সাথে জড়িত হন। তিনি এ সংঘের তত্ত্বাবধানে মণিপুরী তাঁতের কাজ, চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ, মানি ব্যাগ তৈরির কাজ, এমব্রডারী, সেলাই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। পরে মহিলা সংঘের শিল্প ক্লাশের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পান। এখানে মেয়েরা শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পেত। তবে সংঘ স্কুল থেকে সুহাসিনী দাস কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নি। সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিলেন তিনি। প্রশিক্ষণ দেবার সময়সূচী ছিল রোববার ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন দুপুর ১টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। প্রচণ্ড নিয়মশৃংখলা ছিল স্কুলের। হাজিরা ছিল নিয়মিত। মহিলা সংঘ অফিসে তাঁকে প্রায়ই নিতে আসতেন নরেশ নন্দিনী দত্ত।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু হলে সুহাসিনী দাসও সে আন্দোলনে যুক্ত হন। ১০ আগস্ট মহিলা সংঘের কর্মী সরলা দেব, নরেশ নন্দিনী দত্ত, উমা চক্রবর্তী, লীলা দত্ত, সুপ্রভা পুরকায়স্থ, হীরেন বালা দেবী, লিলি দত্ত এবং গিনী দাস প্রমুখের সাথে সুহাসিনী দাসও গ্রেপ্তার বরণ করেন। তাঁরা সিলেট জেলে আটক ছিলেন।

একই ঘটনায় সিলেট জেলে আটক ছিলেন যোড়হাটের দেবেশ্বর শর্মা, মণিপুরের ইরাবত সিংহ, বড় পেটার কামেশ্বর দাস, তেজপুরের গহন গোস্বামী, লীলা বড়ুয়া, লক্ষ্মী বড়ুয়া, সিলেটের শিবেন্দ্র বিশ্বাস, কেদার নাথ ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, অবলা গুপ্ত, এ. এস. এম. মোবারক, ইব্রাহিম আলী চতুলী, নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী, বাঘার মৌলানা বশির আহমদ, লাবণ্য চৌধুরী, রথীন্দ্র সেন, দূর্গাপদ দাস, কামিনী কুমার দে, শেখ আহমেদ হোসেন, হারুণ মিয়া, যতীন দে, প্রেমেন্দ্র গোস্বামী, হরি নারায়ণ দাস, নব কুমার ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকুমার পাল, অনিল রায়, যতীন্দ্র নাথ ভদ্র, নীরোদ কুমার গুপ্ত, রবীন্দ্র নাথ আদিত্য, দক্ষিণারঞ্জন গুপ্ত, অরুণ কুমার চন্দ্র, গোপেশ বিশ্বাস, কালী কুমার ভট্টাচার্য, যতীন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ। সুহাসিনী দাসের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর জেল জীবন আনন্দেরই খোরাক যুগিয়েছে। কেননা

তৎকালীন স্বদেশী যুগে গ্রেপ্তার হওয়াটা ছিল গৌরবের। জেলের ভেতরে তাঁরা সূতা কেটে ও পড়াশোনা করে সময় কাটাতেন। জেলের মধ্যে জোরে গান গাওয়া নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সহবন্দী লিলি দত্ত ও উমা চক্রবর্তী জেলারের নির্দেশ অমান্য করে গান গাইতেন। তাঁর কারাবাসের মেয়াদ ছিল নয় মাস।

দীর্ঘ নয় মাস কারাবাসের পর কারামুক্ত হবার পর ব্যাপকভাবে যোগাযোগ ঘটে পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত, নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী প্রমুখ এর সাথে। এ যোগাযোগের ফলে সামাজিক গঠনমূলক কাজকর্মের সাথে জড়িত হবার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয় সুহাসিনীর জন্যে।

১৯৪৫ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সভাপতি রূপে সিলেট সফরে আসেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় সফর। জেলা নেহেরু অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত। সহকারী নিকুঞ্জ গোস্বামী। সিলেট, মৌলভীবাজার, কুলাউড়ার কর্মীরা সর্বত্র তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। সিলেট মহিলা সংঘও নেহেরুকে অভ্যর্থনা দেবার আয়োজন করে। স্বদেশী কাজে সাহায্য করার জন্য নেহেরুর হাতে চার হাজার টাকা চাঁদা তুলে দেওয়া হবে স্থির হয়। মহিলা সংঘের সম্পাদিকা সরলা দেবী মহিলা কর্মীদের চাঁদা সংগ্রহ করতে বলেন। সুহাসিনী দাস ও অন্য তিনজন নারী কর্মীর উপর টাকা তোলার ভার পড়ে। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে চাঁদা তুলে সরলা দেবীকে দেন। সুহাসিনী দাস ও স্নেহলতা মহিলা সংঘের পক্ষে ডাউকিতে জওহরলাল নেহেরুকে অভ্যর্থনা জানান। পরে নেহেরুর সাথে সিলেট জেলার সর্বত্র ঘোরার সুযোগও তিনি পান। এছাড়া পার্টির নির্দেশে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৫ সালে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচনে পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্তের পক্ষে কুলাউড়া নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণায় সুহাসিনী দাস ও নরেশ নন্দিনী দত্ত অংশ নেন। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গলের কাছে বালিশিরা ভ্যালিতে। এ নির্বাচনে পূর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত ও জীবন সাঁওতাল জয়ী হন। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদেও দু'জনের সদস্যপদ অপরিবর্তিত ছিল।

শ্রীমঙ্গল চা শ্রমিক কেন্দ্র থেকে জীবন সাঁওতাল জয়ী হওয়াতে সিলেট জেলার চা বাগানসমূহে চা-শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। এ চা শ্রমিক ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তানের সর্ব বৃহৎ শ্রমিক ইউনিয়নে এক সময় পরিণত হয়। এর সদস্য সংখ্যা ৪০ হাজারে দাঁড়ায়। কুলাউড়া কর্মী ভবনে তার মূখ্য কার্যালয় স্থাপিত হয়। পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত এ শ্রমিক ইউনিয়নের জনক। জীবন সাঁওতাল, দুর্গেশ দেব, নিকুঞ্জ চৌধুরী, ভোলা সিংহ, মহিতোষ পুরকায়স্থ, সুবোধ দত্তের সাথে সুহাসিনী দাসও শ্রমিক নেতা হিসেবে এ সংগঠনকে গড়ে তোলেন। চা শ্রমিকের ন্যূনতম দাবি ও অধিকার সম্বলিত এক ঘোষণাপত্র এলাকায় প্রচার করা হয় এবং একে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক কাজ ও প্রচার জোরদার হয়। সে সময় শ্রমিকদের মধ্যে আফিং ও মদের বিশেষ প্রচলন ছিল। ইউনিয়নের প্রচার কাজ জোরদার হওয়াতে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার কমতে থাকে। এ ছাড়া এ প্রচারে শ্রমিক বালকদের শিক্ষা, মেয়েদের মাতৃত্বের ছুটি ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব পায়।

১৯৪৫ সালের নির্বাচনের পর আসাম কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়। তাতে রাজনৈতিক ও গঠনমূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সে সময় দিরাই থানার রাজানগরের টর্ণেডোর ফলে কয়েকটি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়। জানমালের ক্ষতি হয়। আসাম সরকার রাজানগরের চরকা ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে চরকা ও কুটির শিল্পের কেন্দ্র খোলা হয়। প্রবাল চৌধুরী ও চামেলী

চৌধুরীকে সেই কেন্দ্রের দায়িত্ব দেয়া হয়। কুলাউড়া কর্মীসংঘ থেকে কর্মীরা গিয়ে তাদের কাজে সহায়তা করেন। বীণা দত্ত ও নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামীর সাথে সুহাসিনিও সেখানে ছিলেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দৈলে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষ্ণুসেধীরা কুলাউড়া কর্মীসংঘের কাজকর্ম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৯৪৫ সালে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যকার রাজনৈতিক কোন্দল বেড়ে যায়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'ডারেক্ট এ্যাকশন' ঘোষণা করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৬ সালে নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। সিলেট রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত ঘানি কেন্দ্রটি ভস্মিভূত হয়। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। লক্ষাধিক লোক নোয়াখালী ত্যাগ করেন। শিলচর, সিলেট প্রভৃতি স্থানে ক্যাম্প স্থাপিত হয়। বাস্তুভিটা ত্যাগকারীদের এখানে আশ্রয় দেয়া হয়। হিন্দুদের ওপর চরম নির্যাতন চালানো হয়। সে সময় মহাত্মা গান্ধী আসেন তার শান্তি মিশন নিয়ে। সিলেট থেকে একটি দল নোয়াখালীর রামগঞ্জে গিয়ে গান্ধীজীর কাছে উপস্থিত হন। দশজনের এ দলে ছিলেন নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী, সরলা দেব, নরেশ নন্দিনী দত্ত, কিরণ শশীদেব, লীলা দাসগুপ্তা ও সুহাসিনী দাস। অভয় আশ্রমের সাথে যুক্ত হয়ে তারা প্রায় ছয়মাস সেখানে সেবা ও ত্রাণ কাজ চালান। নোয়াখালীর রায়পুরায় বিষকাটালী গ্রামে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর সহধর্মিনী মালতী দেবীর সাথে সফরকালে নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী কলেরা রোগে এবং আলুনিয়া গ্রামে সুহাসিনী দাস বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সে খবর পেয়ে গান্ধীজী তাঁদের দেখতে আসেন।

গান্ধীজী হিন্দিতে বললেন: শীগগীর সুস্থ হয়ে উঠবে এবং সেবার কাজ করবে। মন খারাপ করো না।

এ সময় নোয়াখালীর গ্রামগুলোতে মুসলিম বাড়িতে আটক হিন্দু মেয়েদের উদ্ধার করা এবং ত্রাণের কাজই ছিল নোয়াখালীতে থাকাকালে তাঁদের প্রধান কাজ। ১৫-১৬ জনের একটি দল তৈরি করে কাজের চাহিদা নিরূপণ করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতেন তিনি।

সুহাসিনী দাসের নোয়াখালী থাকাকালে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। ফলে মহাত্মা গান্ধীকে নোয়াখালী ছেড়ে ভারতে চলে যেতে হয়।

১৯৪৬ সালে আন্দোলনরত চা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন। সে সময় চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ছিল ০.১৫ পয়সা। শ্রমিক ভাতা ও মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য মূলতঃ এ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনের দাবি ছিল ঃ

১। শ্রমিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃতি।

২। শ্রমিকদের কাজের নিরিখ হ্রাস করা।

৩। শ্রমিকদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের সংগৃহীত চা পাতার ওজনে কারচুপি, মজুরী কাটা প্রভৃতি বন্ধ করা।

৪। মজুরী বৃদ্ধি।

৫। গিরমিট প্রথা বা আজীবন বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করার চুক্তি বাতিল করে শ্রমিকদের কর্ম ও কর্মস্থল বেছে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া।

৬। উন্নততর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭। শ্রমিকদের অসুখ বিসুখে উন্নততর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৮। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব কালীন ছুটি মঞ্জুর করা।

৯। কোম্পানীর খরচে শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা।

১০। ইউনিয়নকে স্বীকার করে নেয়া প্রভৃতি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ৫ লক্ষ চা শ্রমিককে ভাসমান হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়া হয়। ভোটের দাবিতে তারা ফুলতলা থেকে মৌলভীবাজার শহর অবধি চল্লিশ মাইল পায়ে হেঁটে লংমার্চ করে। কিন্তু আমাদের বড়দলৈ সরকারের অসহযোগিতার ফলে শ্রমিকদের এ দাবি দিল্লীতে পৌঁছায় না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দূত যোগেন্দ্র মন্ডল এসে তপসিলী সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট পাকিস্তানের অনুকূলে কাষ্টিং করান। ৫৫ হাজার ভোটে সিলেট জেলা পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায়। যুদ্ধ ও দেশ বিভাগের পরিণতির প্রভাব পড়ে চা শ্রমিকদের ওপর। তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। শ্রমিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। দেশ বিভাগের সাথে সাথে হবিগঞ্জের অধীনস্থ লাখাই এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। এরফলে নোওয়া গ্রামসহ পাঁচটি নমঃশুদ্র ও কৈবর্ত গ্রাম সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়। গণভোটে এরা ভারতের পক্ষে ভোট দিয়েছিল এ ছিল তাদের অপরাধ। কুলাউড়া কর্মীভবন থেকে সম্প্রীতি স্থাপন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে যোগ দেবার জন্য সুহাসিনী দাস, চারুশীলা দেব, সুপ্রভাব পুরকায়স্থ সহ লাখাই যান এবং সেখানে বেশ ক'টি মাস অতিবাহিত করেন। পূর্ববাংলা সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে সুহাসিনী দাস ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের সহায়তায় পঞ্চাশ বেইল সূতা কোলকাতা থেকে আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মদিনা স্টীমার গুদামে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ সূতা কোলকাতা থেকে আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মদিনা স্টীমার গুদামে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ সূতা আটক করেন। অনেক চেষ্টা ও তদবীরে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হবার পর নাজিম উদ্দিনের আদেশে মাত্র পনের বেইল সূতা তাঁরা পান, কৈবর্তদের জার তৈরির জন্য। বাদ বাকি সূতা সরকার অধিগ্রহণ করেন। এতে কর্মী সংঘের অর্থ তহবিল নিঃশেষ হয়।

দেশ বিভাগের পর দেশের হিন্দু নেতা, কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেশত্যাগ শুরু হয়। সুহাসিনী দাস সে সময় দেশ ছাড়বেন না বলে স্থির করেন। পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ও নিকুঞ্জ গোস্বামীদের সাথে রঙ্গীরকূল আশ্রমকে পুনরায় গো-পালন কেন্দ্র ও সেবামূলক কর্মকেন্দ্র হিসেবে পুনর্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কস্তরবা প্রশিক্ষণ থাকাতে রঙ্গীলকূল আশ্রমকে কেন্দ্র করে গ্রাম সেবামূলক কার্যক্রম শুরু করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মণিপুরী তাঁত বুনা, চরকায় সূতা কাটা, সেলাই কাজ, গ্রাম সাফাই কাজ, প্রার্থনা সভা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ শুরু করেন।

এগার বার ভারতবর্ষে কস্তুরবা ট্রাস্ট-এর বাৎসরিক কর্মী সম্মেলনে যোগ দেবার সুযোগ পান সুহাসিনী।

১৯৪৮ সালের শেষ ভাগে মধ্যভারতের ওয়ার্ধায় গান্ধী পন্থী নেতৃবর্গের এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যাশ্রম থেকে ধীরেন দাস গুপ্ত, পূর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত ও নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামীর সাথে সুহাসিনী দাসও ওয়ার্ধা সম্মেলনে যোগ দেন। এ সম্মেলনে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, কাকা কোললকার, আচার্য বিনোবাভাবে, ডা. জাকির হোসেন, আচার্য কৃপালিনী, শংকরারাও দত্ত, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষসহ ভারতবর্ষের প্রায় সাতশত নেতৃবৃন্দ এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণই ছিল এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

মাসিক ৩০ টাকা ভাতার বিনিময়ে ১৯৪৯ সালে তিনি কুলাউড়ার রঙ্গীলকুল আশ্রমে যোগ দেন। এখান থেকে বছরে একবার করে কংগ্রেসের কনফারেন্সে যেতেন। দেশ বিভাগের পর

পাকিস্তান কংগ্রেসের কোন সক্রিয় কেন্দ্র না থাকাতে নারী সহকর্মীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একক নারী কর্মী হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তান রয়ে যান।

১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বরিশাল, ভৈরব, ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেট সদর, বিশ্বনাথ ও বালাগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। সংখ্যালঘুদের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দেশত্যাগ শুরু হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তত পাক-প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান সিলেট সফরে আসেন। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংখ্যালঘুদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ বিশ্লেষণ করে এর প্রতিকার দাবি করেন। সে সাথে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের উসকানীদাতা তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার মিঃ নোমানীর বদলির দাবিও তোলেন। প্রধান মন্ত্রী অচিরেই ডেপুটি কমিশনারের বদলির ব্যবস্থা করেন।

সে সময় সংখ্যালঘুদের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জনাব মদরিছ আলী চৌধুরীকে স্পেশিয়াল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। জনাব মদরিস আলী ও তৎকালীন পুলিশ সুপার জনাব আহম্মদের একান্ত প্রচেষ্টায় দাঙ্গারত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নেহেরু-লিয়াকত আলী প্যাক্ট হয়, সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হিসেবে। জেলা ও মহকুমার মাইনরিটি বোর্ড গঠিত হয়। বাঙালী সি. এস. পি. অফিসারদের সহায়তায় বেদখলকৃত হিন্দুদের বিত্ত ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কাজ চলে। এ সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কাজে সুহাসিনী দাস ব্রতী হন।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুবের সামরিক শাসন শুরু হলে দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে কংগ্রেসও বেআইনী ঘোষিত হয়। কুলাউড়াস্থিত চা শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে সরকারী তালা পড়ে। তখন সুহাসিনী দাস রঙ্গীলকুল আশ্রমের কর্ম পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৬০ সালে চট্টগ্রামে সামুদ্রিক প্রলয়ংকরী ঝড়ে বহু প্রাণ ও সম্পত্তির বিনাশ ঘটে। প্রবর্তক সংঘের পরিচালনায় চিরিংগা নামক অঞ্চলে ত্রাণ কাজে সুহাসিনী দাস অংশ নেন। নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী দশটি অনাথ শিশুকে চট্টগ্রাম থেকে সিলেট নিয়ে আসেন। এদের পাঁচজনকে রঙ্গীলকূল আশ্রমে ও বাকিদের পঞ্চখণ্ড কালাচাঁদ মিলন মন্দিরে আবাসিক আশ্রয় দেয়া হয়। এদের লেখাপড়া শেখানো হয়। এসব ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুহাসিনী দাস পালন করেন। এরা সবাই পরবর্তী জীবনে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায়।

১৯৬১ সালে সিলেট শহরের চালিবন্দরস্থিত এড্‌ভোকেট উমেশচন্দ্র দাসের অন্তিম ইচ্ছে অনুযায়ী জনসেবার উদ্দেশ্যে একটি ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। ছাত্রাবাস গড়ে তোলার ব্যাপারে সুহাসিনী দাসের সহযোগিতা ছিল।

১৯৬২ সালে দেশব্যাপী বিবেকানন্দ শত বার্ষিকী উৎসবে তিনি যোগদান করেন। সিলেট শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৬৩ সালের শেষের দিকে আচার্য বিনোবাভাবে আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গ যাবার পথে পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর ও দিনাজপুর জেলাদ্বয়ের ওপর দিয়ে ষোলদিন ভূদান পরিক্রমা করেন। এ পদ পরিক্রমায় সুহাসিনী দাসও যোগ দেন। একই সালে চন্দ্রনাথ তীর্থেও তিনি যান।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত ও নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী গ্রেপ্তার হন। সে সময় রঙ্গীরকুল আশ্রমের উপর দিয়ে বহু ঝড় বয়ে যায়। সুহাসিনী দাস কয়েকটি অনাথ শিশু ও কর্মী নিয়ে আশ্রমে থেকে যান।

১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ভাগবতী পরিক্রমায় তিনি অংশ নেন।
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় উমেশচন্দ্র ছাত্রাবাসের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। সুহাসিনী ছিলেন রঙ্গীলকুল আশ্রমে। এখানে পাক সেনারা হানা দেয়। আশ্রমে আশ্রিত অনাথ ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে তাঁর পক্ষে আশ্রম ত্যাগ সম্ভবপর হয়নি। পাকসেনারা অনেক ঝামেলা করেছিল। আশ্রম তল্লাসী করে তারা আশ্রমকর্মী জীবন সাহাকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু তিনি বেশীদিন বাঁচেন নি। সুহাসিনী দাস একাকী এ সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে এ বিভীষিকাময় দিনগুলোতে আশ্রমে ছিলেন।
বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নিরাশ্রিত মানুষের কথা চিন্তা করে বেসরকারীভাবে কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে 'শ্রীকৃষ্ণ সেবা সদন' নাম দিয়ে উমেশচন্দ্র ছাত্রাবাসের বাড়িতে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সংস্থার সম্পাদক হন নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন সুহাসিনী দাস। এ সদনে ৫৫ জন বিপন্ন মহিলাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। সে সাথে তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এদের ৮টি মেয়েকে স্কুলেও ভর্তি করা হয়।
শ্রীমৎ সাগর মহারাজ নামক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের এক সন্ন্যাসী প্রাথমিকভাবে এ কাজে প্রয়োজনীয় বাসন, তৈজসাদি, বিছানা, কম্বল, শাড়ি সংগ্রহ করে দেন এবং তিন মাসকাল এদের ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয় বহন করে সংস্থাটিকে চালু রাখেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রস, রামকৃষ্ণ মিশন থেকেও বস্ত্রাদি, দুধ সাহায্য হিসেবে আসে। এতে করে ৫৫ জন মহিলার আশ্রয়, ভরণ পোষণ, জীবিকা ও শিক্ষা নিশ্চিত হয়। এদের মধ্য থেকে ১০টি মেয়ের পরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। ১২টি মেয়ে প্রেসের কাজ শিখে স্বাবলম্বী হয়। বেশ কয়েকজন এস. এস. সি পাশ করে। এ সংস্থাটি ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।
১৯৭৩ সালে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক মহাসম্মেলন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে তিনি ও নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী যোগ দেন এবং রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় তারা অভ্যর্থিত হন। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং তাঁদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিশেষ অতিথিরূপে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ১৫ই আগস্ট লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সম্মেলন শেষে তারা দিল্লী, আগ্রা, বোম্বে, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, কাশী, গয়া, পুরী, কটক, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন।
১৯৭৪ সালে নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ ভিত্তিক সনাতন ধর্মীয় এক মহাসম্মেলনে ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর সাথে তিনি যোগ দেন। সেখানে তাঁরা 'সনাতন ধর্ম মহামন্ডল' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সংস্থার কার্যক্রমও বন্ধ হয়।
১৯৮০ সালে কোলকাতার বেলুড় মঠে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিশ্ব সম্মেলনে ভক্তকর্মী হিসেবে সুহাসিনী দাস যোগদান করেন।
১৯৮২ সালে তাঁর প্রবাসী কন্যা নীলিমা ও জামাতা ডাঃ যতীন সাহার সহায়তায় তিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন।
লন্ডনের টয়েনবী হলে প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষে তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। লন্ডনে তিনি তিনমাস অবস্থান করেন।
১৯৮৮ সালের ২২ মার্চ বিশ্ব হিন্দু ধর্মীয় মহাসম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি নেপাল যাত্রা করেন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ৫০ জন সদস্য যোগ দেন।

১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে তিনি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা ভ্রমণ করেন। কুমিল্লার অভয় আশ্রম হয়ে সিলেট ফেরেন। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে এখন গভীরভাবে জড়িয়ে রেখেছেন সুহাসিনী দাস। দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার পর সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হয়। ১৯৯০ সালে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্তার কারণে হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি নতুন করে লুণ্ঠিত হয়। দেবস্থলী ধ্বংস করা হয়। সেবা, পূজা, ধ্যানের মন্দির বিধ্বস্ত হওয়াতে সংখ্যালঘুদের মনের হতাশা আরো তীব্রতর হয়। হিন্দুদের ধর্মাস্থলী পুনঃ নির্মাণের জন্য সীতাকুন্ডের সাধুদের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় সনাতন ধর্মীয় সম্মেলন। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরু হয় সারা বাংলাদেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত দেবস্থলীয় পুনঃনির্মাণ এবং পরিক্রমা, হরিসভা। এসব অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডে সুহাসিনী দাস অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকা জগবন্ধু মঠের সম্মেলন শেষে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাম্প্রদায়িক উন্মত্তার শিকার নিয়ে একটি আলোচনা সভায় যোগ দেন। ঢাকা থেকে সিলেটে ফিরে কিভাবে নিজেদের সংগঠিত ও নিজেদের রক্ষা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা যায় – তারই আলোকে কাজ শুরু করেন।

রঙ্গীলকুল আশ্রমটি দেখাশোনার ভার ইস্কনের ওপর ছেড়ে দিয়ে সুহাসিনী দাস বর্তমানে সিলেটের চালিবন্দরস্থিত উমেশচন্দ্র নির্মলাবালা ছাত্রাবাসে বসবাস করছেন। তিনি এ ছাত্রাবাসের জন্য ১ লাখ টাকা ও রঙ্গীলকুল আশ্রমের উন্নয়নের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করেন।

এ বয়েসও তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে, নীরবে, সমাজ উন্নয়নের কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। সব বাঁধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতার পথ ডিঙ্গিয়ে ১৯৯৭ সালে ৮৬ বছরে অদম্য মনোবল নিয়ে ৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

এছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গ সংগঠন 'সারদাসংঘের' সভানেত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। 'কর্মই ধর্ম'- গীতার এ বাণীকে সামনে রেখে তাঁর পথ পরিক্রমা চলছে।

লেখক: ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ

বিঃদ্রঃ এই লেখাটি রচনা করা হয়েছিল ১৯৯৪-১৯৯৭ সালে। তখন সুহাসিনী দাশ জীবিত ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালের ২৫ মে মারা যান।– সম্পাদক

তথ্যসূত্র:

১. মুক্তি মঞ্চে নারী– ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, রচনা কাল: ১৯৯৪–১৯৯৭, প্রকাশকাল ১৯৯৯, প্রকাশক: প্রিপ ট্রাস্ট, ৫৯ এ সাত মসজিদ রোড, ঢাকা।

জোৎস্না নিয়োগী



জ্যোৎস্না নিয়োগী ব্রিটিশ যুগের একজন সাধারণ গৃহবধূ। বৃহৎ সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে শিশু সন্তান ও বয়োঃজ্যেষ্ঠদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন। কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, কর্মতৎপরতা, আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের জোরে একসময় নারী মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী নেত্রীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। কর্মগুণেই এদেশের নারী মুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লবী গণআন্দোলনের ইতিহাসে তার নাম যুক্ত হয়েছে।

জোৎস্না নিয়োগী ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলার সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকের কর্মী প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা রবি নিয়োগীর স্ত্রী। সংসার জীবনের প্রচণ্ডচাপ, কঠোরতা, নানাবিধ সমস্যার মধ্যেও তিনি তার কাজ করে গেছেন নিজস্ব গতিতে। জ্যোৎস্না নিয়োগীর জন্ম ১৯২৩ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নয়না গ্রামে। পিতা যোগেন চন্দ্র মজুমদার ছিলেন পেশায় একজন চিকিৎসক। ১৯৩৫ সালে জ্যোৎস্নার বয়স যখন বারো তখন পরিবারের সবাই মারাত্মক সমস্ত রোগে আক্রান্ত হন। জ্যোৎস্না ও তাঁর বোনকে তাঁদের এক আত্মীয় কোলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে আসেন। আত্মীয় সুবোধ দাশ গুপ্ত জ্যোৎস্নাকে কোলকাতার সরোজ নলিনী স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলে পাঠ্যরত অবস্থায় ১৯৪০ সালে তাঁর বিয়ে হয়। এ বিয়ে ছিল যৌতুকহীন। বিয়ের সময় জ্যোৎস্নার শর্ত ছিল, যৌতুক দেওয়া বা নেয়া যাবে না। বিয়ের পর তিনি স্বামীর সাথে অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরে শ্বশুরালয়ে আসেন। শেরপুর সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া হিসেবে সে আমলে প্রসিদ্ধ ছিল। শ্বশুর বাড়িতে আসার পর শাশুড়ি, বউকে দিয়ে ছেলেকে রাজনীতি থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। বরং দেবর মণি নিয়োগী ও স্বামীর বন্ধুদের প্রভাবে জ্যোৎস্নার উল্টো রাজনীতির দিকে আকর্ষণ জন্মায়। ধীরে ধীরে রাজনীতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

১৯৪২ সালে জ্যোৎস্না কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। পার্টির একজন সংগঠক হিসেবে সাংগঠনিক দায়িত্বও পালন করেন। ময়মনসিংহ জেলা আত্মরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে জেলার সব মহকুমায় মহিলাদের বিশেষ করে উপ-জাতীয় কৃষক মহিলাদের সংগঠিত করে আন্দোলনে নামান।

৪২-৪৩ সালে সারা বাংলাদেশে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোৎস্না ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে মহিলা প্রতিনিধি হয়ে কোলকাতা যান।

সম্মেলনের ফাঁকে মহিলাদের নিয়ে একটি ফ্র্যাকশন সভার আয়োজন করেন। সে সভায় মহিলা প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জেলার সংগঠন, সমস্যা, সমালোচনা, আত্মসামলোচনা এবং ভবিষ্যত কর্মসূচী পরিকল্পনা রিপোর্ট আকারে তুলে ধরেন। জ্যোৎস্না নিয়োগীর রিপোর্ট উপস্থাপনা ও বলার ভঙ্গিটি ছিল চমৎকার। মহিলাদের সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা, নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা, বাস্তবজীবনের সমস্যা পুংখানুপুংখরূপে তার প্রতিবেদনে তিনি তুলে ধরেন। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি মহিলাদের অবস্থা বুঝতে পারতেন বলে মহিলাদের প্রকৃত সমস্যা ও মহিলা সংগঠকদের সমস্যা সমাধানের বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। জ্যোৎস্না নিয়োগীর সাথে বরিশালের মনোরমা বসুর একটা আদর্শগত মিল ছিল। দু'জনেই অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। গ্রামবাংলার কৃষক নারী সমাজে দুজনেরই ছিল অবাধ বিচরণ। তৃণমূলের এসব নারীর সমস্যাকে বুঝতে পারতেন। বিশ্লেষণ করতে পারতেন সহজে।

১৯৪৬ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য জ্যোৎস্না অসম্ভব পরিশ্রম করেন। গ্রাম গঞ্জে, হাজংদের পাহাড়ী এলাকায় ছুটে বেড়ান। তিনি অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁর পক্ষে যদিও বাইরে ছোটাছুটির ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না।

সাংসারিক দায়িত্ব পালন বা শিশু সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে কখনো অবহেলা করেন নি। প্রায় সময় তিনি তাঁর সন্তানদের সাথে নিয়ে বাইরে বের হতেন ও নির্ধারিত কাজকর্ম করে যেতেন। জ্যোৎস্নাকে বহু ধরনের সামাজিক বাঁধা নিষেধ, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে।

সারা বাংলাদেশে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' নারী সমাজকে সংগঠিত করার পাশাপাশি দারিদ্রের হাত হতে মুক্ত করে আর্থিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। গরীব ও দুঃস্থ নারীদের কাজের সংস্থানের জন্য কুটির শিল্প প্রকল্প, শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলে। এ কাজগুলো খুব সহজ সাধ্য কাজ নয়। সেকালে এ কাজের জন্য ধৈর্য ও একাগ্রতা বড় ছিল। জ্যোৎস্নার ধৈর্য ও মনোবল থাকার কারণে তিনি তাঁর এইসব কাজে সাফল্যও লাভ করেন।

মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে গেলে শিক্ষা ও আর্থিকায়ন যে জরুরী সে উপলিব্ধ থেকে জ্যোৎস্না কমিউনিস্ট নেতা জিতেন সেনের বাড়িতে একটি তাঁত কেন্দ্র গড়ে তোলেন। মুকুল বসু, অনিমা সেন, লিলি বকসী, টুটু ভট্টাচার্য, তুলশী মজুমদার, কণা পাল, পূর্ণিমা বক্শী প্রমুখ সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে এ তাঁত কেন্দ্রের সাথে জড়িত ছিলেন। শেরপুরকে কেন্দ্র করে নলিতাবাড়ি, শ্রীবরদী, নখলা থানায় বিশেষভাবে আদিবাসী হাজং, কোচ, বানাই, রাজবংশী ক্ষত্রিয় কৃষক মহিলারা আত্মরক্ষা সমিতির সাথে এসে যুক্ত হন।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় জ্যোৎস্নার নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা মানব সেবায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পথ থেকে রুগ্ন শিশুদের কোলে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ওষুধ পথ্য জোগানো, কাপড় সংগ্রহ করা ছিল তাঁদের কাজ। এ ছাড়া তাঁরা নিজেরা লঙ্গরখানা চালিয়েছেন।

এ দুর্ভিক্ষ দীর্ঘকাল চালু ছিল। এ সময়ে জ্যোৎস্না নিয়োগী ও অন্যান্য মহিলা কর্মীরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন এবং সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বর্তমান যুগে তা বিরল।

এ সময়ে নানকার (বেগারী) ও ভাওয়ালী (খাজনা ছাড়া ধান এবং পূজা পার্বনে, পাঁঠা মানকচু, কলা প্রভৃতি কৃষকদের দিতে হতো) প্রথার অবসানের দাবিতে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জ্যোৎস্নার ভূমিকা ছিল সক্রিয়। জ্যোৎস্না মহিলাদের সচেতন ও সংগঠিত করার কাজ করেছেন। সময় বাঁচানোর জন্যে দূরপথ পরিভ্রমণে জ্যোৎস্না সাইকেল চালানোর কলা কৌশল আয়ত্ব করেছেন। সাইকেল ব্যবহার করেছেন।

১৯৪৬ সালে শুরু হয় তেভেগা আন্দোলন। শেরপুর, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, শ্রীবরদী এলাকায় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী প্রচণ্ড দমননীতি চালায়। এ সময় সর্ব প্রথম একজন কৃষক মহিলা (রাসমণি) পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। পার্টির নির্দেশে জ্যোৎস্না তাঁর সহকর্মী কণা ও পূর্ণিমাকে সাথে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে কাজ চালাতে থাকেন। জ্যোৎস্নাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালানো হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাষ্টিন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হন।

১৯৪৮ সালে টংক আন্দোলন শুরু হলে মুসলিম লীগ সরকার দমন নীতি চালায়। গ্রামে গ্রামে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, গ্রেপ্তার ও নারী ধর্ষণ চালিয়ে আতংক সৃষ্টি করা হয়। রেবতী, শংখমণি, সারথী সহ বেশ ক'জন মহিলা পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়। সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকায়, পুলিশ বাহিনীর তাণ্ডবলীলার মধ্যেও জ্যোৎস্না তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। একদিন শেষ রাতের দিকে ঘরে ফেরার পথে পুলিশ তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী হারু চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে। রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁদের দু'জনকে জেলে পাঠানো হয়। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৫৩ সালের জুন অব্দি তাঁকে জেলে কাটাতে হয়। একজন যক্ষা রোগীকে অন্যান্য মেয়েদের সাথে রাখার প্রতিবাদে জ্যোৎস্না, হাজং মেয়ে রাহেলা, অশ্বমণি, ভদ্রা প্রমুখ মিলে অন্যান্য বন্দীদের সাথে জোট বেঁধে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

জেল থেকে বের হয়ে জ্যোৎস্না তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িতে আসেন। স্বামী রবি নিয়োগীও ১৯৪৮ সালের টংক আন্দোলনের শুরুতে জলধর পালের সাথে মুসলিম লীগের ইয়ার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁদেরকেও কারাগারে পাঠানো হয়। কাজেই জ্যোৎস্না যখন দেয়ালের বাইরে আসেন তখন তাঁদের বাড়িতে কেউ ছিল না। কাজেই পরিত্যক্ত বাড়িতে তাঁর পক্ষে একা বাস করা সম্ভব হয় না। তিনি বাধ্য হয়ে কোলকাতা চলে যান। কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, ডাঃ নারায়ণ রায়, স্নেহাংশু আচার্য সহ অন্যান্য পার্টি নেতারা তাঁকে কোলকাতা থেকে কাজ চালিয়ে নেবার পরামর্শ দেন।

১৯৫৪ সালে কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রবি নিয়োগীকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে স্বামীর মুক্তিলাভের পর জ্যোৎস্না তাঁর ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ি ফিরেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে রবি নিয়োগীর মা কোলকাতা চলে গিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পর সংসারে অর্থ যোগান দেবার জন্য তিনি টিউশনি শুরু করেন। ঘরের সব কাজ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপার, রান্নাবান্না ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজ সেরে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজনীতি শেখার জন্য গভীর রাত অব্দি জেগে লেখাপড়াও করতে হয়েছে।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের কিছুদিন পর ৯২(ক) ধারা জারি হয়। এ সময় রবি নিয়োগীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। কিন্তু রবি নিয়োগী আত্মগোপন করাতে পুলিশ তাঁকে খুঁজে পায়নি। রবি রিয়োগীকে না পেয়ে পুলিশ জ্যোৎস্না নিয়োগীকে তাঁর ৮ মাসের শিশু পুত্রসহ জেলে পাঠায়। রবি নিয়োগীর অস্থাবর সম্পত্তি সব পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

খালি বাড়িতে অভিভাবকহীন অল্পবয়স্ক তিনটি ছেলেমেয়ে একা পড়ে থাকে। সে সময় পাড়া প্রতিবেশীরা রবি নিয়োগীর ছেলে মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে। যতদিন পর্যন্ত ৯২(ক) ধারা টিকে ছিল ততদিন পর্যন্ত তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে। জেলে থাকা অবস্থায় সাধারণ মহিলা বন্দীরা যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে সেজন্য তাদের পক্ষে তিনি লড়েছেন। তাদের লেখাপড়া শেখার কাজে সাহায্য করেছেন। জেলে একজন গর্ভবতী মহিলাবন্দী ছিলেন। প্রসব কালে তার অবস্থা খুবই সংকটজনক ছিল। জ্যোৎস্না তখন তার জীবন রক্ষার জন্য যথাসাধ্য করেন। মহিলাবন্দী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। মুক্তি পাবার পর সে জ্যোৎস্নার খোঁজ নিয়েছে।

সাংস্কৃতিক দিকেও জ্যোৎস্নার ঝোঁক ছিল প্রবল। তিনি তাঁর সন্তানদের ললিতকলার দিকে আকৃষ্ট করেছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুকে নাচ গান শিখতে উৎসাহ জুগিয়েছেন। বড় ছেলে রঞ্জিতকে চিত্রাঙ্কনে ও কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেছেন। পরবর্তীতে রঞ্জিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে তারা স্বাধীন বাংলা বেতারের সাথে জড়িত ছিলেন। জ্যোৎস্না নিয়োগীর উৎসাহ আর প্রেরণাতে গণসংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে মঞ্চায়িত নাটকে সামাজিক গোড়ামি ভেঙ্গে লক্ষ্মী, রুণু, ঝুনু, মঞ্জু প্রমুখ অভিনয় করেছিলেন। অলংকার ব্যবহারের প্রবণতা মহিলা মাত্রই থাকে। জ্যোৎস্না নিয়োগী উত্তরাধিকার সূত্রে তার মায়ের ব্যবহৃত ১৫ ভরি স্বর্ণ পেয়েছিলেন। প্রথমে কিছু সোনা বিক্রি করে কাজের সুবিধার্থে তিনি তাঁর স্বামী রবি নিয়োগীকে একটি সাইকেল কিনে দেন। কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা' প্রকাশকালে পার্টির আহ্বানে এবং বিভিন্ন সময়ে পার্টির জন্য জ্যোৎস্না তাঁর স্ত্রীধন সোনা দান করেছেন। 'একতা' প্রকাশের আগে পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। 'একতা' প্রকাশিত হওয়ার পর 'একতা' বিলি করার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর সন্ধান করতে না পেরে প্রয়াত কমরেড মন্মথ দে তাঁকে 'একতার' এজেন্ট বানান। জ্যোৎস্না নিয়োগী 'একতার' এজেন্ট হিসেবে দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। জ্যোৎস্না নিজ উদ্যোগে একটি পারিবারিক লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রবি নিয়োগী গৃহে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় এ উপমহাদেশের অনেক স্বনামধন্য রাজনৈতিক নেতা শেরপুরস্থিত তাঁদের বাসভবনে আসেন। পার্টির নেতা কর্মীরা গোপনে আলোচনা করতে এলে জ্যোৎস্না প্রহরীর দায়িত্বও পালন করেন।

১৯৬৬ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শেরপুরের তাঁদের বাড়িতে এসে জ্যোৎস্নার সাথে দেখা করেন।

শেরপুর ছিল মহিলা আন্দোলনের ঘাঁটি। ঘর গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজকর্ম সেরে সন্তানদের দেখাশোনা করে তারপর তিনি বাইরের কাজে যেতেন। জ্যোৎস্নাকে বাইরের কাজ করার জন্য বহু কষ্ট করতে হয়েছে।

সারা বাংলাদেশে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও নারী সমাজকে আন্দোলনমুখী করার পাশাপাশি তিনি দুঃস্থ মেয়েদের আর্থিক কর্মসংস্থানের জন্য কুটির শিল্প প্রকল্প, শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র গড়েন। গরীব নিরক্ষর মেয়েদের গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে সংগঠিত করা সহজ এ ছিল জ্যোৎস্নার বিশ্বাস। তিনি তাঁর বিশ্বাসের সাথে নিজ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

পাকিস্তানী আমলে তীব্র দমননীতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক দেশত্যাগের প্রবণতার ফলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ভেঙ্গে যায়। অন্যান্য প্রগতিশীল গণসংগঠনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। জ্যোৎস্না নিয়োগী ও রবি নিয়োগীর ওপর শাসকের রুদ্র রোষ পড়ে।

'৭১ এর স্বাধীনতার পর পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটলে জ্যোৎস্না নতুন উদ্যমে কাজ নিয়ে মেতে ওঠেন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাথে যুক্ত হয়ে সাংগঠনিক কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। মহিলা পরিষদের সব রকমের আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।

১৯৮৬ সালে জ্যোৎস্না নিয়োগী পক্ষাঘাতে চলশক্তিহীন হয়ে পড়েন। এ সময় হাত দিয়ে পায়ের কাজ চালাতেন। কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখের হাসি ছিল অমলিন।

১৯৯০ সালের ২৭ জানুয়ারি জ্যোৎস্না নিয়োগী প্রাণত্যাগ করেন।

তথ্যসূত্র:

১. মুক্তি মঞ্চে নারী– ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, রচনা কালঃ ১৯৯৪–১৯৯৭, প্রকাশকাল ১৯৯৯, প্রকাশক: প্রিপ ট্রাস্ট, ৫৯ এ সাত মসজিদ রোড, ঢাকা।

মনোরঞ্জন ধর

রাজনীতিতে আজ সৎ, ত্যাগী, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ রাজনীতিবিদের বড়ই অভাব। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে আমাদের রাজনীতিতে সৎ, আদর্শবান, ত্যাগী, নি:স্বার্থ ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদের যে অভাব শুরু হয়েছে আজ তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নি:সন্দেহে বলা যায়, আমাদের দেশের রাজনীতিতে নীতিবান ও নিষ্ঠাবান এবং ত্যাগী রাজনীতিবিদদের বড়ই আকাল চলছে। হাতে গোনা দুই-চারজন ছাড়া রাজনীতিতে গর্ব করার বা অহংকার করার মত তেমন বেশী ব্যক্তি বা নেতা-কর্মী নেই যাদের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি। এক্ষেত্রে দু-একজন নেতার নাম উল্লেখ করতে হলে অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী মনোরঞ্জন ধর-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। যার সুদীর্ঘ দিনের রাজনীতিতে রয়েছে ত্যাগ, সততা, একনিষ্ঠতা। যার রাজনীতি ছিল দেশ ও জাতির কল্যাণ ও স্বার্থে। যার রাজনীতিতে ছিল না নিজের স্বার্থ, নিজের কল্যাণ। তিনি দেশ ও জাতির স্বার্থ এবং কল্যাণকে ভাবতেন নিজের স্বার্থ বা নিজের কল্যাণ।

শ্রী মনোরঞ্জন ধর কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি থানার চাতলা গ্রামে ১৯০৪ সালের ৩১শে ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জগৎচন্দ্র ধর এবং মাতার নাম সৌদামিনি ধর। তিনি পিতা-মাতার চার সন্তানের মধ্যে প্রথম। তার অন্যান্য ভাই বোনদের নাম সরসী রঞ্জন ধর ও হেমজা রঞ্জন ধর এবং বোন শৈলবালা দাস। শ্রী মনোরঞ্জন ধর নিজ গ্রাম্য পাঠশালায় বাল্যশিক্ষা শেষ করে আর্চমিতা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই এস. এস. সি. পাশ করেন। বি. এ পাশ করার পর তিনি আইনে ভর্তি হন এবং বন্দী অবস্থায়ই পাঞ্জাবের আমবালা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। শ্রী মনোরঞ্জন ধর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে অর্থনীতি নিয়ে এম. এ পাশ করেন। তিনি শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সর্বদা ব্যস্ত থেকে বার বার জেলখানায় বন্দী থেকেও প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। শ্রী মনোরঞ্জন ধর শিক্ষা জীবনে তার মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন।

শ্রী মনোরঞ্জন ধর ১৩ বছর বয়সে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত রাজনীতির সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। প্রায় ৭৭ বছর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের অংশীদার হয়েছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ইংরেজ ও পাকিস্তানী শাসকদের নির্যাতন এবং অত্যাচারের শিকার হয়েছের বার বার। জীবনের ২৭টি বছর কাটিয়েছেন জেলখানায়। বহু সময় থেকেছেন পলাতক। শ্রী মনোরঞ্জন ধর অষ্টম শ্রেণীতে লেখাপড়া করার সময় ১৯১৩ সালে দেশ মাতৃকার মুক্তির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে গোপন বিপ্লবী দল 'যুগান্তর'-এর সক্রিয় সদস্য হন। তার রাজনৈতিক দীক্ষা গুরু ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বাঘা যতীন। দীক্ষাগুরুর নির্দেশে ঠাকুর স্বামীজীর প্রতিকৃতির সামনে বুকের রক্ত দিয়ে লিখে শপথ নেন। সে শপথ মরণকে তুচ্ছ করার শপথ, দেশমাতৃকার জন্য মরণপণ শপথ। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রী অরবন্দী ঘোষ, মানবেন্দ্র নাথ রায় এবং বাঘা যতীদের ভাবাদর্শ ছিল তার পাথেয়।

শ্রী মনোরঞ্জন ধর কলেজে পা দিয়েই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু যখন বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি

তখন শ্রী মনোরঞ্জন ধর নেতাজীর একান্ত রাজনৈতিক সহকর্মী হিসাবে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ১৯২১ সালে সারা ভারতব্যাপী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এক জঙ্গী আকার ধারণ করে। এ সময়ে একজন ছাত্র নেতা হিসেবে শ্রী মনোরঞ্জন ধর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে বন্দী করে এবং তিনি প্রায় এক বছর কারাগারে বন্দী থাকেন। ১৯২৮ সালে পাঞ্জাবের বিখ্যাত নেতা ড. আলমের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় ছাত্র পরিষদের সম্মেলন। সম্মেলনের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। ওই সম্মেলনে শ্রী মনোরঞ্জন ধরকে ছাত্র পরিষদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সূর্যসেনের নেতৃত্বে এবং অস্ত্রাগার লুঠ করে। ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে। সরকার দেশব্যাপী শুরু করে ব্যাপক ধরপাকড়। এসময় শ্রী মনোরঞ্জন ধরকেও গ্রেফতার করে সরকার। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ৯ বছর একনাগাড়ে বিভিন্ন কারাগারে বন্দী থাকেন তিনি।

১৯৩৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রী মনোরঞ্জন ধর রাজনীতির পাশাপাশি আইন ব্যবসা শুরু করেন। এ সময় থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত থাকেন। ময়মনসিংহ থেকে 'গণ অভিযান' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় সরকার বিরোধী ক্ষুরধার বক্তব্য প্রকাশের জন্যে ইংরেজ সরকার ১৯৪০ সালে ভারত রক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেফতার করে এবং তাঁকে দীর্ঘ ছয় বছর বিভিন্ন জেলখানায় বন্দী রাখে। তিনি বন্দী অবস্থায়ই বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

তিনি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় জেল থেকে বের হয়ে আসেন। দেশ বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করে ময়মনসিংহে 'নিখিল বঙ্গ সম্মেলন' করেন। সম্মেলনে প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা ড. আলমসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে বাংলাসহ সারা ভারতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় শ্রী মনোরঞ্জন ধর অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে বিভিন্ন স্থানে শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহযোগী হিসেবে নোয়াখালীসহ বিভিন্ন স্থারে ঘুরে বেড়ান। দেশ বিভাগের পর আইন সভায় কংগ্রেস দলের সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রী মনোরঞ্জন ধর। কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন শ্রী বসন্ত কুমার দাস আর সহকারী নির্বাচিত হন শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। চীপ হুইপ নির্বাচিত হন গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী। এ সময় পাকিস্তানে হিন্দুদের রাজনীতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণ হিন্দুদের মত বহু রাজনীতিক নেতাকর্মী দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। সামান্য কয়েকজন হিন্দু রজানীতিক দেশ মাতৃকার মায়া না ছাড়তে পেরে দেশে থেকে যান। তাদের মধ্যে শ্রীধর অন্যতম। যখন হিন্দুদের মধ্যে দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়, সর্বত্র হিন্দুদের মধ্যে ভীতি ও আতংকজনক অবস্থা তখন যে কয়জন কংগ্রেস নেতা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশে থাকতে চান তাঁদেরই একজন শ্রী মনোরঞ্জন ধর। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের পাস করা ও দলীয় নীতি নির্ধারণের জন্য প্রদেশের সামান্য কয়জন কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের এক সম্মেলন ডাকা হয় ঢাকায়। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দুইদিনব্যাপী। বহু তর্ক-বিতর্কের পর দলের নামকরণ করা হয় 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস'। গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হয়। দলের সভাপতি নির্বাচিত হন সুরেশ দাসগুপ্ত, আর সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রী মনোরঞ্জন ধর। এরপর সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্যে দেশব্যাপী দলের জেলা ও মহকুমা শাখা গঠন করা হয়।

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে শ্রী মনোরঞ্জন ধর অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারী গুলি হওয়ার পর আইন সভার অধিবেশনে তিনি অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রাখেন। সেদিন কংগ্রেসের আরো কয়েকজন নেতা ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জি, প্রভাস লাহিড়ী, শ্রীমতি নেলী সেন গুপ্তা প্রমুখ। শ্রী মনোরঞ্জন ধরসহ কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা মেডিকেলে গুলিতে নিহত ও আহতদের দেখতে যান। ২১ ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পরবর্তী আন্দোলনে কংগ্রেস সমর্থন করে এবং আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্যে শ্রী ধরসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তৎপরতা চালান। যার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারী শ্রী ধর ও গোবিন্দ লাল ব্যানার্জিকে গ্রেফতার করে পাকিস্তান সরকার। দীর্ঘ দু'বছর বন্দী থাকার পর ১৯৫৩ সালে শ্রী ধর মুক্তি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেন এবং বেশ কয়েকজন কংগ্রেস দস্যসহ তিনি বিজয়ী হন। এ সময় তিলি দল ও পার্লামেন্টারী শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালে কংগ্রেস আওয়ামী লীগের সাথে প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে। এই মন্ত্রী পরিষদে শ্রী ধর অর্থ ও স্বরাষ্ট্র এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালের নেহেরু-লিয়াকত ফ্যাক্ট অনুসারে সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। আইয়ূবের সামরিক শাসন জারির আগ পর্যন্ত তা বজায় থাকে। আইয়ূব খানের সামরিক শাসনের আমলে ১৯৬০ সালে শ্রী মনোরঞ্জন ধর আবার গ্রেফতার হন। আইয়ুব সরকার তাঁকে তিন বছর বন্দী রাখে। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি পুনরায় দলকে সংগঠিত করার জন্যে তৎপরতা চালান। ১৯৬৪ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং এক বছর বন্দী থাকার পর মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার মাত্র পনের দিন পরে আবার তাঁকে পাকিস্তান সরকার গ্রেফতার করে। এবারও তিনি বেশ কিছুদিন বন্দী থাকার পর মুক্তি লাভ করেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রী মনোরঞ্জন ধর কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। কংগ্রেস নির্বাচনে মাত্র দুইজন প্রার্থী দেয়। অপর জন হলেন মিঃ গোমেজ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রী মনোরঞ্জন ধর অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২৬শে মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানী খুনী সৈন্যরা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এর কয়েকদিন পরই হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যরা ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশ করে। শহরের দিকে পাকিস্তানী সৈন্যরা আসছে এ সংবাদ পাওয়ার পর শ্রী মনোরঞ্জন ধর পরিবারের লোকজন ও কয়েকজন রাজনৈতিক সহকর্মীকে সাথে নিয়ে বহু কষ্ট করে পায়ে হেঁটে ভারতের গারো পাহাড়রে ওপর দিয়ে মেঘালয় উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে তিনি প্রথমে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শরণার্থী শিবিরে থাকা অবস্থায়ই সংবাদ পান মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছে। সংবাদ পাওয়ার পর শ্রী মনোরঞ্জন ধর মুজিব নগর সরকারের সাথে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কলকাতায় এসে তিনি ভাই সরসী রঞ্জন ধরের বাসায় ওঠেন। ভাইয়ের বাসায় থাকতেন তার মা। মাকে দেখার জন্যে ভাইয়ের বাসায় ওঠেন। মা পুত্রকে পাওয়ার পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সেই জ্ঞান আর তিনি ফিরে পাননি। এমন অবস্থায় মায়ের মৃত্যু শ্রী ধরকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। মায়ের মৃত্যু তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মাতৃশোককে ভুলে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কলকাতায় ভাইয়ের বাসাতেই সংবাদ পাঠান মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সংবাদ পাওয়ার পর শ্রীধর মুজিব নগর সরকারের নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেন। নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার পর শ্রীধর মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করার জন্যে বিভিন্ন স্থানে উল্কার মত ছুটে বেড়ান। তিনি যেমনি ভারতের সহযোগিতার জন্যে সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেন-দরবার করেন তেমনি ভারতে অবস্থিত প্রবাসীদের মধ্যে সভা-সমাবেশ করেন বিভিন্ন শিবিরে শিবিরে। এক পর্যায়ে মুজিব নগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন বলে মনে করেন। তাই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থিত কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে গঠন করা হয় সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ। শ্রী মনোরঞ্জন ধর কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। উক্ত উপদেষ্টা পরিষদের অন্যান্যরা ছিলেন ভাসানী ন্যাপের প্রধান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ন্যাপ মোজাফ্ফরের ছিলেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির শ্রী মনি সিং, আওয়ামী লীগ থেকে ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোস্তাক আহমদ।

শ্রী মনোরঞ্জন ধর দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে কর্মকাণ্ড চালান। তিনি ভোরবেলায় বের হতেন আর গভীর রাতে বাসায় ফিরতেন। দিন রাত পরিশ্রম করে বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করেন এবং সহযোগিতার জন্যে বিভিন্ন বিদেশি রাজনীতিবিদদের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুরনো কংগ্রেসের নেতাদের খুঁজে বের করেন যাদের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল। ঐসব নেতাদের মাধ্যমে ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে এবং যুদ্ধে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার জন্যে। শ্রী ধর তার পুরনো কংগ্রেস দলীয় নেতাদের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। যা ছিল এদেশের স্বীকৃতি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল পদক্ষেপ। এমনিভাবে বাংলার মুক্তিযুদ্ধে শ্রী মনোরঞ্জন ধর গুরু দায়িত্ব পালন করেন। যা এদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৬ ডিসেম্বর দেশ হানাদার মুক্ত হওয়ার পর শ্রী মনোরঞ্জন ধর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে দেশে ফিরে আসেন। দেশে আসার পর তিনি বঙ্গবন্ধু সরকারের জাপানে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাপানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশের সাথে জাপানের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। যা ছিল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রী মনোরঞ্জন ধর আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হন। নির্বাচনের পরে তিনি বঙ্গবন্ধু সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী হন। মন্ত্রী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নিয়ে এশিয়া ও ইউরোপের বহুদেশ সফর করেন। শ্রী মনোরঞ্জন ধর পারিবারিক জীবনে দুই পুত্র সন্তান ও এক কন্যার জনক। পুত্র মলয় রঞ্জন ধর ও মানষ রঞ্জন ধর এবং কন্যা স্বাতী ধর। স্ত্রী শ্রীমতি ভক্তি ধর।

্রী মনোরঞ্জন ধর ২০০০ সালের ২২ জুন ময়মনসিংহে মৃত্যুবরণ করেন।

তথ্যসূত্র:

১ বিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা: তপন কুমার দে; প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

মুস্তাফিজুর রহমান খান

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান ১৯১০ সালের ১০ জুন ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিউর রহমান খান এবং মাতার নাম সালেকুন্নেসা। মুস্তাফিজুর রহমান খান সাহেবের পিতা মতিউর রহমান খান সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন। ঐ সময় সরকারের এমন কোন সংস্থা ছিল না যেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরা উচ্চ পদে ছিলেন না। তৎকালীন সময় এ ধরনের পরিবার মুসলমানদের মধ্যে খুব কমই ছিল। তাঁর পরিবার শুধুমাত্র সরকারী উচ্চ পদেই ছিলেন না, তাঁরা শিক্ষা দীক্ষায়ও ছিলেন সম্ভ্রান্ত। কারণ মুসলিম সমাজের খুব কম পরিবারেই তখন শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে পেরেছিল।

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খানের শিক্ষা শুরু হয় মক্তব্যে। তিনি ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মেধার প্রমাণ মিলে তাঁর প্রতিটি পরীক্ষায়। তিনি ম্যাট্রিক, আই. কম ও বি. কম পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলায় মেধা তালিকায় স্থান দখল করেছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন এবং অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পিতার কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রামের পটিয়াতে। ওই সময়ে পটিয়া ছিল বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্যসেনের বিপ্লবী দলের এক দূর্গ। সেখান থেকেই বিপ্লবী দলের সদস্যদের সাথে প্রথম পরিচয় হয় বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খানের। পরিচয় থেকেই পরে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেন তিনি। বিপ্লবী দলে যোগদান করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যার জন্যে তিনি বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং কয়েকবার পুলিশী আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হন। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের যুব বিদ্রোহের পর তিনি অনেকগুলি সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ওই সময় একবার তিনি পুলিশের গুলিতে প্রচণ্ডভাবে আহত হন। তাঁর দেহে প্রায় ১০/১২টি গুলি লাগে। বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান সক্রিয়ভাবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি টাকা পয়সা দিয়েও বিপ্লবীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পরিবারের অবদানও কম নয়। সরকারী চাকরি করেও তাঁর পিতা মতিউর রহমান খান সাহেব বিপ্লবীদের টাকাপয়সা দেয়াসহ বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। ঐ পরিবার ছিল বিপ্লবীদের এক গোপন আস্তানা। যেখানে প্রায় সবসময় বিপ্লবীদের যাতায়াত ছিল। এজন্যে তাঁর পরিবারকে প্রচুর খেসারত দিতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের দুটি সশস্ত্র দল সক্রিয় ছিল। এ দুটি ছিল যুগান্তর ও অনুশীলন দল। চট্টগ্রাম সহ সারা বাংলায় এ দুটি দলের মধ্যে সবসময় বিরোধ লেগেই থাকত প্রায়। কোন সময় আবার দল দুটির মধ্যে বিরোধ মিটেও যেত এবং এক সাথে কার্যক্রম চালাতো। দুটি দলের সাথেই বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান সুসম্পর্ক রেখে চলতেন। তিনি সব সময়ই দল দুটিকে মিলেমিশে থাকার এবং একত্রে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগিতা করতেন।

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্ট ভারত বিভাগের পর বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান পাকিস্তান চলে আসেন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ঢাকায় এসে তিনি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ঢাকার স্বামীবাগের ৩৬ নং বাসাটি হয়ে পড়ে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের মিলনস্থল। এ বাড়িতে আসতেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কমডের মণি সিংহ, আব্দুল ওয়াসেক, আব্দুল জববার খদ্দর, বিপ্লবী সুখেন্দু দস্তিদার প্রমুখ। রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি আসতেন সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, নাসির উদ্দিন, আবুল ফজল, আবুল মনসুর, কাজী ইদ্রিস, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, রোকুনুজ্জামান খান দাদা ভাই, শহীদুল্লাহ কায়সার, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি মঈনুদ্দিন, কবি আহসান হাবিব, কবি তালিম হোসেন, কবি আব্দুল কাদের, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক সাইদুর রহমান, কাজী মোতাহের হোসেন প্রমুখ।

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিক্ষেত্রে গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। যার ফলে তাঁকে পাকিস্তান সরকার বার বার অত্যাচার নির্যাতনের হুমকী দিয়েছে।

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান প্রথম জীবনে রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি কলকাতায় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি বীমা জগতে প্রবেশ করেন এবং সুদীর্ঘ ৬৮ বছর বীমার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বীমা জগতের কিংবদন্তী পুরুষ। তার প্রচেষ্টায় তৎকালীন পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে বীমা একটি মর্যাদার পেশা ও শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বীমার আদর্শ মানুষের কল্যাণ করা একথা প্রতিষ্ঠা করতে তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বীমা জগতের উন্নয়নের জন্য। নিঃসন্দেহে বলা যায় বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান উপমহাদেশের বীমা জগতের এক দিকপাল ছিলেন।

পেশাগত কারণে উপমহাদেশের প্রতিটি স্থান ছিল তাঁর নখদর্পণে। সেখানকার মাটি, মানুষ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ছিল বাস্তব ধারণা। ভারত বিভাগের পূর্বে রাজনীতি ও সাংবাদিকতাসহ সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর ছিল ব্যাপক পদ চারণা। যার ফলে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, অন্নদাশংকর রায়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের সাথে। ফিরোজ গান্ধী ছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান খান সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সুবাদে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও ফিরোজ গান্ধীর বিয়েতে খান সাহেবের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

বহুমুখী প্রতিভা ও গুণবালীর অধিকারী বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান রাজনীতি ও পেশাগত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রেখেছেন। তিনি সবসময় দেশ ও জাতির উন্নয়নের চিন্তা করতেন। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, একটি জাতিকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করতে হলে আগে তার শিক্ষার প্রয়োজন। তাই তিনি একটি শিক্ষিত জাতি গঠনের জন্যে বিভিন্ন শিক্ষা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকায় এসে তিনি স্কুল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্যে সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম চালান। বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান ছিলেন একজন অনন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে

আজীবন জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে শিক্ষক ও পরীক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য হিসাবে তাঁর অসাধারণ মেধা ও মনন দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। মুস্তাফিজুর রহমান খান নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পিতার নামে মতিউর রহমান খান ট্রাস্ট ফান্ড ও মাতার নামে সারেকুন্নেসা গোল্ডমেডেল প্রবর্তন করেছেন।

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময় এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসাবে কার্যক্রমকে গতিশীল করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি তাঁর স্ত্রীর নামে ১৯৮৬ সালে সালেহা খানম ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্ত্রীর নামে সলিমুল্লাহ এতিমখানায় মেয়েদের জন্যে আবাসিক ছাত্রীনিবাস 'সালেহাভবন' প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময় একাডেমীর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসাবে বিশেষ অবদান রাখেন। এছাড়া আরো বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। আজীবন 'রেডক্রস সোসাইটির' সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময় দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা, আর্তমানবতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রামের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর দীর্ঘ তিন মাস তিনি উপকূল এলাকায় আর্তপীড়িত মানুষের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। যার জন্যে তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক সরকার তাঁকে 'তখমা' দেয়ার প্রস্তাব করলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন। তিনি সবসময় গরীব দুঃখী মানুষের প্রতি নজর রাখতেন। পাড়াপ্রতিবেশী বা এলাকার গরীব দুঃখীদের বিপদাপদে সাহায্য সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িতে দিতেন। তিনি বহু গরীব দুঃখী মানুষের রোগের চিকিৎসা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। বহু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন নিজের অর্থে। বহু বেকার লোকের চাকরির ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান সাহেব মনে প্রাণে ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার মানুষ। তিনি বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর ঢাকাস্থ স্বামীবাগের বাড়ির সামনেই 'স্বামীজীর আশ্রম'। বিভিন্ন সময় দাঙ্গাকারীদের কবল থেকে আশ্রমবাসীদের রক্ষার জন্য নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

মুস্তাফিজুর রহমান খান সাহেব অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর পোশাক আশাকে অনেকেই বুঝতে পারতেন না তিনি বড় পদ মর্যাদার একজন মানুষ। তাঁর পোশাক আশাকে যেমন কোন প্রকার বাহাদুরিভাব ছিল না তেমনি তাঁর বাসায় আসবাবপত্র ছিল অতি সাধারণ। তিনি নিজে খেতেন খুবই কম।

ব্যক্তি জীবনে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতেন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। যার ফলে সারা জীবনই ছিলেন পাতলা একহারা গড়নের এবং অনেকটা নিরোগ। তিনি ঘুম থেকে উঠতেন খুব সকালে। সকালেই ঠাণ্ডা পানিদিয়ে গোসল করা ছিল তাঁর নিয়ম। নিজের কাপড় চোপড় তিনি নিজেই ধুতেন। তাঁর আরাম আয়েস ও বিলাসীতার প্রতি কোন মোহই ছিল না।

জাগতিক সম্পদ আহরণের ব্যাপারে তিনি বলতেন, যে পরিমাণে একজন ব্যক্তি বাহ্যিক সম্পদ আহরণ করে সেই সমপরিমাণে মানসিক সম্পদ হারান। তিনি বড় সম্পদ বলে মনে করতেন বইকে। তাঁর মত বই প্রেমি মানুষ সমাজে বা আমাদের দেশে খুবই কম পাওয়া যায়। বই ছিল তাঁর অমূল্য সম্পদ। প্রচুর বই তিনি কিনতেন এবং পড়তেন। এসব বই দিয়ে তিনি নিজেই গড়ে তোলেন বিশাল এক পারিবারিক গ্রন্থাগার। তিনি বলতেন, ভাল বইয়ের চেয়ে বড় বন্ধু আর হয় না। ভাল বই পড়ার অভ্যাস কর জীবনে কখনও নিঃসঙ্গ হবে না।

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খানের চরিত্রের উজ্জ্বল দিক ছিল সততা। তিনি সব সময় সত্য বলতেন এবং মিথ্যাকে কোন সময়ই প্রশ্রয় দিতেন না বা বলতেন না। তিনি অহংকার করেই বলতেন, তিনি জীবনে মিথ্যা বলেননি, যে কারণে দেখা গেছে তাঁর কোন অসম্ভব বক্তব্যও সত্যিই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তাঁর উপদেশ ছিল কখনও মিথ্যা বলবে না, কখনও বিবেককে ফাঁকি দেবে না। দেখবে জীবনে কখনও কষ্ট পাবে না। আর্থিক ব্যাপারেও তাঁর ছিল প্রচণ্ড সততা। তাঁর জীবনে সামান্যতম অসততার স্পর্শ নেই আর্থিক ক্ষেত্রে। পেশাগত জীবনে তিনি অনেক বড় বড় পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বত্রই তিনি সততার জন্য প্রশংসা অর্জন করেছেন।

মুস্তাফিজুর রহমান খানের চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নীতি পরায়ণতা। তিনি তাঁর নীতির প্রশ্নে সবসময় অটল থেকেছেন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তা তিনি বলতেন বা করতেন। নীতির প্রশ্নে কেউ তাঁকে টলাতে পারেনি। চিরজীবন তিনি তাঁর বিশ্বাসে অটল ছিলেন। নিজের বিশ্বাসের সাথে কোন সময় আপোষ করেননি। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী। যার জন্য তিনি সর্বদা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের ঘৃণা করতেন।

মুস্তাফিজুর রহমান খান বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করতেন না। কিন্তু তাঁর মত আল্লাহতে অগাধ বিশ্বাস কমই দেখা যায়। এ কারণেই তাঁকে অনেকে হুজুর বলে সম্বোধন করে তৃপ্তি পেতেন।

তিনি নারী শিক্ষা ও নারী অধিকারের প্রতি ছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তিনি নারী শিক্ষা এবং অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর পারিবারিক জীবনে নারী শিক্ষা ও নারীর অধিকার দিতে সামান্যতম কার্পণ্য করেননি। তাঁর চারপুত্রের মত তিন কন্যাকেও উন্নত শিক্ষা এবং সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার দিয়েছেন। তাঁর কন্যাদের পুত্রদের মতই সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। পুত্রদের মত কন্যারাও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাঁর কন্যারা সে যুগে সেই ৫০/৬০ দশকেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছেন অবলীলাক্রমে। সে সময় খুব কম মুসলিম পরিবারের মেয়েরাই উচ্চ শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করত। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মাহফুজা খানম ৬০ দশকে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর সহসভাপতি (ভি. পি) নির্বাচিত হন। তিনি আইয়ুব বিরোধী

আন্দোলনে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। এই কন্যার জন্য খান সাহেবকে বহু নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে আইয়ুব মোনের শাহীর কাছ থেকে। কিন্তু কোন সময়ই তিনি তাঁর কন্যাকে সরকার বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে আসতে বলেননি। বরং, তৎকালীন গভর্ণর মোনেম খানকে বলেছেন, কন্যার বিশ্বাসে এবং কর্মে বাধা দান তাঁর নীতি বিরুদ্ধ। বহু রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বাধাকে খান সাহেব তাঁর সত্য ও বিশ্বাস দিয়ে অতিক্রম করেছেন অবলীলাক্রমে।

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান যথার্থ অর্থেই ছিলেন একজন খঁটি মানুষ। তিনি মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালি। তিনি ছিলেন সত্যিকার একজন মুসলমান। ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ শিক্ষানুরাগী ও সমাজকর্মী। তিনি ছিলেন মুক্ত চিন্তা ও চেতনা অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল নির্লোভ, কঠিন কঠোর কমোলের বিরল ব্যক্তিত্ব। এ সমস্ত বিশেষণগুলিই তাঁর জন্যে যথেষ্ট নয়। এছাড়াও তাঁকে আরো বহু বিশেষণেই ভূষিত করা যায়। বীমা একাডেমী বীমা জগতে একাধারে ৬৮ বছর অবদান রাখার জন্যে খান সাহেবকে বহু অনুরোধ করে সম্মাননা প্রদান করে ১৯৯৫ সালের ২৮ মার্চ। তিনি চিরদিন ছিলেন প্রচার বিমুখ। কর্মেই ছিল তাঁর সুখ শান্তি প্রচারে নয়।

বিপ্লবী মুস্তাফিজুর রহমান খান ১৯৯৬ সালের ৭ জানুয়ারি রাত ৯ টায় মৃত্যুবরণ করেন।

লেখক: তপন কুমার দে

তথ্যসূত্র:

১. বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা– তপন কুমার দে; প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

জসিমউদ্দিন মণ্ডল



জসিমউদ্দীন মণ্ডলের দাদাবাড়ি ছিল নদীয়া জেলার হৃদয়পুর গ্রামে। ছেলেবেলায় সেই গ্রামে গরু চরাতে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বহুদিন নীলকুঠির ভাঙ্গাচোরা দালানের কাছাকাছি যেতেন। সেখানে কোনো গাছের ছায়ায় বসে গ্রামের বয়স্ক লোকদের কাছ থেকে কুঠিয়াল ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী শুনতেন। নীল জিনিসটা কি, সেটা তিনি তখনো বুঝতেন না। তবে ইংরেজরা যে নীল চাষের জন্য চাষাভুষো মানুষদের ওপর অত্যাচার করতো, সেটা তার কাছে ওই বয়সেই অন্যায় কাজ বলে মনে হতো। সে কারণে ইংরেজদের ওপর সেই ছেলেবেলাতেই বিতৃষ্ণা জন্মেছিল তার মনে ।

তারা যখন পার্বতীপুরে ছিলেন তখন তাঁদের পাশের বাসায় থাকতেন তার বাবার এক সহকর্মী বন্ধু। তিনি ছিলেন স্বদেশি। বাবার অনুরোধে একদিন তিনি তাঁকে পড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু পড়াশোনার দিকে জসিমউদ্দিন মণ্ডলের আদৌ কোনো মনোযোগ ছিল না। তার বাবার সেই বন্ধুটি তাঁকে পড়ানোর জন্য খুব চেষ্টা করতেন। তবে পড়ার চাইতে তিনি তার সেই শিক্ষকের কাছ থেকে স্বদেশিদের গল্প শুনতে বেশি পছন্দ করতেন। তখন ব্রিটিশ রাজকে তাড়াবার জন্য তরুণরা হাতে তুলে নিয়েছেন অস্ত্র। তাঁদের সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী তখন লোকের মুখে মুখে। মাস্টারদা, বাঘা যতীন, প্রীতিলতা তখন কিংবদন্তির নায়ক-নায়িকা। ধুতির কোঁচায় পিস্তল গুজে রাখা, বোমাবাজি করা এসব ছিল জসিমউদ্দিন মণ্ডলের কাছে সত্যিকারভাবেই রোমাঞ্চকর ঘটনা। তার কাছে শুনতেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে মাস্টারদার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা, ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রীতিলতা ও কল্পনার সাহসিকতার কথা। সেসব কথা বলতে বলতে এক একদিন তার শিক্ষকও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। তার চোখ দুটো অজানা আক্রোশে ধিকি-ধিকি জ্বলে উঠত।

সেসব গল্প শুনতে শুনতে জসিমউদ্দিন মণ্ডলের মনে হতো, 'হায়! আমার কোমরেও যদি এমনি একটা পিস্তল থাকতো, আমিও যদি স্বদেশি হতে পারতাম।' এসব গল্প শোনার কারণে সেই ছেলেবেলাতেই স্বদেশিদের ওপর তার মোহ জন্মে এবং ইংরেজদের প্রতি জন্মে ক্ষোভ। আর তাই তো ব্রিটিশদেরকে এদেশ থেকে তাড়ানোর জন্য, এদেশের মানুষকে তাঁদের অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপ্লবী ও শ্রমিক নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

জসিমউদ্দিন মণ্ডলের জন্ম হয়েছিল এমন একটা পরিবারে, যেখানে জন্ম-তারিখ কিংবা জন্মসন ঘটা করে লিখে রাখবার কোনো রেওয়াজ ছিল না। তার মা বলতেন, 'সেই যে দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ শুরু হল, তার ঠিক দশ বছর পর তোর জন্ম।' তার থেকেই আন্দাজ করা যায়, ১৯১৪ সাল থেকে দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আজকের কুষ্টিয়া জেলা তখন অবিভক্ত ভারতের নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নদীয়া জেলার কালীদাশপুর গ্রাম তার জন্মস্থান। তার বাবার নাম হাউসউদ্দীন মণ্ডল। ছেলেবেলায় দাদীর মুখে শুনেছিলেন, দাদী আদর করে তার প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিলেন হাউস অর্থাৎ শখ। তার বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন।
সে সময় আজকের দিনের মতো এতো স্কুল ছিল না। গ্রামে তো প্রায় ছিল না বললেই চলে। দু'একটা মক্তব, পাঠশালা যাও-বা ছিল, সেগুলোরও প্রায় টিম-টিমে অবস্থা। নানাবাড়ির গ্রামের এমনি একটা পাঠশালায় শুরু হয় তার বিদ্যা অর্জনের কসরত। তবে বিদ্যা অর্জনের চাইতে বিদ্যা বিসর্জনের আয়োজনই ছিল সেখানে বেশি। পাঠশালার মাষ্টার মশাই তাঁদেরকে সেদিনকার মতো পাঠ ধরিয়ে দিয়ে নড়বড়ে টেবিলে খ্যাংরা কাঠির মতো পা দু'খানা তুলে আয়েশ করে সটান হতেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই শুরু হতো তার নাকের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর গর্জন। তারা সেই অবসরে পিঠটান দিতেন আমবাগান মুখে। কতোবার যে আম পাড়তে গিয়ে মাষ্টার মশাইয়ের বকুনি খেয়েছেন তার হিসেব নেই।
১৯৩২ সালে তার বাবা বদলি হয়ে এলেন সিরাজগঞ্জে। এরপর তিনি বদলি হলেন রানাঘাটে। সেখান থেকে পার্বতীপুর। জসিমউদ্দিন মণ্ডলরাও বাবার সাথে সাথে চলে এলেন পার্বতীপুর। মূলত তার বাবার এই ঘন ঘন বদলির কারণে, তার পড়াশোনা তেমন এগোতে পারেনি। তবে দুনিয়াদারি সম্পর্কে তার ধারণা হয়েছিল বিস্তর। এরপর তার বাবা বদলি হয়ে এলেন ঈশ্বরদী। ঈশ্বরদীতে আফসার ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
এরপর একদিন তার বাবা বদলি হলেন কলকাতায়। তার অনেকদিনের শখ পূরণ হল এবার। এখন থেকে প্রাণভরে স্বদেশি দেখতে পারবেন ও স্বদেশিদের সাথে মিশতে পারবেন। তাঁদের বাসা ছিল নারকেলডাঙা কলোনিতে। কলোনিটি চারপাশে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রাচীরের পাশ দিয়ে চলে গেছে বড় বাজারের রাস্তা। রাস্তার উপর নারকেলডাঙা ব্রিজ। সেই রাস্তা ধরে দুপুরের খর রোদে মিছিল করে চলে যেতো অগ্নিযুগের অগ্নিপুরুষরা। আর মিছিলের পুরোভাগে দৃপ্ত পদভারে বুক চিতিয়ে হেঁটে যেতেন শ্রমিকের দল। তখন সমস্ত কলকাতাই পরিণত হয়েছিল যেনো মিছিলের নগরীতে। ইংরেজ খেদাবার জন্য সমস্ত শহরের মানুষ যেনো ক্ষীপ্ত হয়ে উঠেছে। নারকেলডাঙা কলোনির তারা ক'জন কিশোর প্রাচীরের ওপর বসে বসে দেখতেন সেইসব মিছিল আর পদযাত্রা। মিছিল থেকে 'ইংরেজ বেনিয়া এদেশ ছাড়ো, ভারত মাতাকে মুক্ত কর', 'লাল ঝাণ্ডা কি জয়', 'ভারত মাতা কি জয়' ইত্যাদি শ্লোগান উঠতো।
প্রতিদিন মিছিল দেখে দেখে আর শ্লোগান শুনে শুনে জসিমউদ্দিন মণ্ডল মনে মনে উৎসাহ বোধ করতেন মিছিলে যাবার জন্য। মাঝে মাঝে মিছিলের লোকজনও তাঁদের ডাকতেন, 'এই খোকারা চলে এসো আমাদের মিছিলে।' একদিন সত্যি সত্যি সম্মোহিতের মতো তারা দল বেঁধে যোগ দিলেন লাল ঝাণ্ডার মিছিলে। প্ল্যাকার্ড তুলে নিলেন দৃঢ় দুই হাতে। উঁচিয়ে ধরলেন লাল ঝাণ্ডা। তারপর থেকে শুরু হল নিয়মিত মিছিলে যোগ দেয়ার পালা। মনে মনে নিজেকে কল্পনা করতেন লাল ঝাণ্ডার একজন বলিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে। মিছিল ছুটতো

ধর্মতলা আর বউ বাজার ঘুরে মনুমেন্টের দিকে। মাঝে মাঝে থেমে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিতেন নেতারা। সেসব বক্তৃতার কী তেজ! বুকের গভীরে ঢুকে রক্তে মাতম লাগিয়ে দিতো।

মনুমেন্টের এই রকমের সভা-সমাবেশ শেষে বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ধুম পড়ে যেতো। তারা যারা অল্প বয়সের, তাদেরকে বলা হতো বিলিতি কাপড় সংগ্রহ করে আনার জন্য। কতোদিন তারা আউটরাম ঘাটে স্নানরতা মহিলাদের বিলেতি কাপড় চুরি করে এনে নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছেন! আস্তে আস্তে মিছিলে যোগ দেয়া, যেখানেই হোক জনসভা শুনতে যাওয়া তার একটা নেশায় পরিণত হল। ধর্মঘটের শ্লোগান শুনলেই তার বুকের মধ্যে আগুন ধরে যেত।

১৯৪০ সালের মাঝামাঝিতে শিয়ালদহে মাসিক ১৫ টাকা মাইনেতে রেলের চাকরিতে যোগ দিলেন জসিমউদ্দিন মণ্ডল। চাকরির পাশাপাশি ক্রমে ক্রমে লাল ঝাণ্ডার একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি বেশ পরিচিতি পেলেন। এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেও এসে গেলেন একদিন। ১৯৪০ সালের শেষে এসে সদস্য হলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। গর্বে সেদিন তার বুক ভরে উঠেছিল শোষিত মানুষের পার্টি, সর্বহারা শ্রেণীর সংগঠন, সেই পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য হয়েছেন তিনি।

১৯৪১-৪২ সালের দিকে জসিমউদ্দিন মণ্ডলের প্রমোশন হল সেকেন্ড ফায়ারম্যান হিসেবে। ইঞ্জিন চালনায় তার এখন একটা মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। তারা ইঞ্জিনে কয়লা না মারলে ইঞ্জিন চলবে না। বার্মায় ব্রিটিশের সাথে জাপানিদের প্রচণ্ড যুদ্ধের খবর কানে আসছে। আর সেই খবরে কলকাতার মানুষগুলো আনন্দে আত্মহারা। ব্রিটিশদের বিপর্যয় লক্ষ করে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ উৎফুল্ল। ঠিক হয়েছে! এতদিন ভারতের অসহায় মানুষের ওপর একতরফা গুঁতোনি চালিয়েছে বাবা ব্রিটিশ! এবার জাপানি গুঁতোনি কেমন লাগে, একটুখানি চেখে দেখো না কেনো বাছাধন!

তখন জাপানের নাম ভারতের প্রতিটি মানুষের অন্তরে গাঁথা। আজাদ হিন্দু ফৌজের প্রতিষ্ঠা, নেতাজী সুভাষ বোস এবং বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী ঘোষের জার্মান ও জাপানিদের সাথে সমঝোতার ফলে জার্মান ও জাপানিদের ভারতের মানুষ আপন বলে ভাবতে শুরু করেছিল। আর কি না সেই জাপানের বিরুদ্ধেই বার্মায় যুদ্ধ চলছে! প্রচণ্ড যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ব্রিটিশদের অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ তারাই ট্রেনে করে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর সেটাই ব্যবহার করা হচ্ছে তাঁদেরই শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরুদ্ধে। না, এ কিছুতেই হতে দেয়া যায় না!

তখন বোম্বে ও মাদ্রাজগামী সব ট্রেনই চিৎপুর হয়ে যেতো। হরহামেশাই বার্মা রণাঙ্গনে ব্রিটিশের অস্ত্র বোঝাই ট্রেন চলাচল করছে। এরই মধ্যে একদিন চিৎপুর স্টেশনের চায়ের দোকানে বসে তারা ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানের দল সিদ্ধান্ত নিলেন, কেউ ইঞ্জিনে উঠবেন না। বার্মার যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করা যাবে না। বন্ধ করতে হবে ট্রেন চলাচল। যেই কথা সেই কাজ। চিৎপুর স্টেশনে সমস্ত ট্রেন থেমে রইলো। চারদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল। খবর পেয়ে রেলের গোরা সাহেবরা সবাই পড়িমরি করে ছুটে এলেন। প্রথমে হুমকি ধামকি, তারপর অনুরোধ-উপরোধ। কিন্তু কিছুতেই কাজ হল না।

তারা সিদ্ধান্তে অটল। অবশেষে গোরারা শরণাপন্ন হলেন তাঁদের নেতাদের। খবর পেয়ে ছুটে এলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ আর সোমনাথ লাহিড়ীসহ ক'জন নেতা। অনেক বোঝালেন তাঁদের কিন্তু তারা তাঁদের সিদ্ধান্তে তখনো অটল।

জসিমউদ্দিন মণ্ডলরা বললেন, 'এতদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলেছেন, কিন্তু আজ যখন ব্রিটিশকে বাগে পাওয়া গেছে, তখন আপনারাই আবার সুর বদলে বলছেন, ব্রিটিশকে সাহায্য করো। এ আপনাদের কেমন ধারা নীতি?'

এর কারণ হল ১৯৪১ সালের ২২ জুন হঠাৎ করে ফ্যাসিস্ট হিটলার আক্রমণ করে বসলো সমাজতন্ত্রের সূতিকাগার সোভিয়েত রাশিয়া। আর সে প্রেক্ষাপটেই কমিউনিস্ট পার্টি তার নীতি পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিল। দেউলি বন্দী নিবাসে আবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ১৯৪১ সালের ১৫ ডিসেম্বর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ'। কাজেই দেশের জনসাধারণকেও এগুতে হবে সেভাবেই। এই সিদ্ধান্ত থেকেই বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ জেল থেকে প্রকাশ করলেন একটি ইশতেহার। তাতে বলা হল, 'বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি রাশিয়া আক্রান্ত, সুতরাং এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ', যে করেই হোক সর্বশক্তি দিয়ে হিটলারকে রুখতে হবে। তার জন্যই আজ ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতা প্রয়োজন।'

আন্তর্জাতিক রাজনীতি তখন তারা অতোশতো বুঝতেন না। তাঁদের কাছে তখন ব্রিটিশের বিরোধিতাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা হোক নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের ধর্মঘট তুলে নিতে রাজি করালেন। রেলের সাহেবরা তাঁদের কাছ থেকে বন্ড লিখিয়ে নিলেন, যুদ্ধের ভেতরে ভবিষ্যতে তারা যেনো এমন কাজ আর না করে! শেষমেষ বিকেলের দিকে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হল।

কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনার জের হিসেবে বেছে বেছে তাঁদের ক'জনকে বদলি করা হল বিভিন্ন জায়গায়। জসিমউদ্দিন মণ্ডলকে বদলি করা হল কাঠিহার লোকোইয়ার্ডে।

১৯৪২ সালের শেষের দিকে তার বন্ধু আফসারের ছোট বোন মরিয়মের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ জুগিয়েছেন সারাজীবন। তার পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে।

পাকিস্তান বিভাগের পর, ১৯৪৯ সালের দিকে দুর্ভিক্ষ যখন চরমে, তখন রেলওয়ে রেশন সপ থেকে শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ করা হল খুদ। এ ছিল আর এক প্রহসন। পাকিস্তানে এসে রাতারাতি রেলের শ্রমিকরা মানুষ থেকে বনে গেলো 'মুরগি'। মুরগির খাবার খুদই সরবরাহ করতে লাগলো তাদের জন্য। মুসলমানের দেশ, তাই অফিসারদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তারা পায় চাল। আর শ্রমিকদের জন্য খুদ। 'হায়রে স্বাদের পাকিস্তান!' অচিরেই শ্রমিকরা হয়ে উঠলো ক্ষুব্ধ। তাদের নেতৃবৃন্দ ঘনঘন বৈঠক করতে লাগলেন শ্রমিকদের সাথে। প্রকাশ্যে তো কিছু করা যায় না, কারণ শিশু রাষ্ট্র! বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না। গোপনেই বৈঠক করতেন নেতারা। দেশ বিভাগ হলেও তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু তখনো বিভক্ত হয়নি, তখনো তাঁদের কর্মকাণ্ড কলকাতাকে ঘিরেই চলছে। তাঁদের সেইসব গোপন বৈঠকে তখন আসতেন সোমনাথ লাহিড়ী, ব্যারিস্টার লতীফ, জ্যোতি বসু, ইলা মিত্র, রমেন মিত্র ও ভবানী সেনের মতো আরও কত নেতা! ঈশ্বরদীতে লাল ঝাণ্ডার কর্মী কমরেড সাহাবুদ্দীনের বাসায় মাঝে-মধ্যেই বসতো তাদের গোপন বৈঠক। স্বাদের পাকিস্তানে বাস করে মানুষ থেকে মুরগি কিছুতেই হওয়া যাবে না। অতএব, আন্দোলন। গড়ে তোল দুর্বার আন্দোলন। বন্ধ করে দাও রেলের চাকা। টনক নড়ুক কর্তৃপক্ষের। সিদ্ধান্ত মত চারদিকে পড়ে গেলো সাজ সাজ রব শ্রমিকদের মধ্যে। প্রায় প্রতিদিনই আন্দোলনের পক্ষে চলতে লাগলো মিছিল ও পথসভা ইত্যাদি ।

১৯৪৯ সালের দিকের কথা। গর্জে উঠলো লোকোসেডের শ্রমিকরা। সেড খালাসীরা হাতের গাঁইতি-কোদাল ফেলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। পোর্টার, সান্টার, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার সবাই কাজ বন্ধ রেখে শরিক হল মিছিলে। মুহূর্তখানেকের ভেতরেই সমস্ত সেড এলাকা নীরব নিথর হয়ে পড়ল। তখনো ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ ছিল। ফলে দার্জিলিং থেকে কলকাতাগামী সব ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ঈশ্বরদী প্লাটফরমে। প্যাসেঞ্জাররা বিরক্ত হলেও সাধারণ মানুষ আর সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীরা কিন্তু মহাউল্লাসে ফেটে পড়লো। ঠিক হয়েছে বেশ হয়েছে, জসীম মণ্ডলরা ঠিক মারই দিয়েছে। চালের বদলে তোমরা খাওয়াবে খুদ, আর আমরা মুখ বুজে সব সহ্য করব? এ আর হচ্ছে না।

অবশেষে বিকেল পাঁচটার দিকে পাবনা থেকে কয়েক লরি রিজার্ভ ফোর্স এসে পৌছুলো। সে সময়কার বিপ্লবী শ্রমিক-কর্মী বাহাদুরপুরের দেলওয়ার দৌড়ে এসে খবর দিলেন, 'জসীম ভাই, পালাতে হবে, পুলিশ এসে গেছে।' খবর শুনে তিনি পশ্চিমে শ্রমিক কলোনির একটি বাসায় এসে আশ্রয় নিলেন। সারাদিন কিছু খাননি। ক্ষুদায় পেট জ্বালা করছিল তার। খাবারের কথা বলতেই শ্রমিক কলোনির অনেকেই খাবার নিয়ে হাজির হলেন। শোনা গেল, স্ট্রাইকের সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দকে হন্যে হয়ে পুলিশ খুঁজছে। তাই তিনি রেল কলোনিতে থাকা আর নিরাপদ মনে করলেন না। সরে গেলেন আরও উত্তরে আউটার সিগনালের কাছে শ্রমিক কলোনির আর একটি বাসায়।

এরপর ট্রেনে চেপে তারা পৌছুলেন আবদুলপুর স্টেশনে। সেখান থেকে হাঁটাপথে নাটোর হয়ে বাসুদেবপুর গ্রামের হালদারপাড়ায় গিয়ে উঠলেন গভীর রাতে। এরই মধ্যে একদিন খবর পেলেন 'খুদ স্টাইকের' অপরাধে জসিমউদ্দিন মণ্ডল, দেলওয়ার, হামিদ আর রুহুলসহ মোট ছ'জনের নামে হুলিয়া হয়েছে। পুলিশ তাদের খ্যাপা কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় ঈশ্বরদী ফিরে যাওয়া কোনোক্রমেই নিরাপদ নয়। কমরেডরা পরামর্শ দিলেন, সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে সেল্টার নিতে। সে সময় সাঁওতালদের ভেতরে পার্টির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। জসিমউদ্দিন মণ্ডলের গায়ের রং-চেহারা আর স্বাস্থ্যের সাথে সাঁওতালদের মিল থাকায় সহজেই তাদের সাথে মিশে গেলেন তিনি। ফলে তাদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করার সময় কেউ ধরতেই পারতো না যে তিনি সাঁওতাল নন। এভাবে কাজ করতে করতেই কয়দিনের ভেতরে তারা তাকে আপন করে নিল।

ঈশ্বরদীতে সংগঠনের অবস্থার কথা চিন্তা করে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। অস্থির হয়ে উঠলেন ভেতরে ভেতরে। তাই প্রায় ছ'মাসের মাথায় সাঁওতাল পাড়া থেকে ঈশ্বরদী ফিরলেন একদিন। আশ্রয় নিলেন লোকোসেডে কমরেড সাহাবুদ্দিনের বাসায়। ওখান থেকেই পুলিশ ১৯৪৯ সালে তাকে গ্রেফতার করলো।

তাকে পাঠিয়ে দেয়া হল পাবনা জেলে। জেল সম্পর্কে তার একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছিল এর মধ্যেই। সেটা ছিল ব্রিটিশের জেলখানা। এর আগেও কয়েকবারই কলকাতা থাকতে জেল হাজতে গিয়েছেন। তবে স্বল্প সময়ের জন্য। জেলের খাওয়া-দাওয়ার চরম অব্যবস্থার কথা জানা ছিল। তাই ঘাবড়ালেন না। রাতে তাকে রাখা হল হাজতিদের সাথে।

রাতে দেয়া হল দুটো করে রুটি আর ডাল। সে রুটির কী চেহারা! আটার মধ্যে পোকার ছড়াছড়ি আর দুর্গন্ধ, সে কথা বলবার নয়। তাই খেতে হল। ভেবেছিলেন পাকিস্তানে জেলের বুঝি কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো লক্ষণ টের পেলেন না।

ভোরবেলা তাকে ঘানি টানতে বলা হল। কিন্তু তিনি ঘানি টানতে নারাজ। এ অপরাধে তাকে পিছমোড়া করে ধরলো দু'জন, আর দু'জন মিলে এলোপাতাড়ি হান্টারের বাড়ি মারতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা শরীর আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেলো। তারপর জেলার সাহেবের হুকুমে তাঁকে কয়েদি সেলে তোলা হল। শুরু হল অমানুষিক নির্যাতন। সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে রাখা হল। পায়ের নিচে মেঝেতে পানি ঢেলে দেয়া হল। শীতের দিন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার ওপর উদোম গা। হু হু করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। সারাটা দিনই গেলো এইভাবে। পেটে অসম্ভব ক্ষিদে। জ্বরজ্বর বোধ করতে লাগলেন।

সিদ্ধান্ত নিলেন, এই অমানুষিকতার প্রতিবাদ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলেন অনশন করবেন। যতক্ষণ না এর প্রতিকার হয়, ততক্ষণ ছুঁবেন না দানাপানি।

সারাদিন অভুক্ত রইলেন। খাবার ফিরিয়ে দিলেন। সবাই জেনে গেলো চার নম্বর সেলের কয়েদি জসিম মণ্ডল অনশন করেছে। দিন গড়িয়ে রাত এলো, তাকে রাখা হয়েছে তেমনি বিবস্ত্র আবস্থায়।

তার 'হাঙ্গার স্টাইক'-এর খবরটা আর চাপা থাকলো না। শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছে গেল কর্তৃপক্ষের কানে। জেল কর্তৃপক্ষ হাঙ্গার স্টাইককে বড়ই ভয় করত সেইকালে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন জেলার চাকলাদার। প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ, তারপর হুমকি-ধামকি। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তে অটল। বললেন, 'অনশন কিছুতেই ভাঙ্গবেন না। আপনি ডি. সি সাহেবকে খবর পাঠান, তার সাথে কথা বলতে চাই।' অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে জেলার সাহেব খবর পাঠালেন ডি. সি সাহেবকে।

ডি. সি সাহেব আসার পর তাকে তিনি বললেন খাবারের পরিমাণ ও মান বাড়ানোর জন্য। কয়েদিদের দিয়ে ঘানি টানা বন্ধ করার কথাও তিনি ডি. সি সাহেবকে বললেন । সবকিছু শুনে বললেন, 'সব ব্যবস্থা হবে। আপনি এখন কিছু খেয়ে নিন। আমি আপনার খাওয়া দেখে যেতে চাই।' ডাক্তার সাহেব সঙ্গেই ছিলেন। তাকে ডাবের পানি আর গ্লুকোজ খেতে দিলেন তিনি। জসিমউদ্দিন মণ্ডল অনশন ভঙ্গ করলে ডি.সি সাহেব জেলারকে বললেন, 'যতোদিন ওর শরীর সুস্থ না হয়, ততোদিন ওকে হাসপাতালে রাখবার ব্যবস্থা করবেন।'

এরপর তাকে পাঠিয়ে দেয়া হল হাসপাতালে। হাসপাতালে মোটামুটি আরামেই দিন কাটছে। খাওয়া-দাওয়াও ভালো। প্রায় ছ'মাস পাবনা জেলে কাটানোর পর তাকে বদলি করা হল রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে। এখানে এসেও তার উপর অনেক নির্যাতন-অত্যাচার চলতে লাগল।

১৯৫৪ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকে ফিরে আসার পর রেলের চাকরি আর করা হয়নি তার। কারণ রেল কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বন্ড চেয়েছিলেন, 'এরপর থেকে আমি আর কোনো রকম আন্দোলনে অংশ নেব না।' কিন্তু তিনি বন্ড দিতে অস্বীকার করায় তার আর চাকরি হয়নি।

মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পর ১৯৫৪ সালেই আবার শত শত রাজনৈতিক কর্মীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে পোরা হল জেলে। জসিমউদ্দিন মণ্ডলও রেহাই পেলেন না তার আওতা থেকে।

এসময় রাজশাহী জেলে কিছুদিন থাকার পর তাঁকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হল। ঢাকা জেলে তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু কর্মী নেতারা বন্দী জীবনযাপন করছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬২ সালের দিকে আবার গ্রেফতার হলেন তিনি এবং ১৯৬৪ সালের দিকে মুক্তি লাভ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কলকাতা চলে যান। সেখানে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে প্রচার চালান। মুক্তিযুদ্ধের সময় দশ কাঠা জমির উপর তার স্ত্রীর তিল তিল করে গড়ে তোলা চালাঘর দুটোও বিহারিরা পুড়িয়ে দিয়েছিল জসিমউদ্দিন মণ্ডলের রাজনীতি করার অপরাধে। সেই দশ কাঠা জমিও বিক্রি করে সংসার চালাতে হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। আজ সারা বাংলাদেশে তার এতটুকু জায়গা নেই, যে জমিটুকু তিনি নিজের বলে দাবি করতে পারেন। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বর্তমানে বসবাস করছেন। তারও বৈধ মালিক তিনি নন।

সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জীবনের পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখেন, পাওয়ার পাল্লাটি শূন্য। বঞ্চনার পাল্লাটি ভারি হয়ে আছে বেশি। তবুও হতাশ নন তিনি। এ যেন এক কঠিন নেশা, সুতীব্র আকর্ষণ, যা উপেক্ষা করে থাকা কখনো সম্ভব নয়। তাইতো অনাচার-অত্যাচারের প্রতিবাদে এই বৃদ্ধ বয়সেও ছোটেন মিছিলে, ঝাঁপিয়ে পড়েন আন্দোলনে। বক্তৃতার ঝড় তোলেন সভামঞ্চে। যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন অক্ষুণ্ন থাকবে তার জীবনের এই ধারা।

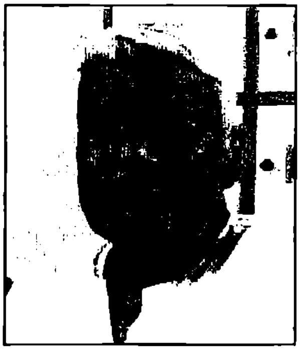
লেখক: গুণীজন দল

তথ্যসূত্র:

১. জীবনের রেলগাড়ি, সংগ্রামী স্মৃতিকথা- জসিমউদ্দিন মণ্ডল, অনুলিখন-আবুল কালাম আজাদ, সাহিত্য প্রকাশ, প্রকাশক: মফিদুল হক।

২. www.gunijan.org.bd থেকে নেয়া।

কামাক্ষ্যা রায় চৌধুরী



একবার নকশালপন্থী কিছু উগ্রবাম তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে। সেই সময় একদিন নকশালপন্থীদের আরেকটি গ্রুপ একদিন তার বাড়িতে আসে। তাদের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রয়োজনীয় কথা শেষে তাদের একজনকে বিপ্লবী কামাক্ষ্যা রায় বলেন, 'আমি শুনেছি তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবা না। আমাকে মেরে ফেলবা। মারো, তাতে আপত্তি নেই। তবে তোমরা তো প্রলেতারিয়েত, তোমাদের মধ্যে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতও আছে। আমার অনুরোধ হচ্ছে কোনো লুম্পেন প্রলেতারিয়েত দিয়ে আমাকে মেরো না।'

বিপ্লবী কামাক্ষ্যা রায় চৌধুরী ১৯২০ সালের ২০ জুন খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানাভুক্ত ভদ্রদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম শরদিন্দু রায় চৌধুরী আর মাতার নাম মৃণালিনী রায় চৌধুরী। গ্রামের পাঠশালাতেই পড়াশুনার হাতে খড়ি। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি কাছড়াপাড়া হার্নেট হাই স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। এরপর তিনি ভর্তি হলেন সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে।

সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনাকালে তিনি বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৬ সালে তিনি অনুশীলন দলের একজন সক্রিয় বিপ্লবী হিসেবে নাম লেখান এবং বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকেন। ওই সময়ে বিপ্লবী সুবোধ শূর ছিলেন সৈয়দপুর অঞ্চলের বিপ্লবী দলের কাণ্ডারি। তিনি ছিলেন রাজবন্দী, ওই সময়ে তিনি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নজরবন্দীতে ছিলেন। তখন বিপ্লবী দলে কামাক্ষ্যা রায়ের কাজ ছিল দলের বিভিন্ন চিঠিপত্র গোপনে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছে দেয়া। যাদের কাছে কাগজপত্র পৌঁছে দিতেন তারা সকলেই বিপ্লববাদী পন্থা থেকে পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পৃক্ত হন।

বিপ্লবী সুবোধ শূরও বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কমিউনিস্ট মর্তাদর্শের দীক্ষা নেন এবং তিনি মনে করেন শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। তাই তিনি রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনে মার্কসবাদী পথ ও মতকে গ্রহণ করেন। যে কারণে কামাক্ষ্যা রায়ও তার কাণ্ডারির পথ অনুসরণ করে ১৯৩৭ সালে বিপ্লবী দলের পাশাপাশি কমিউনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হন এবং ওই বছর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির Candidate Membership-এর জন্য আবেদন করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি পার্টির মেম্বারশীপ পান। এ বছর তিনি দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। একই বছর তার বাবা

মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর তিনি সৈয়দপুর থেকে গ্রামের বাড়ি খুলনার ডুমুরিয়া চলে যান। এ পর্যায়ে তিনি জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। যে কারণে তার পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। দুই বছর বিরতীর পর তিনি ১৯৪১ সালে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে (বর্তমান বিএল কলেজ) আই. এ ভর্তি হন। কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি ছাত্র ফেডারেশনের সাথে যুক্ত হন। গান্ধীজির ভারত ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট তিনি কলেজ থেকে গ্রেফতার হন। এক বছর কারাভোগের পর ১৯৪৩ সালে মুক্তি পান।

জেলে যাওয়ার আগেই তিনি কৃষক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পুরোদমে কৃষক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। এসময় কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন করে দেওয়ার জন্য তিনি কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। জমির লবণাক্ততা দূর করার জন্য তিনি কৃষক নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জির সাথে জমিতে বাঁধ নির্মাণে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। বাঁধ নির্মাণ করে চাষ করার ফলে ব্যাপক ফলন হয়। ফলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ওই অঞ্চলে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। খাস জমি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক খুন, ধর্ষণ ও লুটপাট হয়। তারা তখন এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন।

১৮৪৫ সালের শেষের দিকে তিনি চুকনগর দিবাকলী বিদ্যা ভবনে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর খুলনার কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হন এবং যশোরে তেভাগার আন্দোলনে যুক্ত হন। তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৪৬ একটি মামলা হয়। এ মামলার প্রথম আসামী ছিলেন বিষ্ণু দে এবং দ্বিতীয় আসামী ছিলেন কামাক্ষ্যা রায় চৌধুরী। ওই সময়ে ঘর জ্বালানো মামলা নামে আরেকটি মামলা হয়। যদিও এ মামলায় তাঁকে আসামী করা হয়নি কিন্তু অন্য যাদেরকে আসামী করা হল তাদের ৭ বছরের জেল হল।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে বিষ্ণু দে গ্রেফতার হন। ২৪ এপ্রিল তারিখে বিষ্ণু দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে মিছিল বের করা হয়। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। তিনজন নিহত হন।

এ সময় আব্দুল হকের নেতৃত্বে কামাখ্য রায় চৌধুরী, সতিশ বাইন, রমাকান্ত বাইন, মাদার বাছার, হেমন্ত সরকার, প্রবাস চৌধুরী ও মুনির ক্ষেত মজুর সম্মেলনে যোগদান করতে যান শিকগাছায়। কলকাতা যাওয়ার পথে আব্দুল হক, হেমন্ত সরকার, প্রবাস চৌধুরীর সাথে তিনি বেনাপোল বর্ডারে গ্রেপ্তার হন। তাঁদের সাথে মনোজ নামে একজন বিপ্লবী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রেফতারের পর বিভিন্ন সময়ে তাঁকে যশোর থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে বগুড়া এবং বগুড়া থেকে রাজশাহী জেলে পাঠানো হয়। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে তিনি রাজশাহী জেল থেকে মুক্তি পান।

কামাক্ষ্যা রায় জেলে বসে কমিউনিস্ট বইপত্র পড়তেন। তিনি ঢাকা জেলে অনশনে অংশগ্রহণ করেন। এ অনশনে শিবেন শিকদার মারা যান। অনশনে ৩০০ জনেরও বেশী বন্দী অংশগ্রহণ করেছিল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি পুনরায় পার্টির কাজে সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত হন। ওই সময়ে পাকিস্তান বিরোধী সকল আন্দোলনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন।

পাকিস্তান আমলে রেল শ্রমিক বিপ্লবী জমিসইদ্দন মণ্ডল, কামাক্ষ্যা রায় চৌধুরী, বরুণ রায়, সাতকৌড়ী দত্ত ও সুবোধ রায়কে পঞ্চপাণ্ড বলা হত। কারণ ওই সময়ে তারা পাঁচজন পাকিস্তান সরকারের আতঙ্ক ছিলেন। তারা যে অঞ্চলে যেতেন সে অঞ্চলেই এক গণ আন্দোলনের সৃষ্টি হতো।

১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থানের সময় তিনি খুলনার আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় কুষ্টিয়ায় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি কোলকাতায় যান। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সকালে রেডিওর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পারেন। এরপর দেশে এসে তিনি আজীবন কৃষক সমিতির সাথে ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত থেকে বিভিন্ন সভা-সম্মেলন ও আন্দোলনে সম্পৃক্ত রয়েছেন (এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত)।

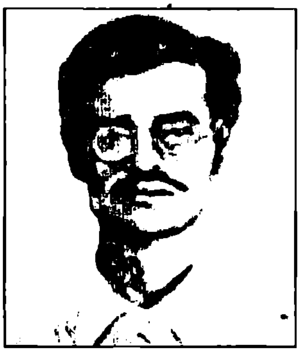
এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি খুলনার যুব সমাজকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। এ সময় খুলনার বিপ্লবী রতন সেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে একজন দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। রতন সেন সম্পর্কে বিপ্লবী কামাক্ষ্যা রায় বলেন, 'রতন সেনের মত আর কোন সংগঠক আমার চোখে পড়েনি।'

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই ছেলে ড. অমিতাভ রায় চৌধুরী, সত্যজিৎ রায় চৌধুরী এবং এক মেয়ে সুজাতা রায় চৌধুরীর পিতা। তার স্ত্রীর মীরা রায় চৌধুরী।

তথ্যসূত্র:

১. ১৭ মার্চ ২০১২ তারিখে বিপ্লবীদের কথা সম্পাদক শেখ রফিক ও রিয়াজ খান তার একটি সাক্ষাতকার নেন। ওই সাক্ষাতকারের উপর ভিত্তি করেই এ সংক্ষিপ্ত জীবনীটি লেখা হয়েছে। সম্পাদনা: মিতফাহুর রহমান চৌধুরী ও রিয়াজ খান ।

সত্যের পূজারি শহীদ কানাইলাল দত্ত



১৮৮৭ সালের জন্মাষ্টমীর দিন জন্ম চন্দননগরের সরষেপাড়ায়। কিন্তু ছেলেটা ভীষণ ডানপিটে, দুরন্ত আর অস্থির। একমুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না। শুধু লাফ-ঝাঁপ, হৈ-হুল্লোড় অথবা কোন না কোন রকমের খেলা নিয়েই মেতে থাকে। আর ঘুড়ি ওড়ানোতেও অসম্ভব নেশা। এক কথায় তার দৌরাত্ম্যে শুধু বাড়ির লোকেরাই নয়, পাড়া-পড়শিরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ। কিন্তু কেউ তার ওপর বিরক্ত নয় বরং ভালোবাসে। সবাই বলেন অসম্ভব ডানপিটে হলে হবে কি ছেলেটার গুণ আছে। কখনও মিথ্যে কথা বলে না–মরে গেলেও না–শত প্রলোভনেও না। তাছাড়া আছে সব মানুষের প্রতি অসম্ভব দরদ ও ভালোবাসা। কিশোর বয়স থেকেই যে কোন লোকের সুখ, দুঃখ অথবা শোকে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবেই। সকলেই স্বীকার করেন যে, মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ ও ভালোবাসা কানাইলালের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিল গভীর ও আন্তরিক দেশপ্রেম। দেশের পরাধীনতার গ্লানিই তাঁকে অস্থির ও অশান্ত করে তুলেছিল। দেশের পরাধীনতার গ্লানি তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর মুখে সব সময় শোনা যেত,

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায়?

সত্যনিষ্ঠা ও সত্যানুরাগ:

ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা ছেলেবেলা থেকে। একে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে স্বাস্থ্য ভালো নয়। তার ওপর ছাদে উঠে রোদে সারাদিন ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য প্রায়ই অসুখে পড়ে। তাই মা ও মামারা ওকে নিয়ে, বিশেষত ওর স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মামা একদিন বেরোবার সময় কানুকে বলে গেলেন সে যেন সেদিন কিছুতেই ছাদে উঠে ঘুড়ি না ওড়ায় রোদে রোদে। কিন্তু তখন কানু একবারেই ছেলেমানুষ। লোভ সামলাতে পারে না। মনে মনে বলে মামাকে কথা দিয়েছি ছাদে উঠে রোদে ঘুড়ি ওড়াব না। তবে ছায়ায় বসে ঘুড়ি ওড়ানো দেখলে তো আর কথার খেলাপ হবে না। তাই টিনের ছাদের ছায়ায় বসে ঘুড়ি ওড়ানো

দেখতে লাগল। ওর বন্ধুরা ওকে বসে থাকতে দেখে বললে, হ্যাঁরে কানু, তুই আজ ঘুড়ি ওড়াবি না? জবাবে কানু বললে,– 'না ভাই, আজ রোদে ঘুড়ি ওড়াতে মামার বারণ আছে।' কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে এসে কানুকে না দেখে মামা কানুর নাম ধরে ডাকাডাকি করতেই কানু নেমে এল। তাকে ওপর থেকে নেমে আসতে দেখে মামা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, তোমাকে না বারণ করেছিলাম এই কাঠফাটা রোদে ছাদে উঠে ঘুড়ি না ওড়াতে। অথচ তুমি ঠিক তাই করছিলে।

– না মামা, আমি ছাদে ঘুড়ি ওড়াইনি।

– ফের মিথ্যেকথা বলছ। ছাদ থেকেই নেমে এলে অথচ বলছ ঘুড়ি ওড়াওনি।

কথা শেষ না হতেই মামা চটাস চটাস করে কানুর পিঠে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলেন। আর যায় কোথা। শুরু হয়ে গেল কানুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। সে কী কান্না, কিছুতেই থামতে চায় না। কারুর কথাতেই তার কান্না বন্ধ হল না। মা শেষপর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে জিজ্যেস করলেন, কী হয়েছে, অন্তত আমাকে বল–তোর মাকেও বলবি না?

বলছি শোন। আমি মামার অবাধ্য হয়ে ছাদেও উঠিনি কিংবা ঘুড়িও ওড়াইনি। অথচ মামা আমায় বিশ্বাস না করে আমায় মিথ্যেবাদী বলে কিল চড় মারল। তোমরা দুজনেই তো জান মা, আমি জীবনে মিথ্যে কথা বলিনি। মিছে কথা আমি বলতেই পারি না। সেসব জেনে শুনেও কেন মামা আমায় মিথ্যেবাদী বললে? যতক্ষণ না আমায় বিশ্বাস করা হবে ততক্ষণ আমার কান্না তো থামবেই না–আমি কিছু খাবও না।

তখন মামা পাড়ার যেসব ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন–'হ্যাঁরে, কানু কি ছাদে উঠে আজ ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল?'

জবাবে সেই ছেলেরা তখন বলল, কৈ না তো। কানু তো আজ ঘুড়ি ওড়ায়নি। ও টিনের ছাদের তলায় ছায়াতে বসে ঘুড়ি ওড়ানো দেখছিল। আমরাই বরং ওকে বললাম, কিরে, তুই ঘুড়ি ওড়াবি না? কানু তখন বলল, না ভাই, আমি আজ ঘুড়ি ওড়াতে পারব না, মামার বারণ আছে।

পাড়ার ছেলেদের কথা শুনে মামার তো চক্ষুস্থির। বুঝতে পারলেন যে, কানুকে মারা ও বকাবকি করা এবং সর্বোপরি মিথ্যেবাদী বলা খুবই অন্যায় হয়েছে। অনুতপ্ত মামা তখন আদরের ভাগ্নেকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন–আমার ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে বাবা। তোকে মেরে ও বকাবকি করে আমি খুবই অন্যায় করে ফেলেছি। ঠিক আছে, আমি আর কখনও এমন ভুল করব না। যাই হোক, সব ভুলে এখন খাবি চল, খাবি তো? হেসে ঘাড় নাড়ল কানু। তারপর মামা-ভাগ্নে দুজনে এক সঙ্গে খেতে বসে গেল। তখন কানুর বয়স মাত্র ১২ বছর।

জন্মাষ্টমীর দিন জন্ম বলে কানুর নাম হয়েছিল কানাই। পাঠকদের তো জানাই আছে, শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই গীতায় বলেছেন যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি বারবার মনুষ্য দেহ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং হবেন। কানাইলালও অনেকটা সেই রকম কাজই করেছিলেন। তার সতীর্থ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের রক্ষা করতে এক দেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতককেই আগে হত্যা করে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। কানুর মতে ভারতবর্ষে একাধিক ইংরেজ শাসক থাকলে দেশের যত ক্ষতি হবে

তার চেয়ে আরও অনেক বেশি ক্ষতি হবে যদি মাত্র একজন বিশ্বাসঘাতকও এদেশে বেঁচে থাকে। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের মনে পড়া উচিত জয়চাঁদ বা মিরজাফরের কথা। কত বারই তো ওইসব জয়চাঁদ ও মিরজাফরের জন্য আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা হারিয়েছি। আজও ভারতবর্ষের দুর্দশার জন্য দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকরাই তো দায়ী। বস্তুত নিজের জীবন দিয়েই কানাইলাল দেশবাসীর সামনে একটা আদর্শ বা প্রেরণার উৎস হয়ে গেছেন। তিনি দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার পরই দেশাবাসী গর্জে উঠেছিল—আমরা রক্ত দেব—প্রাণ দেব—কিন্তু দেশ দেব না—স্বাধীনতা হারাব না কিছুতেই। যে-কোন মূল্যে দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে হবে।

প্রিয় পাঠকবর্গ—এবার আপনাদের কাছে বলব কেমন করে কানাইলাল দেশকে ভালোবাসলেন—কেমন করে ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা বিপ্লবী হয়ে উঠলেন—আর কেমন করেই বা তাঁর কাছে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' হয়ে গেল।

একটু বড়ো হতেই কানাইলালের কাছে সর্বক্ষেত্রে মানুষের সেবা করা—রোগে, শোকে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রভৃতি গুণের দেখা পাওয়া যেতে লাগল।

এছাড়াও স্কুল জীবনের শেষ দিকে এবং কলেজ জীবনে শয়নে-স্বপনে কিংবা নিদ্রা ও জাগরণে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হল ইংরেজ শাসনের ধ্বংস সাধন। নিত্য সঙ্গী হল যত সব বিপ্লবী পত্রপত্রিকা ও বই। অবিনাশ ভট্টাচার্যের 'বর্তমান রণনীতি', বারীন্দ্রকুমারের 'ভবানী মন্দির' ও 'মুক্তি কোন পথে'। স্বামীজির বক্তৃতামালা ও 'পত্রাবলী'। শ্রীঅরবিন্দের কিছু রচনা ও 'যুগান্তর' পত্রিকাটি। তাছাড়াও, ব্যায়াম ও শরীরচর্চার প্রতি অতিশয় মনোযোগী। স্বামীজির বাণী—'গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার মাধ্যমে আরো দ্রুত ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র ইষ্টদেবতা হলেন দেশমাতৃকা' কানাইকে অভিভূত করে ফেলেছিল। বলাবাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর সন্তান দল ও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রও কানাইলাল দত্তকে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। হৈ-হুল্লোড় ও খেলা-ধুলোতে সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যেমন তাঁর, তেমনি ছিল যে-কোন বিষয়ে নেতৃত্ব দেবার প্রতিভা ও দক্ষতা।

সাম্রাজ্যবাদী বড়োলাট লর্ড কার্জন বাংলাপ্রদেশকে দু-ভাগে ভাগ করায় তার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। পাঠকবর্গের জানা আছে যে, স্বয়ং গান্ধীজিই স্বীকার করেছেন, ওই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনই পরবর্তী কালের সকল আন্দোলনেরই পথপ্রদর্শক।

কার্জনের আদেশে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেশাবাসীর কাছে আবেদন জানান, ওই দিনটি যেন রাখিবন্ধন দিবস হিসেবে পালন করা হয়। কানাইলালের উৎসাহ দেখে কে? চন্দননগরের সব ব্যাপারেই এগিয়ে যাচ্ছেন তিনিই। সকালে খালি পায়ে শোভাযাত্রা। তারপর গঙ্গাস্নান। সব বাড়িতে অরন্ধন। সারাদিন ফলমূল খেয়ে থাকা। সন্ধেবেলা সভা। সব বিষয়েই কানাই শুধু নেতা। সভায় ঠিক হল, যেহেতু শক্তিতে ইংরেজদের সঙ্গে পারা যাবে না তাই ওদের ভাতে মারতে হবে। অর্থাৎ ওদের ব্যবসা নষ্ট করে দিতে হবে। কী করে? বিলিতি জিনিস ব্যবহার বন্ধ করে। বিলিতি জিনিসপত্র কেউ যাতে না কেনে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।–

বলে গান গেয়ে গেয়ে প্রচার করে বেড়াতে হবে। দোকানে দোকানে ক্রেতাদের বলতে হবে–বিলিতি জিনিসপত্র একেবারেই কিনবেন না। আমাদের দেশে যা তৈরি হয়, যা উৎপাদন হয়, তাতেই এখন সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মনে রাখবেন এখন বিলাসিতার সময় নয়। এখন ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের সময়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসকদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে হওনা তোমরা লাট-বেলাট, তোমাদের জীবন কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। কেমন করে শাসকদের তা বোঝানো যাবে? বোঝানো যাবে একের পর এক শাসকদের হত্যা করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। সত্যিকারের সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারলে ব্রিটিশ শাসকরা পালাবার পথই পাবে না। অবিভক্ত বাংলার অখণ্ড প্রাণসত্তাকে এক সূত্রে গেঁথে দেওয়ার জন্য বিশ্বকবি রচনা করেছিলেন–রাখি সংগীত। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও (চন্দননগরেও) সভা শেষে মিলিত কণ্ঠে গানটি গাওয়া হয়েছিল।

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক-পুণ্য হউক–পুণ্য হউক–হে ভগবান।

গানটির শেষে ছিল–

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যতো ভাইবোন,
এক হউক–এক হউক–এক হউক–হে ভগবান।

ইংরেজ সার্কাস পার্টিকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করা:

ওই সময় চন্দননগরের কুঠির মাঠে এক ব্রিটিশ সার্কাস পার্টি সার্কাস দেখাতে এসেছিল। বিদেশি সার্কাসের দল এ দেশের মানুষদের টাকা-পয়সা নিয়ে তাদের দেশে চলে যাবে এ ব্যাপারটা কানাইলালের একেবারেই পছন্দ হল না। সে বললে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

উদ্বোধনের দিন কানাই ঠিক সময় দলবল নিয়ে টিকিট ঘরের সামনে এসে হাজির। তারপর হাতজোড় করে সকলকে বলতে লাগলেন, দয়া করে কেউ টিকিট কিনবেন না। টিকিটের বিনিময়ে আপনারা যে টাকা-পয়সা দেবেন সে সবই বিলেতে চলে যাবে। তাতে ইংরেজদেরই শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলে ওরা আরও বেশি দিন ভারতে রাজত্ব করার সুযোগ পেয়ে যাবে। ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় বিচার করে দয়া করে আপনারা টিকিট কেনা থেকে বিরত থাকুন। কানাইলালের কথা শুনে দু'একজন ইংরেজভক্ত ছাড়া আর সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে খবর পেয়েই সার্কাসের ম্যানেজার ছুটে এসে ধমকাতে শুরু করল–ভাগো ইঁয়াসে–ইউ ড্যাম-সোয়াইন-নিগার। ম্যানেজারের পেছন পেছন আর এক সার্কাস কর্তা লাঠি হাতে ছুটে এসে কানাইকে মারতে গেল। কানাই চকিতে লাফিয়ে উঠে বাঁ-হাতে তার লাঠিটা ধরে ফেলে ডান-হাতে কয়েকটা ঘুঁসি বসিয়ে দিল তার মুখে। সে তখন লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে একটা খুঁটিতে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পুলিশ আসার আগেই কানাই ও তার দলের ছেলেরা ওখান থেকে সরে পড়েছিল। পুলিশরা কাউকে ধরতে পারল না। সাহেবদেরও সুবুদ্ধি হল। তারাও পরের দিন সকালেই অন্যত্র চলে গেল।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক সময়েঃ

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা পড়ার পর থেকে আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহ বা বিপ্লবের রূপ নিতে শুরু করে দেয়। বোমা মেরে লাটসাহেবের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হল। ধারাবাহিকভাবে সাহেবদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা চলায় ইংরেজ অত্যাচারী শাসকরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। কানাইলালের চন্দননগরেও সন্ত্রাস শুরু হয়ে গেল। ওখানেও মেয়রের শোবার ঘরে বোমা পড়ল।

হঠাৎ একদিন কানাইলাল কলকাতা চলে এসে মহাবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বোমা তৈরির কাজে সাহায্য করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চাইলেন কানাইলাল তখন কী পড়ছে? উত্তরে কানাই জানাল সে ওই বছর ফাইনাল বি. এ. পরীক্ষায় বসবে। তখন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন–বেশ, তবে পরীক্ষার পরই চলে এসো। লেখাপড়াটাও খুব দরকার।

কিন্তু কানাই ছাড়বার পাত্র নয়। সে তখন থেকেই চন্দননগরে কয়েকটি গুপ্তসমিতি গড়ে তুলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজে লেগে গেল। এর কিছুদিন পরে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ চন্দননগরে এলে সেইসব অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা পয়সা তাঁর হাতে তুলে দেয়। তখন বারীন্দ্রকুমার কানাইকে বুকে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করেন ও বলেন, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে বোমা তৈরির কাজে লেগে যাও তো আমি তোমাকে সানন্দে গ্রহণ করব।

বড়ো চাকরি পেয়েছি বলে গৃহত্যাগ:

একদিন বিকেলে কানাই তার মাকে বলল, খুব ভালো চাকরি পেয়েছি। আজই আমায় চলে যেতে হবে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কী চাকরি? কোথায় যাবি?

খুব ভালো চাকরি। কলকাতায়। আজ এখুনি চলে যেতে হবে। দুধ মুড়ি খেয়ে কানাই তখুনি বেরিয়ে গেল। কানাই তো জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলেনি। তাই মার বিশ্বাস হল সে বড়ো চাকরিই করতে গেল। প্রতিবেশীদেরও সেই বিশ্বাসই হল। কানাই মনে মনে ভাবল দেশের কাজ করার চেয়ে বড়ো চাকরি আর কী হতে পারে? সুতরাং সে মোটেই মিথ্যাচার করেনি।

১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিল থেকে ৩ মে পরপর কদিন কাগজে বেরোচ্ছিল আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতো যত সব খবর। ৩০ এপ্রিল তারিখে কিংসফোর্ডকে মারতে মজঃফরপুরে বোমা পড়েছে। ১ মে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হয়েছেন। দোসরা মে প্রফুল্ল চাকী নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। তেসরা মে তারিখে খবর বের হল মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। গাদা গাদা রাইফেল, রিভলবার, হাত বোমা ও কার্তুজ ইংরেজ শাসকরা পেয়ে গেছে। আর দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে মৃত্যু বরণের শপথ নেওয়া তিরিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই তিরিশ জনের তালিকায় দেখা গেল কানুরও নাম। তখনও কানাই-এর মা এবং আরও কয়েকজন প্রতিবেশীর ধারণা কানাইকে নিশ্চয় ভুল করে ধরেছে। ও নিশ্চয়ই ছাড়া পেয়ে যাবে। কারণ ওতো চাকরি করতে গিয়েছে বলে গিয়েছিল। তাছাড়া ও তো মিছে কথা বলার ছেলে নয়।

একদিন কানাই-এর দাদা ডাঃ আশুতোষ দত্ত উকিল নিয়ে জেলে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে কানাইকে বললেন তোর নামে কোন বড়ো রকমের অভিযোগ নেই। তাই তোকে জামিনে ছাড়িয়ে নিতে উকিলবাবুকেও সঙ্গে করে এসেছি। তুই উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলে নে। কানাই উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর বলল, আমি মুক্তি চাই না। আমার সহবন্দী বিপ্লবীদের যা হবে আমারও যেন তাই হয়, আমি তাই চাই। উকিলবাবু তখন বললেন, অকারণে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। জবাবে কানাই বলল, অকারণে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে আমি জেলে আসিনি। তাছাড়া, সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে আমি যদি সমান শাস্তি না নিই তবে তা বেইমানি করা হবে। তা আমি মরে গেলেও পারব না।

জেলখানা, না, আনন্দের হাট:

কানাইলাল জেলে বেশ মজায় আছে। বেশ আনন্দেই তার দিন কাটছে। যখন অন্য বিপ্লবীরা ধর্মচর্চা করছে–গীতাপাঠ করছে, যোগ-ব্যায়াম করছে, তখন কানাই ওসব কিছুর মধ্যেই নেই। তখন সে ছুটোছুটি লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, অন্য বিপ্লবীদের সন্দেশ কিংবা বিস্কুট খেয়ে নিচ্ছে। কিংবা আম খেতে খেতে অন্যের গায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে। সব বিপ্লবীদেরই যেন উত্যক্ত করে ছাড়ছে। দুপুরবেলা দু'তিন থালা লাপসি খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। আর রাত্রিবেলা চুপিচুপি উঠে একজনের কাছা অন্যজনের কোঁচার সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছে। হয়তো বা কারুর কোঁচার সঙ্গে বেড়াল ছানা বেঁধে দিচ্ছে। ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই নিজের জায়গায় শুয়ে নাক ডাকতে শুরু করে দিচ্ছে। তবুও সকলে তাকে ভালোবাসত।

ইতিমধ্যে একদিন গোপন বৈঠকে বারীন্দ্রকুমার নির্দেশ দিলেন চুপ করে জেলে বসে না থেকে জেল থেকেই বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাও। যে বন্ধুরা জেলে বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাদের মাধ্যমে অস্ত্র আনিয়ে নাও তোমরা সকলে। তারপর জেলরক্ষীদের একদিন আক্রমণ করে জেল ভেঙ্গে পালিয়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নাও। শেষে জঙ্গল থেকে ইংরেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে দাও। বলাবাহুল্য, ওই দিন থেকেই দেখা করতে আসা বন্ধুদের মাধ্যমে জেলের ভেতর অস্ত্র আনানো শুরু হয়ে গেল। শোনা যায়, একটা কাঁঠালের মধ্যে রিভলবার রেখে জেলে পাঠানো হয়েছিল।

বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা:

কয়েকদিন ধরে লক্ষ করা যাচ্ছিল, জেলবন্দী নরেন গোঁসাই-এর ক্ষেত্রে জেলের কড়াকড়ি নিয়মনীতি যেন বেশ শিথিল করা হয়েছে। সকলেই বেশ অবাক ও বিরক্ত। সন্ধের পর সাহেবদের যেখানে রাখা হয় সেখানে রাখা হত ওকে। আলাদা খাতির-যত্ন করা হচ্ছে নরেনকে। ১৯০৮ সালের ২৩ জুন তারিখে বন্দীদের আদালতের কাঠগোড়ায় তোলা হয়েছে। হঠাৎ বন্দীদের কাঠগোড়া থেকে নরেনকে সাক্ষীদের কাঠগোড়ায় সরিয়ে নেওয়া হল।

শোনা গেল, ইংল্যান্ডেশ্বর তাকে ক্ষমা করেছেন তার স্বীকারোক্তির জন্য। এখন বিপ্লবীদের সমস্ত গোপন কথা বলাতেই নরেনকে আদালতে আনা হয়েছে। সকলেই স্তম্ভিত–সর্বনাশ। তা হলে তো আর কারোরই নিস্তার নেই।

এই খবর যখন কয়েকটি কাগজে বেরিয়ে গেল তখন দেশের সব মানুষই এই বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এমনকি, কানাইলালের মা পর্যন্ত বললেন–এমন সর্বনেশে

বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। কেউ কি নেই যে ওই বিশ্বাসঘাতককে কালবিলম্ব না করে শেষ করে দিতে পারে? তখন তো আর তিনি জানতেন না যে তারই ছেলে কানাই এই কাজের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে।

বারীন্দ্রকুমার যখন জেল ভেঙ্গে পালিয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত তখনি কানাইলাল, সত্যেন বসু এবং আরও দু'এক জন বারীন্দ্রকুমারকে বোঝালেন, আগেই বিশ্বাসঘাতকটাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে তাঁদের সংগঠনই শেষ হয়ে যাবে। আর কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাই আগেই বিশ্বাসঘাতকটাকে শাস্তি দিতে হবে এবং এমন শাস্তি দিতে হবে যে এদেশে বিশ্বাসঘাতকতা যেন আর কেউই করতে সাহস না পায়। শেষপর্যন্ত বারীন্দ্রকুমার কানাই ও সত্যেন বসুর যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারলেন। আর তাই সানন্দে ওদের সমর্থনও জানালেন।

সত্যেন্দ্রনাথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ২৭ জুলাই তাঁকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় মাসখানেকের জন্যে। ২৯ আগস্ট নরেন গোঁসাই জেল সুপারের সঙ্গে দেখা করে বললেন, অনুমতি দিন আমি একবার জেল হাসপতালে যাব।

কেন?

ওখানকার সত্যেন বসু খবর পাঠিয়েছেন যে উনিও স্বীকারোক্তি দিয়ে মুক্তি পেতে চান।

ঠিক আছে। যখন খুশি আপনি যেতে পারবেন। সেই দিন ২৯ আগস্ট পরের দিন ৩০ আগস্ট ননের গোঁসাই সত্যেন বসুর সঙ্গে দেখা করে এলেন। দুজনের মধ্যে ঠিক হল ৩১ আগস্ট আবার তারা দেখা করবেন।

এদিকে ৩০ আগস্ট সকালে কানাইলাল পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাঁকেও শেষপর্যন্ত ৩০ আগস্ট তারিখেই জেল হাসপাতালে ভর্তি করতে হল।

৩১শে আগস্ট সকালে একজন জেলকর্মী ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডের সুপারকে জানালেন যে, সত্যেন বসু নরেন গোঁসাই-এর সঙ্গে দেখা করতে চান। তা শুনেই সুপার হিঙ্গিস নামের এক জেলকর্মীর সঙ্গে নরেনকে পাঠিয়ে দিলেন। জেল হাসপাতালের কাছাকাছি আসতেই নরেন দেখতে পেল ইতিমধ্যেই সত্যেন ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। হাসপাতালে প্রবেশ করেই নরেন ওষুধের ঘরে ঢুকে গেল এবং হিঙ্গিসকে বলল, সে যেন সত্যেনকে ওই ওষুধের ঘরে ডেকে আনে। এমন সময় দেখা গেল, কানাই অন্য একটা ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সত্যেন ও কানাই দুজনেই নরেনের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওই ওষুধের ঘরটার মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই ওষুধের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কারোর মুখেই কোন কথা নেই। এভাবে মিনিট দশেক কেটে যাবার পর সত্যেনের পিস্তলটা হঠাৎ গর্জে উঠল। সে নরেনকে লক্ষ্য করেই গুলিটা ছুঁড়েছিল। কিন্তু নিশানা ঠিক না হওয়ায় গুলিটা নরেনের একটা হাতে লাগে।

ওরে বাবারে, আমায় মেরে ফেলল রে, বলে চিৎকার করতে করতে নরেন ফের সেই ওষুধের ঘরটায় ঢুকে পড়ল এবার তার ঠিক পেছনেই কানাই ও সত্যেন। দুজনেরই হাতে গুলিভরা রিভলভার। হিঙ্গিস এই সময় কানাইকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করতেই কানাই-এর রিভলবার গর্জে উঠল। এবার গুলিটা হিঙ্গিসের কোমরে লাগায় সে মাই লর্ড বলে মাটিতে বসে পড়ল। ওদিকে তখন সত্যেনকে নরেনের দিকে তাক করতে দেখেই নরেন চিৎকার করতে করতে এক দৌড়ে ওষুধের ঘর থেকে বেরিয়ে আরও জোরে দৌড়োতে লাগল। কানাই ও সত্যেন তখন গুলি চালাতে চালাতে নরেনের পেছন পেছন ছুটতে লাগল। ওই সময় কানাই-এর

একটা গুলি নরেনের কোমরে বিঁধে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে উল্টো দিক থেকে ছুটে আসা এক ইংরেজ জেলকর্মী সত্যেনকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে কানাই ওই ইংরেজ জেলকর্মীর মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করে দিয়েই একলাফে নরেনের কাছে পৌঁছে যায়। তারপর রিভলভারের বাকি সব গুলিই নরেনের ওপরই চালিয়ে দেয়। নরেন লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে একটা ড্রেনের ভেতর গিয়ে পড়ে। এবার কানাই তার রিভলভারটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ধরা দেবার জন্য সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যেনও মাটি থেকে উঠে এসে হাতের রিভলবারটা মাটিতে ফেলে দিয়ে গ্রেপ্তার হবার জন্য সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। দুজনের কেউই পালাবার কোন রকম চেষ্টাই করেননি। তারা আসলে দেশদ্রোহীকে তার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পেরেই তৃপ্ত ও ধন্য।

জলের ভেতরে ও বাইরে, চারদিকেই সে কী তুমুল হৈ-হৈ। উন্মত্ত জনতা পাগলের মতো পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছেন। মুকুটহীন রাজা (Uncrowned King) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে ডেকে ডেকে জনগণকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছিলেন। জনগণের অনুভবে এ যেন রাহুমুক্তি। এ যেন স্বাধীনতার পদধ্বনি শোনা। কী সাংঘাতিক ব্যাপার রে বাবা। জেলের ভেতরেই বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীকে খুন। ব্রিটিশ শাসকদেরও কেউ কেউ কানাইলালের প্রশংসা না করে থাকতে পারেনি। খাস ব্রিটিশ কাগজেও লেখা হয়েছিল–'নরেন্দ্রনাথ নিজেকে বাঁচাবার জন্যে দেশের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন। পাছে সব কথা বলে তিনি দেশের আরও ক্ষতি করেন তাই তার আগেই তাকে হত্যা করেছে। এখানে একের ক্ষতিতে অনেকের উপকার হয়েছে। এ হত্যাকে হীন বলা যায় না। আত্মত্যাগ এবং গৌরবের আলোয় এ হত্যা উজ্জ্বল।'

(বিবেকানন্দ ভট্টাচর্য, শহীদের রক্তে রাঙা, পৃ. ৬৮)

তারপর। তারপর তো সেই একই কথা। বিচারের নামে প্রহসন করে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসির হুকুম হল। ফাঁসির হুকুম শুনে কানাই প্রথমে একটু হাসল। তার পরেই হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল–ফাঁসির দিনটা কবে ঠিক হয়েছে?

ফাঁসির হুকুম হয়েছে শুনে কানাই-এর দাদা ডাঃ আশুরোতষ দত্ত ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ওই সময় দুজন ইংরেজ আশুতোষবাবুকে বলেছিলেন–এমন আশ্চর্য ছেলে আমরা জীবনে কখনও দেখিনি। সব সময় হাসি তামাশায় মশগুল হয়ে আছে। মৃত্যুকেও হারিয়ে দিয়েছে। ওই সময় কানাই বড়ো ভাইকে বলেছিলেন–'মাকে যেন এনো না কোনো দিন। আর শোনো আমার মৃত্যুর পর যেন শ্রাদ্ধ-শান্তি করতে যেও না।'

ফিরে আসার সময় আশুতোষ বাবু ছোট ভাইয়ের হাতে হাত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়ম নেই বলে পারছিলেন না। দুজন ইংরেজ জেলকর্মী ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে আশুতোষ বাবুকে বলল, আমরা এবার কিছুক্ষণ অন্য দিকে চেয়ে থাকছি এই ফাঁকে আপনারা দু-ভাই হাত মিলিয়ে নিন। ভাবতে সত্যিই অবাক হতে হয় যে ফাঁসির হুকুম হবার কয়েক দিনের মধ্যেই কানাই-এর ওজন ষোলো পাউন্ড বেড়ে গিয়েছিল।

ফাঁসির ঠিক আগের দিন কানাইকে হাসি-তামাশা করতে দেখে এক ইংরেজ জেলকর্মী বলেছিল–আজ হাসছ দেখছি। কিন্তু কাল ফাঁসির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই হাসিটা অটুট থাকবে তো?

সেই রাতে কানাই এমন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিল যে ঠেলাঠেলি করে শেষ রাত্রে তার ঘুম ভাঙ্গাতে হল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কানাই তৈরি হয়ে গেল। তারপর চারজন ব্রিটিশ জেলকর্মীর পেছন পেছন নির্ভীক ও দৃঢ় পদক্ষেপে কানাই মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল। প্রায় লাফ দিয়েই মঞ্চে উঠে পড়ল। এমন সময় গত দিনের সেই ইংরেজ জেলকর্মীটিকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে বলল, হ্যালো মিস্টার, কী দেখছেন–আমার গত দিনের হাসি আজ ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তেও অটুট আছে, না, হারিয়ে গেছে? সেই জেলকর্মীটি লজ্জায় তার মাথা থেকে টুপিটি খুলে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, তার আর দোষ কোথায়? সে তো তার জীবনে মৃত্যুকে জয় করার এমন বীরত্ব আর কখনও দেখেইনি।

গলায় ফাঁসটা পরিয়ে দেওয়া হল ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর ভোর ৬টার কিছু পরে। ইতিমধ্যে কানাই-এর মাথায় কালো একটা টুপি পরিয়ে তার মুখ পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হল। জেল সুপারের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই জল্লাদ একটা হ্যান্ডেলে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে কানাই ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে লাগল। আর নড়ল না।

জয়তু বিপ্লবী কানাই লাল।

লেখক: আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

তথ্যসূত্র:
১. ইতিহাসের পাতা থেকে (প্রথম খণ্ড)– আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক: মিত্রম্, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা–৭৩, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০০৮।